# গোদান

প্রেমচন্দ

অনুবাদক

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

শ্রীস্বর্ণপ্রভা সেন

সরস্বতী প্রেস, বেনারস

১৯৪৫

প্রকাশক—শ্রীপতরায়
সরস্বতী প্রেস,
বেনারস

মূল্য ৫॥০ সাড়ে পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

# ভূমিকা

অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট প্রেমচন্দ অপরিচিত। এখানে তাঁহার কিছু পরিচয় না দিলে 'অপরিচয়াদবজ্ঞা' হইতে পারে; এই আশঙ্কায় তাঁহার সম্বন্ধে সামান্য কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য নীচে দেওয়া হইল। বাঙ্গালী পাঠক ইহা হইতে তাঁহার জীবনী, ব্যক্তিত্ব ও রচনার খানিকটা ধারণা করিতে পারিবেন

প্রেমচন্দের পিতৃদত্ত নাম নবাব রায়। তাঁহার জন্ম ১৮৮০ সালে, ৩১শে জুলাই তারিখে, কাশীর অদূরবর্তী কোনও গ্রামে। যৎসামান্য পৈতৃক বিত্ত যাহা ছিল তাহাতে সংসারের ব্যয় কুলাইত না বলিয়া তাঁহার পিতাকে ডাক বিভাগে সামান্য কাজ করিতে হয়। অল্প বয়সেই পিতামাতার মৃত্যু ঘটে; বালক কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শেখেন এক সময়ে তিনি এতই অভাবে পড়িয়াছিলেন যে পড়াশুনা চালাইবার জন্য তখন মাসে ছয় টাকা প্রাপ্তির আশায় নিত্য তিন মাইল হাঁটিতে হইত। ক্রমে প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রামে বালক জয়ী হইতে আরম্ভ করিলেন; মাসে ত্রিশ টাকা বেতনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা হইতে শুরু করিয়া ক্রমে তিনি সব-ইন্‌স্‌পেক্টর অফ স্কুলস্ হন। উর্দু গল্প লেখার জন্য সাহিত্যিক সমাজে ও পাঠকবর্গের নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি ও সুনাম যথেষ্ট হইয়াছিল। উর্দু মাসিকপত্র 'জমানা'য় প্রকাশিত মমতা নামে গল্প বোধ হয় তাঁহার প্রথম রচনা। ইহা ১৯১০-এরও পূর্বেকার কথা। কিন্তু তাঁহার কাহিনী কর্তৃপক্ষের মনোমত না হওয়ায় তিনি 'নবাব রায়' নাম ত্যাগ করিয়া 'প্রেমচন্দ' নাম গ্রহণ করেন এবং পরে সাহিত্যিকদের মধ্যে এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯২০ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হয় তখন তিনি গোরখপুর জেলায় কাজ করিতেছিলেন, সরকারি চাকুরি ছাড়িয়া তিনি মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে দেশসেবায় ব্রতী হন। ইহার পর তিনি কিছুদিন কানপুরে মারোয়াড়ী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন, কাশী বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষপদেও কিছুদিন নিযুক্ত ছিলেন। দেশসেবার সঙ্গে সাহিত্যসেবা সমান তালেই চলিতে লাগিল। ১৯২৭ সালে তিনি মাধুরীর সম্পাদনা করিতেছিলেন। চার পাঁচ বৎসর তিনি মাধুরীর প্রধান সম্পাদক ছিলেন। হিন্দী সাপ্তাহিক জাগরণ ও ভারতীয় সাহিত্যপরিষদের মুখপত্র মাসিক হংস (১৯৩০) তাঁহারই

সৃষ্টি। সাহিত্যের পথেই তিনি দেশসেবার উপায় খুঁজিয়া পাইলেন; হংসের মধ্য দিয়া নিখিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সাহিত্যিক একটা যোগসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিবেন, ইহা ছিল তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা। জাগরণ ও হংসের পাঠকেরা জানেন, তিনি শুধু উপন্যাস ও গল্পই রচনা করেন নাই, বহু প্রবন্ধে পাঠকদের চিন্তা করিতেও শিখাইয়াছিলেন। প্রগতিশীল লেখকদের ও প্রগতিসাহিত্যের তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

ছায়াচিত্রের দৃশ্যাবলী রচনা ও লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন বলিয়া তিনি বোম্বাইয়ে যান; প্রাপ্তি সমধিক, কিন্তু কোম্পানীর হুকুমদারি তাঁহার সহ্য হইল না। সাধারণ লোককে একমাত্র হাসানোও তাঁহার নিকট ভাল বলিয়া মনে হইল না। তিনি কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুকাল পরে প্রায় দুই মাস রোগের যন্ত্রণা ভুগিয়া ১৯৩৬-এর ৮ই অক্টোবর তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

প্রেমচন্দ বিস্তর ছোটগল্প লিখিয়াছেন। হিন্দীভাষায় তাঁহার প্রথম গল্পসংগ্রহ 'সপ্ত-সরোজে'র (১৯১৭) মধ্যে 'বড়ে ঘর কী বেটী' ও 'পঞ্চ পরমেশ্বর' পাঠকদের মনে গভীর ছায়াপাত করিয়াছিল। তাঁহার 'নবনিধি'র ( ১৯১৯ ) অধিকাংশ গল্প ঐতিহাসিক। তাঁহার প্রেমপূর্ণিমা, প্রেমপচীসী, প্রেমপ্রতিমা ( ১৯২৮ ), মানসরোবর ( ১৯৩৬ ), হিন্দী কথাসাহিত্যে যুগান্তর আনিয়া দেয়। তাঁহার উপন্যাসের মধ্যে প্রেমাশ্রম (১৯১৯), রঙ্গভূমি ( ১৯২৫ ), সেবাসদন, ( ১৯১৬ ), গওঅন ( ১৯৩০ ), কায়াকল্প ( ১৯৩২ ), কর্মভূমি (১৯২৭), গোদান ( ১৯৩৬ ), হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহাসিক সগৌরবে ইহাদের নাম করিবে। রচনার পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে; তাহার গুণের কথা তো আছেই। সে গুণের কথার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয় সমাজের বিভিন্ন স্তর, বিশেষ করিয়া অবহেলিত স্তরের, সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা; বাস্তববাদী তিনি নহেন, তিনি হইলেন আদর্শবাদী। তথাপি সে আদর্শবাদ শূন্যগর্ভ নহে, তাহা স্বপ্নবিলাসী নহে, তাহার ভিত্তি বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতায়। ভারতের জাতীয় মহাসভায় যে গণসংযোগের কথা বলা হইয়াছে, প্রেমচন্দ তাঁহার সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছেন; ভারতের দরিদ্র কৃষক, যাহার জীবন কাটিয়া যায় প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতেই, সে প্রেমচন্দের শেষ উপন্যাস গোদানে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ঔপন্যাসিক প্রেমচন্দ গল্প বলিতে জানেন, কোনও দার্শনিক মতবাদ প্রচার তাঁহার মুখ্য কর্তব্য নহে; গল্প বলার

কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভাষার গুণের কথাও বলা উচিত—সহজ, গ্রাম্য শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত ভাষায় তিনি গ্রামের চিত্র আঁকিতে পারেন। সে চিত্রে দুঃখের কথাও আছে, আবার দারিদ্রমিশ্রিত জীবনের মধ্যে মনের যে সুখের পথ খোলা আছে তাহার রেখাও তিনি টানিয়াছেন।

প্রেমচন্দের জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দীভাষী সমালোচক বলিয়াছেন,—"বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস যাঁহারা বাংলায় পড়িয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে আমার কথা স্বীকার করিবেন যে প্রেমাশ্রমের অনেক স্থলে মনস্তত্ত্ব বিচারের ছবি আঁকিতে গিয়া প্রেমচন্দজী কোথাও কোথাও বঙ্কিমবাবুকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে বাংলায় বঙ্কিমবাবুর রীতি যেখানে শব্দবহুল, প্রেমচন্দজী সেখানে অনেক স্থলে অল্প কথায় সুকৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছেন।...ভবিষ্যৎকালে ইতিহাসলেখক যখন ভারতীয় উপন্যাসের আলোচনা করিবেন তখন কৃষকের চিত্র সুন্দর ও যথার্থ ভাবে আঁকিয়াছেন বলিয়া প্রেমচন্দকে প্রধান স্থান দিতে হইবে।" পূর্বে বলিয়াছি, সপ্ত-সরোজ প্রেমচন্দের হিন্দী ছোট গল্পের প্রথম সংগ্রহ। ইহার সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন বলিয়া সপ্ত-সরোজের নবম সংস্করণের ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে—"গল্পগুলি বাস্তবিকই অতি উৎকৃষ্ট ও ভাবপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের সহিত ইহাদের তুলনা করা অন্যায় ও অনুচিত সাহস; কিন্তু অন্য কোনও বাঙ্গালী লেখক এত ভাল গল্প লিখিতে পারেন কিনা, সন্দেহের বিষয়।" হিন্দী সাহিত্যের পাঠক ও সমালোচক যাঁহারা, তাঁহাদের মতে প্রেমচন্দের আসন বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের নিকটে, এই কথা নির্দেশ করিবার জন্যই এখানে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। নতুবা এ সকল বিচারে এরূপ তুলনার তেমন অর্থ নাই।

ছোটগল্পেই প্রেমচন্দ বেশি পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, না উপন্যাসে, সে বিষয়ে পাঠকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁহার সমালোচকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন, ছোটগল্পেই প্রেমচন্দের বেশি নৈপুণ্য। তবে একথা ঠিক যে, উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরে লেখকের দোষ ও গুণ, দুই-ই বড় করিয়া দেখা দিয়াছে। উপন্যাসের মধ্যে ক্রটির পরিচয় যদি কোথাও কোথাও মেলে, তবে গুণও সেখানে স্পষ্ট, নিঃসন্দিগ্ধরূপে বর্তমান।

প্রেমচন্দের হিন্দী উপন্যাসের বাংলায় অনুবাদের কিছু প্রয়োজন ছিল কি? অনেকে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও করিতে পারেন। এ প্রশ্নের

দুইটি উত্তর আছে। প্রেমচন্দের উপন্যাস কথাসাহিত্যের কষ্টি পাথরে উৎকৃষ্ট উপন্যাস বলিয়া বিবেচিত হইবে। অনেক পাঠক পড়িয়া মনে করিবেন, বাস্তবিক বাংলা ভাষায় এরূপ অনুবাদের প্রয়োজন ছিল—এই ভরসা আছে বলিয়া অনুবাদ করিয়াছি। অনেক স্থলে তিনি বাঙ্গালী পাঠকের নিকটে আদরণীয় বিবেচিত হইবেন, কোনও কোনও স্থলে বাঙ্গালী পাঠক হয়তো মনে করিবেন যে বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিক উৎকৃষ্টতর। তথাপি প্রেমচন্দের উৎকর্ষ উপেক্ষা করিবার নয়, তাঁহার কৃতিত্ব জ্ঞাতব্য ও আদরণীয়। দ্বিতীয় উত্তর, আমাদের সাহিত্যিক বিচারে উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, প্রতিবেশী সাহিত্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন তাঁহাদের লেখার সঙ্গে পরিচয় থাকা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়; প্রতিবেশী বলিয়াই প্রয়োজন। যে প্রয়োজনে মনস্বী আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতভাষা বিভাগ খুলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য এতদতিরিক্ত উত্তর; একজাতীয়ত্বের জন্য আধুনিক ভারতভাষার, অন্ততঃ ভারতসাহিত্যের অনুশীলন করা আমাদের পরম প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে যোগ আরও দৃঢ় হইবে, সে যোগ হইবে শুধু ভৌগোলিক ঐক্য নয়, ভাবগত যোগ, একত্র এক আসরে বসিয়া রসাস্বাদনের যে আনন্দ তাহার জন্য পরস্পরে আত্মীয়তাবোধ।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি শুনিয়া প্রেমচন্দের সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। বৃহদাকার উপন্যাসের আদ্যোপান্ত তিনি ধৈর্য ধরিয়া শুনিয়াছিলেন; অনুবাদ প্রকাশে তাঁহার আগ্রহ আমাদিগকে অনেকখানি উৎসাহিত করিয়াছে। অনুবাদের একটা প্রুফ দেখিয়াছেন বন্ধুবর শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়, নতুবা শুদ্ধ আমার নিজের উপর নির্ভর করিলে অনেক ভ্রমপ্রমাদ থাকিয়া যাইত। দুই চারিটি ত্রুটি তাঁহারও সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে; তাহার জন্য আমিই দায়ী, কারণ শেষ প্রুফটি আমি দেখিয়াছি। আশা করি, অনুবাদের অপটুতায় ও মুদ্রাকরের প্রমাদে প্রেমচন্দের উপন্যাসের গল্পভাগের মাধুর্যের ব্যাঘাত ঘটে নাই। এই সম্পর্কে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের কর্মীদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

১

হরিরাম বলদ দুটিকে দানাপানি দিয়া আসিয়া পত্নী ধনিয়াকে বলিল—গোবরকে পাঠিও আখের ক্ষেতে। আমার ফিরতে কত বেলা হবে জানি না। আর দেখ, আমার লাঠিটা দাও তো।

ধনিয়ার দুই হাত গোবরমাখা। সে ঘুঁটে দিতেছিল, বলিল—আরে একটু জল-টল তো খেয়ে যাও, এত তাড়া কিসের?

রুক্ষ চুলে ভরা মাথাটিতে ঝাঁকানি দিয়া হরি বলিল, তোমার তো জলখাবারের চিন্তা, এদিকে আমি ভাবছি, আর দেরি হলে মালিকের সঙ্গে দেখাই হবে না। যদি স্নান-পূজায় বসে যান, তবে তো একটা ঘণ্টা বসেই কাটাতে হবে।

তাই তো বলি, একটু জল-টল খেয়ে যাও। আর আজ না গেলেই বা এমন ক্ষতি কি? এই তো পরশুই গিয়েছিলে।

তুই যে কথা বুঝিস না তার মধ্যে ঠোক্কর মারিস কেন বল্‌তো! দে, আমার লাঠিগাছটা দে, আর নিজের কাজ কর্‌। এই যে যাতায়াত করছি এরই জন্যে না আজ অবধি প্রাণে বেঁচে আছি! নইলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম কে জানে! গ্রামে এত লোক তো আছে—কার না জমি বেদখল হয়েছে, কার ওপর শমন আসে নি?

ধনিয়া অত মারপ্যাঁচ বোঝে না। ওর মতে, আমরা ক্ষেতে চাষ দেব, আর মালিক তার ফসল পাবে—এই হল রীতি। তা মালিকের খোসামুদি বা কেন করব, আর তার কথায় ওঠা বসাই বা কেন? যদিও এই বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে সে বেশ দেখিয়াছে যতই না হেরফের কর, যতই না কৌশলে চল, চাই কি এক একটি কড়ি দাঁত দিয়া চাপিয়া ধর, কিছুতেই পুরা ফসল পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তবু ও হার মানিতে চায় না। ইহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে চিরদিন

মতের অমিল রহিয়াই গিয়াছে। ধনিয়ার ছয়টি সন্তানের তিনটি কেবল এখন জীবিত, বছর ষোল বয়সের ছেলে গোবর, আর দুই মেয়ে সোনা ও রূপা, বয়স যথাক্রমে বারো ও আট বছর। আরো তিনটি ছেলে শৈশবেই মারা গিয়াছে। ধনিয়ার মা এখনও বলে, যদি ওষুধপত্র দিতে পারিত, শিশুগুলি এখনও বাঁচিয়া থাকিত ; কিন্তু সে এক আধলারও ওষুধ আনিয়া দিতে পারে নাই। আর ওরই বা কি বয়স ? ছত্রিশ বৎসর হয়তো বা হইবে, কিন্তু ইহারই মধ্যে সমস্ত চুলে পাক ধরিয়াছে, চেহারার মধ্যে বার্ধক্যের ছাপ, গায়ের চামড়া ঢিলা, অমন সুন্দর ফরসা রং কালি হইয়াছে, আর চোখেও কম দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। পেটের চিন্তাই তো ইহার কারণ—জীবনে সুখ কখনও মিলিল না। এই চিরস্থায়ী দৈন্যদশা উহার আত্মসম্মানকে করিয়াছে বৈরাগ্যে মণ্ডিত। যে গৃহস্থের পেটের ভাত জোটে না, তার আবার মালিককে খোসামোদ করিতে যাওয়া কেন ? এই অবস্থায় উহার মন সর্বদাই বিদ্রোহ করিয়া বসিত, আর দুই চার বার ধমক খাইয়া তবে চুপ করিত।

স্বামীর কাছে হার মানিয়া ধনিয়া তাহার লাঠি, মেরজাই, পাগড়ি, জুতা আর তামাকের থলিটি আনিয়া সামনে ধরিল।

হরি কটাক্ষ করিয়া বলিল, কিগো, শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি না কি, যে পাঁচ রকম পোষাক এনে হাজির করেছ ? আর শ্বশুরবাড়িতেও তো কোন সোমত্ত শালী-শালাজ নাই যে গিয়ে দেখাব ?

হরির ঘন কালো কুঞ্চিতচর্ম মুখের উপর দিয়া মৃদু হাসির কোমল আভা খেলিয়া গেল। ধনিয়াও সলজ্জ হাসিয়া বলিল, আর নিজেই যেন কত জোয়ান যে শালীশালাজ ওঁকে দেখলেই মজে যাবে !

হরি তড়াক করিয়া উঠিয়া অতি সাবধানে মেরজাইটি ভাঁজ করিয়া খাটের উপরে রাখিয়া দিল, বলিল, কী, তুমি কি ভাবছ আমি বুড়ো হয়ে গেছি ? এখনো তো চল্লিশই হয় নাই। মরদ তো ষাট বছরেও তাগড়া থাকে।

যাও না, গিয়ে আয়নায় মুখটা দেখ একবার। তোমার মত পুরুষ 'ষাটে পাঁঠা' থাকে না। সারা জীবন তো দুধ-ঘি কত খাচ্ছ, আবার চেহারা ! তোমার দশা দেখে দেখে আমার আরো ভাবনাই হয়—ভগবান, বুড়ো বয়স কি করে কাটবে ? কার দুয়োরে ভিক্ষা করে খাব ?

হরির মুখের এই ক্ষণিকের কোমলতা বাস্তবের আঁচে গলিয়া গেল, লাঠি

সামলাইতে সামলাইতে বলিল, ঘাট পর্যন্ত পৌঁছবার ভাগ্য আমার হবে না রে ধনিয়া, তার আগেই যেতে হবে।

ধনিয়া রাগ করিয়া বলে, রাখ, রাখ, ওসব অলক্ষুণে কথা আর মুখে আনতে হবে না, তোমাকে ভাল কথা বললেও হয়ে যায় মন্দ।

লাঠি কাঁধে ফেলিয়া হরি ঘরের বাহির হইল, দরজার কাছে গিয়া ধনিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া উহার পথে চাহিয়া রহিল। ধনিয়ার শোকতপ্ত বুকে হরির এই নিরাশার কথাগুলি ভয়ের আতঙ্কের দোলা দিতে লাগিল। ও যেন আপন নারীত্বের পূর্ণ তেজে ও ব্রতনিয়মের বলে স্বামীকে অভয় দিতে লাগিল। অন্তরের প্রার্থনা ও শুভকামনার ব্যূহরচনা করিয়া ও স্বামীকে লুকাইয়া নিরাপদে রাখিতে চায়। বিপদের এই অথই জলে ওর প্রেম যেন সেই তৃণ, যাহাকে ধরিয়া ও স্বামীকে বিপদসাগরের পারে লইয়া যাইবে। এমন অসঙ্গত কথা সত্য হইলেও ও মুখ হইতে ছিনাইয়া লইতে চায়, আর এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয় বলিয়াই উহার এত বিচলিত ভাব।

কাণাকে কাণা বলিলে তাহার যে কি আঘাত লাগে, চক্ষুষ্মান্ লোক তাহা কি করিয়া বুঝিবে?

হরি পা চালাইয়া দিল। পায়ে-চলা রাস্তার দুই ধারে ঢেউ-খেলানো আখের সবুজ ক্ষেতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনে হইল, ভগবান মুখ তুলে চান, যদি আর নতুন কোন জরিমানা না চাপে, তবে একটি গোরু নিশ্চয় কিনবো। দেশী গোরুতে না দেয় দুধ, না ওর বাছুরই কোন কাজে লাগে। খুব বেশি হয় তো কলুর ঘানি ঘোরাবে। না, ঐ পশ্চিমী গোরুই কিনব। ওর খুব সেবা যত্ন করব। খুব কমও যদি হয় তো চার পাঁচ সের দুধ দেবে। গোবর দুধের জন্য হা পিত্যেশ করে থাকে। এই বয়সেই যদি ভাল করে খেতে না পেলে তো আর কবে খাবে? একটা বছর যদি ভাল করে দুধ খাওয়াতে পারি তো চেহারা বদলে যাবে। এদিকে বাছুরটা বেশ ভাল বলদ হবে। দু শ টাকার কমে গোরু কেনা হবে না। তাছাড়া দরজার কাছে গোরু বাঁধা থাকলে কেমন শোভা হবে! ভোরে উঠেই কেমন গোরুর মুখ দেখা যাবে! হা ভগবান, জানি না কবে আমার এ সাধ পূর্ণ হবে।

সব গৃহস্থের মতই হরির মনেও একটি গোরু কেনার আকাঙ্ক্ষা আজন্ম চলিয়া আসিয়াছে। ইহাই উহার জীবনের প্রধান স্বপ্ন, সব চেয়ে বড় সাধ। ব্যাঙ্কে

টাকা রাখিয়া মোটা সুদের আরাম ভোগ করা, বা জমি কিনিয়া মস্ত বাড়ি তৈয়ারি করিবার মত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, তাহার ক্ষুদ্র মনে কি করিয়া আসিবে? জ্যৈষ্ঠের সূর্য আম গাছের পাতার মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া লালিমায় আকাশ রঞ্জিত করিয়া তুলিল। ক্রমে মাথার উপর উঠিয়া মধ্যাহ্ন দীপ্তি প্রখর হইয়া রজত বর্ণ ধারণ করিল; বাতাস গরম হইয়া উঠিল। দুই দিকে চাষীরা ক্ষেতে কাজ করিতেছিল, হরিকে দেখিয়া 'নমস্কার' বলিয়া সম্ভাষণ করিল, আর সসম্মানে হুঁকা বাড়াইয়া দিল। কিন্তু হরির অবসর কোথায়? অন্তরের সম্মান-লালসা এই সমাদর লাভে উহার সারা মুখে গর্বের আনন্দ ফুটাইয়া তুলিল। মনিবের কাছে খাতির আছে বলিয়াই তো আজ সকলে উহাকে খাতির করে। নতুবা কেই বা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত? পাঁচবিঘার চাষীর মূলধনই বা কি? আর এই যে তিন-তিন চার-চারখানা হালের মালিকেরা উহার সম্মুখে মাথা নীচু করিয়া নমস্কার জানায়, এ কি কম সম্মান?

এই বার হরি মাঠের রাস্তা ছাড়িয়া এক খালের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। এই খালটা বর্ষাকালে জলে ভরিয়া যায় বলিয়া কয়েকটি নৌকা সর্বদা বাঁধা থাকিত, আর জ্যৈষ্ঠ মাসেও স্থানে স্থানে ঘাসের সবুজ রং চোখে পড়িত। আশে পাশের গ্রাম হইতে গোরুগুলি এই খানে চরিতে আসিত। এই গ্রীষ্মেও এখানকার হাওয়া একটু শীতল আর আর্দ্র। হরি এখানে আসিয়া জোরে দুই তিন বার শ্বাস নিল। উহার মনে ইচ্ছা হইল, এখানে একটু জিরাইয়া লয়। দিন ভর তো গরম লুর মধ্যেই দৌড় ধাপ করিতে হয়। একজন কিষাণ এই খালটির ইজারা লইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। বেশ কিছু দিতেও সে রাজী, কিন্তু রায়সাহেব—ঈশ্বর তাঁকে সুখে রাখুন—তাহাকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, এই জমি তিনি গোরুভেড়ার চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, যতই দাম উঠুক, আর উহা বিক্রী করিতে পারেন না। স্বার্থপর জমিদার হইলে বলিত, গোরু জাহান্নামে যাক, আমি টাকা পাইতেছি, ছাড়িব কেন? কিন্তু রায়সাহেব এখন পর্যন্ত প্রাচীন মর্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। মালিক যদি প্রজাকে না রাখে, তবে সে কি মানুষ?

হঠাৎ হরি দেখে, ভোলা গোরু নিয়া এই দিকেই আসিতেছে। ভোলা এই গাঁয়েরই গোয়ালা, দুধ মাখনের ব্যবসা করে। সুবিধামত দাম পাইলে কখনো কখনো কিষাণের কাছে গোরু বেচিয়া যায়। ভোলার গোরুগুলির উপর হরির

লোভ হইল। আহা, ভোলা যদি ঐ সামনের গোরুটি হরিকে দেয় তো ক্রমে ক্রমে সে টাকাটা শোধ করিয়া ফেলিবে। হরি জানে ঘরে টাকা নাই, এখনো জমিদারের পাওনাই শোধ করা হয় নাই; বিশ্বেশ্বর সাহার দেনাটাও পড়িয়া আছে, টাকায় আনা হিসাবে সুদ বাড়িয়া চলিয়াছে; কিন্তু দরিদ্রের এক প্রকার অদূরদর্শিতা আছে, যাহার জন্য সে অগ্রপশ্চাৎ ভাবেনা, লজ্জা ভুলিয়া যায়, গালাগালি আর মারামারিতে ভীত হয় না, এই অদূরদর্শিতাই হরিকে গোরু কিনিতে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। এক বৎসর যাবৎ এই সাধ উহার মনে দেখা দিতেছিল, এখন ভোলাকে দেখিয়া সে বিচলিত হইয়া পড়িল। ভোলার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, নমস্কার, তারপর, ভোলাভাই, খবর টবর সব ভাল তো? শুনলাম মেলা থেকে নতুন গাই কিনে এনেছ।

ভোলা একটু রুক্ষ স্বরে উত্তর দিল। হরির মনের কথা টানিয়া লইয়া সে বলিল, হাঁ, দুটি গোরু আর দুটি বাছুর কিনেছি। আগেকার গোরুগুলি সব রোগা হয়ে গিয়েছে। দুধ কমে গেছে, এখন দিন গুজরাণ হবে কিসে?

হরি সামনেকার গোরুটির গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, বেশ দুধ দেবে মনে হচ্ছে তো! কত দিয়ে কিনলে?

ভোলা ঝোপ বুঝিয়া কোপ দিতে জানে। সে বলিল, এখন বাজার যা চড়া, এরি জন্যে দিতে হল নগদ আশি টাকা। চোখ বেরিয়ে আসে। বাছুর দুটোর জন্যেই ত্রিশ টাকা করে দিলাম। ত্রিশ জনেরও বেশি খদ্দের, টাকায় আট সের করে দুধ চায়।

তোমাদের ভাই খুব বুকের পাটা। আর জিনিস যা এনেছ, পাঁচ দশ খানা গ্রামে কারু কাছে এমনটি পাওয়া যাবে না।

ভোলার দুষ্ট বুদ্ধি বাড়িয়া চলিল। সে বলিল, রায়সাহেব এই গাইটার জন্য একশ টাকা দিতে চেয়েছিলেন, আর বাছুর দুটির জন্যে পঞ্চাশ হিসেবে। কিন্তু আমি দিলাম না। ঈশ্বর যদি করেন, তো এই বিয়োনেই একশ টাকা উঠে আসবে।

এতে কি আর সন্দেহ আছে? মালিক কি সবই নেবেন? নজরানা নিতে হয়, বেশ তাই নাও। তোমাদের এই রীতি দেখি, আঁজলা-ভরা টাকা আছে, কপাল ঠুকে গুণে দিচ্ছ। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, এই গোরুটির দিকে চেয়ে থাকি। তোমাদের জীবন ধন্য, এমন করে গোরুর সেবা কর। আমরা তো গোরুর গোবর

পর্যন্ত চোখে দেখি না। গৃহস্থের ঘরে একটি গোরু নেই, এমন লজ্জার কথা আর আছে? বছরের পর বছর কেটে যায়, গব্য জিনিস চোখে দেখিনা। আমার গিন্নী বলে, আচ্ছা, ভোলাভাইকে কেন বলে দেখনা? আমি বলি, বলব, এবার দেখা হলেই বলব। তোমার ব্যবহারে বৌ ভারি প্রসন্ন। বলে যে এমন মরদ দেখিনি; যখন কথা বলে মাথা নীচু করে থাকে, মুখ তুলে চায় না।

ভোলার নেশায় রং ধরিয়া আসিয়াছিল, এ কথায় পেয়ালা একদম ভরপুর হইল। বলিল, সেই তো ভাল লোক যে পরের বৌ-ঝিকে নিজের বৌ-ঝিয়ের মতই সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখে। যে দুষ্টু লোক পরের স্ত্রীর দিকে চোখ দেয়, তাকে গুলি করে মারতে হয়।

ভাই, এতো লাখ কথার এক কথা। যে লোক পরের অন্তঃপুরকে নিজের অন্তঃপুরের সম্মান দেয়, সেই সজ্জন।

পুরুষ মরে গেলে স্ত্রী যেমন অনাথা হয়, স্ত্রী মারা গেলে স্বামীরও তেমনি হাত পা অবশ হয়ে যায়। আমার তো ভাই ঘর শূন্য, একঘটি জল দেবারও কেউ নেই।

গেল বৎসর ভোলার স্ত্রী লু লাগিয়া মারা গিয়াছে। হরি তাহা জানিত, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও ভোলার মন এত নরম তাহা হরির জানা ছিল না। বিবাহের কথায় উহার চোখ সজল হইয়া উঠিয়াছে, দেখিয়া হরিব স্বাভাবিক চাষার বুদ্ধি জাগিয়া উঠিল।

সে বলিল, ঘরণী বিনে ঘর ভূতের বাথান। বিয়ের সম্বন্ধ খোঁজ করনা কেন?

ভাই, খোঁজে তো আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি কিছু হবার নয়। একশ দেড়শ খরচ করতেও রাজী। দেখা যাক, ঈশ্বরের কি ইচ্ছা।

এখন থেকে আমিও খোঁজে থাকবো। ভগবান যদি করেন তো শীগগিরই তোমার ঘর বসত হয়ে যাবে।

সাবাস ভাই, এতেই বুঝেছ, ঘরে যেতে কি আমার মন চায়? ঘরে ভগবান খাবার মেলাই দিয়ে রেখেছেন, রোজ বিশ সের তো দুধই হয়, কিন্তু কি লাভ বল?

আমার শ্বশুর বাড়িতে একটি মেয়ে আছে। তিন চার বছর হল ওর

স্বামী ওকে ফেলে কলকাতা চলে গিয়েছে। বেচারী কোন মতে আটা পিষে দিন গুজরাণ করে। ছেলেপুলে নেই, দেখতেও বেশ সুন্দর, আর মেয়েটি খুব লক্ষ্মী।

ভোলার পোড়া কাঠের মত চেহারা যেন চিকণ হইয়া উঠিল, আশার মধ্যে এমনই সুধা। বলিল, তা তোমরাই ভরসা, সময় থাকে তো চলনা একদিন দেখে আসি।

আচ্ছা, আমি ঠিক ঠাক করে তোমাকে বলব। বেশি তাড়াতাড়ি করলে আবার কাজ পণ্ড হয়ে যায়।

হ্যাঁ, তাড়া কিসের, তোমার যখন সুবিধা হবে, নিয়ে যেও। আর দেখ, এই গোরুটা যদি মনে ধরে থাকে তবে নিয়ে নাও।

না দাদা, এ গোরু নেওয়া আমার সাধ্য নয়। আমি তোমার লোকসান করতে চাইনা। বন্ধুর গলায় ছুরি দেওয়া ধর্ম নয়। এত দিনই যখন কেটে গেছে, গোরু কেনা হয় নি, বাকি কটা দিনও কেটে যাবে।

হরি, ভাই, তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেন তুমি আমার পর। আমি তুমি কি ভিন্ন? নাও, গোরু নিয়ে যাও, দাম তোমার যা খুসি দিও। আমার কাছে ছিল, না হয় তোমার ঘরে থাকবে। আমি আশি টাকায় কিনেছি, তুমিও আশি টাকাই দিও। যাও।

দাদা, আমার হাতে কিন্তু নগদ টাকা নেই, আগেই বলে রাখি।

ভাল, নগদ টাকা কে চাইছে? হরির বুক তো ফুলিয়া দশহাত হইল। আশি টাকায় গোরু পাওয়া যাইবে সে ভাবিতেই পারে নাই। এমন সুন্দর গড়ন, দু বেলায় ছয়-সাত সের দুধ হইবেই, ছেলেটাও এর দুধ দোহাতে পারিবে। এর এক একটা বাছুরের দামই কম পক্ষে একশ টাকা হইবে। দরজায় বাঁধিয়া রাখিলে বাড়িটার কেমন শোভা হইবে। উহাকে এখনই না হক চল্লিশ টাকা তো দিতেই হইত। কিন্তু ও ধার করিয়া দেওয়ার কথায় আমল দিল না। বিয়ের সম্বন্ধটা ঠিক করিয়া দিতে পারিলে বছর দুই তিন তো ভোলা কিছুই বলিবে না। আর যদি সম্বন্ধটা নাই লাগে তবেই বা হরির কি ক্ষতি, বড় জোর ভোলা বার বার তাগিদ দিতে আসিবে, রাগ করিবে, গালাগালি করিবে, হরির এমন কিছু লজ্জা সরম নাই। এ সব তো উহার অভ্যস্ত। কৃষকজীবনে এগুলি তো অঙ্গের ভূষণ। ভোলার সঙ্গে ও প্রতারণা করিয়াছে, আর এই ব্যবহার উহার

পক্ষে শোভনও হয় নাই। আসলে তো উহার কাছে দেনা-পাওনার ব্যাপারে লেখাপড়া হওয়া না হওয়ায় বিশেষ প্রভেদ নাই। সুখের কল্পনার মধ্যে বিপদ আসিয়া পড়ার চিন্তা উহার মনকে ভীরু করিয়া তুলিয়াছিল। ঈশ্বরের রুদ্র রূপটিই সর্বদা উহার চোখে পড়িত। এই ছলনা উহার কাছে ছলনাই নয়, ইহা কেবল স্বার্থসিদ্ধির উপায়। ইহার মধ্যে দোষের কিছু নাই। এ রকম ছলনা তো তাহাকে দিনরাত করিতে হয়। ঘরে যখন দু'চার টাকা মজুত, মহাজনের কাছে হামেশা শপথ করিয়া বলিতে হয়, এক আধলাও নেই। পাট একটু ভিজাইয়া ভারি করিয়া দেওয়া আর তুলার মধ্যে কিছু বীজ ভরিয়া দেওয়া উহার কাছে ন্যায় কাজ। আর এখন তো কেবল স্বার্থ নয়, কিঞ্চিৎ ফুর্তি করাও হইল। বুড়োদের বিয়ে রোগ ঠাট্টারই বিষয়; আর ওরকম বুড়োর কাছ থেকে যদি কিছু বাগাইয়া লওয়া যায়, তাহাতে দোষের কিছু নাই।

ভোলা গরু-বাঁধা দড়িটি হরির হাতে দিতে দিতে বলিল, নিয়ে যাও মাহাতো, আর মনে রেখ, বিয়োনমাত্র ছয় সের দুধ পাবে। চল, তোমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিই, তোমায় অচেনা লোক বুঝতে পেরে রাস্তায় গোরুটা যদি কিছু বিরক্ত করে। তোমাকে ভাই সত্যি কথা বলি, মালিক গোরুটার জন্য নব্বই টাকা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওর কাছে এর আদর হবে কেন? আমার কাছ থেকে নিয়ে হয়তো কোন হাকিম সাহেবকে দেবেন। হাকিম মোক্তারে কি গোরুর যত্ন জানে? তারা জানে রক্ত চুষে খেতে। যতদিন দুধ দেবে গোরু রাখবে, তারপর যেই দুধ বন্ধ হবে, কার কাছে বেচে দেবে। কার পাল্লায় গিয়ে পড়বে কে জানে। টাকাই তো সব নয়, ধর্ম বলেও একটা জিনিস আছে। জানি, তোমার ঘরে এ ভাল থাকবে। এমন হবে না যে তুমি খেয়ে দেয়ে আরামে শুয়ে থাকবে, আর গোরু অভুক্ত থাকবে। তুমি গোরুর সেবা করবে, যত্ন করবে, ওকে আদর করবে। গোরু আমাদের আশীর্বাদ করে। আর ভাই, তোমাকে কি বলি, ঘরে এক মুঠো ভুষিও ছিল না, সব টাকা বাজারে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি ভাবছিলাম মহাজনের কাছে ধার করে কিছু ভুষি কিনে নেব, কিন্তু মহাজনের আগেকার দেনাই শোধ হয় নাই। সে অস্বীকার করে বসেছে। এতগুলি জীবকে কি খাওয়াই এই চিন্তায় আমি মারা যাই আর কি! একটু একটু করে খাওয়ালেও যে আমার মণ খানেক খরচ। ভগবান যদি থাকেন, উপায় করে দেবেন।

হরি স্বরে সহানুভূতি ভরিয়া দিয়া বলিল, আমাকে আগে বললে না কেন? আমি তো এক গাড়ী ভুষি বেচে দিলাম।

ভোলা মাথা চাপড়াইয়া বলিল, বলিনি কেন জান? ভাবতাম, নিজের দুঃখের কথা সকলের কাছে কেন গেয়ে বেড়াই? দেয় না কেউ, কিন্তু হাসে সবাই। যে গোরুগুলি শুকিয়ে গেছে, ওদেরও গম নেই, পাতা টাতা খাইয়ে জীইয়ে তুলবো। কিন্তু এটাতো খোরাক বিনে বাঁচবে না; যদি সম্ভব হয় দশ বিশ টাকার ভুষি কিনে দিয়ে দাও।

চাষীরা পাক্কা স্বার্থপর, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের ট্যাঁক হইতে হক্কের ধন একটি পয়সাও বাহির হয় অতি কষ্টে। ভাব-সাব করা বিষয়ে ইহারা বিচক্ষণ। সুদের এক পাই ছাড়াইবার জন্য এরা মহাজনের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুনয় বিনয় করে, যতক্ষণ না মনে পাকা বিশ্বাস জন্মিবে কাহারও ফুসলানিতে উহারা টলিবে না; কিন্তু উহাদের সমগ্র জীবন প্রকৃতির অনুরূপ। গাছে ফল ধরিল, লোকে তাহা খাইবে, ক্ষেতে আনাজপাতি হইল তাহাও সংসারের পাঁচজনের কাজেই লাগে; গোরুর বাঁটে দুধ প্রচুর, সে কি নিজে উহা পান করে, পাঁচজনেই তাহা পান করিয়া বাঁচে; মেঘ বৃষ্টির ধারা দান করে, পৃথিবী তাহাতে শীতল হয়। এই যে বিধান, ইহার মধ্যে স্বার্থের স্থান কোথায়? হরি তো চাষা মাত্র, আর পরের ঘরে আগুন লাগিলে সেই আঁচে নিজের রুটি সেঁকার শিক্ষা তাহার হয় নাই।

ভোলার দুরবস্থার কথা শুনিতে শুনিতে তাহার মনের ভাব বদলাইয়া গেল। গোরুর দড়ি ভোলার হাতে ফিরাইয়া দিতে দিতে বলিল, টাকা তো দাদা আমার কাছে মোটেই নেই, তবে হাঁ, ভুষি কিছু আছে, তা তোমাকে দিতে পারি। চল, তুমি উঠিয়ে নেবে। ভুষির জন্যে তুমি গোরু বেচবে আর সেই গোরু আমি কিনবো, আমার হাত কাটা যাবে না?

ভোলা ধরা ধরা গলায় বলিল, তোমার গোরু বলদ কি না খেয়ে থাকবে, তোমার কাছেই বা এমন কি বেশি ভুষি আছে?

না দাদা, আমার এখনকার মত ঠিক আছে।

তোমাকে ভুষির কথা বলাই আমার উচিত হয় নি।

না বললে আমি বুঝতাম তুমি আমাকে পর ভাব। দরকারের সময় যদি ভাইয়ের কাজে না লাগা গেল তো চলে কি করে?

যাই হোক, এই গোরুটা তো নিয়ে যাও।

কখনো না দাদা, অন্য সময় দেখা যাবে।

তাহলে ভুষির দাম দুধ নিয়ে কাটান দিও। হরি দুঃখিতভাবে বলিল, আচ্ছা, এর মধ্যে দামদস্তুরের কথা কেন বল তো? আমি যদি দু'এক সন্ধ্যা তোমার বাড়িতে খাই, তবে তুমি কি আমার কাছে টাকা চাইবে?

কিন্তু ভুষি নিলে তোমার গোরু বলদ যে না খেয়ে থাকবে।

ভগবান কোন না কোন উপায় করবেন। আষাঢ় মাস যাচ্ছে, বাজরা বুনে নেব।

যাই হোক এই গোরু তোমারই, যেদিন খুসি নিয়ে যেও।

নিজের ভাইয়ের বলদ নীলামে চড়লে তা কেনা যেমন পাপ, এখন তোমার গোরু নেওয়া ঠিক তেমনি।

হরির যদি চুলচেরা বিচারের শক্তি থাকিত, সে খুসিমনে গোরুটি নিয়া বাড়ি রওনা দিত। ভোলা যদি নগদ টাকা না চাহিত তো বুঝা যাইত উহার অন্য কোন মতলব আছে, ভুষির জন্য গোরু বেচিতেছে না। কিন্তু যেমন পাতার খসখসানি শব্দে ঘোড়া অকারণ থমকাইয়া দাঁড়ায়, মারিলেও আর আগে পা বাড়ায় না, হরির অবস্থাও সেইরূপ দাঁড়াইল। সঙ্কটে পড়িয়া বিক্রী করা জিনিস কিনিতে নাই, জন্মজন্মান্তরের এই সংস্কার উহার মনে বদ্ধমূল।

ভোলা গদগদ স্বরে বলিল, আচ্ছা, তবে ভুষির জন্য কাউকে পাঠিয়ে দেব।

হরি উত্তর করিল, আমি তো এখন রায়সাহেবের কাছে যাচ্ছি, এক ঘণ্টা পর বাড়ি ফিরব; ঐ সময় কাউকে পাঠিও।

ভোলার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে বলিল, হরি ভাই, তুমি আজ আমাকে বাঁচালে। আজ আমি জানলাম, সংসারে আমি একলা নই, আমারও বন্ধু আছে। একটু থামিয়া ভোলা বলিল, দেখো ভাই, ঐ কথাটা যেন ভুলো না।

হরি আগাইয়া চলিল, উহার মন ভারি প্রসন্ন, মনে এক বিচিত্র আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে। বেশি আর কি হবে, পাঁচ দশ মণ ভুষিই না হয় যাবে আমার, ও বেচারার গোরুটা তো বেচতে হল না? আমার হাতে যখন টাকা হবে, গোরু আনবো। ঈশ্বর করুন, একটি মেয়ে পেয়ে যাই, তবে তো আর কথাই নেই।

একবার পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, ল্যাজের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে, মাথা দুলাইতে দুলাইতে গোরুটি ধীরে ধীরে চলিয়াছে। দাসী-পরিবৃত

হইয়া যেন কোন রানী চলিয়াছে। হরি ভাবিতে লাগিল, হায়, কবে সেই সুদিন আসিবে যেদিন এই সুলক্ষণা কামধেনুটি উহারই দ্বারে বাঁধা থাকিবে!

২

সেমরী আর বেলারী, দুইটি-ই অযোধ্যার গ্রাম। জেলার নাম বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। হরির বাড়ি বেলারীতে, আর রায়সাহেব অমরপাল সিংহ থাকেন সেমরীতে। দুই গ্রামের মধ্যে ব্যবধান শুধু পাঁচ মাইল। গত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে রায়সাহেবের খুব খ্যাতি বাড়িয়াছিল। কাউন্সিলের দ ছাড়িয়া তিনি জেলে গিয়াছিলেন। তখন হইতে ঐ এলাকার কদের উঁহার প্রতি খুব শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল। স্থানীয় কৃষকদের যে বিশেষ কানও রেয়াৎ করা হইত, কি জরিমানা ও বেগারের কড়াকড়ি কিছু কম হইত, তাহা নয়; কিন্তু এসমস্ত কলঙ্ক কর্মচারীদের মাথায় গিয়া পড়িত। রায়-সাহেবের কীর্তির উপর কেহ কলঙ্ক লাগাইতে পারিত না। ও বেচারাকেও তো ঐ ব্যবস্থাই মানিয়া চলিতে হইবে। নিয়মের কাজতো যেমন চলিয়া আসিতেছে, তেমনই চলিবে। রায়সাহেবের সৌজন্যের উপর তাহার কোনও প্রভাব পড়ে নাই। এই জন্য. লাভ ও স্বত্বাধিকারে সর্ষপ-প্রমাণ ক্ষতি স্বীকার না হইলেও তাঁহার যশ যেন বাড়িয়াই চলিল। চাষীদের সঙ্গে তিনি হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেন। ইহা কি সামান্য হইল? সিংহের কাজ তো শিকার করা; কিন্তু সে যদি গর্জন-আস্ফালনের বদলে মিষ্ট আওয়াজ বাহির করিতে পারে, তবে ঘরে বসিয়াই তাহার মনোমত শিকার জোটে। শিকারের খোঁজে তাহাকে জঙ্গলে জঙ্গলে ধান্দায় ঘুরিতে হয় না।

রায়সাহেব রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত থাকিলেও রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া চলিতেন। তাঁহাদের ভেট ও ডালি এবং অধস্তন রাজ-পুরুষদের দস্তুরি কোন না কোন উপায়ে আসিয়া উপস্থিত হইত। তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন, নাটক অভিনয়ে তাঁহার সখ ছিল, ভাল বলিতে কহিতে পারিতেন, লিখিবার ক্ষমতা ছিল, বেশ উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল। পত্নীর মৃত্যুর পরে আজ দশ বৎসর কাটিয়াছে; কিন্তু আর বিবাহ করেন নাই। হাসিয়া খেলিয়া নিজের বিপত্নীক জীবন চালাইয়া যাইতেছেন।

হরি দেউড়ীতে আসিয়া দেখিল, ধনুর্যজ্ঞের জন্য জোর আয়োজন চলিতেছে, অভিনয় হইবে জ্যৈষ্ঠে, দশহরার সময়ে। কোথাও রঙ্গমঞ্চ তৈয়ারী হইতেছে, কোথাও মণ্ডপ, কোথাও অতিথিদের জন্য অতিথি-ভবন, কোথাও দোকান-দারের জন্য দোকানঘর। রৌদ্রের তেজ হইয়াছে; কিন্তু রায়সাহেব নিজে কাজে লাগিয়া গিয়াছেন। সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি পৈতৃক রামভক্তিও পাইয়াছিলেন, আর ধনুর্যজ্ঞকে নাটকের রূপ দিয়া উহাকে শিষ্টজনের মনো-রঞ্জনের উপায়রূপে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার ইয়ার-দোস্ত হাকিম-টাকিম সকলেই নিমন্ত্রিত হইতেন আর দুই তিন দিন ধরিয়া মহালে খুব ধূম-ধাম চলিত। রায়সাহেবের পরিবার ছিল খুব বড়। প্রায় দেড় শত সরদার এক সঙ্গে খাইতে বসিত। কয়েকজন খুড়া, জন বারো ছিল খুড়তাত ভাই, কয়েক জন সহোদর ভাই, কয় কুড়ি জ্ঞাতি ভাই। এক খুড়া তো শুধু রাধার আরাধনা করিতেন, আর কিছু কাজ ছিল না, তিনি সর্বদা বৃন্দাবনে থাকিতেন। ভক্তিরসাত্মক কত কবিতা রচনা করিতেন, আর সময় সময় তাহা ছাপাইয়া বন্ধুদের কাছে উপহার পাঠাইতেন। আর একজন খুড়া ছিলেন, তিনি রামের পরম ভক্ত, ফারসিভাষায় রামায়ণের অনুবাদ করিতেন। সরকারে সকলের খাওয়া দাওয়ার খরচ বাঁধা ছিল; কাহারও কোনও কিছু কাজ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

চুপে দাঁড়াইয়া হরি ভাবিতেছিল, সে যে আসিয়াছে সে কথা কি করিয়া জানাইবে, এমন সময় রায়সাহেব ঐ দিকেই বাহির হইয়া আসিলেন আর উহাকে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন—"ওরে! তুই এসেছিস হরি, আমি তো তোকে ডাকবার জন্য লোক পাঠাচ্ছিলাম। দেখ্, এখন তোকে জনকরাজার মালী সাজতে হবে, বুঝেছিস তো? সীতা যখন মন্দিরে পূজা করতে যাবেন, সেই সময়ে তুই এক ফুলের ডালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি, আর সীতাকে অর্ঘ্য দিবি। ভুল হয় না যেন, আর দেখ্, চাষীদের সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলিস যেন এখানে সকলে প্রণামী নিয়ে আসে। কুঠিতে আয়, তোর সঙ্গে কথা আছে।"

তিনি কুঠির দিকে আগাইয়া চলিলেন, হরি পিছনে পিছনে গেল। সেখানে এক ঘনপত্রসুশোভিত বৃক্ষতলের ছায়ায় নিজে চেয়ারে বসিলেন, হরিকে মাটিতে বসিতে ইশারা করিয়া বলিলেন—বুঝলি তো, কি বললাম? গোমস্তা তো যা করবার করবে; কিন্তু এক চাষী অন্য চাষীর কথা যত মন দিয়ে

ন, গোমস্তার কথা ততটা শুনতে চায় না। আমাকে এই ৫।৭ দিনের মধ্যেই কুড়ি হাজার টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। কেমন করে হবে, বুঝতে পারি না। তুমি হয় তো ভাবছ, আমার মত আধলা পয়সার লোককে কর্তা কেন নিজের দুঃখ কষ্ট শোনাতে বসেছেন! নিজের মনের কথা কাকে খুলে বলি! কেন তোমার উপর বিশ্বাস আসে জানি না। এই-টুকু জানি যে তুমি মনে মনে আমার অবস্থা দেখে হাসবে না। আর যদি হাসই তাহলেও তোমার হাসি আমি বরদাস্ত করতে পারব। তার হাসিই সহ্য হয় হয় না, যে আমার সমান-সমান; কারণ তার হাসির মধ্যে আছে ঈর্ষ্যা, ব্যঙ্গ আর জালা। আর সে হাসবে না-ই বা কেন? আমিও তো তার দুর্দশায়, বিপদে, পতন হলে হেসে থাকি, মন খুলে, হাততালি বাজিয়ে হাসি। সম্পত্তি আর সহৃদয়তার মধ্যে আছে শত্রুতা। আমিও দানধর্ম করি; কিন্তু কেন, জান কি? শুধু নিজের সমান পদের যারা তাদের খাটো দেখাবার জন্য। আমার দান আর ধর্ম খাঁটি অহঙ্কার, অহঙ্কার ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের মধ্যে যদি কারও উপর ডিক্রী হয়ে যায়, ক্রোক হয়, বাকি খাজনার দায়ে জেল হয়, কারো জোয়ান বেটা যদি মরে যায় কি বিধবা পুত্রবধূ বেরিয়ে যায়, কারো ঘরে আগুন লাগে কি বেশ্যার হাতে কেউ উল্লুক বনে যায়, কি নিজেরাই প্রজাদের হাতে মার খায়, তাহলে সব ভাইবেরাদার তাকে দেখে হাসবে, বগল বাজাবে, এমন ভাব দেখাবে যেন সারা সংসারের সম্পদ লাভ করেছে। কিন্তু বাইরে বাইরে এতখানি ভালবাসা দেখিয়ে মিশবে যেন আমাকে এতটুকু আরাম দেওয়ার জন্য তারা নিজের নিজের রক্ত পাত করতে প্রস্তুত। ওরে, আর কথায় কাজ কি, আমার খুড়তুত, পিসতুত, মামাত, মাসতুত ভাইয়েরা যারা এই এস্টেটের জোরে মজা করে রয়েছে, কবিতা লিখছে আর জুয়া খেলছে, মদ খাচ্ছে আর বাবুগিরি করছে, ওরাও আমাকে দেখে জ্বলতে থাকে, আর আজ দি মরে যাই তো ঘিয়ের প্রদীপ লাগাবে। আমার দুঃখকে দুঃখ বলে মনে , দুঃখ বলে বোঝে এমন কেউ নাই। ওদের দৃষ্টিতে আমার দুঃখী হবার কানও অধিকারই নাই। আমি যদি কাঁদতে বসি, তবে সে কান্না কান্না নয়, দুঃখের প্রতি ব্যঙ্গ; আমি যদি ব্যায়রামে পড়ি, তবে সে হল আরামের জন্য; আমি যদি বিয়ে করে ঘরে ঝগড়া না বাড়াই, তবে সে হল আমার নীচ স্বার্থপরতা; আর যদি বিয়ে-ই করি, তো সে অন্ধ বিলাসের জন্য। মদ যদি না খাই, তবে

তার কারণ আমি কৃপণ ; আর মদ খেতে যদি শুরু করি, তবে সে-তো প্রজাদের রক্ত। বাবুগিরি না করলে হব বেরসিক, বিলাস করলে যে কি হব তা আর বলে দরকার নাই। এরা আমায় ভোগ-বিলাসে ফাঁসাবার জন্য কম চাল চালে নাই, সে চাল এখনও চলছে। এদের ইচ্ছা যে আমি অন্ধ হয়ে যাই, আর এরা আমাকে লুটে পুটে খায়, আর এসব দেখেও কিছু না দেখা হল আমার ধর্ম। সব কিছু জেনেও আমি গাধা হয়ে থাকি।

রায়সাহেব ক্লান্তি দূর করিবার জন্য দুই খিলি পান খাইলেন, আর হরির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, যেন উহার মনের কথা পড়িতে চান।

হরি সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, আমি ভাবতাম এ সব কথা আমাদের মধ্যেই হয় ; কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, বড় বড় লোকদের মধ্যেও এর অভাব নাই।

গালভরা পান লইয়া রায়সাহেব কহিলেন, তুই আমাদের বড়লোক মনে করিস? আমাদের নামই বড় ; কিন্তু নজর ছোট। গরীবদের মধ্যে যদি হিংসা-বিরোধ থাকে তবে তা স্বার্থ কি পেটের খাতিরে। ওরকম হিংসা-বিরোধের আমার মতে ক্ষমা আছে। আমার মুখের গ্রাস যদি কেউ কেড়ে নেয়, তাহলে তার গলায় আঙ্গুল দিয়ে সে গ্রাস বের করা হবে আমার ধর্ম। আর যদি আমি ছেড়ে দিই, তবে আমি হব দেবতা। বড়লোকদের হিংসা ও বিরোধ শুধু আনন্দের জন্য। আমরা এত বড়লোক হয়ে গেছি যে নীচতা ও কুটিলতাতেই নিঃস্বার্থ ও পরম আনন্দ উপভোগ করি। আমরা দেবত্বের সেই শ্রেণীতে পৌঁছেছি, যেখানে অন্যের কান্নায় আমাদের হাসি পায়। একে তুমি সামান্য সাধনা মনে কোর না। যখন পরিবার এত বড়, তখন কেউ না কেউ তো সর্বদা অসুস্থ থাকবে ; আর বড়লোকদের রোগও বড় হয়ে থাকে। সে আবার বড়লোক কি, যার ছোটখাট রোগ হয়? মামুলি জ্বরও যদি আসে, তো আমাদের সান্নিপাতিক জ্বরের ওষুধ দেওয়া হয় ; মামুলি ঘামাচি বের হলে সে হয়ে দাঁড়ায় বিষফোড়া। অমনি ছোট সার্জন মেজ সার্জন আর বড় সার্জনের জন্য তার করা হয়, মসীহুলমুল্‌ককে আনবার জন্য দিল্লীতে লোক পাঠান হয়, ভিষগাচার্যকে আনবার জন্য কলকাতা লোক যায়। ওদিকে দেবালয়ে চণ্ডীপাঠ, জ্যোতিষাচার্য কুণ্ডলী বিচার করতে থাকেন, তন্ত্রাচার্য নিজের মত অনুষ্ঠান জুড়ে দেন। রাজাসাহেবকে যমরাজার মুখের থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। ডাক্তার কবিরাজ তাকে তাকে ফিরতে থাকেন, কবে

এর মাথা ধরবে আর নিজেদের বাড়ি অমনি সোনার বৃষ্টি হবে। আর এ টাকা আদায় হয়ে থাকে তোমার আর তোমার ভাইদের কাছ থেকে, বল্লমের আগায়। আমার তো এইটাই আশ্চর্য লাগে যে তোমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের আগুন কেন আমাদের ভস্ম করে ফেলে না; কিন্তু না, আশ্চর্য লাগবার কথা নয়। ভস্ম হতে তো বেশি দেরি লাগে না। ব্যথাও অল্পক্ষণের জন্যই স্থায়ী হয়। আমরা তো আঙুলের দাগে দাগে, গাঁঠে গাঁঠে ভস্ম হচ্ছি। সেই হাহাকার ধ্বনির জন্যই আমরা পুলিশের, হাকিমের, আদালতের, উকীলের শরণ নিয়ে থাকি, আর রূপসী স্ত্রীর মত সকলেরই হাতের খেলনা হয়ে ফিরি। পৃথিবী ভাবে, আমরা বড় সুখী। আমাদের জমি-জমা, তালুক-মুলুক, চাকর-বাকর, গাড়ি-ঘোড়া, ধার-কর্জ, বেশ্যা, কী বা নাই; কিন্তু যার প্রাণে জোর নাই, অভিমান নাই, সে আর যাই হোক, মানুষ নয়। শত্রুর ভয়ে যার রাত্রে ঘুম হয় না, যার দুঃখে সকলে হাসে আর কাঁদবার কেউ নাই, যার টিকি অন্যের পায়ের নীচে দাবানো আছে, যে ভোগ-বিলাসের নেশায় নিজেকে একেবারে ভুলে গেছে, যে হাকিমের পায়ের তলা চাটে আর নিজের অধীনস্থ লোকদের রক্ত চুষে খায়, তাকে আমি সুখী বলি না। সে তো সংসারে সবার চেয়ে হতভাগা প্রাণী। সাহেব শিকারে বেরিয়েছেন কি ঘোড়দৌড়ে গেছেন, আমার কাজ হল তাঁর লেজে লেজে লেগে থাকি। ওঁর ভুরু কুঁচকে গেল, আর আমার প্রাণ অমনি উঠল শুকিয়ে। ওঁকে প্রসন্ন করবার জন্য কী না করি আমরা; কিন্তু সে প্যাচাল আরম্ভ করলে তোমার হয়তো বিশ্বাসই হতে চাইবে না। ডালি আর ঘুষ পর্যন্ত তো খুব ভাগ্যের কথা, আমরা আরও অনেক বেশি দূর যেতেও তৈরী। দাম না দিয়ে খেয়ে খেয়ে আমরা অকর্মণ্য বনে গেছি, নিজের পুরুষার্থের ওপর আমাদের একটুও বিশ্বাস নাই, শুধু 'অফসর'দের সামনে লেজ নেড়ে নেড়ে কোনও প্রকারে তাঁদের কৃপাপাত্র হয়ে থাকা আর তাঁদের সাহায্যে নিজেদের প্রজাকে ভয়ে ভয়ে জব্দ রাখা—এই হল আমাদের চেষ্টা। আশ্রিতদের খোসামুদিতে আমরা এত অভিমানী ও খিট্‌খিটে হয়ে পড়েছি যে আমাদের সভ্যতা, বিনয়, সেবা করবার প্রবৃত্তি সব লোপ পেয়ে গেছে। আমার তো কখনও কখনও মনে হয় যে, গভর্মেণ্ট যদি কখনও আমাদের জমি-টমি কেড়ে নিয়ে নিজেদের রুজির জন্য মেহনৎ করতে শিখিয়ে দেয়, তাহলে আমাদের খুব উপকার করা হবে, আর এটা তো স্থির যে গভর্মেণ্টও এখন আমাদের রক্ষা

করবে না। আমাদের দিয়ে এখন যে তার কোনও স্বার্থসিদ্ধি হবে না! লক্ষণ দেখে মনে হয়, খুব অল্প দিনের মধ্যে আমাদের শ্রেণীর হাতে আর সম্পত্তি থাকবে না। আমি সেদিনকে বরণ করবার জন্য বসে আছি। ঈশ্বর সেদিন শীগ্‌গির নিয়ে আসুন। সে-ই হবে আমাদের উদ্ধারের দিন। আমরা অবস্থার গোলাম হয়ে বসে আছি, এই অবস্থা-ই আমাদের সর্বনাশ করছে, আর যতদিন সম্পত্তির এই বেড়ী আমাদের পায়ের থেকে না খসবে, যতদিন এই অভিশাপ আমাদের মাথার উপর ঘুরতে থাকবে, ততদিন আমরা মানবতার যে শ্রেষ্ঠ পদ জীবনের লক্ষ্য, সেখানে পৌঁছতে পারব না।

রায়সাহেব আবার পানের ডিবা বাহির করিয়া কয়েকটা পান মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার আরও কিছু বলিবার ছিল এমন সময় এক চাপরাসী আসিয়া বলিল—হুজুর, 'বেগারেরা' কাজ করতে অস্বীকার করছে; তারা বলছে, খেতে না পেলে তারা কাজ করবে না। আমরা ধমক দিলাম, তাতে সকলে কাজ ছেড়ে দাঁড়াল।

রায়সাহেবের মাথায় রাগ চাপিল। চোখ বড় বড় করিয়া বলিলেন—চল, এই দুষ্টু লোকগুলোকে ঠিক করে দিচ্ছি। যখন কস্মিনকালে খেতে দেওয়া হয় নি, তখন আজ এ সব নতুন কথা কেন? রোজ এক আনা হিসেবে তো মজুরি পাওয়াই যাবে, যেমন মজুরি সর্বদাই পাওয়া যায়; আর এই মজুরি নিয়েই লোক-গুলোকে কাজ করতে হবে, তা সোজাপথেই করুক আর বাঁকা-পথেই করুক।

ফিরিয়া হরিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—তুমি এখন যাও হরি, নিজের কাজ গুছিয়ে নাও। আমি যে কথা বলেছি তা খেয়াল রেখ। তোমাদের গাঁ থেকে আমি কম-সে-কম পাঁচ শ টাকা আশা করি।

রায়সাহেব রাগ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। হরি মনে মনে ভাবিল, এখনই তো ইনি কত শত নীতিধর্মের কথা কহিতেছিলেন, হঠাৎ এতখানি গরম হইয়া গেলেন!

সূর্য মাথার উপরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার তেজে অভিভূত হইয়া বৃক্ষেরা নিজ নিজ প্রভাব সঙ্কুচিত করিয়া লইল। আকাশের উপর ধূলা মাটি ছাইয়া গিয়াছিল, আর সম্মুখে পৃথিবী যেন কাঁপিতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল।

হরি নিজের লাঠিখানা উঠাইয়া ঘরে চলিল। প্রণামীর টাকাটা কোথা হইতে আসিবে, এ চিন্তা তাহার মাথায় চড়িয়াছিল।

৩

হরি গাঁয়ে পৌছিয়া দেখে, গোবর তখনও আখ লাগাইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সোনা রূপা দুই বোনও কাজ করিতেছে। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম, লু চলিতেছে, মাটি ফাটিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে। এখনো ইহারা ক্ষেতে কাজ করিতেছে কেন! ইহারা কি তবে কাজ করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জন দিবে নাকি? হরিও মাঠের দিকে চলিল, আর চীৎকার করিয়া বলিল—এই গোবর, আসছিস না কেন? আজ কি সারাদিন কাজেই লেগে থাকবি? বেলা গড়িয়ে গেল, সে খেয়াল নাই?

তাহাকে দেখিয়া তিনজনই কোদাল নামাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গোবরের শ্যামবর্ণ, লম্বা দোহারা চেহারা, দেখিলে মনে হয় না এই কাজে কিছুমাত্র রুচি আছে। আনন্দের বদলে মুখে অসন্তোষ আর বিদ্রোহে
ছাপ। উহার খাওয়া পরার জন্য কাহারও চিন্তা করিতে হইবে না. বলিল,
দেখাইবার জন্য সে ক্ষেতে কাজ করে। বড় মেয়ে সোনা শ্যামলী, হ
ভাবটি চঞ্চল আর গড়নটি সুঠাম। লাল রং-এর মোটা শাড়ীখানা, এ রাম,
আনিয়া এমনভাবে কোমরে কাপড় জড়াইয়াছে যে ছিপছিপে পা
কটু মোটাই দেখাইতেছে, আর সেজন্য বয়সও কিছু বেশি ম চলিল না;
ছোট মেয়ে রূপা ছয় সাত বছরের বালিকা, হাতে পায়ে ময়লা বলিতে লাগিল,
চুলটি ঝুঁটি করিয়া বাঁধা। কোমরে এক টুকরা কাপড়. জড়া
আর কাঁদুনে। পথ চাহিয়া

রূপা হরির পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দেখ বাবা, আমি এত দেরি মাটিও আস্ত রাখিনি। দিদি বলে, যা, গাছের তলায় বোস গিয়ে। মাটি ভেঙ্গে গুঁড়ো না করলে জমিন কি করে সমান হবে বাবা?

হরি উহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিয়া বলিল, খুব ভাল মেয়ে তুমি, চল, এখন ঘরে যাই।

অন্তরের বিদ্রোহের ভাব কিছুক্ষণ চাপিয়া রাখিয়া গোবর বলিল—আচ্ছা বাবা, তুমি রোজ রোজ কেন মালিকের খোসামোদ করতে যাবে? বাকি খাজনার জন্য পেয়াদা এসে গালিগালাজ করে, আমাদের বেগার খেটে দিতে হয়, নজর-নজরানা আমাদের সব পুরিয়ে দিতে হয়, তবু কেন ওঁর কাছে সেলাম ঠোকা?

২

ঠিক এই সময়ে হরির মনেও ঐ ভাবটি জাগিয়াছিল, কিন্তু ছেলের এই বিদ্রোহের সুর তো দমন করিতে হইবে। তাই বলিল, সেলাম করতে না গেলে তো বাঁচাই দায়। ভগবান গোলাম করে পাঠিয়েছেন, নিজের আর স্বাধীনতা কোথায়? আর এই সেলাম করি বলেই তো দরজায় ঝাঁপ তুলতে পেরেছি, আর কেউ কিছু আমায় বলতেও পারে না। ঐতো ঘুরে দুয়ারে খুটি পুঁতেছিল, কারিন্দা অমনি খুঁটির জন্য দুটাকা নিয়ে নিল। পুকুর থেকে কত মাটি আমি তুলেছি, তাও কারিন্দা আমাকে কিছু বলে নি। আর কেউ খুঁড়ুক তো, অমনি নজর দিতে হবে। নিজেব মতলবেই আমি তোয়াজ করতে যাই, পায়েরও দুঃখের সীমা নেই। আর এই সেলাম করার মধ্যে কি বড়ই সুখ! ঘণ্টাভর দাঁড়িয়ে থাক, তবে হয়তো কর্তার কাছে আ...বর যাবে। কখনো বা বাইরে এলেন আর কখনো হয়তো এলেনই না, বলছে, পাঠালেন, অবসর নেই। এই তো সুখ!

সকলে ক...বর বলিল, বড় লোকের কথায় হুঁ দিয়ে দিয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনও রায়সা...য়ই আছে, নইলে লোকে খোসামুদের দলে যায় কেন?

এই দুষ্টু লো... যখন নিজের ঘাড়ে পড়বে তখন বুঝবে, এখন যা ইচ্ছা বল। নি, তখন আজ...স আমিও এই সব কথাই ভাবতাম, ক্রমে বুঝেছি, আমাদের পাওয়াই যাবে, ...য়ের তলায় পিষে আছে, এ প্যাঁচ খোলবার নয়।

গুলোকে কাজ ...পরে খানিকটা রাগ ঝাড়িয়া ফেলিয়া গোবর শান্ত হইল, এবং ফিরিয়...তে লাগিল। রূপা বাবার কোলে চড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া কাজ গু...একটু হিংসা হইল; সে বলিল, আচ্ছা রূপা, তোর কি পা ভেঙ্গে গেছে? গাঁ পে... কোল থেকে নেমে হেঁটে চল্ না কেন?

রূপা বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া জোর করিয়া বলিল, আমি নামব না, যাও। বাবা, দিদি আমায় রোজ খেপায়, আমি রূপো আর ও সোনা; তুমি আমার নামটা বদলে দাও।

হরি রাগের ভাণ করিয়া সোনাকে বলিল, সোনা মা, ওকে রাগাও কেন? সোনা তো দেখতেই সুন্দর, কিন্তু কাজের জিনিস তো রূপো! রূপো না থাকলে টাকা কোত্থেকে আসত বল তো?

সোনাও নিজের দিক টানিয়া বলিল—বা রে, সোনা না থাকলে মোহর কি করে আসত, নাকের নথ, গলার কণ্ঠী, এসব কি করে পেতে?

গোবরও স্নেহের এই কোঁদলে যোগ দিয়া রূপাকে বলিল—তুই বল্ না, সোনা তো শুকনো পাতার মত হলদে রং-এর। আর রূপো কেমন সূর্যের মত উজ্জ্বল।

সোনা বলিল, বিয়েচূড়োয় লোকে কিন্তু হলুদ রং-এর কাপড়ই পরে, কেউ কি সাদা শাড়ী পরে?

এবার রূপাকে হার মানিতে লইল। গোবর আর হরির কোনও যুক্তি ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। রূপা ক্ষুব্ধ চোখে হরির দিকে চাহিল।

তখন এক নতুন যুক্তি হরির মাথায় আসিল। সে বলিল, সোনা বড় লোকের জন্যে, আর আমাদের মত গরীবের জন্যে তো রূপাই আছে। যেমন যবকে বলে রাজা, গমকে বলে চামার; এই জন্য না, যে বড় লোকেরা খায় গম আর আমরা খাই যব!

এই প্রবল যুক্তির কোনও উত্তর সোনার ছিল না। হারিয়া গিয়া সে বলিল, তোমরা সবাই এক দিকে হয়েছ, নইলে রূপাকে কাঁদিয়ে ছাড়তাম।

রূপা আঙুল মটকাইতে মটকাইতে বলিল, এ রাম, সোনা চামার, এ রাম, সোনা চামার।

এই জয়ে উহার এতই আহ্লাদ হইল যে আর কোলে থাকা চলিল না; মাটিতে লাফাইয়া পড়িল, আর উচ্ছল হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, রূপা রাজা, সোনা চামার।

ইহারা যখন বাড়ি আসিয়া পৌছিল তখন ধনিয়া উহাদের পথ চাহিয়া দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। একটু রাগিয়া বলিল, আচ্ছা গোবর, আজ এত দেরি কেন? কাজ করতে গিয়ে কি লোকে প্রাণ দেয়?

তার পর আরো একটু গরম সুরে স্বামীকে বলিল, তুমিও দেখি ওখানকার কাজ সেরে মাঠেই গিয়েছ; কেন, ক্ষেত কি পালিয়ে যাচ্ছে?

দরজার কাছেই কুয়া। হরি আর গোবর এক এক কলসী জল তুলিয়া মাথায় ঢালিল, রূপাকে স্নান করাইল, তারপর খাইতে বসিল। যবের রুটি, কিন্তু ঠিক গমের মতো পরিষ্কার আর মিহি আটা। আর ছিল কাঁচা আম দিয়া অড়হর ডাল। রূপা বাবার সঙ্গে একথালায় বসিল দেখিয়া সোনা তাহার দিকে হিংসাভরে চাহিল, যেন বলিতে চায়, বা রে দুলালী!

ধনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কর্তাবাবুর সঙ্গে কি কথাবার্তা হোল?

হরি ঘটিতে করিয়া জল ভরিতে ভরিতে বলিল, এই আদায় উশুলের কথা, আর কি। আমরা ভাবি, বড়লোকেরা খুব সুখী, কিন্তু সত্যি বলতে কি, ওরা আমাদের চেয়েও বেশি দুঃখী। আমাদের শুধু আপনার পেটের চিন্তা, আর ওদের হাজারো রকমের চিন্তা ঘিরে থাকে।

রায়সাহেব আর কি কি বলিয়াছিলেন, হরির স্পষ্ট মনে নাই, সকল কথার সারাংশটুকু শুধু মনে লাগিয়া রহিয়াছে।

গোবর ঠাট্টা করিয়া বলিল, খুব দুঃখ বটে ওঁদের! তবে ওঁর জমিদারী আমাদের দিয়ে দিন না! আমি তার বদলে আমাদের ক্ষেত, বলদ, কোদাল সব ওঁকে দেব। করবেন বদলাবদলি? এসব শুধু ধূর্ততা, কেবল চাল। যার দুর্দশা, সে ডজনখানেক মোটরগাড়ি রাখে না, সাতমহলা বাড়িতে থাকে না, পুরী হালুয়া খায় না, আর নাচ গান নিয়ে কাটায় না। মজা লুটে রাজসুখ ভোগ করে, তাদের আবার দুঃখ!

হরি একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে কি লাভ? জমিদারী কাউকে ছেড়ে দিতে পারলে সে দেয়। আমাদের ক্ষেত থেকে কি ই বা মেলে? চাকরের এক আনা মজুরিও তো ওঠে না। দশ-টাকা মাইনের চাকরও আমাদের চেয়ে ভালো খায় দায়, কিন্তু সেই ক্ষেতি কি আমি ছাড়তে পারি? মর্যাদা তো রক্ষা হয়! চাকুরের তা হয় না। জমিদারের অবস্থাও ঐরকম জেনো। ওঁদের জীবনেও নানান উপসর্গ—এই হাকিমের কাছে রসদ ভেট পাঠাও, তোয়াজ কর; কখনো তার আমলার মন জোগাও। ঠিকদিনে খাজনা পৌছাতে না পারলেই বাস্, নীলামে চড়বে, শমন নিয়ে পেয়াদা আসবে। আমাদের তো কেউ আদালতে নিয়ে যায় না, দুচারটে গালমন্দ, কিলচড়ের উপর দিয়েই চলে।

গোবর প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ কেবল কথার কথা। আমরা সব দিতে দিতে ফতুর হয়ে গেলাম, পরনে একখানা আস্ত কাপড় নেই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলি, তবু দিন গুজরাণ হয় না। ওদের কি, আরামসে গদীর উপর বসে আছে, শত খানেক দাসদাসী, হাজার লোকে রাতদিন হুকুম তামিল কোরছে। টাকা না জমতে পারে, কিন্তু সুখ তো সবদিকে ষোল আনা ভোগ করে। টাকাতো মানুষের এজন্যেই।

তবে কি তুমি বলতে চাও আমরা আর ওঁরা সমান হব?

তা, ঈশ্বর তো সবাইকেই সমান তৈরি করে পাঠিয়েছেন।

না বেটা, এ ঠিক কথা নয়। ঈশ্বরের কোল থেকেই মানুষ ছোট বড় হয়ে জন্মায়। সম্পত্তি অনেক তপস্যায় মেলে। আর জন্মে ওদের নিশ্চয় সুকৃতি ছিল, এ জন্মে তাই আরাম ভোগ কোরছে। আমাদের কোনও সঞ্চয় ছিল না, তা এখন ভোগ করব কি?

এ সব মনকে বুঝ দেওয়ার কথা। ঈশ্বর সবাইকে সমান করেছেন। দুনিয়ায় যার হাতে লাঠি, সে-ই গরীবকে মেরে বড়লোক সাজে।

এটা তোমার ভুল। মালিক আজ অবধি রোজ চার ঘণ্টা ঈশ্বরের নাম ভজন করেন।

এসব ভজনপূজন আর দানধর্ম তিনি করেন কার দৌলতে?

কেন, নিজের শক্তিতে।

না না, এটাই হয় তাঁর চাষী আর জনমজুরদের কৃপায়। এই পাপের ধন হজম হবে কি করে? তাই দরকার হয় এসব দানধ্যান করার, ঈশ্বরকে ডাকাও এজন্যেই। খালি পেটে, খালি গায়ে থেকে ভগবানের পূজা কর, তবে তো বুঝি। আমায় কেউ দুবেলা খেতে দিক, আমি বসে বসে অষ্টপ্রহর ভগবানের নাম জপ কোরব। একদিন খেতে এসে আখ লাগাতে হোক না, সব ভক্তি উড়ে যাবে।

হরি হারিয়া গিয়া বলিল, আর বাপু, তোমাদের মুখে কিছুই আটকায় না, তোমরা ঈশ্বরের লীলা নিয়েও হাসি ঠাট্টা করতে পার।

তিন প্রহর বেলায় গোবর কোদাল লইয়া চলিল দেখিয়া হরি বলিল, একটু দেরি কর বেটা, আমিও আসচি। ততক্ষণ খানিকটা ভুষি তো বার করে রাখ, ভোলাকে দেব বলেছি। বেচারার আজকাল দিন বড়ই খারাপ যাচ্ছে।

চোখে অবজ্ঞা ভরিয়া গোবর বলিল, আমাদের কাছে বেচার মতো ভুষি নেই।

বেচছি না রে, অমনি দিচ্ছি। ওর এখন দুঃসময় পড়েছে, ওকে একটু সাহায্য কোরবো না?

ও তো কখনো আমাদের একটা গোরু দিল না!

এবার ও দিতে চেয়েছিল, আমিই নিলাম না।

ধনিয়া বিরক্ত হইয়া বলিল, ইস্, ভোলা গোরু দিতে চেয়েছিল না আরো কিছু! ভুলেও কথনো এক ঝিনুক দুধ দিল না, আর আজ কিনা গোরু দিয়ে দেবে!

হরি শপথ করিয়া বলিল, সত্যি বলছি, ওর পশ্চিমী গোরুটাই দিতে চেয়েছিল। হাত একেবারে খালি, দানা ভুষি কিছু রাখতে পারে নি। তাই এখন ও একটা গোরু বেচে ভুষি কিনতে চায়; তা আমি ভাবলাম ও বিপদে গাই বেচতে চায়, সেটা কেনা কি আমার উচিত? এখন কিছু ভুষি আমি দিয়ে দি, পরে হাতে একটু টাকা জমলে গোরুটা নিয়ে আসবো। আস্তে আস্তে দাম চুকিয়ে দিলেই হবে। আশি টাকা দাম, কিন্তু গোরুটার দিতে চেয়ে থাকতে হয় এমন জিনিস।

এবার গোবর এক হাত লইল, তোমার এই সাধুগিরিই তো তোমার সর্বনাশ কোরছে। পষ্টাপষ্টি কথা বোলতে হয়। গোরুর দাম আশি টাকা, তা বেশ, তুমি আমার কাছ থেকে টাকা কুড়ির ভুষি এখন নাও, আর গোরুটা আমাকে দাও। ষাট টাকা বাকি থাকে, তা আমি ধীরে ধীরে শুধব।

হরি রহস্যের হাসি হাসিয়া বলিল, আমি এমন চাল দিয়েছি যে গাই আমার কাছে অমনি এসে যাবে। ভোলার একটা বিয়ে ঠিক করতে পারলে হল, বাস্, আর কিছু চাই না। দুচার মণ ভুষি তো খালি রঙ্গ জমানোর জন্যে।

গোবর ভৎর্সনা করিয়া বলিল, তুমি বুঝি এখন লোকের ঘটকালি করে বেড়াবে?

ধনিয়া তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিল, এই কর্মই বাকি আছে। আমি কাউকে ভুষি দেব না, আমি ভোলা টোলা কারো ধার ধারি না তো।

হরি নিজের সাফাই গাহিবার জন্য বলিল, তা আমার একটু চেষ্টাতে যদি একজনের ঘর বসত হয় তো তাতে দোষটা কি?

গোবর চিলমচি উঠাইয়া আগুন আনিতে গেল, ওর এসব ঝামেলা মোটেই পছন্দ নয়।

ধনিয়া মাথা দুলাইয়া বলিল, ঐ বুড়োর যে সম্বন্ধ ঠিক করে দেবে, সে আশি টাকায় চুপ করে থাকবে না, এক থলি টাকা খসাবে তবে ছাড়বে।

হরি স্বীকার করিল—তা আমি জানি; কিন্তু ওর ভালমানষিটাও দেখ।

আমার সঙ্গে যখন দেখা হয় তোমার কত ব্যাখ্যানা করে—তুমি কেমন লক্ষ্মী, কেমন খপসুরত।

ধনিয়ার মুখে লজ্জার আভা দেখা দিল, মনোহরভাবে মাথা দুলাইয়া বালিকার ভঙ্গীতে বলিল, আমি ওর সুখ্যাতির কাঙাল নই।

হরি স্নেহভরে অথচ একটু রঙ্গ করিয়া বলিল, আমি তো ওকে বলে য়েছি, ভাই ওকে জান না, গাল ছাড়া কথা কয় না, নথ নাড়ার চোটে নাকে মাছি বসতে পায় না। কিন্তু ও কি বলে জান, ও বলে তোমার বৌ তো মেয়ে নয়, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আসল কথা কি জান, ভোলার বৌয়ের মুখ বড় কড়া ছিল, ও বেচারা বৌয়ের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। ও আমাকে বলছিল, যেদিন সকাল বেলায় আমার বৌয়ের মুখ দেখে সেদিনটা ওর ভালো যায়, কিছু না কিছু লাভ হবেই। আমি বলি, তোমার নিজের বরাতেই পাও ভাই, না তো ঐ মুখ তো আমি রোজই দেখচি, কই এক পয়সা ভেটও তো কেউ পাঠায় না।

ধনিয়া বলিল, তোমার কপাল ফুটো, তা আমি কি করব?

আরম্ভ করে দিল নিজের ঘরণীর নিন্দে করতে—সে ভিখারিকে একমুঠো ভিক্ষা দিত না, ঝাঁটা নিয়ে মারতে যেত, এমন লোভী ছিল যে নুনটাও অন্যের বাড়ি থেকে মেগে আনত।

মরবার পর আর কার কি নিন্দা করব। আমাকে দেখে জ্বলে উঠত।

ভোলার খুব সহ্যগুণ তাই ওর সঙ্গে ঘর করতে পেরেছে, আর কেউ হলে বিষ খেয়ে মরতো। আমার থেকে বছর দশেকের বড় ভোলা, তবু দেখা হলে আগে সেই নমস্কার করে।

যেদিন তোমার গিন্নীর মুখ দেখে সেদিনটা ওর কি হয় বল্লে?

সেদিন ভগবান কোথাও থেকে কিছু নিশ্চয় জুটিয়ে দেন।

বৌরাও এসেছে অমনি লোভী। দুটাকা ধার করে খরমুজা কিনল, তা বটা খেয়ে ফেলল। ধার নেবার সময় ওদের পেলেই হোল, কি করে শোধ দবে সে ভাবনা নেই।

তবে আর কিসের জন্যে ভোলা কাঁদে?

এমন সময় গোবর আসিয়া বলিল, ভোলা জ্যাঠা এসে গেছে; মণ দু মাড়াই ভুষি আছে, দাও, ওকে দিয়ে দাও, আর ওর সম্বন্ধ খুঁজতে বেরোও।

ধনিয়া বুঝাইয়া বলিল, আরে, লোকটা বাড়িতে হাজির, ওকে কোথায় ডেকে বসাবে, না, এখন ভিতর থেকে প্যানপ্যানানি স্থরু কোরলে। একটু ভদ্রতা তো শিখতে হয়। কলসি নিয়ে যা, মুখ হাত ধোওয়ার জল এনে দে, তারপর একটু সরবত খাওয়াও। হরি বলিল, সরবত টরবতে কাজ নেই, মনিব এল নাকি? ধনিয়া রাগিয়া গেল, মনিব আর কি করে হবে? রোজ রোজ তো আর তোমার বাড়ি আসছে না! এতদূর থেকে রোদে পুড়ে এসেছে, তেষ্টাও তো পায়। রূপো, দেখ্ তো কলকেয় তামাক আছে কি না, গোবরের জন্য কি আর কিছু বাঁচে! তুই যা তো, দৌড়ে সাহুয়াইনের দোকান থেকে এক পয়সার তামাক নিয়ে আয়। ভোলার আজ যা যত্ন আত্তি হইল আর কোনদিন তা হইবে না। গোবর খাটিয়াটা বাহির করিয়া বসিতে দিল, সোনা মিষ্টি ঘোলের সরবত দিল, রূপা তামাক দিল। ধনিয়া দরজার আড়ালে গিয়া নিজের কানে নিজের সুখ্যাতি শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

হুঁকোটি হাতে নিয়া ভোলা বলিল, উপযুক্ত বৌ যদি বাড়ি আসে তবে জানবে, বাড়িতে লক্ষ্মীর আগমন হয়েছে। সে ঠিক জানে, কাকে কি ভাবে আদর অভ্যর্থনা কোরতে হয়।

ধনিয়ার হৃদয় উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। অভাব, নিরাশা, ভাবনা চিন্তায় পীড়িত অন্তর এই কথাগুলি শুনিয়া কেমন স্নিগ্ধ ও কোমল হইয়া উঠিল।

হরি যখন ভোলার খাঁচিটি নিয়া ভুষি আনিতে ভিতরে গেল, ধনিয়াও ওর পিছু পিছু চলিল। হরি বলিল, এত বড় খাঁচি কোথায় পেয়েছে জানি না। কোনও খইয়ের ব্যাপারীর কাছ থেকে চেয়ে এনেছে। এক-মণের কমে ভরবে না, দু খাঁচিও যদি দিই তাও দুমণ পুরো চলে যাবে।

ধনিয়ার মন তখন উৎফুল্ল। প্রীতিপূর্ণ চোখে চাহিয়া সে বলিল, হয় কাউকে নেমন্তন্ন করো না, আর যদি কর তো পেট ভরে খাওয়াও। তোমার কাছ ফুলপাতা চাইতে তো আর আসে নি যে সাজি নিয়ে আসবে! দেবেই যদি তবে তিন খাঁচি ভুষি দিয়ে দাও। ও ভালোমানুষ ছেলেদের সঙ্গে আনেনি কেন? একলা কতক্ষণে পৌছোবে। প্রাণ বেরিয়ে যাবে যে!

তিন খাঁচি আমার হাত দিয়ে বেরোবে না।

তবে কি এক খাঁচা দিয়েই সারবে নাকি? গোবরকে বল না, নিজে এক খাঁচি নিয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে যাক।

গোবর তো আখ লাগাতে চলে গেছে।

একদিন বাদ আখ কিছু শুকিয়ে যাবে না।

ওরই তো কাউকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল—ঈশ্বরের ইচ্ছায় ছেলেও তো দুটি আছে।

হয়তো ঘরে নেই, দুধ বেচতে বাজার গেছে।

এ তো আচ্ছা আবদার, জিনিস দেব, আবার বাড়িও পৌঁছে দিতে হবে!

আচ্ছা, বাপু, আচ্ছা, তোমাদের যেতে হবে না, আমি পৌঁছে দেব। বড়র সেবা করার মধ্যে লজ্জা নেই।

কিন্তু তিন খাঁচা ভুষি ওকে দিয়ে দিলে আমার বলদ জোড়া খাবে কি?

এ সব তো নেমন্তন্ন করার আগেই ভাবা উচিত ছিল। না হয়, গোবর আর তুমি দুজনেই চলে যাও।

ভদ্রতা ভদ্রতার পথ দিয়েই চলে, নিজের ঘর উজাড় করে কেউ দিয়ে দেয় না।

এখন যদি জমিদারের পেয়াদা এসে বলে, তবে তোমরা সবাই যাবে মাথায় করে ভুষি পৌঁছাতে। তুমি, তোমার ছেলে, মেয়ে, কেউ বাদ যাবে না। চাইকি, দুমণ আড়াই মণ কাঠও চিরে দিয়ে আসতে পারবে।

জমিদারের কথা ভিন্ন।

তা তো বটেই, সেখানে যে লাঠির চোটে কাজ আদায় হয়!

আরে, ওর ক্ষেতে যে চাষ করি!

বাঃ, চাষ করে ফসল ওকে দিই না?

আচ্ছা আচ্ছা, আর বিঁধে মারিস না, আমরা দুজনে চলে যাব। কি কুক্ষণে যে আমি একে ভুষি দেবার কথা বলেছিলাম! আগে তো দেবেই না, এখন দেবে তো তর সয় না।

তিন খাঁচা ভুষি ভরা হইল। গোবরের মনে ছিল বিরক্তি। বাপের কথায় ওর এতটুকু বিশ্বাস নাই। ও জানিত, বাবা যেখানেই যাইবে, কিছু না কিছু খোয়াইয়া আসিবে। ধনিয়ার মন কিন্তু বেশ প্রফুল্ল। আর হরি, ধর্ম আর নিজের স্বার্থ এই দুইয়ের মাঝে সে দোটানায় পড়িয়া।

হরি আর গোবর ধরাধরি করিয়া এক খাঁচি বাহিরে আনিল, ভোলা তাড়াতাড়ি নিজের গামছাখানা বিড়ের মত করিয়া মাথায় রাখিতে রাখিতে

বলিল, আমি এইটি বাড়িতে রেখে এখুনি আবার আসব, আরেক খাঁচি নিতে হবে ভাই।

হরি বলিল, একটা নয়, আরো দু খাঁচি আমার ঘরে ভরা আছে। তোমার আর আসতে হবে না, আমি আর গোবর সে দুটো নিয়ে তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

ভোলা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হরি যেন উহার আপনার ভাই অপেক্ষাও আরো কত আপন। উহার অন্তরে এমন একটা তৃপ্তির ভাব আসিল যে উহার সমস্ত জীবনকে সরস ও নবীন করিয়া তুলিল।

তিন জনে ভুষি লইয়া চলিল, পথে চলিতে চলিতে কথাবার্তাও চালাইতে লাগিল।

ভোলা বলিল, দশহরা এসে গেল, জমিদার বাড়িতে নিশ্চয় খুবই ধূমধাম হবে।

হাঁ, তাঁবু, সামিয়ানা পড়েছে। এবারকার পালায় আমারও পার্ট থাকবে। রায়সাহেব বলেছেন, আমাকে রাজা জনকের মালী সাজতে হবে।

জমিদার তোমার উপর খুব প্রসন্ন।

তা ওঁর অনুগ্রহ।

কতক্ষণ পরে ভোলা আবার জিজ্ঞাসা করিল, পার্বণীর জন্য কিছু টাকা জোগাড় করেছ তো? মালী সাজলে তো গলা ছুটবে না।

হরি মুখের ঘাম মুছিয়া বলিল, ঐ চিন্তায়ই তো মরে যাচ্ছি দাদা। ফসল তো সকলের খোলাতেই তুলে দিয়েছি। জমীদার নিজের ভাগ নিলেন, মহাজনও তারটা নিল, আমার ভাগে তো মোটে রইল পাঁচসের। এই ভুষি তো আমি রাতারাতি সরিয়েছি, নইলে এক কণাও বাঁচত না। জমিদার তো একা, কিন্তু মহাজন যে তিনটি, সাহুয়াইন, মংগরু, দাতাদীন পণ্ডিত, সব যে ভিন্ন। কারো পাওনাই পুরো মিটাতে পারি নি। জমিদারেরও অর্ধেক বাকী। সাহুয়াইনের কাছে ফের টাকা ধার নিয়ে তবে তো চালাচ্ছি। দেখলাম ভায়া, সব দিকে সুবিধা আর কিছুতেই হয় না। আমাদের জন্মই হয়েছে মুখে রক্ত উঠিয়ে বড়লোকের বাড়ি মারা পড়তে। আসলের দুগুণ সুদ তো ধরে দিয়েছি, তবু আসল যা তাই মাথার উপর ঝুলে আছে। লোকে বলে, বিয়েচুড়োয়, তীর্থে, ব্রতে হাত আঁট করে খরচ করতে হয়। কিন্তু কেউই

নিজের বেলায় তা করে না। রায়সাহেব তো নিজের ছেলের বিয়েতে বিশ হাজার টাকা ঢেলে দিলেন। ওঁকে তো কেউ কিছু বলে না। মংগরু তার বাপের শ্রাদ্ধে পাঁচ হাজার টাকা খরচ কোরলে, ওকেও কেউ কিছু বলে না। এই হোল ব্যাপার।

ভোলা করুণ স্বরে বলিল, তা ভাই, বড়লোকের সঙ্গে কি তোমার আমার তুলনা চলে?

আচ্ছা ভাই, মানুষ তো সকলেই সমান।

আর ভাই, আমাকে তোমাকে কি মানুষ বলে? আমাদের ভিতরে মানুষের মনুষ্যত্ব কিছু আছে? মানুষ তাকেই বলে, যার ধন আছে, বিদ্যা আছে, ক্ষমতা আছে। বলদ হয়ে ঘানিতে জুততেই আমাদের জন্ম। আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে দেখতে পারে না। একতা বলে জিনিস নাই। এক চাষী অপর চাষীর ক্ষেতে গিয়ে চড়াও হবে, কে কার তোয়াক্কা রাখে? প্রেম জিনিস সংসার থেকে উঠেই গেছে।

অতীতের সুখ, বর্তমানের দুঃখ-দুর্দশা, আর ভবিষ্যতের সর্বনাশের চেহারা—বুড়ো বয়সে লোকে এই সব প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে যেমন সুখ পায় আর কিছুতে তেমন পায় না। দুই বন্ধু নিজের নিজের দুঃখের কাহিনী বলিয়া চলিল। ভোলা তার ছেলের কীর্তি সব শুনাইল, হরিও তার ভাইদের দুর্ব্যবহারের কথা বলিয়া কাঁদুনি গাহিল, তার পর একটু জল খাইবে বলিয়া একটা কুয়ার কাছে পিঠের বোঝা নামাইয়া রাখিল। গোবর একজনের কাছ থেকে ঘটি চাহিয়া লইয়া কুয়ার জল তুলিতে লাগিল।

ভোলা মোলায়েম স্বরে বলিল, ভাইদের তুমি ছেলের মত মানুষ করেছিলে, ভিন্ন হবার সময় তোমার খুবই কষ্ট হয়ে থাকবে।

হরি ধরা গলায় বলিল, আর বলো না দাদা, মনে হোত কোথাও গিয়ে ডুবে মরি। আমি বেঁচে থাকতেই এসব হোল, যাদের জন্যে নিজের জোয়ান বয়সটা মাটি কোরলাম তারাই কিনা হয়ে দাঁড়াল শত্রু! আর ঝগড়ার কারণটা কি? না, আমার বৌ কেন ক্ষেতে কাজ কোরতে যায় না। আচ্ছা, তুমিই বল, ঘরে থাকারও তো একজন লোক চাই, দেওয়া নেওয়া, ঝাড়া বাছা, জিনিস ওঠানো নামানো—এ সব কে করে? আর ও তো ঘরে বসে থাকে না। ঝাড়া মোছা, রান্না করা, হেঁসেল তোলা, বাসন মাজা, ছেলেপুলের দেখা শোনা করা—এসব কি

চাট্টিখানি কথা ? শোভার বৌ কি ঘর সামলাতে পারে, না হীরার বৌ পারে খাটতে ? যেদিন থেকে ভিন্ন হয়েছে ওদের দুবাড়িতেই হাঁড়ি চড়ে কেবল এক বেলা। তখন তো সকলের দিনে চারবার করে খিদে লাগতো, আর এখন খাক তো চারবার, তবে বুঝি। এই গিন্নীপনা কোরতে গোবরের মার যা দুর্গতি হোত তা আমিই জানি। বেচারি নিজের জায়েদের ছেঁড়া পুরণো কাপড় পরে কাটাত, পেট ভরে খাওয়া জুটত না, তবু বৌয়েরা যাতে জলখাবারটি পর্যন্ত ঠিক মত পায় সেদিকে ঠিক খেয়াল রাখত। নিজের গায়ে গয়নার নাম পর্যন্ত নেই, তাও জায়েদের জন্য দুখানা চারখানা বানিয়ে দিল। সোনার না হোক, অন্তত রূপোর গয়না। তবু তাদের গা জ্বলতো যে, এ কেন গিন্নীপনা করে। বেশ ভাল হয়েছে, সবাই ভিন্ন হয়েছে, আমার মাথা থেকেও বোঝা নেমে গেছে।

ভোলা এক ঘটি জল উঠাইতে উঠাইতে বলিল, জান ভাই, ঘরে ঘরে এই ব্যাপার। ভাইয়ে ভাইয়ের কথা ছেড়েই দাও, আমার তো ছেলেদের সঙ্গেই বনে না। কেন বনে না জান ? আমি কারো অন্যায় দেখলে মুখ বন্ধ করে থাকতে পারি না। তোমরা জুয়া খেলবে, গাঁজা খাবে, চণ্ডু খাবে, তা এসবের টাকা আসে কোথেকে ? খরচা করবে, তো রোজগার কর। কিন্তু সে বেলায় নেই, কেউ এক পয়সা কামাবে না। এদিকে দিলদরিয়া হয়ে খরচ করবে। বড় ছেলে কামতা বাজার কোরে আনবে, তো আর্ধেক পয়সা গাপ করবে। আর ছোট ছেলে জঙ্গী, সে তো গানবাজনা নিয়ে মেতে আছে। সন্ধ্যা হোল কি খোলকরতাল নিয়ে বসে গেল। গানবাজনা আমি খারাপ বলি না, গানবাজনা দোষের নয়, তবে এ সব হোল অবসর সময়ের জিনিস। তাই বলে তুমি ঘরের একটা কুটো নাড়বে না, অষ্টপ্রহর ঐ নিয়েই থাকবে, এ সব দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। আমি গরুকে খড়বিচালি দেব, গরুও দোয়াব, আবার দুধ নিয়ে বাজারেও যাব, এ রকম গেরস্থালি ঝঞ্ঝাট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যেন সোনার হাঁসুলি—গিলতেও পারি না, ফেলতেও পারি না। মেয়ে ঝুনিয়া—তারও কপাল খারাপ। তার বিয়েতে তো তুমি এসেছিলে কেমন সুন্দর ঘরবর দেখে বিয়ে দিলাম। ওর স্বামীর বোম্বাইয়ে দোকান ছিল সেই যেবার ওখানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হোল, কে একজন ওর পেটে ছোরা মেরে দিল। সংসার ভেঙ্গে গেল। ওখানে আর ওর থাকা চলে না। আমি নিয়ে এলাম যে আরেকবার বিয়ে দেব, তা মেয়ে কিছুতে রাজি নয়। ভাই

দুটি তো দিনরাত ওকে জ্বালা দিচ্ছে। ঘরে এক মহাভারতের লীলা। দুঃখে পড়ে এখানে এল, তা এখানেও সুখ হল না।

ইহাদের দুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে পথ শেষ হইয়া আসিল। ভোলার পাড়া বড় নয় তবে ঘন বসতি। বেশির ভাগ গোয়ালারই এই অবস্থা, আর কিষাণদের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহাদের অবস্থা খারাপ বলা যায় না। ভোলা গ্রামের মাতব্বর। উহার বাড়ির দরজায় গরুর খাওয়ার যে প্রকাণ্ড কাঠের গামলা, তাহাতে দশ বারটি গরু একসঙ্গে দানা খাইতেছে। আড়া-আড়িভাবে একখানি প্রকাণ্ড তক্তা পাতা রহিয়াছে, দশজনেও বোধ হয় উঠাইতে পারে না। উহার উপরে কোথাও খোল, কোথাও করতাল, একটা তাকের উপর একখানা বই কাপড়ে বাঁধা, সম্ভব রামায়ণ। দুই বৌ বাড়ির সম্মুখে বসিয়া ঘুঁটের জন্য গোবর ছানিতেছে, আর চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া আছে ঝুনিয়া। উহার চোখ দুটি লাল, নাকের ডগার কাছটা যেন জখম। দেখিলে মনে হয় এখনই কাঁদিতেছিল। উহার সুঠাম সুডৌল দেহে যৌবন ঝলমল করিতেছে। মুখখানি গোলগাল, কপাল একটু উঁচু, চোখদুটি একটু ছোট আর ভিতরে ঢোকা, মাথাটি হালকা। উহার পরিপূর্ণ বক্ষ আর সুপুষ্ট দেহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছাপানো গোলাপী রং-এর শাড়ীখানি উহার দেহের শোভা আরো বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

ভোলাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া ঝুনিয়া উহার মাথা হইতে খাঁচিটি নামাইয়া লইল। ভোলা হরি আর গোবরের মাথার খাঁচি দুটি নামাইয়া ঝুনিয়াকে বলিল, আগে এক ছিলুম তামাক দে, তার পর একটু সরবত বানিয়ে দে। জল না থাকে তো কলসি নিয়ে আয়, আমি তুলে দিই। হরিভাইকে চিনতে পারছিস না?

তারপর হরির দিকে চাহিয়া বলিল, গিন্নী না থাকলে কিসের ঘর? কথায় বলে, এঁড়ে গোরুর চাষ, আর বৌদের গেরস্থালি! এঁড়ে গোরু দিয়ে চাষ করবে কি, আর বৌরাই বা সংসার সামলাবে কি! যবে থেকে এর মা মারা গেছে, ঘরের যেন সৌভাগ্যচিহ্ন উঠে গেছে; বৌরা আটা চটকাতে পারে বটে, তবে তারা গেরস্থালির কি জানে? অবশ্য মুখ চালাতে জানে খুব। সব কটি আলসে, ফাঁকিবাজ। যদ্দিন বেঁচে আছি এদের পেছন পেছন ঘুরতে হবে। যেদিন মরবো, সেদিন খুব মাথা চাপড়ে কাঁদবে। মেয়েও হয়েছে

তেমনি। সামান্য কিছু ত্রুটি হবে তো মুখ খিঁচিয়ে উঠবে। আমি সবই সয়ে যাচ্ছি, স্বামী কিছু সইবে না।

ঝুনিয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যে এক হাতে তামাক ভরা কলকে, অন্য হাতে এক ঘটি সরবত লইয়া আসিল। তারপর দড়ি আর কলসি লইয়া জল আনিতে চলিল। গোবর তাড়াতাড়ি তাহার কাছ হইতে কলসিটি নিবার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল, থাক, তোমার তুলতে হবে না, আমি তুলে নিচ্ছি।

ঝুনিয়া কলসিটা দিল না। হাসিতে হাসিতে কুয়ার পারে গিয়া বলিল, তোমরা অতিথি, শেষে বলবে, এক ঘটি জল পর্যন্ত দিল না।

অতিথি কি করে হোলাম, আমরা তোমাদের পাড়াপড়সী।

প্রতিবেশী যদি সম্বৎসরের মধ্যে একবারও উঁকি না মারে তবে সে অতিথি ছাড়া আর কি ?

আবার রোজ রোজ এলেও তো মান থাকে না।

ঝুনিয়া হাসিয়া, কটাক্ষ হানিয়া বলিল, তাই তো মান্যি দিচ্ছি। মাসে একবার যদি এস, ঠাণ্ডা জল দেব। পনেরো দিন পরে পরে এস, তবে তামাক দেব। সাত দিন পর পর যদি আস, তবে পাবে খালি বসবার পিঁড়ি। আর রোজ রোজ এলে বাস্ একদম কিচ্ছুটি না।

দেখা তো দেবে ?

দর্শনের জন্য কিন্তু আরাধনা করতে হবে। বলিতে বলিতে হঠাৎ যেন কোন এক বিস্মৃত কথা উহার মনে পড়িয়া গেল। মুখটি শুকাইয়া গেল। ও যে বিধবা। এতদিন উহার স্বামী ছিল উহার মান-মর্যাদার রক্ষক—ও ছিল নিশ্চিন্ত। এখন রক্ষক কেহ নাই, তাই সে সর্বদা শঙ্কিত। অতি সাবধানে সতীত্বের দরজায় আগল বন্ধ করিয়া রাখে। কখনো কখনো ঘর খালি বলিয়া দরজা ফাঁক করে, আবার কাহাকেও আসিতে দেখিলে কপাট বন্ধ করিয়া ফেলে।

গোবর কলসি ভরিয়া চলিয়া গেল। সরবত খাওয়া হইয়াছিল, আরেকবার তামাক খাইয়া সবাই উঠিয়া পড়িল। ভোলা বলিল, গোবর, কাল এসে তুমি গাইটা নিয়ে যেও, এখন তো খাবার খাচ্ছে।

গোবরের চক্ষু দুটি তো গোরুর উপর পড়িয়াই ছিল, যতই দেখিতেছিল গাইটির রূপে গোবর মুগ্ধ হইতেছিল। গোরু এমন সুন্দর হয় এ যেন, গোবরের জানা ছিল না।

হরি লোভ দমন করিয়া বলিল, তা নেব এখন, তাড়া কিসের ?

তা, তোমার তাঁড়া নেই থাক, আমার আছে। এটাকে চোখের সামনে দেখলে তোমার ঐ কথাটা মনে পড়বে।

ও আমার খুব খেয়াল আছে।

আচ্ছা, তবে গোবরকে কাল পাঠিয়ে দিও।

বাপ বেটা খাঁচি মাথায় ফিরিয়া চলিল। দুজনেই এমন খুসি যেন নতুন বিবাহ করিয়া চলিয়াছে। হরির এত কালের অভিলাষ পূরণ হইল, সেজন্য আনন্দ, আর তাও আবার বিনা পয়সায়। আর গোবর তো ইহার অনেকগুণ বেশি মূল্যের জিনিস পাইয়াছে। উহার মনে একটি বাসনা জাগিয়া উঠিয়াছে।

একটু ফাঁক পাইয়া সে পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেখে, ঝুনিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মত্ত আশার মত অধীর চঞ্চল ঝুনিয়া।

## ৪

হরির চোখে সারারাত্রি ঘুম আসিল না। নিমগাছের তলায় নিজের বাঁশের খাটিয়ার উপর শুইয়া বারবার তারার দিকে তাকাইতেছিল। গোরুর নাদ বসাইবার জন্য জায়গা খুঁড়িতে হইবে। বলদগুলোর থেকে ওর জায়গাটা আলাদা হয় তো ভাল হয়। এখন তো রাত্রে বাহিরেই থাকিবে; কিন্তু চার মাসের মধ্যে ওর জন্য আর একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাহিরে লোকে নজর দেয়; কখনও কখনও এমন ধারা টোটকা ঔষধপত্র চালায় যে গোরুর দুধই শুকাইয়া যায়; বাঁট ছুঁইতে দেয় না, লাথি ছোঁড়ে। নাঃ, বাহিরে বাঁধা ঠিক নয়। তা.ছাড়া, বাহিরে গর্তই বা কে খুঁড়িতে দিবে ? কারিন্দা সাহেব নজরের জন্য গাল ফুলাইয়া থাকিবেন। ছোট ছোট কথা লইয়া রায়সাহেবের নিকটে নালিশ করিতে যাওয়াও ঠিক নয়। আর কারিন্দাদের সামনে আমাদের কথা শুনিবেই বা কে! তাঁহাদের কিছু বলিলে কারিন্দা শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করা মূর্খতা। ভিতরেই বাঁধিব। উঠান তো ছোট্ট এক ফালি; কিন্তু একটা বাঁশের খুঁটা ফেলিয়া দিলেই কাজ চলিয়া যাইবে। এই তো প্রথম বিয়েন; পাঁচ সেরের কম কী আর দুধ হইবে ? গোবরেরই তো চাই এক সের। রূপিয়া দুধ দেখিলে কেমন লোভ করে। এখন যত ইচ্ছা খাইয়া লউক। কখনো কখনো মালিককে দুই.এক সের দিয়া

আসিতে হইবে। কারিন্দা সাহেবকেও তো পূজা করিতে হইবে। আর ভোলার টাকাটাও দেওয়া চাই। সম্বন্ধের মিথ্যাজালে ওকে কেন ফেলি? যে আমার উপর এতখানি বিশ্বাস রাখে তাহাকে ঠকানো নীচতা। আশি টাকার গোরু আমাকে বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া দিয়া দিয়াছে। নাঃ, এখানে তো কেহ এক পয়সারও বিশ্বাস করে না। শণ হইতে কি কিছুই পাওয়া যাইবে না? যদি পঁচিশ টাকাও দিয়া দিই, তা হইলে ভোলার সাহস হইবে। ধনিয়াকে শুধু শুধু বলিয়া ফেলিয়াছি; চুপে চুপে গোরু লইয়া বাঁধিয়া দিলে, মাথা ঘুরিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করিত, কাহার গোরু? কোথা থেকে নিয়ে এসেছ? খুব বিরক্ত করিলে তখন বলিতাম; তবে, পেটে কথা হজম হইলে তো? কখনও দুই চার পয়সা উপর থেকে আসিলে ওকে তো গোপন করিতে পারি নাই। আর একথাটা ভালও বটে। ওর আছে ঘরের চিন্তা; যদি ওর খেয়াল হয় যে আমার কাছেও পয়সা থাকে, তবে ল্যাঠা আরম্ভ হইবে। গোবরা একটু আলসে, না হলে গোরুর এমন সেবা করিত যেমনটি চাই। আলসে-টালসে কিছু নয়; এই বয়সে কেই বা অলস নয়? আমিও তো বাবার কাছে গা ছেড়ে দিয়া চলিতাম। বেচারি এক প্রহর রাত থাকিতেই গোরুর জাব কাটিতে আরম্ভ করিত; কখনও দরজায় ঝাঁট দিত, কখনও ক্ষেতে গর্ত করিত। আমি পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতাম। কখনও যদি জাগাইয়া দিত তো আমি বিরক্ত হইয়া ভয় দেখাইতাম, বাড়ি হইতে পলাইয়া যাইব কিন্তু। ছেলে যদি বাপ-মায়ের সামনে জীবনের সামান্য কিছু সুখভোগ না করিবে, তো নিজের মাথার উপর বোঝা পড়িলে কি করিবে? বাবা মারা যাইতে যাইতেই কি আমি বাড়িঘর সামলাই নাই? গ্রামশুদ্ধ সব লোক এই কথা বলিত যে হরি ঘর একেবারে উচ্ছন্ন দিবে; কিন্তু মাথায় বোঝা পড়িলেই আমি ভোল এতখানি বদলাইলাম যে লোকে অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল। শোভা আর হীরা আলাদাই হইয়া গেল, না হইলে আজ এবাড়ির অন্যরকম কথা হইত। তিন তিনটে লাঙ্গল এক সঙ্গে চলিত। এখন তিনটে আলাদা আলাদা চলে। যাক, সমস্তই কালের গতিতে হয়। ধনিয়ার দোষ কি? বেচারি যবে থেকে ঘরে আসিয়াছে আজ পর্যন্ত কখনও আরাম করিয়া বসে নাই। ডুলি হইতে নামিয়াই সমস্ত কাজ মাথায় করিয়া লইয়াছে। মায়ের হাতে হাতে কাজ করিয়া বেড়াইত।

বাড়ির পিছনে যে আপনাকে এমন করিয়া বিলাইয়া দিয়াছে, জায়েদের কাজ করিতে বলিলে সে কি মন্দ করিয়াছে? ওরও তো কিছু আরাম পাওয়া চাই; কিন্তু ভাগ্যে আরাম লেখা থাকিলে তবে তো পাইবে। তখন দেওরদের জন্য মরিত, এখন নিজের ছেলেদের জন্য মরে। ও এতটা সাদাসিধা, সহৃশীল, ছলজ্ঞানহীন না হইলে আজ যে শোভা আর হীরা গোঁফে তা দিয়া বেড়ায়, তাহারা কোথায় ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। যার জন্য মর, সে-ই প্রাণের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

হরি আবার পূর্বদিকের পানে তাকাইয়া দেখিল। ভোরের শুভলগ্ন বহিয়া যাইতেছে। গোবরা কেন যেন জাগিয়া উঠিল। শুইবার আগে ও বলিয়াছিল, আঁধার আঁধার থাকিতেই চলিয়া যাইবে, গিয়া নাদের জন্য জায়গা খুঁড়িবে। কিন্তু না, যতক্ষণ গোরু একেবারে দরজায় আসিয়া উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ নাদের জন্য জায়গা খোঁড়া ঠিক নয়। হয়তো ভোলার মন বদল হইবে, কি অন্য কোনও কারণে গোরু দিবে না। তাহা হইলে গ্রামশুদ্ধ সকলে হাততালি দিতে থাকিবে, 'গোরু আনিতে গিয়াছিল রে'! 'ছোকরা এত তাড়াতাড়ি 'নাদ'-এর জন্য গর্ত খুঁড়িল যেন ঐটারই অভাব ছিল।' ভোলা হইল নিজের ঘরের মালিক; কিন্তু ছেলে সেয়ানা হইলে বাপের আর কোন্ কথাটা খাটে! কামতা ও জংগী বেঁকিয়া বসিলে ভোলা কি আর নিজের থেকে আমাকে গোরুটা দিবে! কখনই নয়।

হঠাৎ গোবর চমকিয়া উঠিয়া বসিল, এবং চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—আরে! এযে ভোর হয়ে গেল দেখি। তুমি 'নাদের' জন্য জায়গা খোঁড় নাই, বাবা!

হরি গোবরের সুগঠিত দেহ ও চওড়া বুকের প্রতি সগর্বে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে এই কথাই ভাবিল, আহা, একে যদি দুধ খাওয়াইতে পারিতাম তবে কেমন শক্ত হইত—মুখে বলিল, নাঃ, এখনও খুঁড়ি নাই। ভাবলাম যদি গোরুটা শেষ পর্যন্ত না পাওয়া যায় তবে বৃথাই বেকুবি হবে।

গোবর ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল—কেন পাওয়া যাবে না?

ওর মনে কোনও চোর যদি ঢুকে যায়?

চোরই ঢুকুক আর ডাকাতই সেঁধোক, গোরু তো ওকে দিতেই হবে।

গোবর আর কিছু বলিল না; লাঠিখানি কাঁধে তুলিয়া হাঁটিতে আরম্ভ

করিয়া দিল। উহাকে যাইতে দেখিয়া হরি নিজের প্রাণে অস্বস্তি বোধ করিল। এখন আর ছেলের বিয়েতে দেরি করা চলিবে না। সতেরোতে পা দিয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থা হইবে কি করিয়া? কোথাও হইতে পয়সার মুখ দেখিলে তবে তো। যতদিন হইতে তিন ভাই আলাদা হইয়াছে, ঘরের নাম কমিয়া যাইতেছে। মোড়লেরা ছেলে দেখিতে আসে; কিন্তু ঘরের অবস্থা দেখিয়া মুখ ফ্যাকাশে করিয়া চলিয়া যায়। দুই একজন রাজিও হইয়াছিল, কিন্তু টাকা চায়। মেয়ের জন্য দুই তিন শ টাকা দিতে রাজি হইলে আর নিজে হইতে ঐ পরিমাণ টাকা খরচ করিলে, তবে গিয়া বিবাহ হয়। কোথা হইতে এত টাকা আসিবে? সুদেই সব টাকা ফুরাইয়া যায়; পেট ভরিয়া খাইতেও কুলায় না। বিবাহ কি করিয়া হয়! আর এখন সোনারও বিবাহের বয়স হইয়াছে। ছেলের বিয়ে না হয় না-ই হইল। কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিতে না পারিলে সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম্বেরা হাসিবে। প্রথমে তো ওকে 'সগাই' করিতে হইবে—বিয়ের কথাবার্তা ঠিক করিতে হইবে, পরে দেখা যাইবে।

একজন লোক 'রাম' 'রাম' কহিতে কহিতে আসিয়া জুটিল আর জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাড়িতে কিছু বাঁশ হবে, মোড়ল?

হরি চাহিয়া দেখিল, ছোটখাটো বাঁশ-কাটা সামনে দাঁড়াইয়া আছে—বেঁটে, কালো, খুব মোটা, মুখ চওড়া, বড় বড় গোঁফ, কোমরে বাঁশ কাটার কাটারি গোঁজা। বছরে দুই একবার আসিয়া চিক, চেয়ার, মোড়া, টুকরি ইত্যাদি তৈয়ার করিবার জন্য কিছু বাঁশ কাটিয়া লইয়া যায়।

হরি খুশি হইয়া গেল। হাতে কিছু আসিবে, আশা হইল। চৌধুরীকে লইয়া নিজেদের তিন বাড়ী দেখাইল, দামদস্তুর করিয়া পঁচিশ টাকা শ হিসাবে পঞ্চাশটি বাঁশের বায়না লইল। আবার দুইজনে ফিরিল। হরি ওকে ছিলিম খাওয়াইল, জলপান করাইল আর তারপর একটু ইসারার ভাবে বলিল—আমার বাঁশ কখনও ত্রিশ টাকার কমে বিক্রী হয় না; কিন্তু তুমি আমাদেরই একজন, বাড়িরই সামিল, তোমার সঙ্গে আবার দরদস্তুর কি? তোমার বড় ছেলে, যার 'সগাই' হয়ে গেছে, বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল, সে বিদেশ থেকে বাড়ি ফেরে নাই?

ছিলিমে টান দিয়া কাসিতে কাসিতে চৌধুরী উত্তর করিল—ও ছোকরার পিছনে তো মারা গেলাম মোড়ল। সোমত্ত বউ ঘরে, আর ও ফুর্তি করতে

চলে গেল বিদেশে, ভাইবেরাদরির একটা মেয়েমানুষকে নিয়ে। বউও আর একজনের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। বড়ই গোলমাল হয়ে গেছে মোড়ল, এমন আর কারো হয় না। কত বুঝালাম যে, যেমন ইচ্ছা খা, যেমন ইচ্ছা পর, আমার নাক যেন না কাটা যায়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। মেয়েদের ভগবান সব কিছু দিন, রূপ যেন না দেন, না হলে সে কায়দায় থাকবে না। —বাড়ি তো ভাগ হয়ে গেছে, নয় ?

হরি আকাশের দিকে তাকাইয়া যেন আকাশের অনন্ত প্রসারের মধ্যে উড়িতে উড়িতে বলিল—সব কিছুই ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে, চৌধুরী নিজের ছেলের মত যাদের মানুষ করলাম, এখন তারা চিরকালের ভাগীদার; কিন্তু ভাইয়ের ভাগীদার হওয়া ঠিক নয়। এদিকে তোমার কাছ থেকে টাকা পাব, ওদিকে দুই ভাইকে তার ভাগ দেব। চারদিনের তো জীবন, এর মধ্যে কেন কারো সঙ্গে ছল-কপটতা করি ? কুড়ি টাকা শ দরে বিক্রী করেছি বললে কি ওরা ঠিক পাবে কিছু ? তুমি ওদের বলতে তো আর যাবে না, তুমি তো আমাকেই বরাবর নিজের ভাই বলে মনে করেছ।

আমরা 'ভাই' কথাটার অর্থ, প্রয়োগে কতখানি মলিন করিয়া ফেলি; কিন্তু কথাটার ভাবনায় যে পবিত্রতা আছে, তাহা আমাদের কালিমায় কখনও মলিন হইবে না।

হরি বাঁকাভাবে এই প্রস্তাব করিয়া চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে একথায় রাজি হয় কি না। উহার মুখের উপর এমন একটা মিথ্যা বিনয়ের ভাব আসিয়া পড়িল, যাহা ভিক্ষা মাগিবার সময় ভিখারীর মুখের উপর আসে।

চৌধুরী হরির আসন পাইয়া ভাল করিয়া জমাইয়া বসিল—তোমার আমার বন্ধুত্ব পুরানা, মোড়ল, একথা সত্যি; কিন্তু মানুষ যদি তার সম্মান বেচে তো কোনও লোভে পড়ে। বিশ টাকা নয়, আমি পনেরো টাকা বলব; কিন্তু কুড়ি টাকার দর নিও।

হরি চটিয়া বলিল, তুমি তো চৌধুরী সব গোলমাল করে দিচ্ছ; কুড়ি টাকায় কি এমন বাঁশ পাওয়া যায় ?

এমন কেন, এর থেকে ভাল বাঁশ দশ টাকায় পাওয়া যায়, হ্যাঁ, তবে আরও পশ্চিমে দশ ক্রোশ চলে যাও। বাঁশের তো দাম নয়, শহরের কাছে হওয়ার

দাম। লোকে ভাবে, সেখানে যেতে যত দেরি হবে, তার মধ্যে তো দুই চার টাকার কাজই হয়ে যাবে।

সওদা চুকিয়া গেল। চৌধুরী মেরজাই খুলিয়া চালের উপর রাখিয়া দিল ও বাঁশ কাটিতে শুরু করিল।

আখের ক্ষেতে জল ছেঁচাই চলিতেছিল। হীরার স্ত্রী জলপান লইয়া কুয়ার দিকে যাইতেছিল। চৌধুরীকে বাঁশ কাটিতে দেখিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—কে বাঁশ কাটছে? এখানে বাঁশ কাটা হবে না।

চৌধুরী হাত থামাইয়া বলিল—বাঁশের দাম-দস্তর করেছি, পনের টাকা শ করে বায়না হয়েছে; অমনি অমনি কাটছি না।

হীরার বৌ নিজের ঘরের প্রভু; উহারই বেঁকিয়া বসায় ভাইয়ে ভাইয়ে ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল। ধনিয়াকে হারাইয়া ও হইয়াছিল বাঘিনী। হীরা কখনও কখনও ওকে ধরিয়া মার লাগাইত। কিছুদিন পূর্বে এত মারিয়াছিল যে কয়দিন ধরিয়া বিছানা হইতে উঠিতে পারে নাই; কিন্তু নিজের অধিকার সে কোনমতেই ছাড়ে না। রাগের চোটে হীরা উহাকে মারিত বটে; চলিত কিন্তু উহারই ইসারায়, ঠিক সেই ঘোড়ার মত যে কখনও কখনও প্রভুকে লাথি ঝাড়িয়াও তাহাকে বহন করিয়া চলে।

জলপানের টুকরি মাথা হইতে নামাইয়া বলিল, পনেরো টাকায় আমার বাঁশ াবে না।

মেয়েদের সঙ্গে এবিষয়ে কথাবার্তা চালানো চৌধুরীর নীতিবিরুদ্ধ ছিল। ালিল, গিয়ে নিজের লোককে পাঠিয়ে দে; যা বলার আছে এখানে এসে লুক।

হীরার বৌ-এর নাম ছিল পুন্নী। মোটে দুই ছেলে, কিন্তু শরীর ভাঙ্গিয়া গয়াছিল। পোষাক পরিচ্ছদে কালের আঘাত-চিহ্ন দূর করিতে চাহিত; কিন্তু গেরস্তি'তে খাদ্যই জোটে না, পোষাকের পয়সা আসে কোথা হইতে? এই ভাব আর অস্থিরতার জন্য উহার প্রকৃতির সরসতা শুকাইয়া কঠোর হইয়া ঠিল, এত কঠোর যে কোদালও তাহার উপর বুঝি দাগ বসাইতে পারিত না।

কাছে গিয়া চৌধুরীর হাত ধরিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—লোককে কন পাঠাব? যা কিছু বলবার থাকে আমাকে বল না। আমি তো বলেছি, আমার বাঁশ কাটবে না।

চৌধুরী হাত ছাড়াইয়া লইতেছিল, আর পুন্নী বার বার ধরিয়া ফেলিতেছিল। এক মিনিট ধরিয়া এই ধস্তাধস্তি চলিল। শেষটায় চৌধুরী উহাকে জোরে মারিল পিছন দিকে এক ধাক্কা। পুন্নী ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু সামলাইয়া নিয়া পা হইতে জুতা খুলিয়া চৌধুরীর মাথায় মুখে পিঠে পটাপট মারিতে লাগিল। বাঁশের ব্যাপারী হইয়া উহাকে দেয় ধাক্কা? ওর এত অপমান! এক দিকে মার দিতেছে, অন্য দিকে চলিতেছে কান্না। উহাকে ধাক্কা দিয়া—নারীজাতির উপর বল প্রয়োগ করিয়া—চৌধুরী নিজেই ঘাড়ধাক্কা খাইল, এখন দাঁড়াইয়া মার খাওয়া ছাড়া এই সংকট কালে উদ্ধার পাওয়ার আর কোনও উপায় তাহার থাকিল না।

পুন্নীর কান্নার শব্দ শুনিয়া হরিও দৌড়াইয়া আসিল। উহাকে দেখিয়া পুন্নী আরও জোরে চিৎকার করিতে শুরু করিল। হরি বুঝিল, চৌধুরী পুনিয়াকে মারিয়াছে। রক্ত তড়াক করিয়া মাথায় চড়িল, আর আলাদা থাকার যে উঁচু বাঁধ তাহা ভাঙ্গিয়া হরি সমস্ত কিছু নিজের অন্দরে আনিবার জন্য বাহিরে চলিয়া আসিল। চৌধুরীকে জোরে এক লাথি লাগাইয়া বলিল, এখন নিজের ভাল চাও তো চৌধুরী এখান থেকে চলে যাও, নইলে তোমাকে লাস করে দেব। নিজেকে কি মনে কর? তোমার এত ক্ষমতা যে আমাদের বৌয়ের গায়ে হাত তোল!

চৌধুরী দিব্য করিয়া নিজের সাফাই দিতে আরম্ভ করিল। জুতার চোটে উহার অপরাধী আত্মা চুপ করিয়া ছিল। এ লাথি তাহার মিলিল বিনা দোষে, আর উহার ফোলা গাল চোখের জলে ভিজিয়া গেল। ও তো বৌকে কিছু বলে নাই; ও কি এমনি গেঁয়ো লোক যে মোড়লদের বাড়ির মেয়েদের গায়ে হাত উঠাইবে!

হরি অবিশ্বাস করিয়া বলিল, চোখে ধূলো দিও না চৌধুরী, তুমি যদি কিছু না-ই বলবে, তবে বৌ কি মিছামিছি কাঁদছে? টাকার গরম যদি হয়ে থাকে তো সেটা বার করে দেওয়া যাবে। আলাদা হয়েছি তো কি হবে, একই তো রক্ত। কেউ যদি বাঁকা চোখে দেখে তো চোখ উপড়ে ফেলব।

পুন্নী চণ্ডী হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল; গলা ফাটাইয়া বলিল—তুই আমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিস নি? নিজের ছেলের দিব্যি করে বল্ তো!

হীরার কাছেও খবর আসিল যে চৌধুরী আর পুনিয়ার মধ্যে লড়াই

হইতেছে। চৌধুরী পুনিয়াকে ধাক্কা দিয়াছিল, পুনিয়া উহাকে চটি দিয়া পিটাইয়াছে। সে তখনই গ্রাম ছাড়িয়া নীরবে ঘটনাস্থলের দিকে চলিল। রাগী বলিয়া গ্রামে তাহার খ্যাতি ছিল। ছোটখাট ডৌল, গড়া-পেটা শরীর, চোখ দুটা কড়ির মত মত বাহিরে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, আর ঘাড়ের শিরা ফুলিয়া উঠিতেছে; কিন্তু চৌধুরীর উপর তো উহার রাগ নয়, রাগ পুনিয়ার উপর। ও কেন চৌধুরীর সঙ্গে লড়িতে গেল? কেন তার ইজ্জত মাটিতে মিশাইয়া দিল? বাঁশের ব্যাপারীর সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করিবার দরকার কি ছিল ওর? ওর উচিত ছিল, হীরাকে গিয়া সমস্ত সংবাদ বলিয়া দেওয়া। হীরা যেমন যেমন উচিত মনে করিত, তেমনি তেমনি করিত। ও কেন তার সঙ্গে লড়াই করিতে গেল? ওর কথামত চলিলে পুনিয়াকে পর্দায় রাখিত। পুনিয়া কোনও বড় সড় কাহারও সঙ্গে মুখ খুলিয়া কথা কহিলে উহার অসহ্য লাগে। ও নিজে ছিল যত প্রচণ্ড, পুনিয়াকে ততই শান্ত রাখিতে চাহিত। দাদা যখন পনেরো টাকায় সওদা করিয়াছে, তখন মাঝে লাফাইয়া পড়িবার ও কে?

আসিয়াই সে পুন্নীর হাত পাকড়াইয়া লইল, আর ঘসটাইতে ঘসটাইতে তাহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া লাথির উপর লাথি মারিতে মারিতে বলিল—হারামজাদি, তুই আমার নাক কাটার জোগাড় করেছিস! তুই সব ছোট-লোক ব্যাটার সঙ্গে লড়াই করেছিস, কার পাগড়ি নীচে যায় বল্! (আরো এক লাথি মারিয়া) আমি ওদিকে জলপানের জন্য তাকিয়ে আছি, আর তুই এদিকে লড়াই করতে শুরু করেছিস! এত বে-লাহাজ! চোখের জল এমনি ফেলেছিস! পুঁতে ফেলব।

পুন্নী হায় হায় করিয়া যায়, আর চীৎকার করিতে থাকে, তোর মাটি খাঁড়া হোক, তোর হাজা হোক, তোর পিলেগ হোক, তোর ওপর মায়ের অনুগ্রহ হোক, তোর ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে যাক। ভগবান করুন, তোর কুষ্ঠ হোক, হাত-পা খসে খসে পড়ুক।

অন্য সব গাল তো হীরা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, কিন্তু এই শেষের গালটা উহার বড় বিষম লাগিল। প্লেগ, কলেরা, এসবে বিশেষ কষ্ট নাই। এদিকে অসুখ হইল, ওদিকে বিদায়; কিন্তু কুষ্ঠ! এই যে ঘৃণ্য মৃত্যু, আর তাহা হইতেও ঘৃণ্য জীবন! সে তেলে-বেগুনে জলিয়া উঠিল,

দাঁতে দাঁত ঘসিতে ঘসিতে পুনিয়ার উপর লাফাইয়া পড়িল, তাহার ঝুঁটি ধরিয়া মাটিতে মাথা ছেঁচড়াইতে ছেঁচড়াইতে বলিল—হাত-পা খসে খসে পড়বে, তো আমি তোকে নিয়ে চাটতে থাকব ? তুই আমার ছেলেমেয়েদের পালবি? অ্যাঁ! তুই-ই এত বড় গেরস্তি চালাবি ? তুই তো আর একজন স্বামীর ব্যবস্থা করে, একধারে দাঁড়িয়ে থাকবি।

পুনিয়ার এই দুর্গতি দেখিয়া চৌধুরীর মনে দয়া হইল। হীরাকে উদার-ভাবে বুঝাইতে লাগিল—হীরা মোড়ল, এখন যেতে দাও, অনেক হয়েছে। কী আর হয়েছে, বৌ না হয় আমাকে মেরেছে। আমি তো তাতে ছোট হয়ে যাই নি। ভগবানের দয়ায় এদ্দিনও তো দেখলাম।

হীরা চৌধুরীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—চুপ কর চৌধুরী, না হলে তোমার ওপর আমার রাগ হবে, তাতে খারাপই হবে। মেয়ের জাত এমনিই বক বক করে। আজ তোমার সঙ্গে লড়াই করেছে, কাল করবে আর একজনের সঙ্গে লড়াই। তুমি ভাল মানুষ, হেসে সরে গেলে, অন্য লোক তো বরদাস্ত করবে না। কোথাও যদি ও নিজের হাত ছেড়ে দিল, তবে কতখানি আবরু থাকবে তা বোঝ!

এই চিন্তায় তাহার রাগ আবার উথলিয়া উঠিল। সে আগাইয়া আসিল, কিন্তু হরি দৌড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল আর পিছনে ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল—ওরে এখন তো হয়েই গেছে। দুনিয়ার সবাই দেখেছে, তুই খুব একজন বাহাদুর লোক। এখন কি ওকে ঘুঁটে খেয়ে ফেলবি ?

হীরা এখনও বড় ভাইকে সম্মান করিয়া চলে, সোজাসুজি ঝগড়া করে না। ইচ্ছা করিলে এক ঝাপটা দিয়া নিজের হাত ছাড়াইয়া লইতে পারিত; কিন্তু এতখানি বেয়াদবি করিতে পারিল না। চৌধুরীর দিকে তাকাইয়া বলিল—এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি ? বাঁশ কাট গে যাও। আমি রাজি আছি। পনের টাকা দরই ঠিক রইল।

ওদিকে পুন্নী বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল। চট্‌ করিয়া উঠিয়া নিজের মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিল—লাগা নিজের ঘরে আগুন, আমি কি করব। কপাল ফেটেছে তাই তোর মতন কসাইয়ের হাতে পড়েছি। লাগা ঘরে আগুন।

জলপানের টুকড়ি ওইখানেই ফেলিয়া দিয়া সে চলিল. বাড়ির দিকে।

হীরা গজরাইতে লাগিল—ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস, চল কূয়োর দিকে, না হলে তোর রক্ত খেয়ে যাব।

পুনিয়ার পা গেল থামিয়া। এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক অভিনয় করিতে চাহিতেছিল না। নীরবে টুকড়িটা উঠাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে কূয়ার দিকে চলিল। হীরাও চলিল তাহার পিছন পিছন।

হরি বলিল—এখন আর মারধর কোরো না যেন, ওতে মেয়েদের আর লজ্জা সরম থাকে না।

ধনিয়া দরজার কাছে আসিয়া হাঁক দিল—তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি তামাসা দেখছ! কেউ কি তোমার কথা শুনছে যে তুমি শিক্ষা দিচ্ছ! সেদিন এই বৌ-ই তোমাকে ঘোমটার আড়াল থেকে গাড়োয়ান বলেছিল, ভুলে গেছ। ঘরের বৌ হয়ে পুরুষের সঙ্গে লড়বে, তো ধমক দেবে না?

হরি দরজায় আসিয়া দুষ্টামি করিয়া বলিল—আর আমি যদি তোকে এমনি মারি?

কখনো কি মারো নাই যে মারার সাধ হয়েছে?

এত নির্দয় ভাবে যদি মারতাম তো তুই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতিস। পুনিয়ার খুব ধৈর্য।

ওহো! বড় দরদ দেখছি যে! এখনো মারের দাগ স্পষ্ট আছে। হীরা মারেও যেমন, আহ্লাদও দেয় তেমন। তুমি তো মারতেই শুধু শিখেছ, আহ্লাদ করতে শেখই নাই। আমার মত মেয়ে বলে তোমার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছি।

আচ্ছা থাক, থাক, নিজের প্রশংসা নিজে বেশি করিস না। তুই-ই চটে মটে বাপের বাড়ি পালিয়ে যেতি। মাসের পর মাস খোসামোদ করতাম, তবে গিয়ে আসতিস।

যখন নিজের গরজ হত তখন তোষামোদ করতে যেতে বাছাধন! আমায় ভালবাস বলে তো যাও নাই।

এই জন্যই তো সব চেয়ে তোকে ভাল বলি।

বৈবাহিক জীবনের প্রভাতে কামনা তাহার গোলাপী মাদকতা লইয়া উদয় হয়, আর হৃদয়ের সমস্ত আকাশ তাহার মাধুর্যের সোনালি কিরণে রঞ্জিত করিয়া দেয়। আবার মধ্যাহ্নের প্রখর তাপ আসে, ক্ষণে ক্ষণে ঝড়

ওঠে, পৃথিবী কাঁপিতে থাকে। কামনার সোনালি আবরণ দূর হইয়া যায়, বাস্তবতা তাহার নগ্নরূপ লইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার পরে সন্ধ্যা আসে, তাহার সঙ্গে আসে পরিপূর্ণ বিশ্রাম, শীতল ও শান্ত তাহার রূপ; তখন আমরা ক্লান্ত পথিকের মত সারাদিনের যাত্রার বৃত্তান্ত বলি ও শুনি, তটস্থ ভাব আমাদের, যেন কোন উঁচু গিরিশৃঙ্গের উপর বসিয়া আছি, নীচের জনকোলাহল আমাদের কাছে গিয়া পৌঁছিতেছে না।

ধনিয়া চোখের কোণে রস ভরিয়া বলিল—যাও যাও, ভারি প্রশংসা করার লোক। কোন কাজ একটু গোলমাল হলেই ঘাড়ে এসে সওয়ার হও।

হরি মিষ্ট অভিযোগের সঙ্গে বলিল—নে, এখন তোর এই অন্যায় আমার ভাল লাগে না ধনিয়া! ভোলাকে জিজ্ঞাসা কর্, আমি তোর কথা ওকে কি বলেছিলাম।

ধনিয়া কথা বদলাইয়া বলিল—দেখ, গোবর গোরু নিয়ে আসছে, না খালি হাতে।

ভোলা লোক ভাল, কিন্তু ওর ছেলে বড় খারাপ। আমার তো ভয় করছে, কোন রকমে সমস্তটা গোলমাল না করে দেয়।

চৌধুরী ঘামে লত-পত, আসিয়া বলিল—মোড়ল, চল, বাঁশ গুণে নেও। কাল ঠেলা নিয়ে এসে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

হরি বাঁশ গুণিবার যে তাড়াতাড়ি দরকার তাহা বুঝিল না। চৌধুরী সে রকম লোকই নয়। যদি এক আধখানা অমনি কাটিয়া নেয়, তাতেই বা কি! রোজই তো দাম না দিয়া লোকে বাঁশ কাটিয়া নিয়া যায়। পূজাপার্বণের সময় তো মণ্ডপ বানাইবার জন্য লোকে ডজন ডজন বাঁশও কাটিয়া নেয়।

চৌধুরী সাড়ে সাত টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। হরি গুণিয়া বলিল, আরো বের কর। হিসাবে তো আরও আড়াই টাকা হয়। চৌধুরী উচ্চস্বরে বলিল—পনেরো টাকায় দর ঠিক হয়েছিল, কি না?

পনেরো টাকায় নয়, কুড়ি টাকায়।

হীরা মোড়ল তোমার সামনে পনেরো টাকা বলেছিল। বল তো ডেকে

কুড়ি টাকায়ই তো ঠিক হয়েছিল চৌধুরী। এখন তোমারি জিৎ, যা বল। আড়াই টাকা বের হচ্ছে, দেও তো দিয়েই দাও।

কিন্তু চৌধুরী কাঁচা খেলোয়াড় নয়; এখন আর উহার ভয় কাহাকে। হরির মুখ তো তালা দিয়া বন্ধ। কি বলে, মাথা ঠুকিয়া নীরব রহিয়া গেল। শুধু বলিল —এ ভাল কথা নয়, চৌধুরী, দু টাকা কমিয়ে রাজা হয়ে যাবে না।

চৌধুরী তীক্ষ্ণস্বরে বলিল—আর তুমি কি ভাইদের কাছ থেকে দুপয়সা ঠকিয়ে নিয়ে রাজা হবে? আড়াই টাকার জন্য এতখানি মানসম্মান নষ্ট করে আমাকে আবার সে বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছ! এখন যদি পরদা ফাঁক করে দিই তো মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

হরির উপর যেন শত শত জুতার ঘা পড়িল। চৌধুরী তো টাকাগুলি সামনে মাটিতে রাখিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু ও নিমগাছের তলায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পস্তাইতে লাগিল। ও যে কতদূর লোভী ও স্বার্থপরায়ণ, আজ তাহার সন্ধান সে পাইয়াছে। চৌধুরী আড়াই টাকা দিয়া দিলে ও খুশিতে কতখানি ফুলিয়া উঠিত; নিজের চালাকির প্রশংসা করিত, কি, যে বসিয়া বসিয়া আড়াই টাকা মিলিল! চোট খাইয়া তবে না আমরা সাবধানে পা ফেলি!

ধনিয়া ভিতরবাড়িতে চলিয়া গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, মাটিতে টাকা পড়িয়া আছে। গুণিয়া বলিল, আরো দশটা চাই না?

হরি মুখ লম্বা করিয়া বলিল—হীরা তো পনেরো টাকায় দিয়ে দিয়েছে, তা আমি কি করব?

হীরা পাঁচ টাকায় দিক। আমি তো ঐ দামে দেব না।

ওখানে মারপিট হচ্ছিল; আমি মাঝে পড়ে কি বলি?

হরি নিজের পরাজয় নিজের মনেই রাখিয়া লইল, যেমন কোন চোর আম পাড়িতে আমগাছে চড়িয়া মাটিতে পড়িলে ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া দাঁড়ায়, যেন কেহ দেখিতে না পায়। জিতিলে নিজের ঠকামির অহংকার করিতে পারে, জিতিলে তো সব কিছুই মাফ হয়। পরাজয়ের লজ্জা যে পান করিয়া লওয়ারই সামগ্রী।

ধনিয়া স্বামীকে কাপড় আছড়ানোর মত আছড়াইতে লাগিল। এমন ভাল অবসর উহার অতি অল্পই জোটে। হরি উহার অপেক্ষা চতুর; কিন্তু আজ ধনিয়ার হাতেই খেলা। হাত মটকাইয়া বলিল, হবে না কেন, ভাই বলেছে পনেরো টাকা, তুমি কি করে রুখবে? আরে রাম রাম! আদুরে ভাই-এর প্রাণ ছোট্ট হয়ে যায় কি না? আবার যখন এত বড় অনর্থ ঘটেছিল যে

আহ্লাদী বউ-এর গলায় ছুরি বসছিল, তখন তুমি আবার কি বলবে ! ও সময় তোমার সর্বস্ব কেউ লুটে নিলেও তোমার চৈতন্য হত না !

হরি চুপচাপ শুনিয়া যাইতেছিল। মুখে কথা নাই। চিড়বিড় করিয়া উঠিল, রাগ হইল, রক্ত চড়িল, চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, দাঁতে দাঁত ঘষিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। চুপচাপ কোদাল উঠাইয়া আখ লাগাইতে চলিল।

ধনিয়া কোদাল কাড়িয়া লইয়া বলিল---এখন কি ভোর আছে যে আখ লাগাতে চললে ? সূর্জ্যিঠাকুর যে মাথার ওপরে চড়েছেন। নাইতে টাইতে যাও। রুটি তৈরি।

হরি মুখ গোঁজ করিয়া বলিল—আমার খিদে নাই।

ধনিয়া কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া বলিল—হাঁ, খিদে হবে কেন, ভাই বড় বড় লাড্‌ডু খাইয়েছে তো ! ভগবান সবাইকে এমনি ভাল ভাই দিন।

হরি বিগড়াইয়া গেল। রাগ আর সামাল মানিতেছিল না — তোর আজ আর খাওয়া আছে অদেষ্টে।

ধনিয়া কৃত্রিম বিনয়ের ভঙ্গী করিয়া বলিল—কি করি, তুমি এত আহ্লাদ দাও যে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছে।

তুই ঘরে থাকতে দিবি কি না ?

ঘর তোমার, তুমিই মালিক, তোমায় ঘর থেকে বার করে দিই আমার এমন কি ক্ষমতা ?

হরি আজ ধনিয়ার কাছে কোনও মতেই আমল পাইল না। ওর বুদ্ধি শুদ্ধি যেন ভোঁতা হইয়া গেছে। এই সব ব্যঙ্গ আটকাইবার কোনও চাল তাহার জানা ছিল না। আস্তে আস্তে সে কোদালটা রাখিয়া দিল, আর গামছা লইয়া স্নানে চলিয়া গেল। ফিরিল প্রায় আধঘণ্টার মধ্যে ; তখনও গোবর ফিরে নাই। একা কি করিয়া খাইতে বসে ! ও ছোঁড়া ওখানে গিয়া নিশ্চয় শুইয়া পড়িয়াছে। তেমন পাগলী নয় ভোলার মেয়ে ঝুনিয়া। তাহার সঙ্গে শুধু হাসি ঠাট্টা করিতেছে হয়তো। কালও তো ওর পিছনে লাগিয়াছিল। গোরু দিল না, তো ফিরিয়া আসিল না কেন ? ওখানেই কি সাধিয়া পাত পাড়িবে ?

ধনিয়া বলিল—এখন দাঁড়িয়ে কেন ? গোবর সন্ধ্যার সময় আসবে।

হরি আর কিছু বলিল না ; ধনিয়া যদি আরো কিছু বলিয়া বসে।

সে খাইয়া নিমের ছায়ায় শুইয়া রহিল।

রূপা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল, উলঙ্গ দেহে এক লেংটি পরা, ঝাপড়া চুল এদিক ওদিক আসিয়া পড়িয়াছে। হরির বুকে আসিয়া শুইয়া পড়িল। উহার দিদি সোনা বলিতেছে—গোরু আসবে, তার গোবর আমি পাব। রূপা একথা বরদাস্ত করিতে পারে না, সোনা কোথাকার এমন বড় রানী যে সে-ই পাবে? রূপা কিসে তার চেয়ে কম? সোনা রুটি সেঁকে বটে, রূপা কি বাসন মাজে না? সোনা জল নিয়া আসে, রূপা কি কূয়াতে রসি নিয়া যায় না? সোনা তো কলসী ভরিয়া আড়চোখে চাহিতে চাহিতে চলিয়া আসে। রসি জড় করিয়া নিয়া আসে রূপাই। গোবর দুইজনেই একসঙ্গে সমান সমান ভাগে চট্‌কাইতে পারে। সোনা ক্ষেতে গোড়াটা খুঁড়িতে যায়, তা রূপা কি ছাগল চরাইতে যায় না? তবু সোনা কি একাই সমস্ত গোবর চট্‌কাইবে? এ অন্যায় রূপা সহ্য করিবে কেমন করিয়া?

হরি শিশুর সরলতায় মুগ্ধ হইয়া বলিল—না, গোরুর গোবর তুই-ই চট্‌কাবি। সোনা গোরুর কাছে গেলে তাড়িয়ে দিস।

রূপা বাবার গলায় হাত দিয়া বলিল—দুধও আমি-ই দুইব।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই না দুইলে আর কে দুধ দোয়াবে?

ও গোরু আমার হবে।

হ্যাঁ, ষোল আনাই তোর হবে।

রূপা খুশি হইয়া নিজের এই শুভবার্তা পরাজিত সোনাকে শুনাইবার জন্য চলিয়া গেল। গোরু হবে আমার, দুধ দুইব আমি, গোবর চট্‌কাব আমি, তোর কিছু মিলবে না।

দেহের গড়নে সোনা যুবতী, বয়সে কিশোরী, বুদ্ধিতে বালিকা, যেন তাহার যৌবন তাহাকে সামনে টানিতেছে, শৈশব পিছনে টানিয়া রাখিতেছে। কোনও কোনও বিষয়ে এত চতুর যে গ্র্যাজুয়েট মেয়েদের শিখাইতে পারে, কোনও কোনও বিষয়ে এতখানি 'অলবড়েড' যে শিশুদেরও পিছনে। দীর্ঘকায়, রুক্ষ, কিন্তু প্রসন্নমুখ, মাথাটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, চোখে একপ্রকারের তৃপ্তি, চুলে তেল নাই, চোখে কাজল নাই, দেহে কোনপ্রকার গহনা নাই, সংসারের ভার যেন যৌবনকে চাপিয়া রাখিয়া খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।

মাথায় এক ঝটকা দিয়া সে বলিল—যা, তুই গোবর চট্‌কা গিয়ে। যখন তুই দুধ দুয়ে রাখবি, তখন আমি খেয়ে নেব।

আমি দুধের হাঁড়ি তালা চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখব।

আমি তালা ভেঙ্গে দুধ বাইরে নিয়ে আসব।

এই বলিতে বলিতে বাগানের দিকে রওনা হইল। আম আধাআধি াকিয়াছিল, হাওয়ার জোরে এক আধটা মাটিতে পড়িয়াছিল, 'লু' লাগিয়া ্কাইয়া হলুদ রং-এর হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ছেলেরা উহাই গাছপাকা মনে করিয়া বাগান ঘিরিয়া থাকিত। রূপাও দিদির পিছন লইল। সোনা যাহা করে, ়পাকেও তাহাই করিতে হইবে। সোনার বিবাহের কথাবার্তা হইতেছিল, ়পার বিবাহের কথা কেহ বলিত না, তাই সে নিজের বিবাহে নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করিত। উহার বর কেমন হইবে, কি কি আনিবে, কেমন করিয়া তাহাকে রাখিবে, কি খাওয়াইবে, কি পরাইবে, এ সবের বড় বড় বিশদ বর্ণনা করিত, তাহা শুনিয়া কোনও ছেলেই উহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইত না।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। হরির দেহে এতখানি আলস্য যে আখের গোড়া ্ড়িতে যাইতে পারে নাই। বলদগুলা নাদে লাগাইয়া, জাব দিয়া নিজে এক ছিলিম তামাক ভরিয়া খাইতে লাগিল। এই ফসলের সমস্ত কিছু খামার াড়িতে ওজন করিলেও এখনও তাহার তিনশ টাকা থাকে ধার, তার উপর প্রায় একশ টাকা সুদ বাড়িতে থাকে। আজ পাঁচ বৎসর হইতে চলিল মংরু া'র নিকট বলদের জন্য ষাট টাকা লইয়াছিল; তাহার মধ্যে ষাট টাকা দিয়া ফলিয়াছে; কিন্তু ঐ ষাট টাকা যেমন ছিল তেমনি আছে। দাতাদীন পণ্ডিতের াছে ত্রিশ টাকা নিয়া আলু লাগাইয়াছিল; আলু তো মাটি খুঁড়িয়া চোর চুরি করিয়া লইয়া গেল, আর এই তিন বৎসরে সেই ত্রিশ টাকায় তিনশ টাকা ইল। দুলারী বিধবা, সাউকারের স্ত্রী ছিল, গাঁয়ে তাহার ছিল এক নুন-তেল-তামাকের দোকান। ভাগাভাগির সময় তাহার নিকট হইতে চল্লিশ টাকা াইয়া ভাইদের দিতে হইয়াছিল। উহার প্রায় একশ টাকা জমিয়াছিল; কারণ টাকার ব্যাজ ছিল এক আনা করিয়া। খাজনার দরুণও এখন পঁচিশ টাকা বাকি াছে, আর দশহরার দিন পার্বণীর টাকারও কিছু চেষ্টা করিতে হয়। বাঁশের ামটা বড় ভাল সময়ে পাওয়া গিয়াছে। ঐ টাকার সমস্যা মিটিয়া যাইবে; কিন্তু কে জানে। এদিকে যদি এক আধলাও হাতে আসে, তা হইলে গাঁয়ে হ-চৈ পড়িয়া যায়, চারদিক হইতে পাওনাদার আঁচড়াইতে কামড়াইতে শুরু করে। এ পাঁচ টাকা তো ঐ পার্বণেই দিব, যা হয় হোক। কিন্তু এখনও

জীবনের দুইটা বড় বড় কাজ মাথার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—গোবর আর সোনার বিবাহ। খুব হাতকষাকষি করিলেও তিনশ টাকার কমে কুলাইবে না। এ তিনশ আসিবে কার ঘর হইতে? কত চেষ্টা করি, কাহারও নিকট এক পয়সা কর্জ করিব না, যার যার ধারি তাদের সকলেরই দেনা পাই পর্যন্ত চুকাইয়া দিই, কিন্তু সব রকম কষ্ট স্বীকার করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। এইভাবে সুদ বাড়িয়া চলিবে, আর একদিন ওর ঘর দরজা সব নিলাম হইয়া যাবে, উহার পুত্রকন্যা নিরাশ্রয় হইয়া ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইবে। হরি যখন কাম-ধান্ধা হইতে ছুটি পাইয়া ছিলিম টানিতে থাকে তখন এই চিন্তা কালো দেওয়ালের মত চার দিক হইতে তাহাকে ঘেরিয়া লয়, তাহা হইতে বাহির হইবার কোনও পথ আর তাহার চোখে পড়ে না। তবে সান্ত্বনা এই যে, একলা ওর ঘাড়েই এই বিপদ নহে, প্রায় সকল কৃষকেরই এই অবস্থা। অধিকাংশের অবস্থা তো ইহা হইতেও খারাপ। শোভা ও হীরা যে উহার কাছ থেকে পৃথক হইয়া গিয়াছে তাহা আজ মোট তিন বৎসর হইল; কিন্তু দুইজনের উপরই চার চারশ টাকার বোঝা চড়িয়াছে। ঝীংগুর দুই হালের চাষ করে; তাহার ঘাড়ে এক হাজারের কিছু বেশি হইবে দেনা। জিয়াবন মোড়লের ঘরে ভিখারীও ভিক্ষাও পায় না; কিন্তু ধারকর্জের সীমা নাই। এখানে বাঁচিয়া আছে কে?

সহসা সোনা-রূপা দুইজনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিল, আর এক সঙ্গে বলিল—ভাই গোরু নিয়ে আসছে। গোরু আসছে আগে আগে, পিছনে ভাই!

রূপাই প্রথমে গোবরকে আসিতে দেখিয়াছিল। ও এই সংবাদ শুনাইবার জন্য অবসর খুঁজিতেছিল। সোনা যে সর্বদা ভাগীদার হইয়া পড়ে, ইহা ও কেমন করিয়া সহ্য করে!

ও সামনে আসিয়া বলিল—আমি প্রথমে দেখেছি। তখনি দৌড়ালাম। দিদিতো পরে দেখেছে।

সোনা এ দাবি স্বীকার করিতে পারিল না। বলিল—তুই ভাইয়াকে কোথায় চিনলি? তুই তো বলছিলি, কোন একটা গোরু পালিয়ে আসছে? আমি তো বললাম, ভাইয়া আসছে।

আবার দুজনে ছুটিল বাগিচার দিকে, গোরুকে স্বাগত জানাইবার জন্য।

ধনিয়া আর হরি দুইজনে গোরু বাঁধিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। হরি বলিল—চল, তাড়াতাড়ি 'নাদ'টা গেড়ে দিই।

ধনিয়ার মুখে হঠাৎ উত্তর আসিল—না, প্রথমে থালায় অল্প একটু আটা আর গুড় মেখে রেখে দিই। বেচারী রোদের মধ্যে এসেছে, তেষ্টা পেয়ে থাকবে। তুমি গিয়ে গর্ত কর, আমি মাখিগে যাই।

কোথায় একটা ঘণ্টা পড়েছিল। সেটা খুঁজে নে। ওর গলায় বাঁধব।

সোনা গেল কোথায়? সাহুআইনের দোকান থেকে একটুখানি কালো ডোরা চেয়ে আনবে। গোরুর বড্ড নজর লাগে।

আজ আমার মনের খুব একটা জোর ইচ্ছা পূরণ হল।

ধনিয়া চাহিতেছিল, নিজের প্রাণের উল্লাস চাপিয়া রাখে। এত বড় সম্পদ সঙ্গে সঙ্গে কোনও নূতন বাধা লইয়া আসে, এই আশঙ্কা তাহার আশাহীন হৃদয়ে কম্পন জাগাইয়া তুলিতেছিল। আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল—গোরু আনবার আনন্দ তখনি হয়, যখন তার দরজাও থাকে ভাল। ভগবানের মনের কথা।

ও যেন ভগবানকে ঠকাইতে চায়। ভগবানকেও দেখাইতে চায় যে এই গোরু আনায় ওর এত আনন্দ হয় নাই যে হিংসুক ভগবান সুখের পাল্লা উঁচা হইয়াছে বলিয়া কোন নূতন বিপদ পাঠাইয়া দিবেন।

গোবর যখন গোরু লইয়া বালকের উৎসাহে দরজায় আসিয়া পৌছিল তখনও ধনিয়া আটা মাখিতেছিল। হরি ছুটিয়া গোরুর গলা জড়াইয়া ধরিল। ধনিয়া আটা ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি এক পুরানা শাড়ির কালো পাড় ছিঁড়িয়া গোরুর গলায় বাঁধিয়া দিল।

হরি শ্রদ্ধা-বিহ্বল নেত্রে গোরুকে দেখিতেছিল, সাক্ষাৎ ভগবতী যেন তাহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। আজ ভগবান এমনই দিন দেখাইলেন যে তাহার গৃহ গোরুর চরণস্পর্শে পবিত্র হইয়া গেল। এ সৌভাগ্য কে জানে কাহার পুণ্যপ্রভাবে!

ধনিয়া ভীত হইয়া বলিল—দাঁড়িয়ে কেন, আঙ্গিনায় 'নাদ' খুঁড়ে দাও।

আঙ্গিনায়! জায়গা কই?

অনেক জায়গা আছে।

আমি তো বাইরে খুঁড়ছি।

পাগল হোয়ো না। গোরুর অবস্থা জেনেও ন্যাকা হোচ্ছ?

আরে, এক বিঘতের আঙ্গিনা, গোরু বাঁধব কোথায় গো?

যে কথা জান না, তার মধ্যে সর্দারি কোরো না। সমস্ত সংসারের শাস্ত্র তুমি পড়নি।

হরি সত্যই প্রকৃতিস্থ ছিল না। গোরু ওর পক্ষে শুধু ভক্তি ও শ্রদ্ধার বস্তু ছিল না, সজীব সম্পত্তিও ছিল বটে। সে চাহিয়াছিল, গোরু দিয়া নিজের দ্বারের শোভা ও গৃহের গৌরব বাড়াইবে। সে চাহিয়াছিল, লোকে দরজায় গোরু বাঁধা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করুক—এ কার ঘর? আর লোকে বলুক, হরি মোড়লের। যাহাতে মেয়ের বাপেরাও উহার ঐশ্বর্য দেখিয়া অভিভূত হয়। আঙ্গিনায় বাঁধিলে কে দেখিবে? ধনিয়া ছিল ইহার বিপরীত, তাহার মনে ছিল শঙ্কা। সে চাহিত, গোরুটাকে সাত পরদার মধ্যে লুকাইয়া রাখে; গোরু যদি অষ্টপ্রহর কুঠরিতে থাকিতে পারিত, তবে হয়তো উহাকে আর বাহির হইতেই দিত না। এই ধরণের প্রত্যেক কথায় হরির জয় হইত; সে নিজের দিকে টানিয়া ঝগড়া করিত, আর ধনিয়াকে নামিতে হইত। কিন্তু আজ ধনিয়ার সামনে হরির একটা কথাও চলিল না। ধনিয়া লড়িবার জন্য তৈয়ার হইয়াছিল। গোবর আর সোনা আর রূপা, সমস্ত বাড়িই ছিল হরির পক্ষে, কিন্তু ধনিয়া একলাই সকলকে হারাইয়া দিল। আজ তাহার মধ্যে দেখা গেল বিচিত্র এক আত্মবিশ্বাস, আর হরির মধ্যে বিচিত্র এক বিনয়।

কিন্তু তামাসা কি করিয়া বন্ধ করা যায়? গোরুতো আর ডুলিতে চড়িয়া আসে নাই। এ কি আর সম্ভব ছিল যে গ্রামে এত বড় একটা কথা হইবে আর ভিড় জমিবে না? যে-ই শুনিল সে-ই কাজ ছাড়িয়া দেখিতে দৌড়িল। এ মামুলি দেশী গোরু নয়। ভোলার বাড়িতে আসিয়াছিল আশি টাকায়। হরি কি আর আশি টাকা দিতে পারিয়াছে, পঞ্চাশ ষাট টাকায় হয়তো পাইয়াছে। গ্রামের ইতিহাসে পঞ্চাশ ষাট টাকা দিয়া গোরু কেনার কথাও কেহ শোনে নাই। বলদ তো পঞ্চাশ টাকায়ও পাওয়া যায়, একশ টাকায়ও আসে; কিন্তু কিষাণ গোরুর জন্য এত বেশি খরচ করিবে কি খাইয়া; এতো গোয়ালাদেরই প্রাণে সম্ভব যে আঁজলাভরা টাকা গণিয়া আনে। গোরু কি, না, সাক্ষাৎ দেবী। দর্শক ও আলোচনাকারীদের ভিড় লাগিয়াছিল—আর হরি ছুটিয়া ছুটিয়া সকলের অভ্যর্থনা করিতেছিল। এতখানি নম্র, এতখানি প্রসন্নচিত্ত উহাকে কখনও দেখা যায় নাই।

সত্তর বৎসরের বুড়া পণ্ডিত দাতাদীন লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে আসিল, আর

কুঞ্চিত মুখে বলিল—কোথায় হে হরি, আমিও একটু তোমার গোরুটা দেখে যাই। শুনেছি, ভারি সুন্দর।

হরি দৌড়াইয়া আসিয়া প্রণাম করিল, মনে তাহার অভিমানভরা উল্লাস ও আনন্দ, পণ্ডিতজীকে খুব সম্মান দেখাইয়া আঙ্গিনায় লইয়া আসিল। মহারাজ গোরুকে নিজের পুরানা, অভিজ্ঞ চোখ দিয়া দেখিল, শিং দেখিল, বাঁট দেখিল, পিছনটা দেখিল, আর উত্তরে ঘন শাদা ভুরুর নীচে ঢাকা চোখে আনন্দ ভরিয়া বলিল—কোন দোষ নাই, বেটা, চুল ভুরু সব ঠিক। ভগবান যদি মুখ তুলে চান তো তোমার ভাগ্য খুলে যাবে। এত ভাল লক্ষণ যে বাঃ! দিনের খোরাক যেন কম না হয়ে পড়ে। এক এক বাছুরের দাম হবে শ শ টাকা।

হরি আনন্দের সাগরে হাবুডুবু খাইতে খাইতে বলিল—সব আপনার আশীর্বাদ, দাদা!

দাতাদীন সুরতির পিক ফেলিতে ফেলিতে বলিল—আমার আশীর্বাদ নয়, বেটা, ভগবানের দয়া। এ সব প্রভুর দয়া। টাকাটা নগদ দিয়েছ?

হরি বেপরোয়া ভাব দেখাইল। নিজের মহাজনের সামনেও নিজের সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিবার এমন অবসর পাইয়া কি করিয়া ছাড়িতে পারে? ঠগদের নূতন টুপি মাথায় পরিয়া আমরা যখন বাঁকা হইতে শুরু করি, অল্পক্ষণের জন্য কোনও সওয়ারির পর বসিয়া আমরা যখন আকাশে উড়িতে থাকি, তখন এত বড় বিভূতি পাইয়া উহার মন আকাশে উড়িবে না কেন? বলিল—ভোলা এত ভালমানুষ নয় মহারাজ! নগদ গুণে নিয়েছে, পূরা টাকা, হুঁসিয়ার।

নিজের মহাজনের সামনে এই গর্ব করিয়া হরি তো বেকুবি করিয়াছিল নিশ্চয়, কিন্তু দাতাদীনের মুখে অসন্তোষের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। কথাটার মধ্যে কতখানি সত্য, তাহা উহার ঐ সন্ধানী চক্ষে গোপন রহিতে পারিল না, তাহার আলো কয়েক জায়গায় অনুভূতিকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল।

প্রসন্ন হইয়া বলিল—কোনও ক্ষতি নাই বেটা, কোনও ক্ষতি নাই। ভগবান সমস্ত শুভ করবেন। বাছুরের ভাগ বাদ দিয়ে এ পাঁচ সের দুধ দেবে।

ধনিয়া তাড়াতাড়ি জবাব দিল—আরে না না মহারাজ, এত দুধ কই? বুড়ি তো হয়েই গেছে; আর এর খোরাকি ধরা হল কোথায়?

দাতাদীন দরদী চক্ষু দিয়া উহার সতর্কতা স্বীকার করিল, যেন বলিতেছিল—

গৃহিণীর এই ধর্ম, গোলমাল করা পুরুষের কাজ, ওকে গোলমাল করতে দেও। আবার রহস্যভরা স্বরে বলিল—বাইরে বেঁধো না, এইটুকু বলে রাখছি।

ধনিয়া বিজয়ী দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাইল, সে দৃষ্টি যেন বলিতেছিল—নেও, এখন তো মানবে ?

দাতাদীনকে বলিল—না মহারাজ, বাইরে কেন বাঁধবে, ভগবান যদি দেন তো এই আঙ্গিনাতেই আরো তিনটা গাই বাঁধতে পারি।

সারা গ্রাম গোরু দেখিতে আসিল। আসিল না শুধু শোভা আর হীরা, যারা ছিল সোদর ভাই। হরির হৃদয়ে এখনও ভাইদের জন্য কোমল স্থান ছিল। ওরা দুজন যদি আসিয়া গোরু দেখিয়া খুশি হইয়া যাইত, তবে উহার মনস্কামনা পূর্ণ হইত। সন্ধ্যা হইয়া গেল। দুইজনে কাজ করিয়া ফিরিয়া আসিল, এই দরজা দিয়াই বাহির হইয়াছিল; কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

হরি ভয়ে-ভয়ে ধনিয়াকে বলিল—না শোভা এল, না হীরা। শোনে নি কি ?

ধনিয়া বলিল—তা এখানে ওদের ডাকতে যাবে কে ?

তুই তো কথা বুঝিসই না, লড়াই করতে তৈরি থাকিস! ভগবান যখন এদিন দিয়েছেন তখন আমাদের মাথা নীচু করে চলাই দরকার। নিকট আত্মীয়দের মুখে নিজের ভালমন্দ শুনতে মানুষের যতটা লোভ হয়, বাইরের লোকদের মুখে ততটা হয় না। তারপর নিজের ভাই যতটা খারাপ হোক, নিজের ভাই তো! নিজের হিস্‌সা বখরার জন্য সকলেই লড়ে; কিন্তু এতে রক্তের ভাগাভাগি হয় না। দুজনকে ডেকে দেখিয়ে দিতে হয়। না হলে বলবে, গোরু আনল, আমাদের বললেও না।

ধনিয়া নাক সিঁটকাইয়া বলিল—আমি তোমাকে এক শ বার, হাজার বার বলে দিয়েছি, আমার মুখের সামনে ভাইদের ব্যাখ্যানা কোরো না, ওদের নাম শুনলে আমার শরীরে আগুন লেগে যায় যেন। সমস্ত গাঁয়ে শুনেছে, ওরাই কি শুনতে পেলে না ? এমন কিছু দূরেও তো থাকে না। সমস্ত গাঁ দেখতে এসেছে, ওদেরই পায়ে মেহেদি লেগে ছিল; কিন্তু আসবে কেমন করে ? হয়তো মনে মনে জ্বলছে যে এদের ঘরে গোরু এসেছে। বুক হয়তো ফেটে যাচ্ছে।

সন্ধ্যাবাতির সময় আসিয়া গেল। ধনিয়া গিয়া দেখিল, বোতলে মাটির তেল নাই। বোতল উঠাইয়া তেল আনিতে চলিয়া গেল। পয়সা ঘরে থাকিলে

রূপাকে পাঠাইত, ধারে আনিতে হইবে, সামনসামনি কিছু কহিবে, খোসগল্প হইবে, তবে তো ধারে তেল পাইবে।

হরি রূপাকে ডাকাইয়া আদরে কোলে বসাইল, তারপর বলিল—একটু গিয়ে দেখে এস তো হীরাকাকা বাড়ি এসেছে কি না। শোভাকাকাকেও দেখে এস। বোলো, বাবা তোমাদের ডেকেছে। না এলে, ধরে নিয়ে আসবে।

রূপা টুক করিয়া বলিয়া উঠিল—ছোটকাকি আমায় ধমক দেয়।

কাকির কাছে যাবে কি করতে? শোভার বৌ তো তোকে আদর করে?

শোভা কাকা আমায় দেখলে রাগ করে, বলে······আমি বলবো না।

কি বলে, বল্?

রাগ করে।

কি বলে রাগ করে?

বলে যে তোর জন্য বড় ইন্দুর ধরে রেখেছি; যা, ভোজ খেয়ে নে।

হরির মন পুলকিত হইয়া উঠিল।

তুই বলিস না, তুমি আগে খেয়ে নেও, তবে আমি খাব!

মা বারণ করে; বলে, ওদের বাড়ি যেও না।

তুই মার মেয়ে, না আমার মেয়ে?

রূপা তাহার গলায় হাত দিয়া বলে—মার মেয়ে, আর হাসিতে থাকে।

তবে আমার কোল থেকে নেমে যা। আজ আমি তোকে আমার থালায় খাওয়াব না।

ঘরে একটাই কাঁসার থালা ছিল, সে থালায় হরি খাইত। থালায় খাওয়ার গৌরব পাইবার জন্য রূপা হরির সঙ্গে খাইত। এ গৌরব সে পরিত্যাগ করে কি করিয়া? জোর করিয়া বলিল—আচ্ছা, তোমার মেয়ে।

তবে আমার কথা শুনবি, না মার কথা?

তোমার।

তবে গিয়ে হীরা আর শোভাকে ধরে নিয়ে আয়।

আর মা যদি রাগ করে?

মাকে বলতে যাবে কে?

রূপা লাফাইতে লাফাইতে হীরার ঘরের দিকে চলিল। হিংসাদ্বেষের মায়াজালে বড় বড় মাছই আটকাইয়া যায়। ছোট ছোট মাছ তো তার মধ্যে

ধরাই পড়ে না, ধরা পড়িলেও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যায়। তাহাদের পক্ষে ঐ ভয়ানক জাল খেলার সামগ্রী, ভয়ের নয়। ভাইদের সঙ্গে হরির কথাবার্তা বন্ধ ছিল; কিন্তু রূপার দুই ঘরেই যাতায়াত চলিত। শিশুর সঙ্গে আবার শত্রুতা কি?

কিন্তু রূপা ঘর হইতে বাহির হইতেই ধনিয়া তেল লইয়া ফিরিল, উহাকে জিজ্ঞাসা করিল—সন্ধ্যার সময় কোথায় যাস, ঘরে চল্। রূপা মাকে খুশি করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।

ধনিয়া ধমক দিল—চল্ ঘরে, কাউকে ডাকতে যেতে হবে না।

রূপার হাত ধরিয়া সে টানিতে টানিতে ঘরে আনিল, আর হরিকে বলিল—আমি তোমাকে হাজারো বার বলেছি, আমার ছেলেমেয়েদের কারু ঘরে পাঠাবে না। কেউ এদিক ওদিক করবে আর আমি কি তোমায় ধুয়ে খাব? এতই যদি প্রেম তো নিজে যাও না কেন? এখনও পেট ভরে নি বলে বোধ হচ্ছে।

হরি 'নাদ' সাজাইতেছিল। দুই হাতে মাটি মাখা, কপট অজ্ঞানে বলিল—কোন্ কথায় মেজাজ খারাপ করছ গো! এ তো ভাল লাগে না যে অন্ধ কুকুরের মত হাওয়ার গলায় ফাঁসি লাগাও!

ধনিয়ার কূপীতে তেল ঢালা বাকি ছিল, এ সময়ে ঝগড়া বাড়ানো তার অভিপ্রেত ছিল না। রূপাও ছেলেদের সঙ্গে গিয়া মিশিয়াছিল।

রাত এক প্রহরের বেশি; নাদ তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বিচালি আর খৈল তাহাতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। গোরু মনমরা উদাসীন ভাবে বসিয়াছিল, বধূ যেন শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছে। নাদে মুখও দিতেছে না। হরি ও গোবর খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া আধা আধা রুটি তাহার জন্য আনিয়াছিল, কিন্তু ও তাহা শুঁকিয়াও দেখে নাই। কিন্তু ইহা নূতন নহে। গৃহবিরহের দুঃখ পশুরও নানাভাবে লাগে।

বাহিরে খাটের উপর বসিয়া হরি ছিলিম টানিতেছিল; ভাইদের কথা আবার মনে পড়িল। নাঃ, আজ এই শুভ মুহূর্তে ভাইদের সে অবজ্ঞা করিতে পারে না। এই ঐশ্বর্য পাইয়া তাহার হৃদয় উদার হইয়া গিয়াছিল। ভাইদের সঙ্গে পৃথক্ হইয়াছে তো কি হইয়াছে! তাহাদের শত্রু তো নয়। এই গোরুই যদি তিন বৎসর পূর্বে আসিত তো সকলের উহার উপর সমান অধিকার হইত। আর কাল যদি এই গোরু দুধ দিতে শুরু করে, তাহলে কি ভাইদের বাড়ি ও দুধ পাঠাইবে

না, কি দই পাঠাইবে না? এ তো ওর 'ধরম' নয়। ভাইদের ওর প্রতি মন্দ ভাব, তাই কি ওরও মন্দ ভাব হবে ভাইদের প্রতি? নিজের নিজের কর্মফল তো নিজের নিজের সঙ্গেই থাকে।

হরি নারিকেল দড়ির খাটিয়া পা দিয়া সরাইয়া রাখিল, আর হীরার ঘরের দিকে চলিল। শোভার ঘরও ঐ দিকেই। দুইজনে নিজের নিজের দরজায় শুইয়াছিল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। উহাদের কাহারও হরির উপর নজর পড়িল না। দুইজনের মধ্যে কিছু কিছু কথাবার্তা হইতেছিল। হরি থমকিয়া গেল, উহাদের কথা শুনিতে লাগিল। এ রকম লোক কোথায়, যে নিজের আলোচনা শুনিবার লোভ সামলাইতে পারে?

হীরা কহিল—যতদিন এক সঙ্গে ছিলাম, একটা বকরিও কেনে নি। এখন পশ্চিমে গাই পর্যন্ত আনছে। ভাইয়ের হক্ মেরে কারো লাভ হতে দেখি নি।

শোভা বলিল—এ তুমি অন্যায় করছ হীরা! ভেইয়া এক একটা পয়সারও হিসেব দিয়েছিল। এ আমি কখনো মানব না যে প্রথমকার রোজগার ও লুকিয়ে রেখেছিল।

তুমি মানো চাই না মানো, এ হল প্রথমকার রোজগার।

কারো নামে মিথ্যা দোষ দেওয়া ঠিক নয়।

ভাল, তা এটাকা এল কোথা থেকে? আকাশ থেকে এখন কি বৃষ্টি হল? অতখানি ক্ষেত তো আমাদেরও আছে; অতখানি ফলন তো আমাদেরও তবু কেন আমার কাছে মরা পোড়ার কড়ি নাই, আর ওর ঘরে নতুন গোরু আসে!

ধার করেছে হয়তো।

ভোলা ধারে দেওয়ার পাত্র নয়।

যাই হোক, গোরুটা দেখতে বড় সুন্দর, গোবর নিয়ে আসছিল, আমি রাস্তা থেকে দেখেছি।

অধর্মের টাকা যেমনি আসে তেমনি যায়। ভগবান মুখ তুলে চাইলে গোরু বেশি দিন ঘরে থাকবে না।

হরির আর শোনা হইল না। অতীতের কথা ভুলিয়া সে গিয়াছিল ভাইদের কাছে নিজের হৃদয়ে স্নেহ আর সৌহার্দ ভরিয়া। এ আঘাত উহার হৃদয়কে যেন ছিন্ন করিয়া দিল, সে রস, সে ভাব উহার মধ্যে কোনও রূপেই

আর আটক থাকিল না। কোনও রকমে জোড়াতালি দিয়া সে এখন ঐ প্রবাহকে রুদ্ধ করিতে পারিল না। প্রাণে এক প্রবল আগ্রহ আসিল, ঐ মুহূর্তেই এই অভিযোগের উত্তর দেয়; কিন্তু কথায় কথা বাড়ে এই ভয়ে চুপ করিয়া থাকিল। যদি নিজের স্বভাব খাঁটি থাকে, তবে কেহই কিছু করিতে পারিবে না। ভগবানের চোখে সে নির্দোষ। আর কাহাকেও সে গ্রাহ্য করে না। সে ফিরিয়া চলিয়া আসিল, আর সেই পোড়া তামাকই টানিতে লাগিল। কিন্তু ঐ বিষ যেন উহার ধমনীতে প্রতি মুহূর্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। শুইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ঘুম আসিল না। বলদগুলার কাছে গিয়া তাহাদের আদর করিতে লাগিল, বিষ কিন্তু শান্ত হইল না। আর এক ছিলিম ভরিল, তাহাতেও কোনই রস পাইল না। বিষ যেন চৈতন্যশক্তিকে আক্রান্ত, অভিভূত করিয়া দিয়াছিল। নেশায় যেমন চেতনা একমুখী হয়, প্রক্ষিপ্ত জল যেমন এক দিকে বহিয়া বেগবান হয়, উহারও মনের ভাব হইয়াছিল সেইরূপ। এই উন্মত্ত অবস্থায় সে ঘরের ভিতরে গেল। তখনও দরজা খোলা ছিল। আঙ্গিনার এক কোণে ধনিয়া চাটাইয়ের উপর শুইয়া সোনাকে দিয়া গা টিপাইয়া লইতেছিল, আর রূপা যে কিনা সন্ধ্যা হইতে না হইতে ঘুমাইয়া পড়ে, সে তখনও দাঁড়াইয়া গোরুর মুখে হাত দিয়া সোহাগ করিতেছে। হরি গিয়া খুঁটা হইতে গোরুটাকে খুলিয়া লইল, আর দরজার দিকে তাহাকে লইয়া চলিল। তখন তার দৃঢ় সংকল্প যে গোরুকে তখনি ভোলার বাড়ি দিয়া আসিবে। মাথায় এত বড় কলঙ্ক লইয়া ও এখন আর গোরুকে ঘরে রাখিতে পারে না; কোনও রকমেই পারে না।

ধনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—রাত্রে কোথায় নিয়ে চললে?

হরি এক পা সামনে গিয়া বলিল—নিয়ে যাই ভোলার বাড়ি। ফেরত দেব। ধনিয়ার আশ্চর্য লাগিল। উঠিয়া সামনে আসিয়া বলিল—ফেরাবে কেন? ফেরত দেবার জন্য এনেছিলে না কি?

হ্যাঁ, এটাকে ফিরিয়ে দিলেই আমার মঙ্গল।

কেন, কথাটা কি? এত তাড়াতাড়ি নিয়ে এলে, আবার ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছ? ভোলা টাকা চায় না কি?

না, ভোলা আর এখানে এল কখন।

তবে আবার কি কথা হল?

জিজ্ঞাসা করে করবে কি?

ধনিয়া তাহার হাত হইতে গোরুর দড়িটা হাত বাড়াইয়া কাড়িয়া লইল। তাহার চপল বুদ্ধি যেন উড়ন্ত পাখিকেও ধরিয়া লইয়াছে। মুখে বলিল—তোমার ভাইদের ভয় থাকে তবে যাও, তাঁদের পায়ে গিয়ে পড়। আমি কাউকে ডরাই না। আমাদের ঐশ্বর্য দেখে যদি কারও বুক ফাটে তো ফাটুক, আমি কারও পরোয়া করি না।

হরি বিনীত স্বরে কহিল, আস্তে আস্তে বল মহারানী! কেউ শুনলে বলবে যে এরা সব এত রাত্তির ধরে মারামারি করছে। আমি নিজের কানে কি শুনে এসেছি, তা কি জানিস? এই কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে আমি আলাদা হবার সময় টাকা চেপে রেখেছিলাম আর ভাইদের ঠকিয়েছি। সে টাকা এখন বের করছি!

হীরা বলছে তো?

সমস্ত গাঁই বলছে। হীরার কি বদনাম করব!

সারা গাঁয়ের লোক নয়, হীরাই একা বলেছে। আমি এখ্খনি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসি, তোমাদের বাবা কত টাকা রেখে মারা গেছল। দাড়ি-গোঁফওয়ালা হুমদো হুমদো মিনসে, ওদের পেছনে আমার সর্বস্ব গেল। সারা জীবন মাটিতে মিশিয়ে দিলাম, মানুষ করে এত বড় করলাম, আর আমি এখন হলাম অধার্মিক! আমি বলে দিচ্ছি, গোরু যদি ঘরের বাইরে যায় তবে অনর্থ হবে। আমরা টাকা রেখে দিয়েছি, লুকিয়ে রেখেছি, ক্ষেতের মাঝে পুঁতে! বিচ্ছুর বাচ্ছা বলে যে আমরা হাণ্ডীভরা আসরফি লুকিয়েছি! হীরা আর শোভা আর সংসারের যে কেউ যা করতে হয় করুক; কেন রাখব না টাকা? দু-দুটো ষণ্ডামার্কের বিয়ে দিই নাই? গ্রামে ভোজ দিই নাই?

হরি জ্বলিয়া পুড়িয়া উঠিল। ধনিয়া তাহার হাত হইতে গোরুর রসি কাড়িয়া লইয়া খুঁটায় গোরু বাঁধিয়া দরজার দিকে চলিয়া গেল। হরি তাহাকে ধরিয়া রাখিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু সে ততক্ষণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সেখানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বাড়ির বাহিরে উহাকে ধরিতে চেষ্টা করিয়া সে নাটকীয় কাণ্ড বাধাইতে চাহে নাই। ধনিয়ার ক্রোধের সঙ্গে উহার খুবই পরিচয় ছিল। মেজাজ একবার বিগড়াইলে রণচণ্ডী হইয়া যায়। মারো আর কাটো, কিছুতেই শুনিবে না; কিন্তু হীরাও তো বেজায় রাগী। কোথাও হাত দিলে 'পেরলয়' কাণ্ড আর কী! না হইলে হীরু এতটা মূর্খ নয়। আমি

কোথা থেকে কোথায় আগুন লাগাইয়া দিলাম! তাহার নিজের উপরই নিজের রাগ হইতে শুরু হইল। কথাটা যদি মনেই রাখিয়া দিত, তাহা হইলে কি আর এই হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। হঠাৎ ধনিয়ার কর্কশ স্বর কানে আসিল। হীরার গর্জনও শোনা গেল। আবার পুন্নীর কর্ণভেদী চীৎকারও কানে আসিয়া বিঁধিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল গোবরের কথা। লাফাইয়া বাহিরে আসিয়া তাহার খাটিয়া দেখিল। গোবর সেখানে নাই। বিপদ হইল! গোবরও সেখানে গিয়া হাজির! এখন তো আর ভাল নয় কিছু। উহার টাটকা রক্ত, কি করিয়া বসে কে জানে! কিন্তু হরি সেখানে যায় কি করিয়া? হীরা বলিবে, নিজে তো কিছু বলনা, গিয়া এই ডাইনীকে পাঠাইয়াছ লড়াই করিতে। প্রতিক্ষণে কোলাহল প্রচণ্ড হইতে থাকে। সারা গাঁ-টাই জাগিয়া পড়িল। মনে হইতেছিল, কোথায় যেন আগুন লাগিয়াছে, আর লোকেরা বিছানা হইতে উঠিয়া ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য দৌড়াইয়া যাইতেছে।

এতক্ষণ তো সে রোখ করিয়া বসিয়াছিল। আর থাকিতে পারিল না। ধনিয়ার উপর রাগ হইল। ও কেন আগ বাড়াইয়া লড়াই করিতে গেল? নিজের নিজের ঘরে বসিয়া লোকে কে জানে কতই না কথা বলিয়া থাকে। যতক্ষণ কেহ সামনা-সামনি মুখের উপর কিছু না বলে, ততক্ষণ ইহাই বুঝিতে হইবে যে সে কিছুই বলে নাই। হরির চাষাড়ে বুদ্ধি ঝগড়াকে বড় ভয় করিত। দু চার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা, ইহার চেয়ে ভাল আর কি আছে, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা কি এর চেয়ে ভাল? কোথাও মারপিট হইলে থানাপুলিশ, ধরপাকড়, সকলের খোসামুদি কর, আদালতের ধূলা খাও, ক্ষেত খামার জাহান্নমে দেও। হীরার উপর তাহার কোনও জোর নাই, কিন্তু ধনিয়াকে তো সে জোর করিয়া টানিয়া আনিতে পারে। অনেক কিছু হইবে, গালি দিবে, দুই এক দিন না খাইয়া থাকিবে, কিন্তু থানা পুলিশের নহবৎ তো বসিবে না। হীরার দরজার কাছে গিয়া সব চেয়ে দূরে দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া গেল। সেনাপতির মত রণক্ষেত্রে আসিবার পূর্বে অবস্থাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে চায়, আর যদি নিজের জয়ই হইতে থাকে তবে কিছু বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই; হার হইতে থাকিলে তখনি লাফাইয়া পড়িবে। দেখিতে পাইল, জন পঞ্চাশ লোক ভিড় করিয়া আছে; পণ্ডিত দাতাদীন, লালা পটেশ্বরী, যে দুইজন ঠাকুর গাঁয়ের হর্তা-কর্তা, সকলেই আসিয়া

পৌঁছিয়াছে। ধনিয়ার পাল্লা হালকা হইতেছিল। তাহার উগ্রতা জনমতকে তাহার বিরুদ্ধে করিয়া তুলিয়াছিল। সে রণনীতিতে কুশল ছিল না। ক্রোধে এত জ্বলিতে পুড়িতেছিল যে তাহার প্রতি সকলের সহানুভূতি কমিয়া যাইতেছিল।

সে গর্জন করিতেছিল—তুই আমাকে দেখে জ্বলে পুড়ে মরছিস কেন? আমাকে দেখে তোর বুক ফেটে যাচ্ছে কেন? খাইয়ে পরিয়ে তোকে জওয়ান করে তুলেছি, তারই ইনাম বুঝি এই? আমি মানুষ না করলে তো আজ কোথায় ভিখ মেঙ্গে বেড়াতে হত, গাছতলাও জুটত না।

হরির এই সব কথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কঠিন মনে হইল। ভাইদের মানুষ করা তো উহার ধর্ম। ভাইদের ভাগের অংশ তো উহারই হাতে ছিল। মানুষ না করিয়া পারিবে কেন? পৃথিবীতে মুখ দেখাইবার জো থাকিত কি?

হীরা জবাব দিল—আমি কারো কিছু জানি না। তোর বাড়িতে কুকুরের মত একটুকরা খেতাম, আর সারা দিন কাজ করতাম। ছেলেবেলা কি আর জোয়ান বয়স কেমন, তা জানতেই পারি নাই। সারা দিন ভরে শুধু শুকনো গোবর, জল দিয়ে মাখতাম। তার পরও তুই দশটা গালাগাল না দিয়ে রুটি দিস নাই। তোর মত রাক্ষসীর হাতে পড়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল।

ধনিয়ার আরও রাগ হইল—কথা সামাল, না হলে জিভ টেনে বের করব। তোর বৌ রাক্ষসী, তুই কোন ফেরে লোকের গলা কাটবি, চুকলিখোর নেমক-হারাম!

দাতাদীন টিপ্পনী করিল—এত কটু কথা কেন বলছ ধনিয়া? নারীর ধরম হল চুপ করে সহ্য করা। ও ত একটা গুণ্ডা, ওর কথায় জবাব দিস কেন?

পাটোয়ারী লালা পটেশ্বরী সমর্থন করিয়া কহিল—কথার জবাব কথা, গাল নয়। তুই শিশুকালে ওদের মানুষ করেছিস; কিন্তু একথা কেন ভুলে যাস যে ওদের জমিজমা তোর হাতেই ছিল?

ধনিয়া বুঝিল, সকলে পরামর্শ করিয়া আমাকে নীচ দেখাইতে চায়। একা চৌমুখী লড়াই লড়িতে তৈয়ার হইয়া গেল—আচ্ছা, তুমি থাকতে দাও, লালা! আমি সকলকে চিনি। এই গাঁয়ে আজ কুড়ি বচ্ছর কাটালাম। একেক জনকে আগাগোড়া চিনেছি। আমি গাল দিচ্ছি, আর ও ফুল বৃষ্টি করছে না?

দুলারী সাহুয়াইন আগুনের উপর ঘি ঢালিল—কী ভয়ানক গালবাজ মেয়ে রে ভাই! পুরুষ মানুষের মুখে মুখে জবাব দেয়! হরির মত মরদ বলেই এর চলে, আর কোন মরদ হলে এক দিনও পটত না।

হীরা যদি এসময়ে একটু নরম কাটিত, তাহা হইলে তাহারই জিত হইত, কিন্তু এসমস্ত গালাগালি শুনিয়া সে নিজেই বাহির হইয়া আসিল। নিজের পক্ষে অন্য সবকে দেখিয়া ও একটু বাঘের মত হইল। গলা ছাড়িয়া বলিল—চলে যা আমার দরজা থেকে, নইলে জুতো পেটা করব। ঝুঁটি ধরে ওপড়াব। গাল দিচ্ছিস ডাইন? ছেলের দেমাক হয়েছে? রক্ত......

পাশা উলটাইয়া গেল। হরির রক্ত উছলিয়া পড়িল। বারুদে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ পড়িল। সামনে আসিয়া বলিল—বাস, চুপ কর্, হীরা, আর শোনা যায় না। এই মেয়েটাকে কী বলব? আমার পিঠে যে ধূলা লাগে, তা এরই জন্যে। জানি নে একে দেখে চুপ করে থাকা যায় না কেন।

চার দিক হইতে হীরার উপর গালি বর্ষণ হইতে লাগিল। দাতাদীন নির্লজ্জ বলিল, পটেশ্বরী তো গুণ্ডা করিয়া ছাড়িয়া দিল, ঝিঙ্গুরীসিংহ দিল 'শয়তান' উপাধি। দুলারী সাহুয়াইন 'কুপুত্র' এই নাম দিল। একটা অসংযত কথা ধনিয়ার পাল্লা হাল্কা করিয়া দিল। আর একটি উগ্র শব্দ হীরাকে ফেলিয়া দিল এক গর্তের মধ্যে। তাহার উপর হরির সংযত বাক্য যাহা বাকি ছিল তাহা পূর্ণ করিল।

হীরা সামলাইয়া লইল। সমস্ত গাঁ তাহার বিরুদ্ধে গিয়াছে। এখন চুপ করিয়া থাকাই তাহার পক্ষে মঙ্গল। ক্রোধের নেশায়ও তাহার একটু জ্ঞান বাকি ছিল।

ধনিয়ার কলিজা দুই টুকরা হইয়া গেল। হরিকে বলিল—শুনে নেও কান খুলে। ভাইদের জন্যে মরছিলে। এই তো ভাই, এদের মত ভাইয়ের মুখ না দেখাই উচিত। এ আমাকে জুতোপেটা করবে! খাইয়ে দাইয়ে ......

হরি ধমক দিল—আবার তুই বক বক করতে শুরু করলি! ঘরে যাস না কেন?

ধনিয়া মাটির উপর বসিয়া আর্তস্বরে বলিল—এখন তো এর জুতো খেয়ে তবে যাব। এর মরদানি তো একটু দেখে নিই, গোবর কই, এখন কবে কাজে লাগবে? তুই দেখ বেটা, দেখেছিস তো, তোর মাকে জুতোপেটা করছে।

এই বিলাপ করিতে করিতে নিজের ক্রোধের সঙ্গে সে হরির ক্রোধকেও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল। আগুনে ফুঁ দিয়া দিয়া উহাকে জ্বালাইয়া তুলিল। হীরা যেন পরাজিত হইয়া পিছনে হটিয়া গেল। পুন্নী তাহার হাত ধরিয়া ঘরের দিকে টানিতেছিল। সহসা ধনিয়া সিংহিনীর মত লাফাইয়া হীরাকে এত জোরে ধাক্কা দিল যে সে সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল, আর ধনিয়া বলিতে লাগিল—কোথায় যাস, জুতা মার্, মার্ জুতা, দেখি তোর মরদানি!

হরি দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল, আর হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে তাহাকে ঘরে লইয়া চলিল।

গোবর খাওয়া সারিয়া গোরু আনিতে গোয়ালপল্লীতে গেল। তখন ঝুনিয়ার সঙ্গে উহার অনেক কথা হইল। ও গোরু নিয়া রওনা হইল, ঝুনিয়াও অর্ধেক পথ সঙ্গে সঙ্গে আসিল। গোবর একলা কি করিয়া গোরু লইয়া যাইবে? অপরিচিত ব্যক্তির সহিত পথ চলিতে উহার আপত্তি হওয়ারই কথা। খানিক দূর গিয়া গভীর দৃষ্টিতে তাকাইয়া ঝুনিয়া গোবরকে বলিল, এখন আর তুমি কেন এদিকে আসবে?

একদিন আগেও গোবর ছিল বালক। গ্রামের যুবতী মেয়েরা কেউ ছিল তার দিদি, কেউ বৌদিদি; বোনদের সঙ্গে তো আর হাস্য পরিহাস তেমন চলে না; অবশ্য বৌদিদিরা কখনো কখনো উহার সঙ্গে ঠাট্টা পরিহাস করিত। কিন্তু সে সব কেবল সরল লঘু আমোদ মাত্র। ওদের মতে গোবরের যৌবনের ফুল সবে মাত্র ফুটিতে শুরু হইয়াছে। যত দিন না ফল ধরে, গাছে ঢিল ছোঁড়া নিরর্থক। কাহারও কাছে উৎসাহ না পাইয়া গোবর কৌমার্যকে গলার হার করিয়া রাখিয়াছে। ঝুনিয়ার বঞ্চিত অন্তর ভ্রাতৃবধূদের ব্যঙ্গবিদ্রূপের খোঁচায় জাগিয়া উঠিয়া যেন ঐ বালকের প্রতি লুব্ধ হইয়া উঠিল। আর ঘুমন্ত শিকারি জন্তু যেমন পাতার খস্‌খসানি শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠে, তরুণ গোবরের সুপ্ত যৌবনও তেমনি জাগিয়া উঠিল।

গোবর এবার খোলাখুলি রসিকতা করিয়া বলিল, ভিক্ষা পাবে আশা থাকলে ভিক্ষুক দিনরাত দাতার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ঝুনিয়া কটাক্ষ করিয়া বলিল, তবে বল, তোমারও কিছু মতলব আছে।

গোবরের ধমনীতে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে বলিল, ক্ষুধার্ত হয়ে যদি হাত বেশি বাড়িয়ে থাকি, তো ক্ষমা করতে হবে।

ঝুনিয়া আরও গভীর জলে ডুবিয়া বলিল, তা ভিক্ষুকের আরও দশ দুয়ারে ঘুরতে হয়, এক দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকলে কি পেট ভরবে? আমি এরকম ভিক্ষুককে দেখতে চাই না। এরকম তো অলিতে গলিতে কতই মেলে। তা ছাড়া, ভিখারী কি দেয়? আশীষ! কিন্তু আশীর্বাদে তো পেট ভরে না।

স্থূলবুদ্ধি গোবর ঝুনিয়ার কথার তাৎপর্য বুঝিল না। ঝুনিয়া যখন ছোটো ছিল তখনও দুধ বেচিতে সে বাড়ি বাড়ি যাইত, শ্বশুরবড়িতে ও লোকের বাড়িতে দুধের যোগান দিতে হইত; এখনও দই বেচিবার ভার উহার উপর, এই কাজে উহাকে বহু লোকের সংস্পর্শে আসিতে হয়, লোকচরিত্রে তাই উহার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হইয়াছে। দুই চারিটি টাকাও হাতে আসে, খানিক আমোদও হয়, কিন্তু সে সুখ যেন ভিক্ষা করিয়া পাওয়া, উহার স্থায়িত্ব নাই। অন্তর চায় এমন প্রেম, যাহার জন্য ও প্রাণ দিতে পারে। উহাতে সমর্পণ নাই, অধিকার বোধও নাই। ঝুনিয়ার অন্তর চায় এমন প্রেম যাহার জন্য ও প্রাণ দিতে পারে, যাহার জন্য ও সর্বস্ব ছাড়িতে পারে, যে প্রেম জোনাকির ক্ষণিক দীপ্তি নয়, যে প্রেম দীপশিখার মতো স্থির। ঝুনিয়া গৃহস্থকন্যা। নানা লোকের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার গৃহধর্মের আকর্ষণ শিথিল হয় নাই।

কামনাপ্রদীপ্ত মুখে গোবর বলিল, ভিখারীর যদি এক দুয়োরেই পেট ভরে তবে কি আর সে বারো দরজায় ঘোরে?

ঝুনিয়া স্নিগ্ধ চোখে উহার দিকে চাহিল। কি ভালো মানুষ গোবর, এখনও কিছুই বোঝে না। তারপর বলিল, এক বাড়ির দরজায়ই বা ভিখারীর পেট ভরে কবে? পাবে তো এক মুঠো। সর্বস্ব তো তখনই পাওয়া যায় যখন সর্বস্ব দেওয়া হয়।

আমার কি আছে ঝুনিয়া?

তোমার কিছুই নেই? আমার তো মনে হয়, তুমি আমায় যা দিতে পার বড় বড় লক্ষপতিরাও তা দিতে পারবে না। আমার কাছে তোমার ভিক্ষা চাইতে হবে না। তুমি আমায় কিনে নিতে পার।

গোবর চকিত চোখে ঝুনিয়ার দিকে চাহিল। ঝুনিয়া আরও বলিল, কি

দাম দিতে হবে তা জান। আমার হয়ে থাকতে হবে। যদি দেখি, আর কারু কাছে হাত পেতেছ, অমনি ঘর থেকে বার করে দেব।

অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে ঠিক জিনিসটি খুঁজিয়া পাইলে যেমন হয় গোবরের মনের অবস্থা সেইরকম। এক বিচিত্র ভয়মিশ্রিত আনন্দে উহার প্রতি রোম পুলকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে? ঝুনিয়াকে যদি রাখিতে হয়, তবে নিজের রক্ষিতাকে লইয়া বাপ মায়ের ঘরে বাস করা কি সম্ভব? বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের ঝঞ্ঝাট আছে। সারা গাঁ হৈ হৈ করিয়া উঠিবে। সবাই শত্রুপক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে, আর মা তো উহাকে ঘরেই ঢুকিতে দিবে না। তবে কিনা, স্ত্রীলোক হইয়া ঝুনিয়া যদি ইহাতে ভয় না পায় তবে আমি পুরুষমানুষ, আমার কি ভয় পাওয়া সাজে? বেশি কি আর হইবে, না হয় লোকে উহাকে পৃথক করিয়া রাখিবে। ঝুনিয়ার মত মেয়ে গাঁয়ে আর একটিও আছে কি? কেমন বুদ্ধিমতীর মত উহার কথাবার্তা। আমার তো মনে হয়, আমি উহার যোগ্যই নই। তবু ও আমাকে ভালবাসিয়াছে। একান্ত আমার হইতে প্রস্তুত। গাঁয়ের লোকে যদি বাহির করিয়া দেয়, তো পৃথিবীতে আর কি গ্রাম নাই? আর গ্রাম ছাড়িয়াই বা যাইব কেন? এই তো মাতাদীন চামারণী নিয়া আছে, তা কে কি করিল? দাতাদীন খালি দাঁত কড়মড় করিয়া মরিতেছে। তবে হাঁ, মাতাদীন একটি কাজ করিয়াছে, নিজের ধর্ম বজায় রাখিয়াছে। দুই বেলা নিজে রান্না করিয়া খায়, চামারণীর হাতে খায় না। আর আজকাল তো দাতাদীন উহার সঙ্গেই খাইতেছে। ঐ যে ঝিঙ্গুরী সিংহ ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে আছে, তাহাকেই বা কে কি করিতেছে? আগেও উহার যেমন মান প্রতিপত্তি ছিল, এখনও তাহাই আছে, সম্ভব কিছু বেশিই হইয়াছে। আগে চাকরির সন্ধানে ঘুরিত, এখন তো ব্রাহ্মণীর পয়সায় ও মহাজন হইয়া পড়িয়াছে, পুরোহিতগিরি তো ছিলই এখন মহাজনগিরিও জুটিয়াছে। কিন্তু ভাবিতেছি, ঝুনিয়া ঠাট্টা করিতেছে না তো? সেদিকে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার।

এই ভাবিয়া গোবর ঝুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ঝুনা, সত্যি বল্ছো তো, না আমাকে উসকাচ্ছো? অমি তো তোমার হয়ে গেছি, কিন্তু তুমি যাবে তো?

তুমি আমার হয়ে গেছ, তা কি করে বিশ্বাস করি বল তো?

কি করে বোলব ? তুমি যদি বল, তোমার জন্যে প্রাণও দিতে পারি।

প্রাণ দেবার অর্থ বোঝ ?

তুমিই না হয় বুঝিয়ে দাও।

জীবন দেওয়ার অর্থ, এক সঙ্গে থেকে ঘর করতে হবে, একবার হাত ধরলে চিরদিন ধরে থাকতে হবে। দুনিয়া, মা-বাপ, ভাইবন্ধু, ঘর-সংসার সব হয়তো ছাড়তে হবে। মুখের কথা দেনেওয়ালা লোক তো আমি অনেক দেখেছি, ভ্রমরের মত ওরা ফুলের মধু খেয়ে বেড়ায়, মধু ফুরোলে উড়ে চলে যায়। তুমি ঐরকম উড়ে চলে যাবে না তো !

গোবরের এক হাতে গোরুর দড়ি, অন্য হাতে সে ঝুনিয়ার হাত ধরিল। যেন বিদ্যুতের তারে হাত লাগিয়াছে। যৌবনের প্রথম স্পর্শে সমস্ত শরীর উহার কাঁপিয়া উঠিল। কি মোলায়েম, কোমল, মাংসল হাতখানি !

ঝুনিয়া হাত ছাড়াইয়া নিল না, অবশ্য এ স্পর্শে ওর কাছে তেমন গুরুত্বও নাই। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে ও গম্ভীর হইয়া বলিল, গোবর, আজ তুমি আমার হাত ধরেছ, মনে থাকে যেন।

খুব মনে থাকবে ঝুনা, আর নিশ্বাস পর্যন্ত তোমার সঙ্গে থাকবো।

ঝুনিয়া অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, জান গোবর, সবাই এরকম বলে, এর চাইতেও মিষ্টি মিষ্টি কথায়। তোমার মনে যদি বল থাকে, আগেই আমায় বলে দাও। আমি সাবধান হয়ে যাব। ওরকম লোককে আমি মন দিই না। ওদের কাছে আমার শুধু হাসিঠাট্টা, গালগল্পের নিমন্ত্রণ। কত বছর ধরে দুধ নিয়ে বাজারে যাচ্ছি, কত বাবু, কত মহাজন, উকিল, ব্রাহ্মণ, আমলা, কর্মচারী কত ভাবে নিজেদের আসক্তি দেখিয়ে আমাকে ফাঁদে ফেলতে চয়েছে। কেউ বুকে হাত রেখে বলে, ঝুনিয়া, নিরাশ করো না ; কেউ বা পেছন পেছন ঘোরে, চোখে রসের দৃষ্টি, যেন আমার প্রেমে একেবারে বেহুঁস হয়ে গেছে ; কেউ টাকা দেখায়, কেউ গয়নার লোভ দেখায়, সবাই জীবনভোর আমার গোলামি কোরতে রাজি, এমন কি আর জন্মে, কিন্তু আমার এদের ধাত জানা আছে। সবাই ভোমরার মত, রস খেয়ে উড়ে পালাবার দলে। আমিও এদের খেলিয়ে নিয়ে বেড়াই, এদের দিকে বাঁকা চাহনিতে চাই, এদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করি, ওরা আমাকে বোকা বানায়, আমি ওদের উল্লুক বানিয়ে ছাড়ি। আমি মরলেও ওদের চোখে জল বেরুবে না। আর ওরা মলে পর আমি বলবো, বেশ হয়েছে,

দুরাত্মা মরেছে। আমি যার হব সারাজীবন তারই থাকব, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, তারই সঙ্গে চলব, সকলের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করি, তাতে কিছু আসে যায় না। না টাকার কাঙ্গাল, না শাড়ী গয়নার। আমি চাই একটি ভাল লোককে ভালবাসতে, যে আমাকে আপনার মনে করবে, আমিও যাকে আপন ভাবব। একজন পণ্ডিত আছে, খুব ফোঁটা তিলক কাটে, আধসের দুধ রোজ আছে তার বাড়িতে। একদিন ওর স্ত্রী গিয়েছে কোথায় নেমন্তন্নে। আর আমি কি জানি? রোজকার দুধ নিয়ে ভিতরে গিয়ে ডাকতে লাগলাম, গিন্নী মা কোথায় গো! কোনও সাড়াশব্দ নাই, এমন সময়ে দেখি, পণ্ডিতজী বাইরের দরজাটি বন্ধ করে দিল। আমি বুঝতে পারলাম, ওর মতলব ভাল নয়, ধমক দিয়ে বললাম, আপনি দরজা বন্ধ করছেন কেন? বহুজী কোথায়? ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে আছেন, ডাকলে সাড়া নেই কেন? সে বলল, বৌ নেমন্তন্ন খেতে গেছে, আর কথার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে দুই এক পা এগিয়ে এল। আমি বললাম, দুধ নেবে তো নাও, নইলে আমি চললাম। সে বলল, ঝুনারানী, আজ তুমি এখান থেকে যেতে পাবে না, রোজ বুকে দাগা দিয়ে চলে যাও, আজ আমার হাত থেকে পালাতে পারবে না। সত্যি বলছি গোবর, ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

গোবর অভিভূত হইয়া বলিল, আমি সে বেটাকে দেখতে পাই তো মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেলি, ওর রক্ত চুষি। একবার চিনিয়ে দাও তো।

আচ্ছা, তারপর বলি শোন, এরকম লোকের মুখ গুঁড়ো করতে আমি একাই যথেষ্ট। আমার বুক কাঁপতে লাগলো। ভাবলাম, যদি এ শয়তানী করে তো কি করবো? চেঁচিয়ে মরলেও কেউ শুনবে না; তবে মনে মনে এটা ঠিক করে নিলাম, যে আমার গায়ে হাত দিয়েছে কি এই দুধভরা কলসী ওর মুখে ছুঁড়ে মারবো। না হয় চার পাঁচ সের দুধই লোকসান হবে, কিন্তু ঐ বদমায়েসটার তো আক্কেল হবে। মনকে শক্ত করে নিয়ে বললাম, পণ্ডিতজী, সে আশাও কোরো না। আমি গয়লার মেয়ে, একটি একটি করে গোঁফ তোমার উপড়ে দেব। তোমার পুথিপত্রে বুঝি এই লেখে যে, পরের বৌঝিকে ঘরে বন্দী করে বে-ইজ্জত কর? এইজন্যেই বুঝি ফোঁটা তিলকের ভেক নিয়ে বসে আছ? কথা শুনে সে হাত জোড় করে পায়ে ধরতে শুরু করে দিল। বলে কি প্রেমিকের মন রাখলে ঝুনারানী, তোমার কী ক্ষতি হবে? মাঝে মাঝে গরীবের

উপর একটু সদয় হতে হয়, নইলে ভগবান যখন প্রশ্ন করবেন, আমি তোমায় এত রূপের ঐশ্বর্য দিয়েছিলাম, তুমি তা দিয়ে এক গরীব ব্রাহ্মণের একটু সেবাও করলে না, তখন উত্তরে কি বলবে ঝুনারানী? সে আরও বললো, আমি বামুন মানুষ, টাকা পয়সার দক্ষিণা তো রোজই পাই, আজ তুমি একটু রূপ দান দিয়ে যাও।

আমি ওর মন পরীক্ষা করার জন্য বললাম, আমি কিন্তু পঞ্চাশটা টাকা চাই। সত্যি বলছি গোবর, তৎক্ষণাৎ সে ঘরের মধ্যে ঢুকে দশ টাকার পাঁচখানা নোট বার কোরে আমার হাতে গুঁজে দিতে এল। আমি সেই নোটগুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালাম, ও এসে আমার হাত ধরলো, আমিও আগে থেকেই তৈরি ছিলাম, অমনি চট করে দুধের হাঁড়ি ওর মুখে ছুঁড়ে মারলাম। মাথা থেকে পা অবধি দুধের নদী বয়ে গেল। খুব চোটও লেগে ছিল, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো, আর হায় হায় করতে লাগলো। আমি দেখলাম ও এখন কিছু করতে পারবে না, পিঠে দুই লাথি মেরে দরজা খুলে পালিয়ে এলাম।

গোবর ঠাট্টা করিয়া বলিল, বাঃ, বেশ জব্দ তো। দুধে স্নান করে ওর ফোঁটা তিলক সব নিশ্চয় ধুয়ে গেল। গোঁফগুলি ওর ছিঁড়ে ফেললে না কেন?

পরদিন আমি ফের ওর বাড়ি গেলাম, ওর বৌ বাড়ি ফিরে এসেছে। ও বৈঠকখানা ঘরে বসে আছে, মাথায় পট্টি বাঁধা। আমি বললাম, পণ্ডিতজী, তোমার কালকের কীর্তির কথা সব খুলে বলে দি? ও জোড়হাত করলো। তখন আমি বললাম, আচ্ছা, নাকে খৎ দাও, নিজের থুতু চাটো, তবে আমি রেহাই দেব। মাটিতে মাথা ঘসে বলল, ঝুনা আমার মান-ইজ্জত এখন তোমার হাতে, তুমি জেনো, এসব প্রকাশ পেলে পণ্ডিতের দল আমায় আস্ত রাখবে না। শুনে আমার ওর পরে মায়াই হোল।

গোবরের কাছে এই দয়ামায়া ভাল লাগিল না। সে বলিল, এ তুমি কি করলে? ওর বৌকে বলে দিলে না কেন? সে জুতো মারত। এ রকম পণ্ডিতের উপর দয়া করতে নেই। তুমি কালই আমায় ওকে চিনিয়ে দিও। দেখো, আমি মেরে ওর কি হাল করি।

ঝুনিয়া উহার অর্ধবিকশিত যৌবনের প্রতি চাহিয়া বলিল, তুমি ওর সঙ্গে পারবে না। ওর খাসা চেহারা, পরের পয়সায় খায় তো।

নিজের শক্তির প্রতি এই কটাক্ষ তরুণ যুবক গোবরের সহ্য হইল না, বড়াই

করিয়া বলিল, মোটা হলেই তো হয় না। রোগা হলেও আমার হাড় ইস্পাতের মত। রোজ তিন শ ডন করি। দুধ জোটে না, নইলে এতদিনে জামার শেলাই ছিঁড়ে যেত, এই বলিয়া সে বুকের ছাতি ফুলাইয়া দেখাইল।

ঝুনিয়া শান্ত চোখে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, একদিন দেখিয়ে দেব। কিন্তু সবাই এক প্রকৃতির। তুমি কজনের সঙ্গে মারামারি করবে? জানি না, পুরুষের কেন এ রকম স্বভাব। যদি সুন্দরী যুবতী মেয়ে কোথাও দেখল, অমনি পেছন পেছন ঘুরবে। আর যাদের লোকে বড়লোক বলে তারা তো স্রেফ লম্পট স্বভাবের। আর আমি তো এমন কিছু সুন্দরীও নই……

গোবর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, আমার তো তোমাকে দেখে মনে হয় বুকে করে রাখি।

ঝুনিয়া গোবরের পিঠে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল, আর পাঁচজনের মত তুমিও খোসামোদী আরম্ভ করলে। আমি যা তা আমার জানা আছে, কিন্তু এদের কাছে যুবতী হলেই হল। ঘণ্টাখানেক আমোদ করতে আর চাই কি? গুণের খোঁজ তো তারই করে, যার সঙ্গে ঘর কোরতে হবে। আজকালকার বড় ঘরের লীলা তো সব দেখচি শুনচি। আমার শ্বশুরবাড়ির পাড়ায় গপড়ু নামে এক কাশ্মীরী ছিল। খুব বড়লোক, ওদের বাড়িতে রোজ পাঁচ সের দুধ লাগত। ওর তিন মেয়ে। কুড়ি পঁচিশ বছর বয়স হবে। কি সুন্দর এক এক জনা। তিন জনে কলেজে যেত। একজনে বুঝি সেখানে যেত পড়াতে। তিন শ টাকা তার মাইনে ছিল। সবাই হারমোনিয়াম বাজাতে, সেতার বাজাতে, নাচতে, গাইতে জানতো। কিন্তু কারও বিয়ে হয়নি। কেন কে জানে? ভগবান জানেন ওরাই ছেলে পছন্দ করে, ছেলেরাই ওদের অপছন্দ করে না। বড় মেয়েটিকে আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে হেসে বললে, এসব ব্যাধি আমাদের নেই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব মজা লুটতো। যখন তখন দেখতাম, দুচার জন ছেলে ওবাড়ীতে আছেই। সব চেয়ে বড় মেয়েটি তো কোট প্যাণ্টুলন পরে ঘোড়ায় চড়ে পুরুষদের সঙ্গে বেড়াতে যেত। সারা সহরে ওর লীলা ছিল। গপড়ুবাবুর মাথা নীচু হয়ে যেত। মুখ লজ্জায় কালও হয়ে যেত। মেয়েদের কখনও বোঝাতেন, কখনও ধমক দিতেন। কিন্তু সব্বাই মুখের ওপর খোলাখুলি বলে দিত—আমরা বড় হয়েছি, আমরা নিজের নিজের মালিক, যা ইচ্ছে করে তাই কোরবো। বেচারা বাপ, জোয়ান জোয়ান

মেয়েদের কি বলে? ধমক ধামক দিত। কখনো বা আটকাতো। কিন্তু ভাই, বড়লোকদের কে কি বলে? ওরা যা করে তাই ভালো, সব ঠিক। ওরা তোমার আমার মতো পঞ্চায়েত বা জ্ঞাতিকুটুম্বের ভয় করে না। আমি তো বুঝতেই পারি না, লোকের রোজ রোজ মত বদলায় কি করে? মানুষ কি গোরুবাছুর যে দুদিন পর বাতিল করে দিতে হবে? যাক্, ভাই, কারু নিন্দে করি না, তোমার মন তুমি যেমন তৈরি কর তেমনি হবে। অনেককে দেখি, রোজ রোজ ঘরের ডালরুটি পছন্দ হয় না; মাঝে মাঝে মুখ বদলাবার জন্য পুরী হালুয়া চাই। আবার কারু দেখি ঘরের ডালভাতে একদম অরুচি, দেখলে গায়ে জ্বর আসে। আবার কোন কোন বেচারীদের দেখি, নিজের ডাল ভাতেই ডুবে থাকে, হালুয়া পুরীর জন্য খেয়ালই নেই। দেখ না, আমার দুই ভাজকেই দেখ। আমার ভাইয়েরা কিছু কানাখোঁড়া নয়, দশজনের একজন, ওরা চায় স্বামী সোনার বালা গড়িয়ে দেবে, মিহি শাড়ী পরতে দেবে, আর রোজ রোজ ভাল জিনিস খাওয়াবে। গয়না-গাঁটি, শাড়ী, মেঠাই মোণ্ডা—আমারও কম ভাল লাগে না, কিন্তু তাই বলে এর জন্যে নিজের লজ্জাসরম খোয়াতে হবে, ভগবান করুন এমন মতি না হয়। মোটা ভাত কাপড়েও যদি একজনের সঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি, আমি আর কিছুই চাই না। বেশি লোভ করতে গিয়ে পুরুষ বল, স্ত্রী বল, সব নষ্ট হয়ে যায়। পুরুষ মানুষ যদি এর ওর দিকে দৃষ্টি দেয় তবে মেয়েরাও চোখ নাচাবে। স্বামী যদি অন্য স্ত্রীর পেছনে ছোটে, স্ত্রীও অন্য পুরুষের পেছনে ছুটবে। স্ত্রীর হালকা স্বভাব স্বামীর যেমন খারাপ লাগে, স্বামীর চপলতাও স্ত্রীর পক্ষে ঠিক সেই রকমই কষ্টকর, এটা জেনো। আমি তো আমার স্বামীকে স্পষ্টই বলে দিয়েছিলাম, তুমি যদি এদিক ওদিক ছুটবে আমিও যা খুসি কোরব, তুমি যদি ভাব নিজে যা খুসি কোরবে আর মারের ভয়ে বৌকে খুব চেপে রাখবে তাহলে খুব ভুল হবে, ফলে তুমি খোলাখুলি যা কোরছো, ও লুকিয়ে লুকিয়ে সব কোরবে। তুমি জ্বালাও দেবে আর সুখে স্বচ্ছন্দেও থাকবে, তা হয় না।

গোবরের কাছে এ সব এক নূতন জগতের বার্তা। সে তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল, শুনিতে শুনিতে কখনো উহার পা দুটি থামিয়া যাইতেছিল, আবার সচেতন হইয়া চলা শুরু করিতেছিল। ঝুনিয়া আগে উহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, আজ বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমতীর মত কথাবার্তা, অনুভূতি আর নিজের সতীত্বের

ব্যাখ্যানা দিয়া উহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ঝুনিয়ার এমন রূপগুণ, এত জ্ঞান, ঝুনিয়াকে পাইলে গোবর যে ধন্য হইয়া যাইবে। ইহার কাছে কি ভাই বন্ধু আর পঞ্চায়েতের ভয় ?

ঝুনিয়া যখন দেখিল উহার গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছে, তখন বুকে হাত রাখিয়া জিভে কামড় দিয়া বলিল, আরে, এ যে একেবারে তোমাদের গাঁয়ে এসে পড়েছি! তুমিও আচ্ছা বোকা, আমায় ফিরে যেতে বললে না তো ?

এবার ঝুনিয়া ফিরিয়া চলিল। গোবর ব্যগ্রস্বরে বলিল, আচ্ছা, এক মিনিট আমাদের বাড়িতে বসবে চল না কেন ? মাও তোমাকে দেখে নিতেন।

ঝুনিয়ার লজ্জিত দৃষ্টি, হাসিয়া বলিল, না, এখন আর তোমাদের বাড়ি যাব না, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এতদূর কি করে এলাম। আচ্ছা তুমি বল, আবার কবে আসবে ? আজ রাত্রিবেলা আমাদের বাড়ির কাছে গান বাজনা হবে, তুমি এসো, কেমন ? আমিও থাকবো।

আর যদি তুমি না আসতে পার ?

তবে ফিরে যেও।

তাহলে আমি যাব না।

আমি জানি, না বললেও তুমি আসবে।

তুমিও আসবে, কথা দাও ?

আমি কারুকে কথা দিই না।

তবে আমিও যাই না।

তা আমার বয়েই গেল।

ঝুনিয়া ফিরিয়া চলিল, যেন কেয়ারই করে না; প্রথম মিলনেই যেন পরস্পরের উপর ইহারা অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছে। ঝুনিয়া জানে, গোবর আসিবেই, কেন আসিবে না ? গোবর ভাবিল, ঝুনিয়া নিশ্চয়ই আসিবে। না আসিয়া থাকিতে পারিবে কেন ?

গোবর যখন একা একা গোরুটিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল, তখন উহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সদ্য স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছে।

৬

জ্যৈষ্ঠের উদাস ও তপ্ত সন্ধ্যা সেমরিগ্রামের অলিগলিতে রাস্তায় জল ছিটান হইয়াছিল বলিয়া শীতল ও প্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল। মণ্ডপের চারি ধার ফুল ও চারাগাছের টবে সাজান হইয়াছিল, বিজলী পাখা চলিতেছিল। রায়-সাহেব নিজের কারখানায় বিজলী তৈয়ারী করিতেন। তাঁহার সিপাহীরা, পরনে হলদে উর্দি, মাথায় নীল পাগড়ি, লোকজনদের মধ্যে সম্ভ্রম ছড়াইয়া ফিরিতেছিল। চাকরদের পরনে উজ্জ্বলবর্ণের জামা, মাথায় কেশর রং-এর পাগড়ি, তাহারা অতিথি ও প্রধান প্রধান লোকদের আদর-সৎকার করিয়া ঘুরিতেছিল। এমন সময় এক মোটর গাড়ি সিংহদ্বারের সামনে আসিয়া থামিল ও তাহা হইতে তিন জন মহাত্মা অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁর খদ্দরের কুর্তা পরনে, পায়ে চপ্‌পল, তাঁহার নাম পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ। তিনি দৈনিকপত্র 'বিজলী'র যশস্বী সম্পাদক, যাঁহাকে দেশচিন্তা একেবারে জল করিয়া দিয়াছিল। অন্য জন তো কোট-পেন্ট পরনে, তিনি হইলেন উকিল, কিন্তু ওকালতি না চলায় এক বীমা কোম্পানীর দালালী করেন, আর তালুকদারদের মহাজন ও ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ জোগাড় করিয়া ওকালতি হইতে বেশি আয় করেন। ইঁহার নাম শ্যাম-বিহারী তন্‌খা। আর তৃতীয় ভদ্রলোকটি—যিনি রেশমি আচকান আর টানটান পায়জামা পরিয়া—উনি মিঃ বি মেহতা, বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। এই তিনজনই রায় সাহেবের সহপাঠী, আর পার্বণের উৎসবে নিমন্ত্রিত। আজ সারা মহালের প্রজা আসিবে আর পার্বণের টাকা ভেট দিবে। রাত্রে হইবে ধনুর্যজ্ঞ, আর নিমন্ত্রিতদের ভোজ। হরি পাঁচ টাকা প্রণামী দিয়াছিল, আর গোলাপী মেরজাই পরিয়া গোলাপী পাগড়ি বাঁধিয়া, পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকিয়া হাতে এক খুরপি লইয়া, মুখে পাউডার মাখিয়া রাজা জনকের মালী সাজিল, আর গর্বে এত ফুলিয়া উঠিল যে সমস্ত উৎসবটা যেন উহার বলেই হইতেছে।

রায়সাহেব অতিথিদের স্বাগত অভিনন্দন করিলেন। দীর্ঘকায়, দোহারা চেহারা, পেটা শরীর, তেজস্বী ভাব, উন্নত শির, ফরসা রং, শরবতী রেশমী চাদরে বেশ মানাইয়াছিল।

পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন কোন নাটক অভিনয় করার কথা হয়েছে? আমার তো এখানে ঐ একটিই আকর্ষণ।

রায়সাহেব তিনজনকেই আপনার তাঁবুর সামনে কুর্সি চেয়ারে বসাইতে বসাইতে বলিলেন—প্রথমে হবে ধনুর্যজ্ঞ, তার পরে এক প্রহসন। নাটক ভাল কিছু পাওয়া গেল না। কয়েকটা এত দীর্ঘ যে পাঁচ ঘণ্টায়ও শেষ হয় না, আর কয়েকটার এত কষ্ট কল্পনা যে একজনও হয়তো তার অর্থ বুঝবে না। শেষটায় আমি নিজেই এক প্রহসন লিখে ফেলেছি, দু ঘণ্টায় সেটা শেষ হয়ে যাবে।

রায়সাহেবের রচনাশক্তি বিষয়ে ওঙ্কারনাথের বিশেষ সন্দেহ ছিল। তাঁহার ধারণা ছিল, প্রতিভার ছটা তো গরীবদের মধ্যেই চমকায়, প্রদীপের মত—যা কি না অন্ধকারেই নিজের আলোক দেখায়। উপেক্ষায় তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন, গোপন করিবার চেষ্টাও করিলেন না।

মিঃ তন্‌খা এই অপছন্দের কথায় পড়িতে চাহেন নাই, আবার রায়সাহেবকে দেখাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন যে এবিষয়ে তাঁহারও কিছু বলিবার অধিকার আছে। বলিলেন—নাটক কোন কোনটা ভাল দাঁড়াতে পারে, যদি তার অভিনেতা ভাল পাওয়া যায়। খুব ভাল নাটকও অভিনেতাদের হাতে পড়ে খারাপ হতে পারে। যত দিন রঙ্গমঞ্চে শিক্ষিতা অভিনেত্রী না আসেন, ততদিন আমাদের নাট্যকলার উদ্ধার হতে পারে না।…এখন তো আপনি কাউনসিলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছেন; আমি জোর করে বলতে পারি যে কোনও মেম্বারের রেকর্ড এত উজ্জ্বল নয়।

দর্শনের অধ্যাপক মিঃ মেহতা এই প্রশংসা সহ্য করিতে পারিলেন না। বিরোধিতা করিতেই তিনি চাহিতেছিলেন, তবে কিনা সিদ্ধান্তের আড়ালে। সম্প্রতি তিনি কয়েক বৎসরের পরিশ্রমের ফলে এক পুস্তক লিখিয়াছেন; তাহাতে যতখানি আড়ম্বর হইবে আশা করা গিয়াছিল, তাহার শতাংশও হয় নাই। সেই জন্য তাঁহার বড় দুঃখ। বলিলেন—ভাই, আমি প্রশ্নকে ডরাই না। আমি চাই, আমার জীবন আমার মতের অনুকূল হয়। আপনি কৃষকদের শুভার্থী, নানা দিকে নানা ভাবে তাদের রেয়াৎ করতে চান। জমিদারের অধিকার কেড়ে নিতে চান, কারণ ও জিনিসটা আপনি বলেন সমাজের শাপ; আবার আপনি জমিদারও বটেন, আরো হাজার জন লোক যেমন জমিদার তেমনি জমিদার। কিন্তু যদি আপনার মনে হয় যে কৃষকদের পাওনা রেয়াৎ হওয়া চাই, তাহলে আপনিই প্রথমে শুরু করে দিন—চাষাদের নজর না নিয়েই পাট্টা লিখে দেওয়া হোক, বেকার বন্ধ করে দেওয়া হোক, হস্তান্তর

ফি রহিত করুন, গোচর জমি ছেড়ে দেওয়া হোক। আমার ওসব লোকদের প্রতি একটুও সহানুভূতি নাই, যারা কম্যুনিস্টদের মত কথা কয়, কিন্তু যারা রইসদের মত জীবন কাটায়, তাদেরই মত বিলাসে পূর্ণ, তাদেরই মত স্বার্থে ভরা জীবন যাদের।

রায়সাহেবের বুকে আঘাত পৌঁছিল, উকিল সাহেবের মাথায় চাপ পড়িল আর সম্পাদকজীর মুখে যেন কালি মাড়িয়া দিল। তিনি নিজে সমষ্টিবাদের পূজারী ছিলেন, কিন্তু সোজাসুজি ঘরে আগুন লাগাইতে চান নাই।

তন্‌খা রায়সাহেবের পক্ষে ওকালতি করিলেন—আমি বুঝি, রায়সাহেব নিজের প্রজাদের সঙ্গে যত ইচ্ছা ভাল ব্যবহার করুন, সব জমিদার অমনি হন তবে তো এই প্রশ্নই ওঠে না।

মেহতার আর এক চোট আক্রমণ—মানলাম, আপনি নিজের প্রজাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন; কিন্তু প্রশ্ন হোল, তাতে স্বার্থের সংস্রব আছে কি নাই। তার একটা কারণ কি হতে পারে না, যে—মৃদু আঁচে খাদ্য সব চেয়ে স্বাদু হয়? বিষ দিয়ে যে মারে তার চেয়ে গুড় দিয়ে যে মারে সে-ই হয় সফল, কোন কোন ক্ষেত্রে। আমি তো শুধু এইটুকু জানি—আমি হয় সাম্যবাদী, নয় তো নই। যদি সাম্যবাদী হই তবে কাজেও হব, না হলে ও কথা বলা ছেড়ে দেব। আমি নকল জীবন—মিথ্যাচার—পছন্দ করি না। মাংস খাওয়া ভাল মনে কর যদি, তবে খোলাখুলিভাবে খাও; মন্দ যদি মনে কর তো খেও না, এই তো আমার বুদ্ধিতে আসে; কিন্তু ভাল বোঝা আর লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়া—আমার বুদ্ধিতে আসে না। আমি একে কাপুরুষতা বা ধূর্ততা বলি। বাস্তবিক ও দুইটি গুণ একই বস্তু।

রায়সাহেব সভার কাজকর্মে প্রবীণ ব্যক্তি; অপমান ও আঘাত, দুই-ই ধৈর্য ও উদারতার সহিত সহ্য করিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল। কিছু ধোঁকায় পড়িয়া বলিলেন—আপনার বিচার একেবারে ঠিক, মেহতাজী! আপনি জানেন, আমি আপনার নির্মল স্বভাব কতখানি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু এটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন, অন্যান্য যাত্রার মত বিচারের পথে যাত্রাতেও বিশ্রামের স্থান আছে। আর আপনি এক ছেড়ে অন্য স্থানে যেতে পারেন না। মানব-জীবনের ইতিহাস তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমি যে আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছি, সেখানে রাজা হলেন ঈশ্বর, আর জমীদার হলেন ঈশ্বরের মন্ত্রী। আমার স্বর্গীয়

পিতৃদেব কৃষকদের এত অনুগ্রহ করতেন যে বরফ পড়ে ফসল নষ্ট হলে, কি হাজাশুকো হলে, কখনো আধা আধি খাজনা মাফ করে দিতেন, কখনো বা পুরোটাই মাফ করতেন। নিজের ভাণ্ডার থেকে তরকারি বের করে তাদের খাইয়ে দিতেন। ঘরের গহনা বিক্রী করে মেয়েদের বিয়েতে সাহায্য করতেন; তবে সেই পর্যন্ত, যতদিন প্রজারা তাঁকে 'সরকার' আর 'ধর্মাবতার' বলে ডাকত, তাঁকে নিজেদের দেবতা মনে করে তাঁরই পূজা করতে থাকত। প্রজাপালন ছিল তাঁর সনাতন ধর্ম; কিন্তু অধিকারের নামে উনি একটা কড়িও ছাড়তেন না। ঐ আবহাওয়াতে আমি মানুষ হয়েছি, আর আমার গর্ব এই যে, আমি কাজে কর্মে যাই করি না কেন, বিচারে আমি এগিয়ে গিয়েছি, আর একথা মানতে শুরু করেছি যে যতদিন কিষাণেরা অধিকার হিসাবে এসব সুবিধা না পাবে, ততদিন কেবল ভালমানষি করে ওদের দশা শোধরাতে পারে না। নিজের ইচ্ছায় যদি নিজের স্বার্থকে বাদ দেয়, তাহলেও নিন্দা। আমি নিজে হিতচিন্তা পোষণ করলেও স্বার্থ ছাড়তে পারি না, আর চাই যে আমাদের জাতকে শাসন ও নীতির জোরে স্বার্থ ছাড়বার জন্য বাধ্য করা হোক। একে আপনি ভীরুতা বলবেন, আমি একে বাধ্যতা বলব। আমি স্বীকার করি, অন্যের শ্রমের ফলে মোটা হবার অধিকার কারো নাই। অন্যের ওপর বসে খাওয়া, অন্যের উপজীবী হওয়া, খুব লজ্জার কথা। কাজ করা প্রাণি-মাত্রেরই ধর্ম। সমাজের এই যে ব্যবস্থা—যাতে সামান্য কিছু লোক ফুর্তি করে আর বেশী লোক চাকার নিচে পিষে মারা যায় আর শুকিয়ে যায়—এর পরিণামে কখনো সুখ হতে পারে না। পুঁজি ও শিক্ষা, যেটা আমি পুঁজিরই রূপান্তর মনে করি, এদের দুর্গ যত শীগ্‌গির ভেঙ্গে-যায় ততই ভাল। যার পেটের রুটি জোটে না, 'অফ্‌সর লোগ' তার কাছ থেকে দশ-দশ পাঁচ-পাচ হাজার আদায় করে এ ব্যাপার হাস্যাস্পদ, লজ্জাকরও বটে। এই ব্যবস্থায় আমরা জমিদারিতে কতখানি বিলাসিতা, কতখানি অনাচার, কতখানি পরাধীনতা, কতখানি নির্লজ্জতা ভরে দিয়েছি, তা আমি খুবই জানি; কিন্তু সেই জন্যই এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করি না। আমি তো এই কথাই বলতে চাই যে স্বার্থদৃষ্টিতেও এ কথার অনুমোদন করতে পারা যায় না। এই ঠাট বজায় রাখবার জন্য আমাদের নিজের নিজের আত্মা এতদূর হত্যা করতে হয় যে এতে আত্মাভিমানের নামও থাকে না। আমরা নিজেদের প্রজাদের লুটবার জন্য বাধ্য; কিন্তু 'অফসর'দের দামি দামি ডালি

যদি না দিই, তো মনে করবে বিদ্রোহী ; চালের ওপর যদি না থাকি, তবে মনে করবে কঞ্জুষ। প্রগতির অতি সামান্য আগমনধ্বনি পেলেই আমরা কেঁপে উঠি, আর অফসরদের কাছে দরখাস্ত নিয়ে দৌড়াই যে আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের না আছে নিজেদের উপর বিশ্বাস, না আছে পুরুষার্থ। ব্যস, আমাদের দশা সেই শিশুদের মত, যাদের ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াতে হয়, যারা বাইরে থেকে দেখতে মোটা, ভেতরে ভেতরে দুর্বল, প্রাণহীন ও নিঃস্ব।

মেহতা হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—হিয়র, হিয়র! আপনার কথার মধ্যে যতখানি বুদ্ধি আছে, তার অর্ধেকও যদি মগজে থাকত! দুঃখ এই যে, সব কিছু বুঝেও আপনি নিজের বুদ্ধিমত কাজ করেন না।

ওঙ্কারনাথ বলিলেন—একলা কোনও কাজ হয় না, মিঃ মেহতা! আমাদের সময়ের সঙ্গে চলতেও হবে, আর সময়কে নিজের সঙ্গে চালাতেও হবে। শুধু খারাপ কাজেই সহযোগের দরকার হয় না, ভাল কাজের জন্যও সহযোগ ততখানি জরুরি। আপনিই কেন আটশ টাকা মাইনে বলতে অজ্ঞান, খরচ করে ফেলেন, যখন আপনার কোটি কোটি ভাই শুধু আট টাকায় দিন গুজরাণ করে?

রায়সাহেব বাহিরে দুঃখ কিন্তু অন্তরে সন্তোষ লইয়া সম্পাদক মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—ব্যক্তিগত কথা নিয়ে আলোচনা করবেন না, সম্পাদক মশায়! আমরা এখানে সমাজের ব্যবস্থা বিষয়ে বিচার করছি।

মিঃ মেহতা ঐ ধরণের শান্তভাবে বলিলেন—না-না, আমি একে মন্দ মনে করি না। ব্যক্তি দিয়েই সমাজ, আর ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে আমরা কোনও ব্যবস্থা নিয়ে বিচার করতে পারি না। আমি যে এত বেতন নিয়ে থাকি তার কারণ আমার এ ব্যবস্থায় বিশ্বাস নাই।

সম্পাদক মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—কী, আপনি তো প্রচলিত ব্যবস্থা সমর্থন করেন?

আমি এই মত সমর্থন করি যে সংসারে ছোট-বড় সর্বদাই থাকবে; আর সর্বদা থাকা দরকারও বটে। ও ভেদ দূর করবার চেষ্টা করলে মানবজাতির সর্বনাশ হবে।

কুস্তির জোড়ের বদল হইল। রায়সাহেব এক ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সম্পাদক মহাশয় মল্লভূমিতে নামিলেন।—আপনি এই বিংশ শতাব্দীতেও উচ্চ-নীচ ভেদ মানেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মানি, এবং বিশেষ জোরের সঙ্গেই মানি। আপনি যে মত সমর্থন করেন, সে-টা কোনও নতুন জিনিস নয়। যেদিন মানুষের সমত্ববোধ ফুটে উঠেছে, সেদিন থেকে ঐ মতের জন্ম। বুদ্ধ, ঈশা, প্লেটো—সকলেই সমাজে সাম্যের প্রবর্তক ছিলেন। য়ূনান, রোম, সীরিয়া—সব সভ্যতাই তার পরীক্ষা করেছে, কিন্তু অস্বাভাবিক বলে ঐ জিনিসটা কোথাও স্থায়ী হতে পারে নাই।

আপনার কথা শুনে আমার আশ্চর্য লাগছে।

অজ্ঞানের অন্য নামই যে আশ্চর্য।

আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ; কিন্তু আপনি এবিষয়ে কিছু প্রবন্ধ লিখতে শুরু করুন।

মশায়, আমি ততটা আহাম্মক নই। অবশ্য ভাল মত কিছু পাইয়ে দেন তো আলবৎ লিখব।

আপনি এমন আদর্শ নিয়েছেন যাতে খোলাখুলি পাবলিককে লুটতে পারেন।

আপনার আর আমার মধ্যে তফাৎ হল এই যে, আমি যা কিছু মানি, সেই মত চলি। আপনি মানেন এক রকম, করেন আর এক রকম। অর্থসম্পদ আপনি অন্যায় করে অন্যের সমান সমান অর্জন করতে পারেন; কিন্তু বুদ্ধি, চরিত্র, রূপ, প্রতিভা ও বল সমান সমান ভাবে উৎপন্ন করা আপনার শক্তির বাহিরে। ছোট-বড়র ভেদ তো শুধু অর্থ দিয়েই নয়? আমি বড় বড় ধনকুবেরকে ভিক্ষুকদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে দেখেছি, আপনিও দেখে থাকবেন। রূপের চৌকাঠে বড় বড় রাজা মহারাজা নাকে খৎ দিয়েছেন। এটা কি সামাজিক বৈষম্য নয়? আপনি রুষের কথা বলবেন। ওখানে আর তফাৎ কি—শুধু এই যে, মিলের মালিক রাজকর্মচারীর রূপ নিয়েছে? বুদ্ধির রাজত্ব তখনও ছিল, এখনও আছে, চিরকালই থাকবে।

রেকাবিতে করিয়া পান আসিল। রায়সাহেব অতিথিদের পান ও এলাচ দিতে দিতে বলিলেন—বুদ্ধি যদি স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়, তা হলে সেবুদ্ধির প্রভুত্ব স্বীকার করতে কোনও আপত্তি নাই। সমাজবাদের এইটাই আদর্শ। আমরা সাধুমহাত্মাদের সামনে এই জন্য মাথা নোয়াই যে তাঁদের ত্যাগবল আছে। নেতৃত্বও দিতে চাই, এই ভাবে আমরা বুদ্ধির হাতে অধিকারও দিতে চাই, সম্মানও দিতে চাই, কিন্তু কোন মতেই সম্পত্তি তুলে দিতে চাই না। বুদ্ধির অধিকার ও সম্মান ব্যক্তির সঙ্গে চলে যায়; কিন্তু তার সম্পত্তি বিষবৃক্ষের মত,

তার অন্তর্ধানের পর আরও প্রবল হতে থাকে। বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে কোন সমাজই চলতে পারে না। আমরা চাই শুধু এই বিছার কামড় ভেঙ্গে দিতে।

আর একটি 'কার' আসিয়া পৌছিল; মিঃ খান্না নামিলেন—তিনি একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও চিনির কলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। দুই জন মহিলাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রায়সাহেব তাঁহাদের নামাইয়া লইলেন। যাঁহার পরনে খদ্দরের শাড়ী, দেখিতে খুব গম্ভীর ও চিন্তাশীলের মত, তিনি ছিলেন মিঃ খান্নার স্ত্রী কামিনী খান্না। দ্বিতীয় মহিলা, যাঁহার পায়ে উঁচা হিলওয়ালা জুতা, যাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাঁহার নাম মিস মালতী। তিনি বিলাত হইতে ডাক্তারি পড়িয়া আসিয়াছিলেন, এখন প্র্যাক্‌টিস করেন। তালুকদার-মহলে তাঁহার খুব যাওয়া-আসা আছে। তিনি নবযুগের সাক্ষাৎ প্রতিমা। কোমলাঙ্গী, কিন্তু রন্ধ্রে রন্ধ্রে চপলতা ভরা। লজ্জা সঙ্কোচের নামমাত্র নাই, 'মেক অপ্'-এ প্রবীণ, কথাবার্তায় মুখে খৈ ফোটে, পুরুষের মন সম্বন্ধে খুবই অভিজ্ঞ, আমোদ-প্রমোদ ভরা জীবনের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, প্রলুব্ধ ও সন্তুষ্ট করিবার কলায় নিপুণ, যেখানে প্রাণের স্থান সেখানে আছে শুধু বাহিরের চটক, হৃদয়ের পরিবর্তে আছে শুধু হাবভাব, মনের কথা বাহিরে প্রকাশ বিষয়ে কঠোর সংযম, সেই হেতু কোন বিষয়ে ইচ্ছা বা অভিলাষ যেন লোপই পাইয়াছে।

মিঃ মেহতার হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন—সত্যি বলছি, আপনার চেহারা থেকেই মালুম হয় যে আপনি একজন ফিলসফার। আপনার নতুন লেখাটায় তো আপনি অধ্যাত্মবাদীদের ঘায়েল করে রেখে দিয়েছেন। পড়তে পড়তে কতবার মনে হল, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করি। ফিলসফারদের মধ্যে সহৃদয়তা দূর হয়ে যাচ্ছে কেন?

মেহতা থমকিয়া গেলেন। তাঁহার বিবাহ হয় নাই, এবং নবযুগের রমণীদের তিনি এড়াইয়া চলিতেন। পুরুষদের আড্ডায় তিনি খুব বকবক করিতেন বটে, কিন্তু যাই একটি মহিলা আসিয়া উপস্থিত, অমনি তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া যাইত। বুদ্ধির উপর যেন কেহ তালাচাবি বন্ধ করিয়া দিত। মেয়েদের সঙ্গে শিষ্ট ব্যবহার করিবার পর্যন্ত হুঁস থাকিত না।

মিঃ খান্না জিজ্ঞাসা করিলেন—ফিলসফারদের চেহারায় বিশেষ কী আছে, বলুন তো? মালতী মেহতার দিকে সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—মিঃ মেহতা যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।

মিঃ খান্না ছিলেন মিস মালতীর ভক্ত। মিস মালতী যেখানে যান, মিঃ খান্নার সেখানে যাওয়া চাই। ভ্রমরের মত তাঁহার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সর্বদা তাঁহার মনে এই ইচ্ছা জাগিত যে মালতীর সঙ্গে কথাবার্তা তিনিই বেশী বলেন মালতীর দৃষ্টি সব চেয়ে তাঁহারই উপর পড়ে।

খান্না চোখ টিপিয়া বলিলেন—ফিলসফার কোনও কথাই মন্দ মনে করে না। ওদের এই হোলো গুণ।

তবে শুনুন, ফিলসফার সর্বদাই মন-মরা হন, যখনই দেখুন, দেখতে পাবেন নিজের চিন্তায় বিভোর। আপনার দিকে তাকাবেন, কিন্তু আপনাকে দেখবেন না—আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে থাকুন, কিছু শুনবেন না, যেন শূন্যে উড়ছেন।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মিঃ মেহতা যেন মাটিতে মিশিয়া গেলেন।

অক্সফোর্ডে আমার ফিলসফির প্রফেসর ছিলেন মিঃ হাসব্যাণ্ড······

খান্না টিপ্পনী করিলেন—নামটিতো অদ্ভুত।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আর অবিবাহিত······

মিঃ মেহতাও তাই······

এ রোগ সব ফিলসফারদেরই হয়।

এখন মেহতার সুযোগ হইল; বলিলেন, আপনিও তো এই দায়ে ধরা পড়েছেন।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কোন ফিলসফারকে বিয়ে করব, আর এ শ্রেণীর লোক বিয়ের নামে ঘাবড়ায়। হাসব্যাণ্ড সাহেব তো স্ত্রীলোক দেখলে ঘরের ভেতর পালাতেন। ওঁর কয়েকটি ছাত্রী ছিল; তাদের মধ্যে কেউ যদি কখনো কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করবার জন্য ওঁর অফিসে যেত, তবে উনি এতটা ঘাবড়ে যেতেন যেন বাঘ এসে পড়েছে। আমরা ওঁকে খুব বিরক্ত করতাম, কিন্তু লোকটি ছিলেন ভারি সরলপ্রাণ। হাজার কয়েক পাউণ্ড আয় ছিল; কিন্তু সর্বদাই তাঁর পরণে একই স্যুট দেখেছি। ওঁর এক বিধবা বোন ছিল, ঘরসংসার তিনিই দেখতেন। মিঃ হাসব্যাণ্ডের তো খাওয়া-দাওয়ারও ঠিক ঠিকানা থাকত না। আগন্তুকদের ভয়ে তিনি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে লেখাপড়া করতেন। খাওয়ার সময় হলে ওঁর বোন আস্তে আস্তে ভিতরের দরজা দিয়ে ওঁর কাছে গিয়ে বই বন্ধ করে দিতেন, তবে ওঁর চৈতন্য হত যে খাওয়ার সময় হয়েছে। রাত্রেও

খাওয়ার সময় বাঁধা ছিল। ওঁর বোন ঘরে বাতি নিভিয়ে দিতেন। একদিন বোন এলেন বই বন্ধ করে দিতে, তো নিজে দুই হাতে বইখানা চেপে ধরলেন, ভাই-বোনে ধস্তাধস্তি শুরু হল। শেষটায় বোন ওঁর চাকা-ওয়ালা চেয়ার ঠেলে খাওয়ার ঘরে নিয়ে গেলেন।

রায়সাহেব বলিলেন—কিন্তু মেহতা তো বড় খোসমেজাজী লোক, লোকের সঙ্গে মেলামেশা ভালবাসেন। নইলে এই হাঙ্গামে আসবেন কেন?

তবে উনি নিশ্চয় ফিলসফার নন। যখন নিজের চিন্তায় আমার মাথায় ব্যথা হয়েছে, তখন বিশ্বের চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে কেউ কিভাবে খুশি থাকতে পারে?

ওদিকে সম্পাদক মহাশয় শ্রীমতী খান্নার নিকটে নিজের আর্থিক অনটনের কথা বলিতেছিলেন—বাঃ, একথা বুঝে রাখুন যে সম্পাদকের জীবন এক দীর্ঘ বিলাপে ভরা, সে কথা শুনে লোকে দয়া করে না বরং কানে আঙ্গুল দেয়। বেচারা না পারে নিজের উপকার করতে, না পারে অন্যের ভাল করতে। পাবলিক তার কাছে আশা করে প্রত্যেক আন্দোলনে সে-ই দাঁড়াবে সকলের আগে, জেলে যাবে, মার খাবে, ঘরের আসবাবপত্র ক্রোক করাবে, মনে করে এইটেই হল ওর ধর্ম; কিন্তু তার যে অভাব-অসুবিধা সেদিকে কারো দৃষ্টি নাই। ওর তো সব কিছুই আছে। ওর থাকা চাই সব রকম বিদ্যা, সব রকম কলায় পারদর্শিতা; কিন্তু ওর নাই বাঁচবার অধিকার। আপনি তো আজকাল কিছু লেখেনই না। আপনার সেবা করবার যে সামান্য কিছু সৌভাগ্য আমি পেতে পারি, তা থেকে আমাকে কেন বঞ্চিত করেন?

মিসেস খান্নার কবিতা লেখার সখ ছিল। এই সম্পর্কে সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিতেন, কিন্তু বাড়ির কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার জন্য এদিকে বহুদিন কিছু লিখিতে পারেন নাই। সত্য কথা বলিতে কি, সম্পাদক মহাশয়ই উৎসাহ দিয়া তাঁহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছিলেন, প্রকৃত প্রতিভা তাঁহার মধ্যে অতি অল্পই ছিল।

কি লিখব, কিছু মনেই হয় না। আপনি কখনো মিস মালতীকে কিছু লিখতে বলেন নি?

সম্পাদক মহাশয় উপেক্ষার ভাবে বলিলেন, কামিনী দেবী, ওঁর সময় মূল্যবান। তারাই লেখে যাদের অন্তরে আছে কিছু বেদনা, অনুরাগ, কিছু ভালবাসা, কিছু

চিন্তা। যিনি অর্থ ও ভোগবিলাসকে জীবনের লক্ষ্য করে ধরেছেন, তিনি আর কী লিখবেন!

কামিনী দেবী ঈর্ষ্যা-মিশ্রিত কৌতুকের স্বরে বলিলেন—যদি আপনি ওঁকে দিয়ে কিছু লেখাতে পারেন, তাহলে আপনার প্রচার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। লখনৌতে তো এমন রসগ্রাহী কোনও ব্যক্তি নেই যে আপনার গ্রাহক না হয়ে থাকতে পারবে।

অর্থ যদি আমার জীবনের আদর্শ হত, তবে আমার আজকে এদশা হত না। অর্থসংগ্রহের কৌশল আমারও জানা আছে। আজ চাইলে লাখলাখ টাকা রোজগার করতে পারি; কিন্তু আমি তো অর্থকে কখনও কিছু মনে করি নাই—সাহিত্যের সেবাই আমার জীবনের ধ্যানের বস্তু, আর তা থাকবেও বটে।

আচ্ছা, অন্ততঃ আমার নামটা গ্রাহকদের তালিকাভুক্ত করে নেবেন।

আপনার নাম গ্রাহকদের মধ্যে নয়, পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে লিখে নেব।

পেট্রনদের মধ্যে রানী-মহারানীদের রাখুন, যাঁদের অল্প-স্বল্প খোসামোদ করে আপনি আপনার পত্রিকাখানি থেকে আয়ের পথ করতে পারেন।

আপনিই আমার রানী আর মহারানী। আমি তো আপনি ছাড়া কোনও রানী-মহারানীর কথা ভাবিই না। যাঁর মধ্যে দয়া আর বিবেক আছে, তিনিই আমার রানী। খোসামোদকে আমি ঘৃণা করি।

কামিনী টিপ্পনী কাটিলেন—কিন্তু আমার খোসামোদ তো আপনি করছেন সম্পাদক মশাই!

সম্পাদক মহাশয় গম্ভীর হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে কহিলেন—এ খোসামোদ নয় দেবি, এ হচ্ছে হৃদয়ের সত্য সত্য উচ্ছ্বাস।

রায়সাহেব ডাকিলেন—সম্পাদক মশায়, একটু এদিকে আসুন। মিস মালতী আপনাকে কি বলতে চাইছেন।

সম্পাদক মহাশয়ের সমস্ত ঔদ্ধত্য অন্তর্হিত হইল। নম্রতা ও বিনয়ের মূর্তি ধরিয়া তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন। মালতী করুণ নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আমি এখ্‌খুনি বলছিলাম যে দুনিয়ার সম্পাদকদেরই আমি সব চেয়ে ভয় করি। আপনারা যাকে ইচ্ছা এক মুহূর্তে উড়িয়ে দিতে পারেন। চীফ-সেক্রেটারি সাহেব একবার আমায় বলেছিলেন—যদি আমি এই ব্লাডি ওঙ্কার-নাথকে জেলে পুরতে পারি তো নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

ওঙ্কারনাথের দীর্ঘ গুম্ফ খাড়া হইয়া গেল। চক্ষে গর্বের জ্যোতি ঢেউ খেলিয়া গেল। এমনি লোকটির প্রকৃতি ছিল খুব শান্ত; কিন্তু ভীতিপ্রদর্শনের কথা শুনিয়া তাঁহার পৌরুষ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ়তার স্বরে বলিলেন—আপনার এই দয়ার জন্য কৃতজ্ঞ থাকলাম। সে সভায় আমার কথা তো আসবেই, যেভাবেই আসুক। আপনি সেক্রেটারী মশায়কে বলে দেবেন যে ওঙ্কারনাথ সে দলের লোক নয় যারা ধমকে ভয় খায়। তার কলম তখন থামবে যখন তার জীবনযাত্রা শেষ হয়ে যাবে। সে ভার নিয়েছে, দুর্নীতি আর স্বেচ্ছাচার সমূলে উৎপাটন করে ফেলে দেবে।

মিস মালতী আর একটু উসকাইয়া দিলেন—কিন্তু আমার কাছে আপনার এই নীতি দুর্বোধ্য যে আপনি যখন মামুলি শিষ্টাচারে কর্তাদের সহযোগিতা পেতে পারেন তখন কেন তাদের এড়িয়ে চলছেন? আপনার আলোচনায় আপনি যদি আগুন আর বিষ একটু কম করে দেন তো আমি কথা দিচ্ছি, আপনাকে গবর্মেণ্ট হতে যথেষ্ট সাহায্য দেওয়াতে পারি। জনসাধারণকে তো আপনি দেখে নিয়েছেন, তাদের কাছে আপনি আপীল করেছেন, তাদের খোসামোদ করেছেন, নিজের অভাব-অভিযোগের কথা জানিয়েছেন; কিন্তু কোন লাভ হয় নাই। এখন কর্তাদেরও কিছু পরীক্ষা করুন। তিন মাসের মধ্যে আপনি যদি মোটর গাড়িতে না বেরুতে থাকেন, আর সরকারি পার্টিতে আপনার নেমন্তন্ন না হয়, তাহলে আমাকে যত ইচ্ছা শাপ দেবেন। তখন দেখবেন, এই সব রাজা-রাজড়া আর ন্যাশানালিস্ট যারা আপনাকে গ্রাহ্যই করে না, তারাও আপনার দরজায় এসে ধন্না দেবে।

ওঙ্কারনাথ অভিমানের সঙ্গে বলিলেন—এ তো করতে পারি না; নিজের মতবিশ্বাসকে আমি সর্বদাই উঁচু রেখেছি, পবিত্রভাবে রেখেছি, আর প্রাণ থাকতে রক্ষা করেই যাব। অর্থের পূজারী তো অলিতে গলিতে পাওয়া যাবে, আমি মতবাদের পূজারী।

একে আমি বলি দম্ভ।

আপনার খুশি।

অর্থকে আপনি গ্রাহ্যই করেন না?

মতবাদের গলা টিপে নয়।

তবে আপনার কাগজে বিদেশী জিনিসের বিজ্ঞাপন কেন? অন্য কোনও

কাগজে এত বিদেশী জিনিসের বিজ্ঞাপন দেখি না। আপনি তো আদর্শবাদী ও মতবাদী বলে দাঁড়িয়েছেন; কিন্তু নিজের লাভের জন্য দেশের অর্থ বিদেশে পাঠাবার সময় আপনার কি একটুও দুঃখ হয় না? আপনি কোনও যুক্তি দিয়েই এ নীতির সমর্থন করতে পারেন না।

ওঙ্কারনাথের কাছে সত্যসত্যই ইহার কোনও জবাব ছিল না। তাঁহাকে অপদস্থ হইতে দেখিয়া রায়সাহেব তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন—তা আপনি শেষ পর্যন্ত কি চান? এদিকেও মারা পড়বেন, ওদিকেও মারা পড়বেন, তাহলে কাজ চলবে কি করে?

মিস মালতী দয়া করিতে শেখেন নাই।

কাগজ যদি না-ই চলে, তবে ওটাকে বন্ধ করে দিন। আপনার কাগজ চালাবার জন্য আপনার বিদেশী দ্রব্য প্রচার করবার অধিকার নাই। আপনার আর উপায় যদি না-ই থাকে তবে মতবাদের দোহাই ছেড়ে দিন। আমি তো দলগত কাগজ দেখে জ্বলে উঠি। প্রাণ চায়, দেশলাই দেখিয়ে দি। কথায় ও কাজে যার সামঞ্জস্য নাই, সে আর যাই হোক, আদর্শবাদী নয়।

মেহতা উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। একটু আগে তিনি এই কথাই বুঝাইতে-ছিলেন। এখন তাঁহার ধারণা হইল যে এই রমণীর বিচারের শক্তিও আছে, শুধু ঠাট্টা-মস্করাই করে না। সঙ্কোচ কাটিয়া যাইতেছিল।

এই কথা আমি এখনি বলছিলাম। মতে ও কাজে সামঞ্জস্য না হওয়ার নাম ধূর্ততা, কপটতা।

মিস মালতী প্রসন্ন মুখে বলিলেন—তাহলে এ বিষয়ে আপনি ও আমি এক, আর আমিও ফিলসফার হওয়ার দাবি করতে পারি।

খান্না জিভ চুলকাইতেছিল। বলিলেন—আপনার এক একটা অঙ্গ ফিলজফিতে ডুবানো আছে।

মালতী রাশ টানিলেন—আচ্ছা, আপনারও ফিলসফিতে দখল আছে। আমি তো মনে করেছিলাম, আপনি অনেক আগেই নিজের ফিলসফির গঙ্গায় ডুবে আছেন। না হলে আপনি এত ব্যাঙ্ক আর কোম্পানির ডিরেক্টর হতেন না।

রায়সাহেব খান্নাকে প্রশ্ন করিলেন—আপনি কি তবে মনে করেন যে ফিলসফারেরা সর্বদা ফাঁকা নিয়েই পাগল থাকবেন?

আজ্ঞে হাঁ। ফিলসফর যদি মোহ জয়ই করতে না পারে তবে আর ফিলসফর কি ?

এই লক্ষণ থেকে মিঃ মেহতাকেও তবে ফিলসফর মনে করা ঠিক নয় ?

মেহতা যেন আস্তিন গুটাইয়া বলিলেন—আমি তো কখনও সে দাবি করি নাই রায়সাহেব ! আমি তো শুধু এইটুকু জানি যে, যে ওজনে কামার কাজ করে, শ্যাকরার সে ওজন নয়। আপনি কি চান যে বাবলা কি তাল গাছের মত আম গাছেরও বাড় হয় ? সেই অবস্থায় তার ফুল ফল হয় ? আমার কাছে ধনের অর্থ শুধু সেই সুবিধাটুকু যাতে আমি নিজের জীবন সার্থক করতে পারি। ধন আমার কাছে শুধু বাড়াবার বা ফলেফুলে সুশোভিত হবার সামগ্রী নয়, শুধু সাধন মাত্র। টাকাকড়ির প্রতি আমার মোটেই আগ্রহ নাই। আপনি সেই উপায় জুটিয়ে দিন যাতে আমি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারি।

ওঙ্কারনাথ ছিলেন সমষ্টিবাদী, ব্যক্তির এই প্রাধান্য স্বীকার করেন কি করিয়া ?

এভাবে তো প্রত্যেক মজুর বলতে পারে যে কাজ করার সুবিধার জন্য তার এক হাজার টাকা মাইনে চাই।

যদি আপনি মনে করেন যে ঐ মজুর ছাড়া আপনার কাজ চলতে পারে না, তবে আপনাকে সেই সুবিধাই দিতে হবে। আর ঐ কাজ যদি অন্য মজুর কিছু অল্প মজুরি নিয়ে করে, তাহলে প্রথম মজুরের খোসামোদ করার কোনও দরকার নেই আপনার।

যদি মজুরের হাতে অধিকার থাকত, তাহলে তাদের জন্য স্ত্রী ও মদেরও তেমনি সুবিধা তাড়াতাড়ি হয়ে যেত, যেমনি ফিলসফারদের জন্য হয়।

তাহলে, আপনি বিশ্বাস করুন, আমি তাদের হিংসা করতাম না।

আপনার জীবন সার্থক করবার জন্য স্ত্রী যদি এতই প্রয়োজন, তবে আপনি বিয়ে করেন না কেন ?

মেহতা নিঃসঙ্কোচে বলিলেন—এই জন্য করি না যে মুক্ত ভোগ আত্মার বিকাশের পথে বাধা হয় না। বিবাহ তো আত্মা আর জীবনকে খাঁচায় বন্ধ করে দেয়।

খান্না এই কথার সমর্থন করিয়া কহিলেন—বন্ধন আর নিগ্রহ হল পুরানা থিওরি। নূতন থিওরি হল মুক্ত ভোগ !

মালতী খিঁচ টানিলেন—এখন তবে মিসেস খান্নাকে তালাকের জন্য তৈরি হতে হবে?

তালাকের আইন আগে হোক!

হয়তো সেই আইন আপনি প্রথমে কাজে লাগাবেন।

কামিনী মালতীর দিকে বিষভরা দৃষ্টি লইয়া দেখিলেন এবং মুখ সরাইয়া লইলেন, যেন বলিতেছেন—খান্না যদি তোমাকে নিয়ে খুশি থাকে, থাকুক, আমি গ্রাহ্য করি না।

মালতী মেহতার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এ বিষয়ে আপনার কি মত, মিঃ মেহতা?

মেহতা গম্ভীর হইয়া গেলেন। কোনো বিষয়ে নিজের মত বিবৃত করিতে হইলে উনি যেন নিজের সমস্ত প্রাণ তাহাতে ঢালিয়া দিতেন।

বিবাহকে আমি সামাজিক বোঝাপড়া মনে করি; তা ভাঙবার অধিকার স্ত্রী-পুরুষ কারোই নাই। বোঝাপড়া করবার পূর্বে আপনি স্বাধীন, বোঝাপড়া একবার হয়ে গেলে আপনার হাতের বাইরে চলে গেল।

তাহলে আপনি তালাক প্রথার বিরোধী, কেমন?

নিশ্চয়।

আর স্বচ্ছন্দভোগ?

সে হল তার জন্য, যে বিবাহ করতে চায় না।

নিজের আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশ সকলেই চায়; তবে বিবাহ কে বা করে আর কেনই বা করে?

এই জন্যে যে, মুক্তি সকলেই চায়; কিন্তু এরকম লোক খুব কম, যারা লোভে পড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে।

আপনি কোন জিনিসটা শ্রেষ্ঠ মনে করেন, বিবাহিত জীবন, না অবিবাহিত জীবন?

সমাজের দৃষ্টিতে বিবাহিত জীবন শ্রেষ্ঠ, ব্যক্তির দিক থেকে অবিবাহিত জীবন শ্রেষ্ঠ।

ধনুর্যজ্ঞ অভিনয়ের সময় নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল। দশটা হইতে একটা পর্যন্ত ধনুর্যজ্ঞ, একটা হইতে তিনটা পর্যন্ত প্রহসন, এই ছিল প্রোগ্রাম। আহার্য প্রস্তুত করা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বাংলোতে অতিথিদের জন্য পৃথক পৃথক

ব্যবস্থা ছিল। খান্না পরিবারের জন্য দুইটি কুঠরি রাখা হইয়াছিল। আরো কত অতিথি আসিয়াছিলেন। সকলে নিজের নিজের কক্ষে গিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইলেন। এখানে ছোঁয়াছুঁয়ির কোন বাছবিচার ছিল না, সকল জাতির ও সকল বর্ণের লোকে একত্র ভোজন করিতে বসিয়া গেল। শুধু সম্পাদক ওঙ্কারনাথ সবার হইতে পৃথক হইয়া নিজের কক্ষে ফলাহার করিতে গেলেন, আর কামিনী খান্নার মাথা ধরিয়াছিল—তিনি আহার করিতে সম্মত হইলেন না। ভোজনকক্ষে অতিথিদের সংখ্যা পঁচিশের কম হয় নাই। মদ্য মাংস, উভয়েরই ব্যবস্থা ছিল। এ উৎসবের জন্য রায়সাহেব উৎকৃষ্ট মদ বিশেষ করিয়া আনাইতেন; আনা হইত ঔষধের নামে, কিন্তু জিনিসটা ছিল খাঁটি মদ। মাংসও রান্না হইত বিভিন্ন প্রকারে—কোপ্তা, কাবাব, পোলাও। মোরগ, মুরগি, বকরি, বক, তিতির, ময়ূর, যাহার যাহা পছন্দ তাহাই খাইত।

আহার শুরু হইলে মিস মালতী প্রশ্ন করিলেন—সম্পাদক মশায় কোথায় রয়ে গেলেন? কাউকে পাঠান রায়সাহেব, ওঁকে ধরে নিয়ে আসুক।

রায়সাহেব বলিলেন—উনি বৈষ্ণব, ওঁকে এখানে এনে কেন বেচারির ধর্ম নষ্ট করবে? আচারী লোক!

আরে, আর কিছু না হলেও তামাশা করা যাবে তো।

হঠাৎ এক ভদ্রলোককে দেখিয়া ডাকিয়া উঠিলেন—আপনিও বসুন, মির্জা খুরশেদ, এ কাজ আপনার ওপরই ভার। আপনার যোগ্যতার পরীক্ষা হবে।

মির্জা খুরশেদ শাদা ধব্‌ধবে লোক ছিলেন, বড় বড় গোঁফ, নীল চোখ, দোহারা গড়ন, মাথার চাঁদি কেশহীন। 'ছকলিয়া' আচকান ও চুড়িদার পায়জামা পরণে। মাথায় হ্যাট। কাউনসিলের মেম্বর ছিলেন, তবে অধিকাংশ সময় গাঢ় নিদ্রায় বিভোর থাকিতেন। ভোটিং-এর সময় চমকিয়া উঠিতেন এবং জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে ভোট দিতেন। ছিলেন সুফী মুসলমান; দুই দুই বার হজ করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু মদ খুব খাইতেন; বলিতেন, খোদার একটা হুকুমও যখন ভুলিয়াও মানি না, তখন ধর্মের জন্য প্রাণ দিই কেন? খুব কৌতুক ভালবাসিতেন, কূটকপাট কিছু ছিল না। প্রথমে ছিলেন বসোরায় ঠিকাদার, লাখ লাখ টাকা রোজগার করিতেন, কিন্তু খারাপ সময় আসিল—এক মেমসাহেবের সঙ্গে প্রণয় করিয়া বসিলেন। মোকদ্দমা হইল; জেলে যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশ হইতে বহিষ্কারের

আদেশ হইল। যেখানে যাহা কিছু ছিল তাহা সেখানেই ছাড়িয়া শুধু পঞ্চাশ হাজার টাকা লইয়া পলাইয়া গেলেন। বোম্বাইয়ে তাঁহার এজেন্ট ছিল। ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে হিসাব-কিতাব বুঝিয়া লইবেন, যাহা কিছু পাওয়া যাইবে তাহাতেই জীবনটা কাটাইয়া দিবেন ; কিন্তু এজেন্ট জাল করিয়া তাঁহার কাছ থেকে ঐ পঞ্চাশ হাজারও ঠকাইয়া লইল। নিরাশ হইয়া সেখান হইতে লখনৌ আসিলেন। গাড়িতে এক মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মহাত্মাজী তাঁহাকে সবজি বাগ দেখাইয়া তাঁহার ঘড়ি, আংটি, সোনারূপা সব উড়াইয়া দিলেন। বেচারি যখন লখনৌতে পৌছিলেন তখন পরণের কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রায়সাহেবের সঙ্গে ছিল পুরাতন আলাপ পরিচয়। কিছু তাঁহার সাহায্যে, আর কিছু অন্যান্য বন্ধুদের সাহায্যে, এক জুতার দোকান খুলিয়া দিলেন। লখনৌতে এখন ঐটাই সবচেয়ে বেশি চলতি জুতার দোকান ; রোজ চার পাঁচ শ টাকার বিক্রি। অল্প দিনের মধ্যেই লোকের তাঁহার উপর এতটা বিশ্বাস হইল যে এক বড় তালুকদারকে হারাইয়া তিনি কাউনসিলে ঢুকিলেন।

নিজের জায়গায় বসিয়া বসিয়া বলিলেন—না না, আমি কারো ধর্ম নষ্ট করব না, এ কাজ আপনাকে নিজেই করতে হবে। আপনি যখন ওঁকে মদ খাইয়ে ছাড়বেন তখনই তো মজা হবে। এ হবে আপনার মোহিনীশক্তির পরীক্ষা।

চারদিক হইতে ধ্বনি উঠিল—হাঁ-হাঁ, মিস মালতী, আজ নিজের বাহাদুরি দেখান। মালতী মির্জা সাহেবকে বলিলেন, কিছু ইনাম দেবেন?

একশ টাকার এক থলি।

হুস! একশ টাকা! লাখ টাকার ধর্ম নষ্ট করব একশ টাকার জন্য!

আচ্ছা, আপনি নিজেই নিজের ফি কত বলুন।

এক হাজার, এক কড়াও কম নয়।

আচ্ছা, মঞ্জুর।

আজ্ঞে না। টাকাটা নিয়ে মেহতাজীর হাতে রেখে দিন।

মির্জা তাড়াতাড়ি একশ টাকার নোট পকেট হইতে বাহির করিলেন এবং দাঁড়াইয়া তাহা দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন—ভাই সব! এ হচ্ছে আমাদের পুরুষদের ইজ্জতের কথা। মিস মালতীর ফরমাস মাফিক যদি না করা হয়, তাহলে আমাদের আর কোথাও মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না। আমার

কাছে টাকা থাকলে মিস মালতীর এক এক কেরামতির জন্য এক এক লাখ টাকা দিয়ে দিতাম। প্রাচীন এক কবি তাঁর প্রেমাস্পদের কালো তিলের জন্য সমরখন্দ ও বোখারা প্রদেশ বলি দিয়েছিলেন। আজ আপনাদের সব ভদ্রমহোদয়দের মনুষ্যত্বের ও রূপের পূজার পরীক্ষা। যার কাছে যাই কিছু থাক, সত্যি সত্যি বীরের মতন বের করে রাখুন। আপনাদের বিদ্যার দিব্যি, প্রেমাস্পদের আলিঙ্গনের দিব্যি, নিজেদের ইজ্জতের দিব্যি, পিছু হটবেন না। পুরুষগণ, টাকা তো খরচ হয়েই যাবে, নাম থাকবে চিরকালের জন্য। লাখটাকা দিলেও এ তামাশা সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। দেখুন, লখনৌ-এর রূপবতীদের রাণী এক পূজারীর ওপর নিজের রূপের মন্ত্র কি করে চালাচ্ছেন।

বক্তৃতা শেষ করিয়াই মির্জা প্রত্যেকের পকেট খুঁজিতে শুরু করিয়া দিলেন। প্রথমে মিঃ খান্নার পকেট খোঁজা হইল—বাহির হইল পাঁচটি টাকা!

মির্জা মুখ বিবর্ণ করিয়া কহিলেন—বাঃ, খান্না সাহেব, বাঃ! 'নাম বড়, দেখতে ছোট।' এত কোম্পানীর ডিরেক্টর, লাখ লাখ টাকা আয়, আর আপনার পকেটে পাঁচটি টাকা! এ যে পর্বত থেকে ইঁদুর বেরোল! মেহতা কোথায়? উনি একটু গিয়ে মিসেস খান্নার কাছ থেকে খুব কম হলেও একশ টাকা উশুল করে আনুন।

খান্না চটিয়া বলিলেন—আরে, ওঁর কাছে তো এক পয়সাও হবে না। কে জানত যে এখানে আপনারা খানাতালাসি শুরু করে দেবেন!

বেশ, আপনি চুপ করে থাকুন। আমি নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখি।

আচ্ছা, আমি তবে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

আজ্ঞে না। আপনি এখান থেকে নড়তে পারবেন না। মিঃ মেহতা, আপনি হলেন ফিলসফার, মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিত। দেখবেন, আপনি নিজে কোনও আঁচ দেবেন না যেন।

মেহতা মদ খাইয়া অপ্রকৃতিস্থ হইয়া যাইতেছিলেন। ঐ নেশায় তাঁহার দর্শন উড়িয়া যাইতেছিল, আর ফুর্তি জাগিয়া উঠিতেছিল। চট্ করিয়া মিসেস খান্নার নিকটে গেলেন, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মাথা নীচু করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মির্জা জিজ্ঞাসা করিলেন—আরে! খালি হাতে নাকি?

রায়সাহেব হাসিলেন—কাজির বাড়ির ইঁদুরটাও সেয়ানা!

মির্জা বলিলেন—খোদার কসম, খান্নার ভাগ্যি বড় ভাল।

মেহতা উচ্চ হাস্থ করিয়া পকেট হইতে পাঁচখানা একশ টাকার নোট বাহির করিলেন।

মির্জা ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন।

চার দিক হইতে শোনা যাইতে লাগিল—বাহাদুরি আছে বটে, ওস্তাদ ছেলে! হবেই বা না কেন, ফিলসফার যখন!

মির্জা চোখের সামনে নোট রাখিয়া বলিলেন—ভাই মেহতা, আজ হতে আমি তোমার শাকরেদ। কি যাদু করেছ বল তো!

মেহতা বাঁকা হইয়া লাল লাল চোখে তাকাইয়া বলিল—ওহে, কিছুই নয়। এ আর কি এমন একটা কাজ। গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ভেতরে আসব? বললেন, আপনি তো মেহতা? আসুন। ভেতরে গিয়ে বললাম, ওখানে ব্রিজ খেলা চলছে। আংটির দাম এক হাজারের কম নয়। আপনি দেখেছেন তো? ব্যস, ওই। আপনার কাছে যদি টাকা থাকে তো পাঁচ শ টাকা দিয়ে এক হাজার টাকার জিনিস নিয়ে যান। এ অবসর আর আসবে না। মিস মালতী এ সময় টাকা না দিলে দাগের বাইরে গিয়ে পড়বেন। পরে আর কেউ দেবে, এইজন্য হয়তো উনি আংটি বের করেছেন, কার আর হাতের কাছে পাঁচ শ টাকা থাকবে! উনি একটু হেসে নিজের পকেট থেকে চট করে পাঁচখানা নোট বের করে দিয়ে দিলেন, আর বললেন—একেবারে কিছু না নিয়ে ঘরের বাইরে আসি না, কে জানে কখন কি দরকার পড়ে!

খান্না চটিয়া বলিলেন—আমাদের প্রফেসরের যখন এই অবস্থা, তখন ইউনিভার্সিটিকে ভগবান রক্ষা করুন। খুরশেদ কাটা ঘায়ের উপর নুনের ছিটা দিয়া বলিলেন—আরে, এ আর কি ভারি ব্যাপার, যার জন্য আপনার মন ভেঙ্গে পড়ছে! খোদা যদি মিথ্যা না বলান তবে এ তো আপনার এক দিনের আয়! মনে করবেন, একদিন অসুখে পড়ে গেছেন; আর যাবে তো মিস মালতীর হাতেই। আপনার মনের ব্যথার ওষুধ তো মিস মালতীর কাছেই আছে।

মালতী ঠোকর মারিয়া কহিলেন—দেখুন মির্জাজী, ঢিল মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

মির্জাজী লেজ নাড়িয়া বলিলেন—কান ধরছি মিস মালতী!

মিঃ তন্‌খাকে খানাতালাসী করা হইল; অনেক কষ্টে দশটা টাকা বাহির

হইল। মেহতার পকেট হইতে বাহির হইল একটা আধুলি। কয়েকজন ভদ্রলোক নিজেরাই এক-এক, দুই-দুই টাকা দিয়া দিলেন। সব টাকা যোগ দিয়া দেখা গেল, হিসাবে তিন শ-এর কম। যাহা কম পড়িল, রায়সাহেব উদারতা দেখাইয়া তাহা পূরণ করিয়া দিলেন।

সম্পাদক মহাশয় ফল ও মেওয়া খাইয়া কোমরটা একটু সোজা করিয়া লইতেছিলেন; রায়সাহেব গিয়া বলিলেন, আপনাকে মিস মালতী স্মরণ করেছেন। খুশি হইয়া সম্পাদক বলিলেন—মিস মালতী আমায় স্মরণ করছেন, এতো আমার ভাগ্যের কথা! রায়সাহেবের সমান পর্যায়ে উঠে এলাম।

ওদিকে চাকরেরা টেবিল সাফ করিতেছিল। মালতী আগাইয়া আসিয়া উঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

সম্পাদক মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন, বসুন, আড়ম্বর করবেন না, আমি তেমন বড়লোক নই।

শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে মালতী কহিলেন—আপনি আড়ম্বর মনে করবেন, আমি মনে করি এতে আমার নিজেরই সম্মান বাড়াচ্ছি; আপনি নিজেকে কিছু মনে না করতে পারেন, তাতে আপনার শোভাই বাড়ে, কিন্তু এখানে যে সব ভদ্রলোক উপস্থিত আছেন সকলেই আপনার রাষ্ট্র ও সাহিত্য সেবার কথা ভাল করে জানেন্। আপনি এ ক্ষেত্রে যে মহত্ত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, এখন হয়তো লোক তার মূল্য বুঝবে না; কিন্তু সে সময় বেশি দূর নয়—আমি তো বলছি, সে সময় এসেই গেছে—যখন শহরে শহরে আপনার নামে রাস্তা তৈরি হবে, ক্লাব চলবে, টাউনহলে আপনার ছবি ঝুলবে। এখনকার দিনে যে অল্প-স্বল্প কিছু জাগরণ হয়েছে সে তো আপনার প্রচণ্ড উদ্যোগেরই প্রসাদে। একথা জানতে পেরে আপনার আনন্দ হবে যে, দেশে আপনার অনুগামী লোকের জন্ম হয়েছে যাঁরা পল্লীসংস্কার আন্দোলনে হাত দেবার জন্য উৎসুক, তাঁদের সকলেরই খুব ইচ্ছা যে সংঘের ভিতর দিয়ে একাজ করা হয়, এবং এক পল্লীসংস্কার সংঘ স্থাপিত করা হয় আপনি যার সভাপতি হবেন।

নেতৃস্থানীয় লোকদের মধ্যে এতখানি সম্মান পাওয়ার সুযোগ ওঙ্কারনাথের জীবনে এই প্রথম। সাধারণ জলসার মধ্যে তাঁহার কখনো কখনো ডাক পড়িত, কতকগুলি সভার সচিব ও সহকারী সচিবও তিনি ছিলেন বটে; কিন্তু শিক্ষিতসমাজ এ পর্যন্ত তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াই আসিয়াছে।

তাহাদের মধ্যে ইনি কোন ক্রমেই মিশিতে পারেন নাই; এই জন্য তিনি জলসার মধ্যে তাহাদের নিষ্ক্রিয়তা ও স্বার্থপরতার নিন্দা করিতেন, আর নিজের পত্রিকায় এক এক জনকে লইয়া পড়িতেন। কলমে তেজ ছিল, ভাষা ছিল কঠোর, শুদ্ধি ও পবিত্রতার স্থানে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিত; এই জন্য লোকে তাঁহাকে শুধু 'ঢোল' বলিয়া মনে করিত। সে সমাজে আজ তাঁহার এতটা সম্মান! কোথায় আজ 'স্বরাজ্য' আর 'স্বাধীন ভারত' আর 'হাণ্টারে'র সম্পাদক, আসিয়া দেখুন, নিজেদের প্রাণ ঠাণ্ডা করুন। আজ নিশ্চয় তাঁহার উপর দেবতাদের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে। সাধু উদ্যোগ কখনও বিফলে যায় না, এ হইল ঋষিবাক্য। তিনি নিজের দৃষ্টিতে নিজেই উঠিয়া গেলেন। কৃতজ্ঞতায় পুলকিত হইয়া বলিলেন—দেবি, আপনি তো আমায় কাঁটার উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি জনসাধারণের যেটুকু সেবা করেছি, তা নিজের কর্তব্য বলেই করেছি। আমি বুঝি, এ সম্মান ব্যক্তিগত নয়, সেই উদ্দেশ্যের সম্মান, যার জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করেছি; আমার বিনীত নিবেদন, সভাপতির পদ কোনও প্রতিপত্তিবান লোককে দেওয়া যাক, আমি উচ্চপদে বিশ্বাস করি না—আমি তো সেবক, ও সেবাই করতে চাই।

মিস মালতী কিছুতেই একথা স্বীকার করিতে পারেন না। সভাপতি পণ্ডিতজীকেই হইতে হইবে। শহরে উঁহার মত এত প্রভাবশালী ব্যক্তি আর কাহাকেও দেখা যায় না। যাঁহার কলমে যাদু, ভাষায় যাদু, ব্যক্তিত্বে যাদু, তিনি কি করিয়া বলিতে পারেন যে তিনি প্রভাবশালী নন? যে কালে অর্থ ও প্রতিপত্তির একত্র মিলন ঘটিত, সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন প্রতিভা ও প্রতিপত্তির মিলনের কাল। সম্পাদকজীকে এই পদ লইতেই হইবে। মিস মালতী হইবেন কর্মসচিব। এই সভার জন্য এক হাজার টাকা চাঁদাও উঠিয়াছে, এখনও সারা শহর ও প্রদেশ পড়িয়া আছে। চার পাঁচ লাখ সংগ্রহ করা তো সামান্য কথা।

ওঙ্কারনাথের মনে নেশা চড়িতে লাগিল। তাঁহার মনে যে একপ্রকারের পুলকের মত উঠিতেছিল, তাহা গম্ভীর উত্তর রূপে প্রকাশ পাইল। বলিলেন—কিন্তু এটা আপনি জানবেন মিস মালতী যে এ বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ, আর আপনাকে অনেকটা সময় দিতে হবে। আমি নিজের দিক থেকে নিশ্চয় বলছি যে, সভা-গৃহে আমাকে সব চেয়ে আগে হাজির পাবেন।

মির্জাজী ঘসিয়া মাজিয়া বলিলেন—আপনার সব চেয়ে কঠিন শক্রও এ কথা বলতে পারে না যে আপনি নিজের কর্তব্য সাধনে কখনও কারও পেছনে থাকেন।

মিস মালতী দেখিলেন, কিছু কিছু নেশা ধরিয়াছে, তখন আরও গম্ভীর হইয়া বলিলেন—এই কাজ যে কত বড় যদি আমরা তা না বুঝতাম তা হলে এ সভাও স্থাপিত হত না, আপনিও এর সভাপতি হতেন না। কোনও রাজামহারাজাকে সভাপতি করে আমরা টাকার দিকটা খুব জোগাড় করতে পারি আর সেবার আড়ালে স্বার্থসিদ্ধি করতে পারি; কিন্তু তা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, জনসেবা করা। আর তার সব চেয়ে বড় উপায় হল আপনার কাগজখানি। আমরা স্থির করেছি যে প্রত্যেক নগরে প্রত্যেক গ্রামে ওর প্রচার করা যাবে, আর ওর গ্রাহকসংখ্যা শীগগির বিশহাজার পর্যন্ত ওঠাতে হবে। দেশের সব মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান আমাদের বন্ধু। কয়েকজন চেয়ারম্যান তো এখানেই উপস্থিত আছেন। যদি প্রত্যেকে পাঁচ শ করেও নেন, তা হলে পঁচিশ হাজার পত্রিকা তো আপনার ঠিকই রইল জানবেন। আবার রায়সাহেব ও মির্জা সাহেবের পরামর্শ হোল এই যে, কাউনসিলে এ বিষয়ে এক প্রস্তাব উপস্থিত করা হোক যে প্রত্যেক গাঁয়ের জন্য একখণ্ড 'বিজলী' গবর্ণমেণ্ট থেকে নেওয়া যাক, অথবা বার্ষিক সাহায্য মঞ্জুর করা হোক। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, এ প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবে।

ওঙ্কারনাথ যেন নেশার ঘোরে বলিলেন—আমাদের গভর্ণরের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যেতে হবে।

মিঃ খুরশেদ বলিলেন—জরুর, জরুর!

তাঁকে বলতে হবে যে কোনও সভ্য শাসনতন্ত্রের পক্ষে এটা কতখানি কলঙ্ক ও লজ্জার কথা যে গ্রামোন্নতির একমাত্র মুখপত্র হোলেও 'বিজলী'র অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করা হয় না।

মির্জা খুরশেদ বলিলেন—অবশ্য, অবশ্য!

আমি অহঙ্কার করে বলছি না। অহঙ্কারের সময় এখনও আসে নি; কিন্তু আমার এই দাবি যে, গ্রামসংগঠনের জন্য 'বিজলী' যতখানি উদ্যোগ করেছে…

মিঃ মেহতা ভ্রম সংশোধন করিয়া কহিলেন—না মশাই, বলুন 'তপস্যা'।

মিঃ মেহতাকে ধন্যবাদ, একে তপস্যাই বলা উচিত, ভারি কঠোর তপস্যা। 'বিজলী' যে তপস্যা করেছে, তা এই প্রদেশের নয় শুধু, সমগ্র দেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

মির্জা খুরশেদ বলিলেন—জরুর, জরুর!

মিস মালতী আর একমাত্রা চড়াইলেন—আমাদের সংঘ স্থির করেছে, কাউনসিলে এখন যে যায়গা খালি আছে তার জন্য আপনাকে দাঁড় করাতে হবে। আপনাকে শুধু নিজের সম্মতি জানাতে হবে। আর সব কাজ আমরাই করে নেব। আপনার না করতে হবে কিছু খরচ, না প্রোপাগাণ্ডা, না দৌড়-ধাপ।

ওঙ্কারনাথের চোখের জ্যোতি দ্বিগুণ হইয়া গেল। গর্বমিশ্রিত বিনয়ের ভাবে বলিলেন—আমি আপনাদের সেবক, আমাকে যে কাজে হক নিয়ে নিন।

আমরা আপনার কাছ থেকে এমনি ধারাই আশা করি। এপর্যন্ত আমরা মিথ্যা দেবতার সামনে নাক ঘসটাতে ঘসটাতে হেদিয়ে গেলাম, কিছু পেলাম না। এখন আমরা আপনাকে আমাদের প্রকৃত পথপ্রদর্শক, প্রকৃত গুরু পেয়েছি, আর এই শুভদিনের আনন্দে আজ আমাদের একমন একপ্রাণ হয়ে নিজের অহঙ্কার, নিজের দম্ভে তিলাঞ্জলি দিতে হবে। আজ থেকে আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে কেউ নাই। কেউ শূদ্র নাই, হিন্দু নাই, মুসলমান নাই উচ্চ নাই, নীচ নাই। আমরা সকলে একই মাতার সন্তান, একই কোলে মানুষ হয়েছি, একই থালায় খেয়েছি, সকলেই ভাই-ভাই। যারা ভেদ-ভাবে বিশ্বাস রাখে, যারা পৃথকতা ও কঠোরতায় বিশ্বাস রাখে, আমাদের সভায় তাদের যায়গা নাই। যে সভার সভাপতি পূজ্য ওঙ্কারনাথজীর মত বিশালহৃদয় ব্যক্তি, সে সভায় উঁচু-নীচুর, খাওয়া-দাওয়ার, জাতি-পাঁতির ভেদ হতে পারে না। যে মহানুভব একতায় ও রাষ্ট্রীয়তায় বিশ্বাস করেন না, তিনি কৃপা করে এখান থেকে উঠে যান।

রায়সাহেব আপত্তি তুলিলেন—আমার মতে একতার অর্থ এ নয় যে সকলে খাওয়া দাওয়ার বিচার ছেড়ে দিক। আমি মদ খাই না, তাই বলে কি আমায় এই সভা থেকে বেরিয়ে যেতে হবে?

মালতী নির্মম স্বরে বলিলেন—নিশ্চয় বেরিয়ে যেতে হবে। এই সংঘের মধ্যে থেকে আপনি কোনও প্রকার ভেদ রাখতে পারেন না।

মেহতা ঘড়ায় টোকা দিলেন—আমার সন্দেহ হচ্ছে, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার কোনও গুণ আছে বলে আমাদের সভাপতি নিজেই বিশ্বাস করেন না।

ওঙ্কারনাথের চেহারা ফ্যাকাশে হইয়া গেল। এই বদমায়েসটা কি অসময়েই বিদায়ের শানাই বাজাইয়া দিবে? দুষ্টটা কোথাও লুকান মৃতদেহ খুঁড়িয়া না বাহির করে, তাহা হইলে এ সব সৌভাগ্য স্বপ্নের মত শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

মিস মালতী তাঁহার মুখের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইয়া দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন—আপনার সন্দেহের কোনও ভিত্তি নাই মেহতা মশাই! আপনি কি মনে করেন যে রাষ্ট্রীয় একতার এমন একজন অনন্য উপাসক, এমন ধারা উদারচেতা একজন পুরুষ, এমন একজন রসিক কবি এই নিরর্থক ও লজ্জাকর ভেদ মানা উচিত বলে মনে করেন? এমন ভয় করা তো ওঁর রাষ্ট্রীয় বোধের অপমান করা।

ওঙ্কারনাথের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া গেল। প্রসন্নতা ও সন্তোষের আভা ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল।

মালতী দৃঢ় স্বরে বলিতে লাগিলেন—আর তার চাইতেও বেশি অপমান করা হবে ওঁর পুরুষত্ববোধকে। একজন রমণীর হাত থেকে মদের পেয়ালা পেয়ে এমন কোন ভদ্রলোক আছেন, যিনি অস্বীকার করতে পারেন? এতে তো নারীজাতিরই অপমান করা হবে, সেই নারীজাতির যার নয়নবাণে আপনার হৃদয় বিদ্ধ করবার লালসা পুরুষমাত্রেরই হয়ে থাকে, যার প্রেমালিঙ্গনের জন্য সর্বস্ব খোয়াতে বড় বড় রাজাও লালায়িত হন। আনুন বোতল আর পেয়ালা, চলুক পালা করে সকলের কাছে। এই শুভ মুহূর্তে কোনও প্রকারের সন্দেহ, কোনও প্রকারের আপত্তি রাষ্ট্রদ্রোহের চেয়ে কম নয়। প্রথমে আমরা নিজেদের সভাপতির স্বাস্থ্য পান করি, আসুন।

বরফ, মদ ও পেয়ালা প্রথম হইতেই প্রস্তুত ছিল। মালতী নিজের হাতে ওঙ্কারনাথকে লাল বিষে ভরা গেলাস দিলেন, এবং যাদুভরা দৃষ্টিতে এমন করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন যে তাঁহার সমস্ত নিষ্ঠা, সমস্ত বর্ণাভিমান উবিয়া গেল। মন বলিল, আচার-বিচার সবই অবস্থার দাস। আজ তুমি দরিদ্র, মোটরকার ধূলা উড়াইয়া যাইতেছে দেখিয়া মেজাজ এমনি চটিয়া যায় যে ইচ্ছা করে, পাথর ছুঁড়িয়া ওটা গুঁড়াগুঁড়া করিয়া দাও; কিন্তু তোমার মনে কি 'কারের' জন্য লোভ নাই? অবস্থাই বিধি, আর কোনটিকে বিধি বলিব? বাপ-দাদা মদ খান নাই, না-ই খাইলেন। তাঁহাদের এই সুযোগই বা কখন হইল? পুথিপত্রের

উপর তাঁহাদের জীবিকা নির্ভর করিত। মদ আনিতেন বা কোথা হইতে, আর খাইয়া যাইতেনই বা কোথায়! ওঁরা তো আবার রেলগাড়ি চড়িতেন না, কলের জল খাইতেন না, ইংরেজি পড়া পাপ মনে করিতেন। সময় কতটা বদলাইয়া গিয়াছে। সময়ের সাথে যদি চলিতে না পারি, তো সময় আমাদের পিছনে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে। এমন রমণীর কোমল করে বিষও যদি পাওয়া যায়, তাহাও শিরোধার্য। যে সৌভাগ্যের জন্য বড় বড় রাজা-রাজড়া তৃষ্ণার্ত, সেই সৌভাগ্য আজ সামনে উপস্থিত। ইহা কি পায়ে ঠেলা উচিত?

সভাপতি গ্লাস গ্রহণ করিলেন এবং মাথা হেলাইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক এক নিশ্বাসে তাহা খাইয়া ফেলিলেন, তখন গর্বভরা দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকাইতে লাগিলেন, যেন বলিতে চান যে এখন তো আমার উপর বিশ্বাস হইল! আপনারা কি মনে করেন যে, আমি একেবারে নিরেট ব্রাহ্মণপণ্ডিত? এখন তো আর আমাকে আপনারা অহঙ্কারী ও পাষণ্ড বলিতে সাহস করিবেন না?

হলের ভিতর এত শোরগোল হইতে লাগিল যে কিছু আর জিজ্ঞাসার যো নাই, যেন বাক্সজাত অট্টহাস্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাঃ দেবী! কিছু আর বলবার নেই। বাহাদুর বটে মিস মালতী, বাহাদুর মেয়ে! দিয়েছে ভেঙ্গে, নুন আইন ভেঙ্গেছে, ধর্মের কেল্লা ভেঙ্গেছে, নিয়মের ঘড়া দিয়েছে চুরমার করে!

যাই ওঙ্কারনাথের গলার নীচে মদ গিয়া পৌঁছিল অমনি তাঁহার রসিকতা মুখর হইল। হাসিয়া বলিলেন—আমি নিজের ধর্মের সঞ্চয় মিস মালতীর কোমল হাতে সঁপে দিলাম, আমার বিশ্বাস তিনি সে ভাণ্ডার যথোচিত রক্ষা করবেন। ওঁর চরণকমলের এই প্রসাদের জন্য আমি এমনি এক হাজার ধর্ম উপহার দিতে পারি।

অট্টহাস্যে হলঘর গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল।

সম্পাদক মহাশয়ের চেহারা ফুলিয়া গেল, চোখ ঝুঁকিয়া পড়িল। আর এক গ্লাস ভরিয়া বলিলেন—এ হল মিস মালতীর স্বাস্থ্য পান। আপনারা পান করুন আর ওঁর শুভকামনা করুন সঙ্গে সঙ্গে।

সকলে আবার নিজের নিজের গ্লাস শূন্য করিয়া দিলেন।

এই সময় মির্জা খুরশেদ একটি মালা আনিয়া সম্পাদকের গলায় দিলেন আর বলিলেন—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অধম সেবক এখনি আপনাদের পূজনীয়

সভাপতির মহিমার ওপর এক শ্লোক বলছেন। আপনাদের অনুমতি পেলে শুনিয়ে দিই।

চারদিক হইতে শব্দ আসিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্য শুনিয়ে দিন।

ওঙ্কারনাথ ভাঙ্গ তো আগে খাইতেন, তাঁহার মাথা উহাতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু মদ্য পান করিবার সুযোগ তাঁহার এই প্রথম। ভাং-এর নেশা মন্থর গতিতে আসিত এক স্বপ্নের মত, আর মাথার মধ্যে মেঘের সমান ছাইয়া যাইত। তাঁহার চেতনা ঠিক থাকিত। তিনি নিজেই টের পাইতেন, এই সময়ে তাঁহার ভাষা খুব গোলমেলে হইয়া পড়িত, আর কল্পনা খুব প্রবল হইত। মদের নেশা তাঁহার উপর সিংহের মত প্রচণ্ড আক্রমণ করিল, আর পাইয়া বসিল। তিনি কহিলেন এক, মুখ হইতে বাহির হইল অন্য জিনিস। এ জ্ঞানটুকুও চলিয়া যাইতেছিল। তিনি যে কি বলিতেছেন আর কি করিতেছেন, তাহার বোধশোধও থাকিল না। এই স্বপ্নে রঙ্গীন বৈচিত্র্য নাই, জাগরণের এক ভ্রম মাত্র থাকিল, তাহাতে সাকার নিরাকার ভেদ থাকে না।

জানি না কেন তাঁহার মস্তিষ্কে এই কল্পনা জাগিয়া উঠিল যে কবিতা পড়া খুব অনুচিত। টেবিলের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—না, কথ্‌খনো না। এখানে কোনও কবিতা অবে না, অবে না। আমি সবাপতি। আমার হুকুম। আমি এখনি এ সবা বেঙ্গে ফেলতে পারি। এখনি বাঙ্গতে পারি। সবাইকে বের করে দিতে পারি। কেউ আমার কিছু করতে পারবে না। আমি সবাপতি। আর কেউ সবাপতি নয়।

মির্জা জোড় হাত করিয়া বলিলেন—হুজুর, এ কবিতায় তো আপনার তারিফ করা হয়েছে।

সম্পাদক মহাশয় লাল অথচ নিষ্প্রভ নেত্রে তাকাইয়া দেখিলেন—তুমি আমার তারিব করলে কেন? কেন করলে? বল, কেন আমার তারিব করলে? আমি কারো চাকর নই। কারো বাপের চাকর নই, কোনো শালারটা খাই না। আমি খোদ সম্পাদক। আমি বিজলীর সম্পাদক। আমি বিজলীতে সকলের তারিব করবো। দেবী, আমি তোমার তারিব করবো না। আমি এমন কিছু বড়লোক নই। আমি সকলের গোলাম। আমি সকলের গোলাম। আমি আপনাদের চরণের ধূলো। মালতী দেবী আমার লক্ষ্মী, আমার সরস্বতী, আমার রাধা……

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি মালতীর পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন আর মুখ গুঁজিয়া মাটিতে পড়িলেন। মির্জা খুরশেদ ছুটিয়া আসিয়া সামলাইয়া লইলেন, আর চেয়ার হটাইয়া তাঁহাকে ঐখানেই শোওয়াইয়া দিলেন। তারপর তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন—রাম-রাম সত্ত হ্যায়। বলেন তো আপনার পৈতেটা বের করে নিই।

রায়সাহেব বলিলেন—কাল দেখবেন কতখানি মেজাজ বিগড়ে যায়। এক এক জনকে নিজের কাগজে একহাত নেবেন আর এমনি রগড়ে দেবেন যে আপনারাও বুঝবেন। একে তো লোক খারাপ, কারো ওপর বিবেচনা নাই; লেখায় নিজের কোনও আগল রাখে না। এমন-ধারা গাধা কি করে এত ভাল লিখতে পারে, সেইটেই আশ্চর্য।

কয়েকজন ধরাধরি করিয়া সম্পাদক মহাশয়কে উঠাইয়া তাঁহার ঘরে শোওয়াইয়া দিল। ওদিকে প্যাণ্ডালে ধনুর্যজ্ঞ শুরু হইয়া গিয়াছিল। কয়েকবার ইঁহাদের ডাকার জন্য লোক আসিয়াছিল; কতক কতক সম্ভ্রান্ত লোক প্যাণ্ডালে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। সকলে যাইবার জন্য প্রস্তুত এমন সময় সহসা এক আফগানের আবির্ভাব। গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, দীর্ঘ গঠন, চোখে নির্ভয়তার উন্মাদনা ভরা, ঢিলা পায়জামা, পরণে শালোয়ার, জরির কাজকরা ফতুয়া, মাথায় পাগড়ি আর 'কুলা', কাঁধ হইতে চামড়ার ব্যাগ ঝোলানো, কাঁধে বন্দুক আর কোমরে তলোয়ার বাঁধা, কে জানে কোথা হইতে আসিয়া দাঁড়াইল, আর গর্জন করিয়া বলিল—খবরদার! কেউ এখান থেকে যেও না। আমার সাথীদের ওপর ডাকাত পড়েছে। এখানকার যে সরদার সেই আমার লোকজনের জিনিসপত্র লুটে নিয়েছে, তাদের জিনিসপত্র তোমাদের দিতে হবে। এক এক কড়ি পর্যন্ত দিতে হবে। কোথায় সরদার, বোলাও উস্‌কো।

রায়সাহেব সামনে আসিয়া রাগত স্বরে কহিলেন—লুট কেমন! ডাকাতি কেমন? এ তোমাদের কাজ। এখানকার কোনও লোক কারু লুটেপুটে নেয় না। সাফ সাফ বল তো, মতলবখানা কি?

আফগান চক্ষু কটমট করিয়া বন্দুকের কুঁদা মাটিতে ঠুকিয়া বলিল—আমায় জিজ্ঞাসা করছ, কেমন লুট, কেমন ডাকাতি? তোমরা লুটছ, তোমাদের আদমিরা লুটছে। আমি এখানকার কুঠির মালিক। আমার কুঠিতে পাঁচিশ জন জোয়ান আছে। আমার আদমি টাকা আদায় করে আনছিল। এক

হাজার। ও তোমরা লুটে নিয়েছ, আর বলছ—ডাকাতি কেমন? আমি বুঝিয়ে দেব, কেমন ডাকাতি। আমার পঁচিশজন জোয়ান এখুনি আসছে। আমি তোমাদের গাঁ লুটে নেব। কোন শালা কিচ্ছু করতে পারবে না, কিচ্ছু করতে পারবে না।

খান্না আফগানের লক্ষ্য দেখিয়া চুপচাপ উঠিয়া বাহিরে যাইতে চাহিলেন। সরদার জোরে ধমক দিল—কাঁ জাতা তুম? কেউ কোথাও যেতে পারবে না। না হলে আমি সব্বাইকে কোতল করে দেব। এখখুনি 'ফায়ার' করে দেব। আমায় তোমরা কিছু করতে পারবে না। আমি তোমাঁদের পুলিশকে ডরাই না। পুলিশের আদমি আমাদের দেখে সব ভেগে যায়। আমাদের নিজেদের কাউনসিল আছে, তাদের 'খৎ' নিয়ে লাটসাহেবের কাছেও যেতে পারি। 'অম ইয়ঁাসে কিসীকো নইঁ জানে দেগা।' তোমরা আমাদের এক হাজার টাকা লুট করে নিয়েছ। আমার টাকা না দিলে আমি কাউকেই জ্যান্ত রাখব না। তোমরা সব অন্যের মালপত্তর লুট কর আর এই প্রেমাস্পদের সঙ্গে বসে মদ খাও।

মিস মালতী তাহার চোখ এড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়, এমন সময় বাজপাখীর মত ছুটিয়া সে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল ও বলিল—তুমি এই সব বদমায়েসের কাছ থেকে আমার জিনিসপত্র দিয়ে দাও, নয় তো আমি তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাব আর নিজের কুঠিতে আটক করে রাখব। তোমার রূপ দেখে আমি প্রেমে পড়ে গেছি। এরা হয় আমায় এখ্‌খুনি এক হাজার টাকা দিয়ে দিক, নয় তো তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। তোমাকে আমি ছাড়বো না। আমি তোমার প্রেমে পড়েছি, আমার মন প্রাণ বিদীর্ণ হচ্ছে। এখানে আমার পঁচিশ জন জোয়ান আছে। এ জেলায় আমার পাঁচশ জন জোয়ান কাজ করছে। আমার জাতের খাঁ হচ্ছি আমি। আমার জাতে দশ হাজার সিপাই আছে। কাবুলের আমীরের সঙ্গে আমি লড়তে পারি। ইংরেজ সরকার আমায় বছরে বছরে বিশ হাজার টাকা কর দেয়। তোমরা যদি আমায় টাকা না দেও, তবে আমি গাঁ লুঠ করব আর তোমাদের প্রেমাস্পদকে উঠিয়ে নিয়ে যাব। খুন করতে আমাদের ফুরতি লাগে। রক্তের নদী বইয়ে দেব।

মজলিসে আতঙ্কের ছায়া পড়িল। মিস মালতী নিজের কাকলী ভুলিয়া

গেলেন। খান্নার শরীর কাঁপিতেছিল। বেচারি দৈবক্রমে আঘাতের ভয়ে একতলা বাংলোতে থাকেন; জিনে চড়া তাঁর পক্ষে শূলে চড়ার চেয়ে কম নয়; গ্রীষ্মকালেও ভয়ের চোটে ঘরেই শুইয়া থাকেন। রায়সাহেবের প্রভুত্ব অভিমান ছিল। তিনি নিজেরই গাঁয়ে এক পাঠানের কাছে ভয় পাওয়া হাস্যকর মনে করিতেছিলেন; কিন্তু উহার বন্দুককে কি করা যাইবে! উনি একটু খুটখাট করিলেই লোকটা বন্দুক চালাইবে। এ সবই তো হুঁশ হইতেছে, আর লক্ষ্যও এদের সব কতকটা অভ্রান্ত: লোকটার হাতে যদি বন্দুক না থাকিত, তাহা হইলে রায়সাহেব তাহার সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি করিতেও তৈয়ারি হইতেন। মুস্কিলের কথা যে দুষ্ট কাহাকেও বাহিরে যাইতে দিতেছে না। না হইলে এক নিশ্বাসে সারা গাঁ একত্র হইয়া যাইত আর এর সমস্ত দলকে পিটাইয়া ঠিক করিত।

অবশেষে মন স্থির করিয়া তিনি প্রাণ লইয়া খেলিতে খেলিতে বলিলেন—আমি আপনাকে বলেছি, আমরা চোর-ডাকাত নই। আমি এখানকার কাউনসিলের মেম্বর, আর এই মহিলাটি লখনৌ-এর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার। এখানে যাঁরা যাঁরা এসেছেন সকলেই মানী ও বড়ঘরের লোক। আপনার লোকদের টাকাকড়ি কারা লুঠে নিয়েছে তা আমরা মোটেই জানি না। আপনি গিয়ে থানায় রিপোর্ট করুন।

খাঁ সাহেব মাটির উপর পা ঠুকিয়া পায়তাড়া কসিল, বন্দুক কাঁধ হইতে নামাইয়া হাতে লইতে লইতে গর্জন করিল—বক বক কোরো না। কাউনসিলের মেম্বরকে আমি এমনি করে পায়ে গুঁড়ো করি। (মাটিতে পা ঘসিতে ঘসিতে) আমার হাত মজবুৎ, আমার মন মজবুৎ, আমি খোদাতালা ছাড়া আর কাউকেই ভয় করি না। তোমরা আমার টাকা দেবে না, তা হলে আমি (রায়সাহেবের দিকে ইসারা করিয়া) এখ্‌খুনি তোমাদের কোতল করব।

বন্দুকের নালী দুইটি তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়াছে দেখিয়া রায়সাহেব ঝুঁকিয়া টেবিলের সামনে আসিলেন। নিতান্ত বেঘোরে প্রাণটা গেল; শয়তানটা জোরগলায় বলিয়া যাইতেছে, তোমরা আমার টাকা লুটিয়া নিয়াছ। না কিছু শোনে, না কিছু বোঝে, না কাউকে বাহিরে আসিতে যাইতে দেয়। চাকর-বাকর, সিপাই-পেয়াদা, সকলে ধনুর্যজ্ঞ দেখিতে মগ্ন। জমীদারের চাকর তো অলস হয়, কাজে ফাঁকি দেয়, দশবার না ডাকিলে সাড়াই দেয় না; আর এখন

তো উহারা এক শুভ কর্মে ব্যস্ত আছে। ধনুর্যজ্ঞ তাহাদের কাছে তামাসা নয়, ভগবানের লীলাও বটে, যদি একটা লোকও এদিকে আসিত, তাহা হইলে সিপাইয়েরা খবর পাইত আর এক মুহূর্তে খাঁ সাহেবের সব খাঁ-গিরি বাহির হইত, দাড়ির এক এক গাছা উপড়াইয়া ফেলিত। লোকটার রাগ কি! জল্লাদ তো বটেই, না আছে মরণের দুঃখ, না আছে বাঁচার সুখ।

মির্জা সাহেবকে ইংরেজিতে বলিলেন—এখন কি করা যায়?

মির্জা সাহেব চকিত দৃষ্টিতে দেখিলেন—কি বলি, কোনও বুদ্ধি জোগাচ্ছে না। আমি আজ নিজের পিস্তলটা ঘরে রেখে এসেছি, নইলে মজা বুঝিয়ে দিতাম।

খান্না কাঁদ কাঁদ মুখে বলিলেন—কিছু টাকা দিয়ে কোনও রকমে এই গুণ্ডাটাকে সরিয়ে দিন।

রায়সাহেব মালতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, আপনি কি পরামর্শ দেন?

মালতীর মুখে একটা থম-থমা ভাব; বলিলেন—কি আর হবে, আমার এতখানি বে-ইজ্জতি হচ্ছে, আর আপনারা বসে বসে দেখছেন! বিশজন পুরুষ থাকা সত্ত্বেও একটা গোঁয়ার পাঠান আমার এতখানি দুর্গতি করছে! আর আপনাদের রক্ত একটু গরম হচ্ছে না। প্রাণ আপনাদের কাছে এতই প্রিয়? একজন কেউ বাইরে গিয়ে হাঁক-ডাক করছেন না কেন? আপনারা লাফিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিচ্ছেন না কেন? বন্দুক তো চালাবে? চালাতে দিন। দুই এক জনের প্রাণই তো যাবে? যাক।

কিন্তু মালতী মৃত্যু যত সহজ মনে করিতেছিলেন, অন্য লোকেরা তেমন মনে করিতেছিল না। কেহ যদি বাহিরে যাইতে সাহস করে আর পাঠান যদি রাগে দশ-পাঁচটা ফায়ার করিয়া দেয়, তবে এখানে সব সাফ হইয়া যাইবে! অনেক কিছু হইবে, পুলিশ উহাকে ফাঁসি দিবে। তারই বা ঠিক কি! এক বড় জাতের সরদার, তাহাকে ফাঁসি দিতে সরকারও বিচার-বিতর্ক করিবে; উপর হইতে চাপ আসিবে। রাজনীতির সামনে ন্যায়ের কথা কে জিজ্ঞাসা করে? আমাদের উপর যদি উলটিয়া মোকদ্দমা দায়ের হয় আর পিটুনি পুলিশ বসে, তাহা হইলেও আশ্চর্যের কিছু নাই; কত ফুর্তি, কত হাসি হুল্লোড় হইতেছিল। নাটক দেখার আনন্দ এতক্ষণ উপভোগ করা যাইত—এই শয়তানটা আসিয়া এক নূতন বিপদ খাড়া করিল, মনে হইতেছে, দুই একজনকে খুন না করিয়া ঠাণ্ডা হইবে না।

খান্না মালতীকে ঠেস দিয়া কথা কহিলেন—মালতী দেবী, আপনি তো আমাদের সম্বন্ধে জেনে রেখেছেন যে পুরুষের প্রাণরক্ষা করা একটা পাপ। প্রাণের মায়া প্রাণীমাত্রেরই থাকে, আমাদের মধ্যেও আছে—সেটা কিছু লজ্জার কথা নয়। আপনি আমাদের প্রাণ এতটা সস্তা মনে করেন, এটা দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে। এক হাজার টাকারই তো মামলা। আপনার কাছে অমনি পাওয়া এক হাজার টাকা আছে, সেইটে দিয়ে বিদায় করতে পারেন না? আপনি নিজেই নিজের অপমান করছেন, আমাদের দোষ কি?

রায়সাহেব গরম হইয়া বলিলেন—মালতী দেবীকে যদি ও ছোঁয়, তাহলে আমার লাশ এখানে পড়ে থাকে তাও স্বীকার, আমি ওকে একবার দেখে নেব। ও মানুষ তো বটে।

মির্জা সাহেব সন্দেহাকুল চিত্তে মাথা দোলাইয়া বলিলেন—রায়সাহেব, আপনি এখনও এদের মেজাজ জানেন না, এ যদি ফায়ার করতে শুরু করে, তাহলে কাউকে আর জ্যান্ত রাখবে না। এদের লক্ষ্য বড় ভীষণ।

মিঃ তন্‌খা বেচারী আগামী নির্বাচন সমস্যা দেখাইতে ও বুঝাইতে আসিয়াছিলেন; দশ-পাঁচ হাজারের ব্যবস্থা করিয়া তিনি ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এখানে তো জীবনই সংকটাপন্ন। বলিলেন—সব চাইতে সরল উপায়, ঐ যা খান্নাজী বললেন এখন। এক হাজার টাকারই তো কথা, আর সে টাকাও মজুদ, তবে আপনারা এত ভাবনা-চিন্তা করছেন কেন?

মিস মালতী তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে তন্‌খার দিকে তাকাইলেন।

আপনারা এমন কাপুরুষ, তা জানতাম না।

আমিও জানতাম না যে আপনি টাকাটা এত ভালবাসেন, আর যে টাকাটা অমনি এসেছে!

আপনারা যখন আমার অপমান স্বচক্ষে দেখতে পারেন, তখন নিজের বাড়ির মেয়েদের অপমানও দেখতে পারেন।

আপনিও পয়সার জন্য নিজের বাড়ির পুরুষদের বলি দিতে সঙ্কোচ করবেন না।

খাঁ এতক্ষণ পর্যন্ত যেন হতভম্ব হইয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল। হঠাৎ গর্জিয়া উঠিল—আর আমি মানব না। এতক্ষণ এখানে খাড়া আছি। তোমরা কোনও জবাব দিচ্ছ না। (পকেট হইতে হুইশিল বাহির করিয়া) এখন

তোমাদের আর এক লহমা সময় দিচ্ছি ; তোমরা যদি টাকা না দেও তবে আমি হুইশিল বাজাব, আর আমার পঁচিশজন জোয়ান এখানে এসে যাবে। ব্যস।

আঁখিতে প্রেমের জ্বালা ভরিয়া পাঠান মিস মালতীকে দেখিল—

তুমি আমার সঙ্গে চল পিয়ারী! আমি তোমার অনুগত হয়ে থাকব। আমার প্রাণ রেখে দেব তোমার পায়ের উপর। এতগুলি লোক তোমার প্রেমিক ; কিন্তু যথার্থ প্রেমিক এরা কেউ নয়। সত্যিকার প্রেম যে কি, তা আমি দেখিয়ে দেব। তোমার ইসারা পেলেই আমি নিজের বুকে খড়্গ ঢুকিয়ে দিতে পারি।

মির্জা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিলেন—মালতী দেবী, খোদার দোহাই। এই লোকটাকে টাকা দিয়ে দিন।

খান্না জোড়হাতে প্রার্থনা করিলেন—আমাদের ওপর দয়া কর মিস মালতী!

রায়সাহেব রাগ করিয়া বলিলেন—কখনও না। আজ যা কিছু হবার, হতে দিন। হয় আমি নিজে মরে যাব, নয় তো এই মূর্খটাকে চিরকালের জন্য শিক্ষা দিয়ে দেব।

তন্‌খা রায়সাহেবকে ধমক দিয়া কহিলেন—বাঘের গর্তে ঢোকা কিছু বাহাদুরি না ; আমি মনে করি সেটা মূর্খতা।

কিন্তু মিস মালতীর মনের ভাব ছিল অন্য রকম। খাঁ-এর লালসা-প্রদীপ্ত চক্ষু তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল, আর এখন এই ব্যাপারে তাঁহার আগ্রহের আনন্দ দেখা দিতেছিল। এই সব নরপুঙ্গবের মধ্যে কিছুকাল কাটাইয়া তাঁহার হৃদয় বর্বরদের প্রেমের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিল। সভ্য ভব্য শিষ্ট প্রেমের দুর্বলতা ও নির্জীবতা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। আজ এই 'আকাট' মূর্খ পাঠানের উন্মত্ত প্রেমের জন্য তাঁহার মন ছুটিতেছিল, যেমন সঙ্গীতের আনন্দ আস্বাদ করিবার পর পাগলা হাতীর লড়াই দেখিবার জন্য কেহ দৌড়ায়।

খাঁ সাহেবের সামনে আসিয়া তিনি নির্ভয়ে বলিলেন—তুমি টাকা পাবে না।

খাঁ হাত বাড়াইয়া কহিল—তবে আমি তোমাকে লুটে নিয়ে যাব।

এত লোকের মধ্যে থেকে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

আমি তোমায় এক হাজার লোকের মাঝখান থেকে নিয়ে যেতে পারি।

তোমাকে প্রাণটা এখানে রেখে যেতে হবে।

প্রেমাস্পদের জন্য আমার শরীরকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারি।

সে মালতীর হাত ধরিয়া টানিল। ঠিক তখনই হরি সে কক্ষে প্রবেশ করিল। সে সাজিয়াছিল রাজা জনকের মালী, আর তাহার অভিনয়ে গ্রামের লোকেরা হাসিতে হাসিতে মাটিতে গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে ভাবিল, কর্তা কেন এখনও আসিলেন না? উনিও তো আসিয়া দেখিবেন, গাঁয়ের লোক কতটা পারে। তাঁহার ইয়ারবন্ধুরাও আসিয়া দেখুন! কর্তাকে কি করিয়া ডাকিয়া আনা যায়? সে সুযোগ খুঁজিতেছিল, একটু অবকাশ পাইবা-মাত্র ছুটিয়া এখানে আসিয়াছিল; কিন্তু এখানকার এই দৃশ্য দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গেল, তাহার যেন মাথা ঘুরিতেছে এমন অবস্থা। সকলে চুপ-চাপ করিয়া বসিয়াছিল, থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, খাঁর প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ, আর খাঁ মালতীকে নিজের দিকে টানিতেছিল। সহজ বুদ্ধিতে সে অবস্থাটি অনুমান করিয়া লইল। সেই সময়ে রায়সাহেব ডাকিয়া উঠিলেন—হরি, দৌড়ে যা, সিপাইদের ডেকে আন, জলদি দৌড়!

হরি মুখ ফিরাইতেই খাঁ তাহার সামনে বন্দুক ধরিয়া ধমক দিল—কোথায় যাস শূয়র, গুলি করব।

হরি ছিল গ্রাম্য লোক। লাল পাগড়ী দেখিলে তাহার প্রাণ বাহির হইত; কিন্তু পাগলা ষাঁড়ের উপর লাঠি লইয়া লাফাইয়া পড়িত। সে কাপুরুষ ছিল না, মরিতেও পারিত, মারিতেও জানিত। কিন্তু পুলিশের হাতকড়ির সামনে তাহার পা চলিত না। বন্দী অবস্থায় কে ঘুরিবে, ঘুষের টাকা জোগাইবে কোথা হইতে, ছেলে-পুলেদের রাখিবে কাহার আশ্রয়ে; কিন্তু প্রভু ডাকিতেছেন, তবে আর ভয় কাহাকে? তবে তো সে মৃত্যুর মুখেও লাফাইয়া পড়িতে পারে।

সে ঝাঁ করিয়া খাঁ সাহেবের কোমর জড়াইয়া ধরিল এবং এমন প্যাঁচ মারিল যে খাঁ উলটিয়া মাটিতে আসিয়া চিৎ হইয়া পড়িল, আর লাগিল পুস্তু ভাষায় গালি দিতে। হরি তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিল আর দাড়িতে জোরে মারিল এক টান। দাড়ি তাহার হাতে আসিয়া গেল। খাঁ চট্ করিয়া তাহার 'কুলা' খুলিয়া ফেলিল ও জোর করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। ওরে! এতো মিঃ মেহতা! বাঃ!

চারদিক হইতে লোকজন আসিয়া মেহতাকে ঘিরিল। কেহ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল, কেহ পিঠ চাপড়াইতে লাগিল; মিঃ মেহতার মুখে কিন্তু হাসি

বা গর্ব কোনও ভাবই প্রকাশ পাইল না; তিনি চুপ চাপ দাঁড়াইয়া রহিলেন—যেন কিছুই হয় নাই।

মালতী কৃত্রিম রোষে কহিলেন—আপনি এই বহুরূপীর বিদ্যা কোথায় শিখলেন, আমার বুক এখনও ধড়ফড় করছে যে!

মেহতা মুচকি হাসিয়া বলিলেন—এই সব ভদ্রলোকদের সাহসের পরীক্ষা নিচ্ছিলাম। যা অপরাধ হয়েছে ক্ষমা করবেন।

৭

এদিকে এই অভিনয় শেষ হইল, ওদিকে রঙ্গালয়েও ধনুর্যজ্ঞ শেষ হইয়া সামাজিক একটা প্রহসনের আয়োজন চলিতেছিল, কিন্তু উহাতে ইহাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কেবল মিস্টার মেহতা দেখিতে গিয়াছিলেন, আর গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত ছিলেন। দেখিতে দেখিতে খুব জমিয়া গিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে হাততালি দিয়া, "আবার, আবার" বলিয়া অভিনেতাদের উৎসাহ দিতেছিলেন। রায়সাহেব এই প্রহসনের অভিনয়ে এক মামলাবাজ দেহাতি জমিদারের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নামে প্রহসন, কিন্তু কাহিনীটি করুণ। নায়কের কথায় কথায় আইনের ধারা উল্লেখ করা, রান্না করিতে দেরি হওয়ার জন্য স্ত্রীর উপর মামলা দায়ের করা, উকিলের হায়রানি, গ্রাম্য সাক্ষীদের চালাকি আর ফুসলানি; প্রথম সাক্ষী হবার জন্য চট্‌পট তৈয়ার হওয়া, আবার এজলাসে তলব হইলে নানা প্রশ্নে বেকুব বনিয়া যাওয়া, নানা রূপ দৃশ্য দেখিয়া লোকে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল সেই দৃশ্যটি যেখানে ছিল বিচারের প্রহসন। সাক্ষীর বার বার ভুল হওয়া, উকিলের রাগ, তারপর গ্রাম্য ভাষায় নায়কের সাক্ষীকে বোঝান, অবশেষে এজলাসে যাইবার সময় সাক্ষী বদলাইয়া যাওয়া—এসব এত জীবন্ত অভিনয় হইয়াছিল যে মিঃ মেহতা মহা খুসী হইয়া নায়ককে জড়াইয়া ধরিলেন, আর প্রত্যেক অভিনেতাকে পদক দিবেন ঘোষণা করিলেন। রায়সাহেবের প্রতি তাঁহার মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। রায়সাহেব রঙ্গমঞ্চের পিছনে থাকিয়া অভিনয় পরিচালনা করিতেছিলেন। মেহতা ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, আর মুগ্ধভাবে বলিলেন—চারদিকে আপনার এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এ আমার জানা ছিল না।

পরের দিন জলযোগের পরে শিকারের পালা ছিল। ওখানেই কোন নদীর ধারে বাগানে খাওয়া দাওয়া হইবে, নদীতে মহা উৎসাহে জলক্রীড়া হইবে, তার পর সন্ধ্যা বেলা ঘরে ফিরিবার পালা। একদিন পুরাপুরি কৃষক জীবনের আনন্দ উপভোগ করা যাইবে। যাহাদের কাজ ছিল তাহারা বিদায় নিল, রায়-সাহেবের সঙ্গে যাহাদের ঘনিষ্ঠতা তাহারাই কেবল বসিয়া রহিল। মিসেস খান্নার মাথা ব্যথা, তিনি যাইতে পারেন নাই, আর পণ্ডিতজী এই দলটির উপর এত বিরক্ত হইয়াছিলেন, ইহাদের বিরুদ্ধে একটি কড়া লিখন লিখিয়া ইহাদিগকে সাজা দিবার কথা ভাবিতেছিলেন। সব ফন্দিবাজ, সব গুণ্ডা। ঘরের পয়সায় খায়, আর গোঁফে তা দিয়া বেড়ায়। দুনিয়ায় কি হইতেছে কোন খবরই ইহারা রাখে না। পাড়ায় কে মরিয়া রহিল, তাহারও খবর ইহারা রাখে না। ইহাদের নিজের নিজের ভোগবিলাস হইলেই হইল। এই যে মেহতা, ফিলসফারের মত ঘুরিয়া বেড়ায়—উহার মুখের বুলি হইল, 'জীবনকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাও।' আরে, মাসে মাসে হাজার টাকা মাহিনা পাও, তোমার মুখেই সাজে জীবনকে এই কর, সেই কর। কিন্তু রুগ্ন স্ত্রীর ওষুধ কি করিয়া কিনিব, বাড়ি ভাড়া কোথা হতে দিব, ছেলের বিবাহ কি করিয়া দিব, এই সব ভাবনায় যাহার শরীর ক্ষয় হইতে চলিয়াছে, জীবনের সাধনার কথা সে কেমন করিয়া ভাবিবে? খোদার ষাঁড়ের বেশে ইহার উহার ক্ষেতে ঢুঁ মারিয়া বেড়ায়, আর মনে করে জগতে সকলেই বুঝি সুখী। তোমাদের চোখ খুলিবে যখন প্রলয় কাল আসিবে, আর তোমাদের বলা হইবে, যাও ক্ষেতে গিয়া হাল চাষ কর। তখন দেখা যাইবে, কেমন তোমাদের জীবনের পরিপূর্ণতার সাধনা। আর ঐ যে মালতী, বাহাত্তর ঘাটের জল খাইয়া আজও কুমারী—বিবাহ করিবে না, কারণ বিবাহ একটা বন্ধন, আর বন্ধন থাকিলে জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয় না! যেন সারা দুনিয়া লুটিয়া বেড়াইলে ও নির্ঝঞ্ঝাটে আরাম ভোগ করিলেই জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয়! সমস্ত বন্ধন ছিন্ন কর, ধর্ম আর সমাজের বুকে ছুরি চালাও, কর্তব্যের ত্রিসীমানায় যাইও না—ব্যস, তবেই জীবন সার্থক হইবে। ইহার চেয়ে সহজ আর কি আছে? মাবাপের সঙ্গে বনিবনাও হইতেছে না, দাও উহাদের পৃথক করিয়া; বিবাহ করিও না, সন্তান হইলে বন্ধন বাড়িবে; এই সকল মোহপাশ। আচ্ছা, তবে ট্যাক্স কেন দাও, আইনও তো বন্ধন, উহা কেন ভাঙ্গ না? উহাকে

কেন ফাঁকি দিবার ছল খোঁজ? জান না কি যে, সামান্য আইন ভঙ্গ করিলেও হাতে বেড়ি পড়িবে? যাতে নিজের ভোগলিপ্সা বাধা না পায় তোমরা সেই সব বন্ধনই কাটাইতে চাও। দড়ি দিয়া সাপ তৈরি করিয়া বধ কর, আর মনে কর মস্ত বীর হইয়াছ। কেন, জ্যান্ত সাপের কাছে যাও দেখি। সাপের হিস্ হিস শব্দ শুনিলেই তো চোখের জলের বন্যা ছুটিবে। উহাকে আসিতে দেখিলেই তো ল্যাজ নীচু করিয়া ছুটিয়া পালাইবে। এই তো তোমাদের সফল জীবন!

আটটার সময় শিকার পার্টি রওয়ানা হইল। খান্না তো আগে কখনো শিকার করেন নাই, বন্দুকের শব্দেই তাঁহার বুক কাঁপে; কিন্তু মিস মালতী যাইতেছেন, উনি কি করিয়া বাসায় থাকেন? মিঃ তন্‌খার এখন পর্যন্ত ইলেক্‌শনের বিষয় কথাবার্তা বলার সময় হইল না; হয়তো ওখানে গেলে সেই সুযোগ মিলিতে পারে। রায়সাহেব তাঁহার এই মহল্লায় অনেক দিন যান নাই; ওখানকার অবস্থা একবার দেখিতে চান। মাঝে মাঝে মহালে যাওয়া আসা করিলে লোকজনের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ গড়িয়া ওঠে আর প্রতিপত্তি বাড়ে, নায়েব আর পেয়াদাও সজাগ থাকে। মির্জা খুরশেদেরও সখ, জীবনে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে, বিশেষ যেসব ব্যাপারে সাহসের দরকার। মিস মালতী একা কি করিয়া থাকিবেন? উঁহার তো পিছনে পিছনে ভক্তের দল চাই। একমাত্র মিঃ মেহতাই শুধু শিকারের জন্য চলিয়াছেন। রায়সাহেবের ইচ্ছা ছিল খাবারের জিনিসপত্র, রাঁধিবার লোক-জন, বাসনপত্র, চাকরবাকর সব সঙ্গে সঙ্গে চলে, কিন্তু মিঃ মেহতা বিরোধী হইলেন।

খান্না বলিলেন, শেষ পর্যন্ত খাওয়া জুটবে তো, না, ওখানে গিয়ে খিদেয় মরব?

মেহতা বলিলেন—কেন খাওয়া হবে না? তবে আজ কিন্তু আমরা সব কাজ নিজেরা করব। চাকর বামুন না হলেও যে আমরা বেঁচে থাকতে পারি, একদিন দেখিয়ে দেওয়া যাক্। মিস মালতী রাঁধবেন, আমরা খাব। গ্রামের কৃষকদের কাছে হাঁড়ি কুড়ি নিশ্চয় পাওয়া যাবে, কাঠের তো ভাবনাই নেই। আর আমরা শিকার করে আনবো।

মালতী হাসিয়া বলিলেন—ক্ষমা কোরবেন। আপনি কাল রাতে আমার কব্জি এত জোরে ধরেছিলেন, এখন পর্যন্ত ভীষণ ব্যথা।

আচ্ছা, কাজ তো সব আমরাই করে দেব, আপনি শুধু বলে দেবেন।

মির্জা খুরশেদ বলিলেন—আমি বলি, আজ এক মজা কোরলে হয়। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব। কথা হোচ্ছে, কি রকম ব্যবস্থা হবে? জঙ্গলের মধ্যে হাঁড়ি-পাতিল, থালা-বাসন খোঁজা বৃথা। শুনুন, হরিণ শিকার করে আনুন, তাই পুড়িয়ে খাওয়া যাক, আর তার পর ওখানেই গাছের ছায়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে নিন।

এই প্রস্তাবে সকলেই রাজী হইল। দুখানা মোটরে সকলে রওনা হইল। একখানা চালাইলেন মিস মালতী, অন্যখানা স্বয়ং রায়সাহেব। কুড়ি পঁচিশ মাইল পরে পাহাড়িয়া অঞ্চল শুরু হইল, দুই দিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের সারি। রাস্তাও আঁকা বাঁকা। খানিক চড়াইয়ের পর এক এক জায়গা বেজায় ঢালু, মোটর জোরে নীচে নামিতে থাকে। দূর থেকে নদীর সরু রেখা দেখা যায়, রোগীর মত দুর্বল, নিস্পন্দ। এক পাশে বড় একটি বটগাছের নীচে মোটর থামান হইল, সবাই নামিল। ঠিক হইল, দুই দুই জন করিয়া এক দলে শিকারে বাহির হইবে, শিকার শেষ করিয়া বারোটার সময় সকলে এখানে ফিরিবে। মালতী মেহতার সঙ্গে যাইবার জন্য তৈয়ারী হইল। খান্না সাহেবের মন বিগড়াইয়া গেল। যাহা ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা বানচাল হইয়া গেল, মালতী এমন দাগা দিবে জানিলে এখানে না আসিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতেন। যাক, রায়সাহেবের সঙ্গ এমন বাঞ্ছনীয় না হইলেও খুব বিরক্তিকর নয়; আর কাজকর্মের কথাও অনেক আছে তাঁহার সঙ্গে। বাকী রহিল খুরশেদ ও তন্‌খা। উহারা একজুটি হইল, তিন দল তিন দিকে যাত্রা করিল।

পাথরের পাগদণ্ডিতে কিছুদূর যাওয়ার পর মালতী বলিল—আপনি যে খুব হেঁটেই চলেছেন, আমাকে একটু দম নিতে তো দিন।

মেহতা হাসিয়া বলিল—আরে, এখনো এক মাইল আসি নি, এরি মধ্যে আপনি হাঁপিয়ে উঠলেন!

আমি তো আর শিকার করতে আসি নি।

মেহতা না বোঝার ভাণ করিয়া বলিল—ও, তা তো আমি জানতাম না, তবে আপনি কেন এলেন?

আপনাকে কিই বা বলি?

একদল হরিণ দেখতে পেয়েছিলাম। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে গুলি চালালাম। গুলি লাগলো না, হরিণের দল পালিয়ে গেল।

মালতী বলিল—এখন তবে কি করবেন ?

না না, কিছু না, চলুন, আরো শিকার মিলবে।

কিছুক্ষণ দুইজনে চুপচাপ হাঁটিতে লাগিল, তারপর মালতী একটু থামিয়া বলিল—গরমে মরে যাচ্ছি, এই গাছতলায় একটু বসি।

এখনই বসা—তা তুমি বসতে চাও বসো, আমি এত শীগগির বসছি না।

সত্যি বলছি, আপনি বড় নিষ্ঠুর।

তা, কিছু শিকার না পেলে আমি বসতে পারি না।

তবে দেখচি আপনি আমায় শেষ কোরবেন। আচ্ছা বলুন তো, কাল রাত্তিরে আপনি আমাকে এত খেপাচ্ছিলেন কেন ? আমার কিন্তু আপনার ওপর ভারি রাগ হয়েছিল। কি বলেছিলেন মনে আছে ? আপনার সঙ্গে যাব কি না ? আমি জানতাম না, আপনি এমন ঠক। আচ্ছা, বলুন তো সত্যি কি আপনি তখন আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতেন যদি আমি রাজি হোতাম ?

মেহতা জবাব দিল না, যেন শোনেই নাই। আবার দুইজনে খানিক দূরে চলিল। একে জ্যৈষ্ঠের রোদ, তাতে পাথুরে রাস্তা। মালতী ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। মেহ্তা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বলিল, ভাল কথা, তুমি ক্লান্ত হয়েছ, একটু বসে জিরোও, আমি একটু ঘুরে আসি।

আমাকে একলা ফেলে চলে যাবেন ?

আমি তো জানতাম, তুমি নিজেকে রক্ষা কোরতে জান।

আপনি কি করে জানলেন ?

বারে ! আজকালকার মেয়েরা তো স্বাধীন। তারা পুরুষের আশ্রয় চায় না, পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলতে চায়।

মালতী অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, আপনি, মিঃ মেহতা, দেখচি আনকোরা ফিলসফার।

সম্মুখের গাছটিতে একটি ময়ূর বসিয়াছিল, মেহতা বন্দুক ছুঁড়িতে পাখীটা উড়িয়া পলাইল।

মালতী খুশী হইয়া বলিল—বেশ হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে, আমার শাপ লেগেছে।

মেহতা বন্দুকটা কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল, আমাকে শাপ দাও নি, তোমার নিজেকেই শাপ দেওয়া হয়েছে। শিকার মিলে যেত তো তোমাকে দশ মিনিট বিশ্রাম দিতাম। এখন তো তোমাকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে।

মালতী উঠিয়া মেহতার হাত ধরিতে ধরিতে বলিল—ফিলসফারদের বোধ হয় হৃদয় থাকে না। ভাগ্যিস আপনি বিয়ে করেন নি, সে বেচারী মারা পড়তো। আমি কিন্তু এখন ছাড়ছি না, আপনি আমার হাত ছাড়িয়ে যেতে পারবেন না।

মেহতা এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া চলিতে লাগিল।

মালতী জলভরা চোখে বলিল, যাবেন না, আমি বলছি যাবেন না। গেলে আমি এখানে মাথা খুঁড়ে মরবো।

মেহতা জোরে জোরে হাঁটিতে লাগিল, মালতী উহার পথের দিকে চাহিয়া রহিল। মেহতা বিশ পঁচিশ পা গিয়াছে, এমন সময় মালতী মাথায় ঝাঁকানি দিয়া উঠিয়া উহার পিছন পিছন দৌড়াইতে লাগিল। একলা একলা বসিয়া বিশ্রাম করায় কি সুখ?

কাছে গিয়া বলিল—জানতাম না, আপনি এমন পশু।

আমি আজ যে হরিণ মারবো, তার ছালটা তোমায় দেব মালতী।

ছাল চুলোয় যাক্, আমি আপনার সঙ্গে কথাই বলবো না।

সবাই ভাল ভাল শিকার পাবে, আর আমাদের ভাগ্যে কিছু জুটবে না, তাহলে কিন্তু আমার বিষম রাগ হবে।

সামনে এক মস্ত নালা পথের মাঝখানে মুখ হাঁ করিয়া পড়িয়া আছে। মাঝখানের পাথর যেন উহার দাঁত। জলের এমন তোড় যে ঢেউয়ে ঢেউয়ে তোলপাড় করিতেছিল। মধ্যাহ্ন সূর্যের পিপাসী কিরণমালা জলের মধ্যে খেলা করিতেছিল।

দেখিয়া মালতী প্রসন্ন হইয়া বলিল, এখন তো ফিরতে হবে।

কেন? ওপারে যাব, ওখানেই তো শিকার জুটবে।

জলের কি তোড়! আমি তো ভেসেই যাব।

বেশ কথা, তুমি এখানে বসো, আমি যাচ্ছি।

তা, আপনি যান, আমার বাপু প্রাণের মায়া আছে।

মেহতা জলে পা দিয়া জল ঠেলিতে ঠেলিতে চলিল। যত আগে যায়, জল ততই গভীর, এমন কি শেষে বুক পর্যন্ত।

মালতী ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ভয়ে ওর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। এমন মন খারাপ তো মালতীর কখনো হয় না। সে জোরে জোরে বলিতে লাগিল, জল বেজায় গভীর, আর যেও না, দাঁড়াও, আমিও আসচি।

না, না, তোমার পা পিছলে যাবে, বড় তোড় জলের।

কিছু হবে না, আমি আসচি। খবরদার, তুমি আর এগিও না। মালতী শাড়ী উঁচু করিয়া তুলিয়া নালায় নামিয়া পড়িল, এদিকে দশ হাত না যাইতেই জল তাহার কোমর অবধি আসিয়া পড়িল।

দেখিয়া মেহতা ঘাবড়াইয়া গেল। দুই হাতে উহাকে ফিরিয়া যাইতে মিনতি করিয়া বলিল, আর কিছুতে এসো না, এখানে তোমার গলা জল।

মালতী আরেক পা আগাইয়া বলিল, হোক, তোমার যখন ইচ্ছা আমি মরে যাই, তখন তোমার কাছে গিয়েই মরি।

মালতী কোমর-জলে দাঁড়াইয়া। জলের বেগ এমন প্রচণ্ড, মনে হইতেছিল এখনই উহাকে ফেলিয়া দিবে। মেহতা তাড়াতাড়ি ফিরিয়া এক হাতে মালতীকে ধরিল।

মালতী কৃত্রিম ক্রোধে চক্ষু ভরিয়া বলিল, তোমার মত নিষ্ঠুর লোক আমি আর দেখি নি। তুমি একদম পাষাণ। আচ্ছা, আজ বলে নাও, যত পার খেপাও, আমিও একদিন দেখে নেব।

মালতীর পা ফসকাইয়া যাইতেছিল। বন্দুক সামলাইতে সামলাইতে মেহতা মালতীকে শুদ্ধ সামলাইয়া ধরিল।

তারপর আশ্বাস দিয়া বলিল, তুমি এখন এরকম জায়গায় পা রাখতে পারবে না, চল, আমি তোমায় কাঁধে করে নিয়ে যাব।

মালতী ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, তাও ওপারে যেতে হবে, এতই দরকার?

মেহতা জবাব দিল না। খাপ হইতে বন্দুক খুলিয়া লইয়া ঘাড়ের উপর রাখিল, আর মালতীকে কাঁধে তুলিয়া লইল।

মালতী নিজের আহ্লাদ চাপিয়া রাখিয়া বলিল, যদি কেউ দেখে ফেলে?

তা দেখবে, এতে লজ্জার কি আছে?

অপ্রস্তুত তো লাগে।

দুই পা গিয়াই সে করুণ স্বরে বলিল, আচ্ছা বল তো, আমি যদি আজ

এইখানে মারা পড়ি তো তোমার কষ্ট হবে? আমার তো মনে হয়, একটুও কষ্ট হবে না।

মেহতা আহত স্বরে বলিল, তুমি কি ভাব আমি মানুষ নই?

তা সত্যি আমি তাই ভাবি, লুকিয়ে কাজ কি?

সত্যি বলছো, মালতী?

কি মনে হয়?

আমি কি মনে করি? আচ্ছা, আরেক দিন বলবো।

জল মেহতার গলা পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। আর এক পা বাড়াইলে বুঝি মাথাও ডুবিয়া যায়। মালতীর বুক কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল, মেহতা, ঈশ্বরের দোহাই, আর এগিও না, আমি তাহলে জলে লাফিয়ে পড়বো।

আজ এই সময়ে ঈশ্বরের কথা মনে পড়িল, এতদিন তো ঠাট্টা করিয়াই উড়াইত; ভাবিত, ঈশ্বর তো কোথাও বসিয়া নাই যে আসিয়া উহাকে উদ্ধার করিবেন। কিন্তু মনের যখন শক্তি আর অবলম্বন দরকার হয়, তখন আর কোথায় তাহা পাওয়া যায়?

জল একটু কমিয়া আসিয়াছে, মালতী খুশী হইয়া বলিল, এবার আমায় নামিয়ে দিন।

না, না, চুপচাপ বসে থাক, কি জানি সামনে আবার কোনও গর্ত টর্ত আছে কি না।

তুমি ভাবছ, এ মেয়েটা কি স্বার্থপর।

আমাকে এর মজুরী দিতে হবে।

মালতীর মন আহ্লাদে গদগদ। বলিল, কি মজুরী চাই তোমার?

আমি চাই, তোমার জীবনে যদি কখনো প্রয়োজনের দিন আসে, আমাকে যেন ডাক দিও।

এতক্ষণে উহারা পারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী বালুর চরে নামিয়া শাড়ী নিংড়াইয়া জল বাহির করিল, জুতার মধ্য হইতে জল ফেলিয়া দিল, মুখ হাত ধুইল; আর মেহতার এই কথাগুলি এক রহস্যময় সুরে উহার কানে বাজিতে লাগিল। এ আনন্দটুকু উপভোগ করিতে করিতে বলিল, আজকের দিনটি চিরদিন মনে থাকবে।

মেহতা বলিল—খুব ভয় পেয়েছিলে তুমি, না?

গোড়ায় খুবই ভয় হয়েছিল, কিন্তু পরে বুঝলুম, তুমি আমাদের দুজনকেই বাঁচাতে পারবে।

মেহতা গর্বভরে মালতীর দিকে চাহিল, উহার মুখে পরিশ্রমের লালিমা আর সঙ্গে সঙ্গে তেজের ভাব। তারপর মালতীর দিকে ফিরিয়া বলিল, একথা শুনে কত যে আনন্দ হোল, তা তুমি বুঝবে না মালতী।

তুমি কি বুঝতে দিয়েছ? বরং জঙ্গলে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছ, আর ফেরার পথে আবার তো ঐ নালা পার হতে হবে। তুমি কি সব বিপদের মধ্যে যে ঝাঁপিয়ে পড়! আমাকে যদি তোমার সঙ্গে থাকতে হোত, একদিনও দুজনের বনতো না।

মেহতা হাসিল, এ কথার ইঙ্গিত তাহার জানা। বলিল—তুমি আমাকে এত খারাপ ভাব? আচ্ছা, আমি যদি বলি যে তোমাকে ভালবাসি, তবে তুমি আমাকে বিয়ে কোরবে?

এমন কাঠখোট্টা লোককে কে বিয়ে করে? রাতদিন জ্বালিয়ে মারবে।

তারপর মধুর ভাবে মেহতার দিকে চাহিল, চোখ যেন বলিয়া দিল, আমার একথার ভাবটি কি বোঝ না? তুমি এত বোকা নও।

মেহতা যেন সচেতন হইয়া বলিল, তুমি ঠিকই বলেছ মালতী, আমি কোন মেয়েকে সন্তুষ্ট কোরতে জানি না। আমার কাছে কোন মেয়ে প্রেমের ভাণ কোরতে পারে না। আমি তাদের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পাই। তাতে আমার বিতৃষ্ণা হয়ে যায়।

মালতীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ইহা হয়তো সত্যই উহার মনের কথা। সে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, শুনি, তুমি কিরূপ প্রেম চাও।

আমি চাই, সে মনে মুখে এক হবে। আমার মতে রূপ, সৌন্দর্য, বেশভূষা, হাবভাবের ততটুকুই মূল্য যতটুকু থাকা শোভন ও সুন্দর; আমি এমন খোরাক চাই যাতে আত্মার তৃপ্তি হয়; যে জিনিস উত্তেজিত করে আর মানুষকে শুষে নেয় তাতে আমার দরকার নেই।

মালতী ঠোঁট উলটাইয়া জোরে নিশ্বাস টানিতে টানিতে বলিল—তোমার কাছে কেউ পাশ হবে না, তুমি বেজায় চালাক। আচ্ছা, আমাকে তোমার কি রকম মনে হয়?

মেহতা ঠাট্টার স্বরে বলিল, তুমি, তুমি সব কিছু কোরতে পার, তুমি

বুদ্ধিমতী, প্রতিভাময়ী, দয়াবতী, চঞ্চলা, অভিমানিনী; তুমি ত্যাগ কোরতে পার, আরো কত কি কোরতে পার, কিন্তু ভালোবাসতে তুমি জান না।

মালতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, একদম মিছে কথা, তুমি মোটেই ঠিক বলছো না। তুমি নাকি মেয়েদের মনের তল পর্যন্ত দেখতে পাও? মোটেই না।

নালার পার ধরিয়া দুইজনে হাঁটিতেছিল। বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, তবু মালতীর কিন্তু না ছিল ইচ্ছা বিশ্রাম করিবার, না ফিরিয়া যাওয়ার। আজকের কথাবার্তার মাঝে ও এমন একটি সুরের সন্ধান পাইয়াছে যাহা ওর কাছে একেবারে নূতন। আগে কতবার ও একটু রহস্য করিয়া, একটু ঠাট্টা করিয়া, একটি দৃষ্টি হানিয়া কত বিদ্বান পণ্ডিতকে, কত বড় বড় নেতাকে বাঁদর নাচ নাচাইয়াছে। বালির বাঁধের মত কোথাও উহার মন বসে নাই। আজ ও সন্ধান পাইয়াছে কঠোর, ঠাসবুনট, পাথরের মত শক্ত ভূমির; ঐ পাথর ভেদ করিয়া আলোর স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল, আর ঐ কঠোরতার একপ্রকার মোহ যেন মালতীকে পাইয়া বসিল।

বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। একটা বাজপাখী নালার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। মেহতা তাক্ করিল। চোট পাইয়াও পাখীটা কিছুদূর উড়িয়া গেল, তারপর জলের মধ্যে পড়িয়া স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিল।

এখন?

এখুনি নিয়ে আসছি। কোথায় যাবে?

বলিতে বলিতে সে বালুর উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল, বন্দুকটি এক পাশে রাখিয়া ঝপাং করিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল, আর গ্রামের দিকে সাঁতার দিয়া চলিল; কিন্তু আধ ঘণ্টা জোরে সাঁতার দিয়াও সে পাখীটা ধরিতে পারিল না, মরিয়াও যেন পাখীটা উড়িয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ সে দেখিল, নালার ধারের এক ঝোপের আড়াল হইতে একটি যুবতী মেয়ে বাহির হইয়া আসিল, একটা পাখী ভাসিয়া যায় দেখিয়া শাড়ীটা হাঁটুর উপর তুলিয়া জলে ডুব দিল। আর নিমেষের মধ্যে পাখীটা তুলিয়া আনিয়া মেহতাকে বলিল, জল থেকে উঠে আসুন বাবু, এই যে আপনার পাখী। মেহতা মেয়েটির সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাড়াতাড়ি সাঁতরাইয়া মিনিট দুয়েকের মধ্যে মেয়েটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

যুবতীর রং তো কালো, তাও আবার মিশকালো, কাপড় ময়লা, ছেঁড়া, গহনার মধ্যে হাতে দুই গাছা মোটা চুড়ি, মাথার চুল এলোমেলো, উস্‌কো খুস্‌কো। মুখের মধ্যে এমন কোন জায়গাই নাই যাহাকে বেশ সুন্দর বলা যায়, কিন্তু স্বচ্ছ নির্মল জল হাওয়া ঐ কালো রংকে এমন লাবণ্যমণ্ডিত করিয়াছে, আর প্রকৃতির কোলে মুক্ত অবাধ চলাফেরার ফলে উহার দেহ এমন সুঠাম, সুডৌল ও এমন স্বচ্ছন্দ উহার গতিভঙ্গী যে, মনে হয় যৌবনের চিত্র আঁকিতে হইলে ইহার অধিক সুন্দর তুলনা বুঝি মিলিবে না। মেহতার মন যেমন সবল সতেজ, উহার স্বাস্থ্য ঠিক তেমনি নিটোল। মেহতা উহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলিল, তুমি বড় ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলে, নইলে কতদূর যে সাঁতরাতে হতো জানি না।

মেয়েটি বলিল, আপনাকে এতখানি সাঁতরে যেতে দেখে আমি দৌড়ে এলাম। শিকারে এসেছিলেন বুঝি ?

হাঁ। এসেছিলাম বটে শিকার কোরতে, কিন্তু এতখানি বেলা কাটিয়ে পেলাম শুধু একটা পাখী।

চিতাবাঘ শিকার করতে চাও তো আমি ঠিকানা বলে দিতে পারি। এখানে রোজ রাত্রে জল খেতে আসে। কখনও কখনও দুপুরেও আসে।

তারপর একটু সলজ্জভাবে মাথা দুলাইয়া বলিল, বাবুজী, চিতার ছালটা কিন্তু আমায় দিতে হবে। চল আমাদের ঘরে। ওখানে পিপুলের ছায়ায় বসবে। এখানে রোদে কত বেলা দাঁড়িয়ে থাকবে ? কাপড়ও তো ভিজে ঢোল হয়েছে।

মেয়েটির ভিজা শাড়ী গায়ের সঙ্গে সাঁটিয়া যাইতেছিল, সেদিকে চাহিয়া মেহতা বলিল, কাপড় তো তোমারও ভিজে গেছে।

বেপরোয়াভাবে মেয়েটি বলিল, আমরা জঙ্গলের লোক, আমাদের এতে কি হবে ? আমরা তামাম দিন রোদে পুড়তে, জলে ভিজতে পারি। তোমরা তো একটু ক্ষণও পার না।

মেয়েটি খুবই বুদ্ধিমন্তী আর একেবারে গ্রাম্য।

তুমি চামড়াটা নিয়ে কি কোরবে ?

আমার বাবা বাজারে নিয়ে বেচবে। আমাদের তো এইই ব্যবসা।

কিন্তু দুপুর তো এখানেই কাটে, খাওয়াবে কি ?

যুবতী লজ্জা পাইয়া বলিল, তোমাকে খাওয়ানোর মতো আমাদের ঘরে কি বা আছে ? মকাইয়ের রুটি খাও, তো তা তৈরি আছে। আর এই পাখীর মাংস রেঁধে দেব। তুমি বলে দিও, কি করে রাঁধতে হবে। একটু দুধও আছে। আমাদের গোরুটাকে একবার চিতাবাঘে তাড়া করেছিল। শিং দিয়ে তাড়িয়ে ও পালিয়ে আসে। সেই অবধি চিতাকে ওর বড় ভয়।

কথা কি জান, আমি একলা নই, আমার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে।

ও, তোমার স্ত্রী বুঝি ?

না, স্ত্রী তো আমার নেই, জানা শোনা মেয়ে।

আচ্ছা, আমি ছুটে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসি। তুমি এই ছায়ায় গিয়ে বসো।

না, না, আমি ডেকে আনছি।

তুমি হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। শহুরে লোক জঙ্গলে আসে কেন ? আমরা হলাম জংলী লোক। আর কাছেই নিশ্চয় দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি।

মেহতা কিছু বলিবার আগেই ও হাওয়ার বেগে ছুটিয়া চলিল। মেহতা একটু দূরে গিয়া পিপুলের ছায়ার নীচে বসিল, এই স্বচ্ছন্দ সরল জীবন তাহার বড়ই ভাল লাগিতেছিল। দর্শনতত্ত্বের মতই অগম্য অনন্ত বিস্তৃত সম্মুখের পর্বতমালা, যেন জ্ঞান বিস্তার করিতেছে ; মেহতার আত্মা ঐ জ্ঞানের প্রকাশ, উহার অগম্যভাব, উহার বিরাট প্রত্যক্ষ ভাব তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিল। দূরে পাহাড়ের এক উচ্চ চূড়ায় ছোট একটি মন্দির, যেন এই অগম্যতার পারে পৌছিবার নিশানার মতো মাথা উঁচু করিয়া রাখিয়াছে। যে পাখীর আর কোথাও স্থান মিলিল না, সেও উহার চূড়ায় বিশ্রাম সুখ ভোগ করে।

মেহতা এই সব ভাবনায় ডুবিয়া আছে, এমন সময় মেয়েটি মিস মালতীকে লইয়া পৌছিল ; একজন বনকুসুম, রোদে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে, আরেক জন টবের ফুল, রোদ লাগিয়া নির্জীব ও মূর্চ্ছিতপ্রায়।

মালতী বিরস মুখে বলিল, পিপুলের ছায়া খুব মিষ্টি লাগছে দেখছি, এদিকে খিদেয় আমার প্রাণ যায়।

মেয়েটি দুটি বড় বড় কলসি কাঁখে তুলিয়া লইয়া বলিল, তোমরা যতক্ষণ এখানে বসছো, আমি এক ছুটে গিয়ে জলটা নিয়ে আসি। তারপর উনুন ধরিয়ে

দিই, আর যদি আমার হাতে খাও তবে এক লহমায় রুটি সেঁকে দেব। যদি তা না চাও, তবে নিজেরাই সেঁকে নিও। ভাল কথা, আমাদের ঘরে কিন্তু গমের ময়দা নেই, আর এ তল্লাটে কোন দোকানও নেই যে চেয়ে এনে দেব।

মালতীর মেহতার উপর রাগ হইতেছিল, সে বলিল, তুমি এখানে এসে পড়ে আছ কেন ?

মেহতা একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, একদিন না হয় এই গ্রাম্য জীবনের আনন্দটাই ভোগ করলে ! মকাইয়ের রুটির স্বাদ কি রকম খেয়েই দেখ না ?

আমার দ্বারা মকাইয়ের রুটি খাওয়া চলবে না। আর খেলেও বমি হয়ে যাবে, হজম হবে না। তোমার সঙ্গে এসে খুব পসতাচ্ছি। সারা পথ দৌড় করিয়ে শেষ করেছ, আর এখন এ কোথায় এনে যে ফেললে !

মেহতা ভিজা পোষাক খুলিয়া ফেলিয়াছিল, পরণে শুধু একটি নীল পাজামা। মেয়েটি কলসি নিয়া চলিল দেখিয়া সে উঠিয়া পড়িল, আর উহার হাত হইতে কলসি নিয়া জল তুলিতে কূয়ার দিকে চলিল। দর্শন শাস্ত্রের বিস্তর পড়াশুনা সত্ত্বেও মেহতা নিজের স্বাস্থ্যটি অটুট রাখিয়াছিল, আজ দুই হাতে দুই কলসি নিয়া যখন জল তুলিতে লাগিল, উহার সুপুষ্ট বাহু দুটি, চওড়া বুকের ছাতি, আর মাংসল পা দুইটি দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন এক গ্রীক প্রতিমূর্তি, উহার পৌরুষের মর্যাদা যেন জ্বল জ্বল করিতে লাগিল। যুবতী অনুরাগভরা দৃষ্টিতে উহার জল তোলা দেখিতে লাগিল। এতক্ষণ মেহতা ছিল উহার কৃপার পাত্র শহরের মানুষ, এখন হইল শ্রদ্ধার বস্তু।

কূয়াটি গভীর, ষাট হাত হইবে, কলসি দুটি ভারী, আর মেহতা যদিও ব্যায়ামপটু, তবু অনভ্যাসের দরুণ কলসি টানিয়া তুলিতে হাত শিথিল হইয়া আসিল। যুবতী ছুটিয়া গিয়া উহার হাত হইতে দড়ি ছিনাইয়া লইল, এ তোমার কর্ম নয়, যাও তুমি বোস গিয়ে, আমি জল তুলে নিয়ে যাচ্ছি।

পুরুষের এই অপমান কি মেহতার সহ্য হয় ? দড়িটা উহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া খুব জোরে অন্য কলসিটিতে জল তুলিল, আর দুই হাতে জলভরা দুই কলসি নিয়া মেয়েটির কুটিরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি চটপট উনুন ধরাইল, পাখীটার ছাল ছাড়াইল, ছুরি দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া উনুনের একদিকে মাংস চড়াইল, আর অন্য দিকে দুধের কড়া বসাইল।

আর মালতী ঘোর বিরক্তির সঙ্গে, ক্ষুণ্নমনে, খাটিয়ার উপর পড়িয়া রহিল। সে এমন ভাবে ঐ মেয়েটির কাজকর্ম দেখিতে লাগিল, মনে হইল যেন উহার উপর কোন অস্ত্রোপচারের সব ব্যবস্থা হইতেছে।

মেহতার কিন্তু উহার গৃহকর্মের নিপুণতাটুকু দেখিতে খুবই ভাল লাগিতেছিল। সে বলিল, আমি কি করবো বল, আমায় কিছু কাজ দাও।

মেয়েটি মিষ্টি মিষ্টি ঠাট্টার স্বরে বলিল, তোমাকে কিছু কোরতে হবে না, তুমি গিয়ে আমার দিদির পাশে বসো, ও বেচারীর খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। দুধটা গরম হয়ে এল, একটু দুধ ওকে খাইয়ে দাও।

সে একটা ঘড়া হইতে আটা বাহির করিয়া ঠাসিতে লাগিল, মেহতা উহার অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকে চাহিয়া রহিল। মেয়েটিও মাঝে মাঝে কাজের মধ্যেই কৌতুকভরে উহার দিকে চাহিতে লাগিল।

মালতী ডাকিয়া বলিল, তুমি ওখানে কি করছো? আমার বেজায় মাথা ধরেছে। আধকপালে ব্যথা করছে, মনে হয় মাথা ছিঁড়ে যাবে।

মেহতা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, আমার মনে হোচ্ছে বড্ড রোদ লেগেছে তোমার।

আমি কি জানতাম, আমায় মেরে ফেলার জন্য তুমি এত দূর নিয়ে আসবে?

আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কোনও ওষুধ আছে কি?

আমি কি রোগী দেখতে এসেছি যে সঙ্গে ওষুধ থাকবে? আমার ওষুধের বাক্স তো বাড়িতে রয়ে গেছে। উঃ, মাথা ফেটে যাচ্ছে!

মেহতা ওর মাথার দিকে গিয়া মাটিতে বসিয়া আস্তে আস্তে উহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। মালতী চোখ বুজিয়া রহিল। মেয়েটি আটা মাথা হাতে, মাথার চুল এলোমেলো, কাঠের ধোঁয়ায় চোখ লাল, সারা শরীর ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, পরিশ্রমে পরিণত বক্ষ ওঠানামা করিতেছে, এই অবস্থায় তাড়াতাড়ি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, আর মালতীর চোখ বন্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে? দিদির কি হোল?

মেহতা জবাব দিল, মাথা ধরেছে।

সমস্ত মাথা, না, আধকপালে?

ও তো বলে, আধা।

ডান দিক, না বাঁ দিক?

বাঁ দিকে।

আমি ছুটে গিয়ে একটা ওষুধ এনে দিচ্ছি, ঘসে লাগিয়ে দিলে এখুনি সেরে যাবে।

এত রোদে তুমি আবার কোথায় যাবে?

মেয়েটি এ কথায় কান দিল না, ছুটিয়া একদিকে গিয়া পাথরের আড়ালে লুকাইয়া পড়িল। আধ ঘণ্টা খানিক বাদে মেহতা দেখিল, সে একটা উঁচু পাহাড়ে উঠিতেছে, দূর হইতে দেখিতে একটা পুতুলের মত লাগিতেছে। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই জঙ্গলীদের মধ্যে কেমন সেবার ভাব, আর কেমন ব্যবহারিক বুদ্ধি। এই রোদ, লু চলিতেছে, আর তাহার মধ্যে কিনা ছুটিয়া চলিয়াছে ওষুধের জন্য!

মালতী চোখ চাহিয়া বলিল, কোথায় গেল ঐ কালিন্দী? কি কালোর কালো, যেন আবলুশ কাঠে গড়া! ওকে পাঠিয়ে দাও, রায়সাহেবকে গিয়ে বলুক, গাড়ী এখানে পাঠিয়ে দিন। এই গরমে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

মেয়েটি একটা ওষুধ আনতে গিয়েছে, বলছে, ঐ ওষুধে আধকপালে খুব চট করে সেরে যায়।

এদের ওষুধে এদেরই ধরে। আমার আরাম হবে না।

অপ্রিয় সত্য বলিতে মেহতার মুখে বাধে না। সে বলিল, ওর মধ্যেও এমন কয়েকটা জিনিস আছে, যা তোমার মধ্যে থাকলে তুমি দেবী হয়ে যেতে।

ওর ভালো ওর থাক, আমার দেবী হবার সাধ নেই।

তুমি চাও তো আমি গিয়ে গাড়ীটা নিয়ে আসবো, অবশ্য জানি না এখানে মোটর আসতে পারে কি না।

তুমি যাবে কেন? কালিন্দীকে পাঠাও না?

ও তো ওষুধ আনতে গেছে, তারপর ফিরে এসে রান্না কোরবে।

তুমি দেখছি আজ ওর অতিথি। রাত্তিরটাও হয়তো এখানে থাকবে। রাত্তিরবেলা আবার ভাল শিকারও জোটে।

এই খোঁচায় বিরক্ত হইয়া মেহতা বলিল, এই যুবতীর প্রতি আমার মনে যে শ্রদ্ধা আর প্রীতি জন্মেছে তা এমন যে আমি যদি বাসনার দৃষ্টিতে ওর দিকে চাই, তবে আমার চোখ কানা হয়ে যাবে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের জন্যেও

আমি এই রোদে লুর মধ্যে ওই উঁচু পাহাড়ে উঠতে পারতাম না। আর আমরা একদণ্ডের অতিথি, তা তো ও জানে। ও এমন ধাতের মেয়ে মালতী, গরীব কোন ভিখারীর জন্যও এ রকম ব্যস্ত হয়েই ছুটবে। আমরা তো বিশ্বপ্রেম আর বিশ্বমৈত্রীর বিষয়ে শুধু লিখতেই জানি, বক্তৃতা দিতে পারি; আর ও প্রেম আর ত্যাগ জীবনে দেখাতে জানে। বলার চেয়ে করা ঢের শক্ত। তুমিও তা জান মালতী।

মালতী উপহাসের স্বরে বলিল, আমি হার মানছি, ও দেবী। ওর বক্ষ পুষ্ট, নিতম্ব পরিপূর্ণ; দেবী হোতে আর কি লাগে?

মেহতা এবার রাগিয়া উঠিল; তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় পরিল, এতক্ষণে সব শুকাইয়া গিয়াছে; আর বন্দুক হাতে নিয়া চলার পথে পা বাড়াইল। মালতী চেঁচাইয়া উঠিল, আমাকে ফেলে তুমি কিছুতে যেতে পারবে না।

তবে কে যাবে?

কেন, তোমার দেবী?

মেহতা হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। নারী পুরুষের উপর কত সহজেই না প্রভাব বিস্তার করে, আজ জীবনে সে তাহা প্রথম অনুভব করিয়াছে।

ওদিকে সেই মেয়েটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিতেছে। ঐ কালো মেয়েটি, হাতে একটা গাছের ডাল। কাছে আসিয়া মেহতাকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত দেখিয়া বলিল, আমি এই ওষুধের শেকড়টা খুঁজে এনেছি, এখুনি ঘসে ওর মাথায় লাগিয়ে দেব; কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এতক্ষণে মাংস নিশ্চয় সিদ্ধ হয়ে গেছে, রুটিও এখুনি সেঁকে দিচ্ছি, দু একখানা তো খেয়ে নিন। দিদি দুধ খাবেন। একটু ঠাণ্ডা পড়লে আপনারা চলে যাবেন।

অসঙ্কোচে কাছে আসিয়া সে মেহতার আচকানের বোতাম খুলিয়া দিল। মেহতা অনেক কষ্টে নিজেকে থামাইয়া রাখিল, ইচ্ছা হইতেছিল, গ্রামের এই মেয়েটির চরণে নত হয়।

মালতী বলিল, রাখ তোর ওষুধ। নদীর ধারে গাছের নীচে আমাদের মোটর দাঁড়িয়ে আছে, ওখানে আরো লোক থাকবে, তাদের গিয়ে বল, গাড়ী এখানে নিয়ে আসুক। যা, দৌড়ে যা।

যুবতী করুণ চোখে মেহতার দিকে চাহিল। এত কষ্ট করিয়া ওষুধ সংগ্রহ

করিয়া আনিলাম, তাহার এই অনাদর! আমাদের গেঁয়ো লোকদের ওষুধ তোমাদের রোচে না, তা না হয় নাই রুচিল, তবু আমার মন রাখিবার জন্য একটুখানি লাগাইলে কি কোন ক্ষতি হইত?

ওষুধের শিকড় মাটিতে রাখিয়া দিয়া বলিল, অতখানি গিয়ে ফিরতে ফিরতে উনন তো নিভে যাবে দিদি, বল তো রুটি কখানা সেঁকে রেখে যাই। বাবুজী খানা খেয়ে নিন, তুমি দুধটুকু খাও, তারপর দুজনে বসে একটু বিশ্রাম কর; ততক্ষণে আমি মোটর ডেকে নিয়ে আসবো।

বলিয়া ও ঝুপড়ির মধ্যে গেল, নিভিয়া-আসা আগুন আবার জ্বালাইল। দেখিল, মাংস উথলাইয়া উঠিয়াছিল, কিছুটা জলও উপছাইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি রুটি কয়খানা সেঁকিয়া ফেলিল, দুধ গরম ছিল, একটু ঠাণ্ডা করিয়া একটা বাটিতে ঢালিয়া মালতীর কাছে নিয়া আসিল। মালতী মুখখানা যথাসম্ভব কঠোর করিয়া রাখিল, অবশ্য দুধটুকু ছাড়িতে পারিল না; মেহতা কুটিরের দরজার কাছে বসিয়া একখানা থালায় করিয়া রুটি আর মাংস খাইতে লাগিল। মেয়েটি কাছে দাঁড়াইয়া পাখা করিতে লাগিল।

মালতী বলিল, উনি খেতে থাকুন। পালিয়ে তো আর যাচ্ছেন না। তুই যা, গাড়ীটা ডেকে আন্।

মেয়েটি মালতীর দিকে প্রশ্নভরা চোখে একবার চাহিয়া দেখিল, এ কি চায়, ইহার মতলব কি? মালতীর চেহারার মধ্যে রোগীর মত দুর্বলতা, কৃতজ্ঞতা কি নম্রতা কিছুই উহার চোখে পড়িল না, বরং তাহার বদলে রহিয়াছে অভিমান আর রাগের ঝলক। বনবাসিনীর বিলক্ষণ বুদ্ধি ছিল লোকের মনোভাব বুঝিবার। বলিল, বাই, আমি তো কারো দাসী নই, তুমি বড়লোক বটে, তোমার নিজের ঘরে বড়, আমি তোমার কাছে কোন জিনিসের প্রার্থী তো নই। আমি গাড়ী ডাকতে যাব না।

মালতী রাগিয়া বলিল, বেশ, তুই বেয়াদবি করার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিস, বল্ দেখি কার এলাকায় আছিস?

এটা রায়সাহেবের এলাকা।

হাঁ, ঐ রায়সাহেবের হাঁতের হাণ্টার দিয়ে তোকে মার খাওয়াব।

বাই, আমাকে পেটালে সুখ পাও তো নিজেই মারো না। আমি তো আর মস্ত রানী মহারানী নই যে পেয়াদা পাঠাতে হবে।

মেহতা দুচার গ্রাস গিলিয়াছে কি মালতীর কথাগুলি উহার কানে গেল। খাবার গলায় আটকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি কোনমতে হাত ধুইয়া আসিয়া বলিল, ও কেন যাবে মালতী, আমিই যাচ্ছি।

মালতীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না, ওকেই যেতে হবে। মেহতা ইংরেজিতে বলিল, মালতী, ওর অপমান করে তুমি নিজের মান বাড়াচ্ছ না কিন্তু।

মালতী ফস করিয়া বলিল, পুরুষেরা তো এরকম দাসীই চায় যাদের অন্য গুণ না থাক, খুসিমনে মনিবের ফাইফরমাস ছুটোছুটি করে খাটবে আর মনে কোরবে, কি আমার ভাগ্য, মনিব আমায় খাটিয়ে নিলেন! পুরুষের মতে তারাই হোল দেবী, শক্তি, বিভূতি। আমি ভাবতাম, তোমার কিছু পৌরুষ আছে, তা দেখছি ভেতরে ভেতরে, সংস্কারের বশে তুমিও বর্বর।

মেহতা মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত। মালতীর মনের রহস্য তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। ঈর্ষ্যার এমন আশ্চর্য উদাহরণ সে আর পায় নাই। এই নারী যে এত কোমলস্বভাব ছিল, এমন হাসিখুসি, উদার মন যার, ঈর্ষ্যা তাহাকে কি কোপন করিয়া তুলিয়াছে!

মুখে বলিল, যাই বল, আমি ওকে যেতে দেব না। ওর সেবাযত্নের এমন হীন প্রতিদান দিয়ে নিজের কাছে নিজেকে ছোট করতে পারবো না। মেহতার স্বরে এমন কিছু জোর ছিল যাহার ফলে মালতী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল, ও যাইবার জন্য তৈয়ারী হইল। রাগে জলিতে জলিতে বলিল, বেশ, আমিই যাচ্ছি, এর চরণ পূজো করার জন্য তুমি থাক।

মালতী দুই তিন পা আগাইয়া গেলে মেহতা মেয়েটিকে বলিল, বোন, আমায় যেতে দাও, তোমার এই স্নেহ আর নিঃস্বার্থ সেবা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

যুবতী জোড়হাতে উহাকে নমস্কার করিল, তারপর নিজের ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

* * *

দ্বিতীয় দলে রায়সাহেব আর খান্না। রায়সাহেব নিজের রেশমী চাদর আর কুর্তা গায়ে চলিয়াছেন, কিন্তু খান্নার পরনে শিকারীর পোষাক। আজকার জন্যই হয়তো উহা বানানো হইয়াছে। খান্নার চাষী গৃহস্থদের

শিকার করিতেই সময় যায়। জন্তু শিকারের সময় তাহার কবে মেলে? খান্নার একহারা, ছিপছিপে, সুন্দর চেহারা, পাকা ধানের মত টকটকে রং, বড় বড় চোখ, মুখে বসন্তের দাগ, কথাবার্তায় সে খুব চৌকষ।

কিছুদূর গিয়াই ও মিঃ মেহতার কথা পাড়িল, যে কথা কাল রাত্রিবেলা হইতে উহার মাথায় রাহুর মত চাপিয়া রহিয়াছে। বলিল, মিঃ মেহতা একটি অদ্ভুত লোক। আমার তো মনে হয় উনি একটি ভণ্ড।

রায়সাহেব মেহতাকে শ্রদ্ধা করিতেন, উহাকে সাঁচ্চা প্রকৃতির উদার-স্বভাব বলিয়া জানিতেন। কিন্তু রায়সাহেব লোকটি খানিকটা নির্বিরোধী স্বভাবের, তাহাতে খান্না সাহেবের সঙ্গে দেনাপাওনার সম্বন্ধ আছে, তাহাকে ঘাঁটাইতে চান না। বলিলেন—আমি তো ওকে কেবল আমোদ-প্রমোদের সঙ্গী বলেই জানি, কখনো ওর সঙ্গে বেশি আলাপও করি না; আর করতে চাইলেই বা অত বিদ্যে কোথায় পাব? যে নাকি জীবনের কঠিন ভূমিতে কখনো এক পা বাড়াল না, সে যদি জীবন সম্বন্ধে নতুন তথ্য নিয়ে আলোচনা করে তো তা শুনে আমার হাসিই পায়। মজা করে হাজার টাকা মাস মাস পায়, না বৌ না ঢেঁকি, না আছে ভাবনা চিন্তা, না আছে বাধাবিঘ্ন, এমন লোক দর্শন কপচাবে না তো কি কোরবে? নিজে নির্ঝঞ্ঝাট, তাই স্বপ্ন দেখে জীবনকে উপলব্ধি করার। এমন লোকের সঙ্গে কি কথাই বা বলা চলে?

আমি তো শুনেছি, ওর চরিত্রও ভাল নয়।

বেপরোয়া লোকের চরিত্র কি করে ভাল থাকবে? সমাজে থেকে সমাজের মর্যাদা বাঁচিয়ে চল, তবে তো বোঝা যায়।

জানি না কি দেখে মালতী ওর ওপর এত ঝুঁকেছে।

আমার তো মনে হয় ও কেবল আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে।

ও বেচারী আর আমাকে কি জ্বালাবে, আমি তো ওকে খেলনার বেশি কিছু মনে করি না।

ও কথা বলবেন না মিঃ খান্না, আমার তো মনে হয় আপনি মালতীর জন্য প্রাণ দিচ্ছেন।

এ অভিযোগ তো আমি আপনার সম্বন্ধেও কোরতে পারি।

আমি সত্যিই ওকে খেলনার মত দেখি। আপনি কিন্তু ওকে প্রতিমা বানিয়ে তুলেছেন।

খান্না খুব জোরে হাসিয়া উঠিল, যদিও হাসির কথা কিছু ছিল না।

এক ঘড়া জল তুলে দিলে যদি বর পাওয়া যায়, তবে মন্দ কি ?

এবার রায়সাহেব জোরে হাসিয়া উঠিলেন, যদিও উহার কোন দরকার ছিল না। তবে আপনি ঐ দেবীটিকে মোটেই বোঝেন নি। আপনি যতই ওর আরাধনা কোরবেন, ততই ও দূরে চলে যাবে, আর আপনি যদি দূরে চলে যান তো ও আপনার দিকে ছুটে আসবে।

তবে তো ওর আপনার দিকেই ছোটা উচিত।

আমার দিকে! আমি ঐ রসিক সমাজের একদম বাইরে মিঃ খান্না, একেবারে সত্যি কথা। আমার বুদ্ধি, বল, সব এই জমিদারীর পেছনেই খরচ হয়ে যায়, ঘরের যত লোকজন, সবাই নিজের নিজের ব্যাপারে মত্ত, কেউ উপাসনায়, কেউ বিষয়বাসনায়। কেউ একটা নিয়ে কেউ আরেকটায় ডুবে আছে। আর আমার কাজ এই সবার অজগরের মত বিশাল পেট ভরানো। আমার অনেক তালুকদার ভাই যে ভোগবিলাস নিয়ে ডুবে আছেন তা জানি, কিন্তু এঁরা ঘর উজাড় করে তামাসা লোটেন। মাথার ওপর দেনার বোঝা, হরদম ডিগ্রীজারী হোচ্ছে, যার কাছ থেকে ধার নেন আর শুধতে পারেন না, চারদিকে বদনাম। জানি না কোন্ সংস্কার বশে আমার একটুখানি এখনো বন্ধন আছে, সমাজের বন্ধন ঠেলতে পারি না। সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হোল। আমার ভাইরা তো সব মদ আর মাংস নিয়ে মেতে রইলেন। আমি কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলাম না। জেল খাটলাম, লাখ টাকা লোকসান দিলাম, এখনো পর্যন্ত তার তাল সামলাচ্ছি। তার জন্য অবশ্য পস্তাই না কখনো। কোন আক্ষেপ নেই, বরং গর্ব আছে। যে লোক দেশের জন্য, সমাজের জন্য কাজ না করে, ত্যাগ স্বীকার না করে, তাকে আমি মানুষ বলি না। এই যে নিরীহ কিষাণদের রক্ত শুষে নিয়ে নিজের পরিবারের বড়মানষির খোরাক জোগান—এ কি আমার ভাল লাগে? তবে কি করা বলুন। যে অবস্থার মধ্যে জন্মেছি, মানুষ হয়েছি, সে ব্যবস্থায় ঘৃণা ধরলেও তার মোহ কাটানো শক্ত। আর ঐ চরখা নিয়ে রাতদিন পড়ে থাকলেই কি মান ইজ্জত বাঁচে? ঐ রকম লোক মালতী, কারো চাইতে ছোট হয়ে থাকবে না, কেউ যদি ওর আগে গেল তো তার সর্বনাশ। অবশ্য ওকে নিয়ে একটু ফুর্তি লুটি—সে আলাদা কথা।

মিঃ খান্নাও সাহসী লোক, সংগ্রাম আসিলে আগাইয়া যায়। দুইবার জেল খাটিয়াছে। কাহারো কাছে দমিবার লোক নয়। খদ্দর পরে আর ফরাসী মদ পান করে। দরকার হইলে মহৎ দুঃখ সহ্য করিতে পারে। জেলে থাকিতে মদ ছোঁয় নাই। 'ক' শ্রেণীর বন্দী হইয়াও সাধারণ 'গ' শ্রেণীর খাবার খাইত, যদিও ইচ্ছা করিলে সকল রকমের আরাম ও সুবিধা জোগাড় করা উহার পক্ষে শক্ত ছিল না। কিন্তু যে রথ রণক্ষেত্রে যাইবে তাহারও তো চলিবার জন্য তেল দরকার। তাহার জীবনেও অল্প-স্বল্প সরসতার প্রয়োজন ছিল। বলিল, আপনি সন্ন্যাসী হোতে পারেন, আমি কিন্তু পারি না। আমার মতে, যে জীবনে ভোগ কাকে বলে জানলো না, সে সংগ্রামের সময়ও পুরো উৎসাহে কাজ কোরতে পারবে না, তার দেশ-প্রেমে আমার আস্থা নেই।

রায়সাহেব ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, এ হোল কথার কথা।

কথার কথা নয়, তত্ত্বকথা।

তা হবে।

আপনি নিজের মন পরীক্ষা করে দেখুন, তাহলে বুঝবেন।

আমি ভেবে দেখেছি, আর আপনি বিশ্বাস করুন, আমার মনে আর যে দুরাশাই থাকুক, বিষ খাওয়ার সাধ আমার নাই।

তবে তো আপনার জন্য আমার মায়া হোচ্ছে। আপনি যে সর্বদা এত চিন্তাকুল, নিরাশ আর বিষাদগ্রস্ত, তার কারণ আপনার আত্মনিগ্রহ। আমি কিন্তু এই নাট্যে শুধু অভিনয় করে যাব, দুঃখ দূর হোক বা না হোক। ও আমাকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়, দেখায় আমার জন্য ও পরোয়া করে না; কিন্তু আমি মান খোয়াবার লোক নই। আজ পর্যন্ত ওর মেজাজের তল পেলাম না। কি করলে সে ঠিক খুসি হবে, আজও বুঝতে পারলাম না।

কিন্তু সে চাবিকাঠি আপনার মেলে কিনা সন্দেহ, মেহতা সম্ভবত আপনার ওপর টেক্কা দিয়ে যাবে।

একটা হরিণ আর হরিণী চরিয়া বেড়াইতেছিল, লম্বা লম্বা শিং আর মিশকালো রং। রায়সাহেব বন্দুক উঠাইলেন, খান্না বাধা দিয়া বলিল, আহা-হা, কেন মারবেন ওদের, বেচারীরা কেমন সুন্দর চরে বেড়াচ্ছে, চরতে

দিন ওদের। বড় কড়া রোদ উঠেছে, চলুন কোথাও বসি গিয়ে। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে আমার।

রায়সাহেব তবু বন্দুক ছুঁড়িলেন, হরিণ কিন্তু ছুটিয়া পলাইল। বলিলেন, যাও বা একটা শিকার জুটলো, তাও তাক্ লাগলো না।

যাক, একটা হত্যা করা থেকে বাঁচলেন।

আচ্ছা, বলুন, আপনার কি কথা আছে?

আপনার এলাকায় আখ হয়?

হয়, তবে অনেক কষ্টে।

তবে আমাদের চিনির কলের সঙ্গে যোগ দিন না কেন? শেয়ার তো হরদম বিক্রী হোচ্ছে। বেশি না নিন, এক হাজার শেয়ার না হয় কিনুন।

আপনি তো বললেন, কিন্তু আমি এত টাকা কোথায় পাব?

এমন নামকরা জোতদার আপনি, আর আপনার নাকি টাকার অভাব! হাজার পঞ্চাশ তো নিশ্চয় আছে, তার মধ্যেও শতকরা পঁচিশ মোটে এখন দিতে হবে।

না ভাইসাহেব, আমার হাতে মোটেই টাকা নেই।

আচ্ছা, টাকা যত চাই, আমার কাছ থেকে নিন না। তাছাড়া, আপনার ব্যাঙ্ক আছে। ভাল কথা, আপনি বোধ হয় জীবনবীমা করেননি। আমার কোম্পানীতে একটা ভাল পলিসি কিনুন। ছুএকশ টাকা আপনি মাসে মাসে নিশ্চয় খুব স্বচ্ছন্দেই দিতে পারেন, একসঙ্গে ফিরে পাবেন চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার। ছেলেদের জন্যে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আপনি কোরতে পারবেন না। আমাদের কাগজপত্র নিয়মকানুন আপনি দেখবেন। আমরা সম্পূর্ণভাবে লোকের ভালোর জন্যই একাজে হাত দিয়েছি। আপিস রাখা আর কর্মচারীদের খরচ ছাড়া এক পয়সাও কারো পকেটে যায় না—সব টাকা বীমাকারীদের উপকারের জন্য। আপনি অবাক হবেন, এই নীতিতে কোম্পানী চলে কেমন করে? আমার পরামর্শে এখন কিছু কিছু স্পেকুলেশন করা হোচ্ছে। যত দেখছেন লাখপতি আর কোটিপতি, সবাই এই স্পেকুলেশন করেই বড়লোক হয়েছে। তুলা, চিনি, গম, রবার যা হয় কিছুতে লেগে থাকুন। এক মিনিটে লাখ টাকার ওঠানামা হোচ্ছে। কাজটা কিছু অনিশ্চিত বটে, অনেক লোক লোকসানও দেয়, তবে তারা আনাড়ি। আপনার মত

অভিজ্ঞতা, শিক্ষা আর দূরদর্শিতা যাদের, তাদের পক্ষে এর চেয়ে লাভের ব্যবসা হোতে পারে না। বাজারের উঠতি-পড়তি তো নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার নয়, এরও বিজ্ঞান আছে। এর ভেতরে একবার ঢুকে পড়তে পারলে দেখবেন, কি মজার ব্যাপার।

রায়সাহেবের এসব কোম্পানীর উপর কোন আস্থা ছিল না। দুই একবার লোকসানও দিয়াছেন, কিন্তু মিঃ খান্নাকে তো চোখের উপর এত বড় হইয়া উঠিতে দেখিলেন, তাই উহার কার্যদক্ষতার উপর আস্থা হয়। এই তো দশ বছর আগে মিঃ খান্না ছিল সামান্য ব্যাঙ্কের কেরাণী, আর আজ শুধু অধ্যবসায়, পৌরুষ আর নিজের প্রতিভাবলে এ লোকটা সারা সহরে গণ্যমান্য। উহার উপদেশ কি উপেক্ষা করা যায়? আর খান্না যদি চালনা করিয়া নেয় তবে হয়তো এই ব্যবসায়ে রায়সাহেবের বেশ দুই পয়সা রোজগারও হইতে পারে। এমন সুযোগ কি ছাড়া উচিত? নানা রকম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ চোখে পড়িল এক দেহাতী, মস্ত ধামা করিয়া কিছু শিকড়, কিছু ফুল পাতা লইয়া যাইতেছে।

খান্না জিজ্ঞাসা করিল, কি আছে রে?

দেহাতী ভয় পাইয়া গেল। কোথাও বেগার খাটিতে ধরিয়া লইবে না তো! বলিল, কিছু তো নেই বাবু, এই ঘাস-পাতা শুধু।

এদিয়ে কি করবি?

বেচবো বাবু, শেকড়-বাকড় এগুলি।

দেখি, দেখি, কিসের ওষুধ হবে?

দেহাতী আপনার ঔষধালয়টি খুলিয়া দেখাইল। কয়েকটি মামুলী শিকড় পাতা, যাহা জঙ্গল হইতে তুলিয়া ইহারা শহরে বেচিয়া আসে, আর দুচার আনা উপায় করে। এই যেমন, ধুতুরার বীচি, গাদারের ফুল, করমচা, ঘুমচী ইত্যাদি। প্রত্যেকটি জিনিস তুলিয়া দেখাইতে লাগিল আর চলিত কথায় উহার গুণও ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। এটা মাকার সাহেব। মন্দাগ্নি হোক, শূল ব্যথা হোক, এক দাগ খেলেই ভাল হয়ে যাবে। এটা ধুতুরো বীচি, বাতের ব্যথায়, গাঁঠের ব্যথায়……

খান্না দাম জানিতে চাহিল। লোকটি বলিল, আট আনা। খান্না একটি টাকা ছুঁড়িয়া দিল, আর উহাকে হুকুম করিল জিনিসগুলি গাড়ীতে রাখিয়া

আসিতে। গরীব বেচারি যাহা চাহিয়াছিল তাহার দুগুণ পাইয়া আনন্দে আশীর্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

রায়সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এসব ঘাস পাতা নিয়ে কি করবেন ?

খান্না হাসিয়া বলিল, এ থেকেই মোহর বানাব। আপনি বোধ হয় জানেন না, আমি যে যাদুকর।

দোস্ত, ঐ মন্ত্রটা আমাকেও শিখিয়ে দাও।

নিশ্চয়, খুসি হয়েই শেখাব, আপনি আমার সাকরেদ হয়ে পড়ুন। তা, আগে সওয়া সের লাড্ডু এনে খাওয়ান, তার পর বলছি। কথা কি জানেন, আমার কাছে নানা রকমের লোকের আনাগোনা। কেউ কেউ এমন আসে যাদের এসব গাছগাছড়া, শেকড়বাকড়ের ওপরে মহা ভক্তি। তারা যদি একবার শোনে যে আপনি এসব এক ফকিরের কাছে পেয়েছেন, তবে একেবারে সঙ্গে সঙ্গে আপনার খোসামোদ করতে থাকবে। নাক ঘসবে আপনার কাছে, আর তখন যদি এর একটা ওষুধ আপনি দেন তো চিরদিন আপনার কেনা হয়ে থাকবে। এক টাকায় যদি দশ বিশ জন বোকা লোককে এরকম ভাবে হাত করা যায়, তা মন্দ কি ? এরকম ছোট ছোট ব্যাপার থেকে অনেক সময় বড় বড় কাজ পাওয়া যায়।

রায়সাহেব কুতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, তা যেন হোল, কিন্তু এই গাছগাছড়ার গুণ আপনার মনে থাকবে ?

খান্না খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। রায়সাহেব, আপনি দেখছি ভারি অদ্ভুত কথা বলেন। আপনি যার যা খুসি গুণ বলে দেবেন, ওর নিজের গুণে খেটে যাবে। রোগ তো সারে আট আনা মানুষের বিশ্বাসের জোরে। এই যে দেখছেন বড় বড় অফিসার, লম্বা লম্বা কথা বলা বিদ্বান পণ্ডিত, আর গণ্যমান্য লোক, এরা সব অন্ধ বিশ্বাসে চলে। আমি তো উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অধ্যাপক কত দেখলাম, কুকুরশোঁকা গাছের নামটা পর্যন্ত জানে না। এসব পণ্ডিতদের নিয়ে আমাদের স্বামীজী খুব মজা করেন। আপনি বোধ হয় স্বামীজীকে দেখেন নি। এবার আপনি যেদিন আসবেন, ওঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। যতদিন থেকে আমার বাগানে আছেন, রাতদিন লোকের ভিড় লেগেই আছে। মায়া ওঁকে স্পর্শও করে নাই। দিনে কেবল একবার দুধ খান।

এ রকম বিদ্বান, মহাত্মা ব্যক্তি আজ পর্যন্ত দেখলাম না। কতদিন যে হিমালয় পাহাড়ে বসে তপস্যা করেছেন জানি না, একেবারে সিদ্ধ পুরুষ। আপনি ওঁর কাছে দীক্ষা নিন। আমার খুব বিশ্বাস, আপনার সব কিছু অমঙ্গল মন্ত্রের মত উড়ে যাবে। উনি আপনাকে শুধু দেখেই আপনার অতীত ভবিষ্যৎ সব বলে দেবেন। এমন প্রসন্ন মুখখানা, দেখলেই মনটা খুসি হয়ে ওঠে। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে উনি এমন বড় সাধু, তাও সন্ন্যাস ও ত্যাগ, মন্দির ও মঠ, সম্প্রদায় আর পন্থা, এসব ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেন, বলেন, সব ভণ্ডামি ; বলেন, খ্যাতির বন্ধন ছেড়ে সব মানুষ হও ; দেবতা হওয়ার খেয়াল ছাড়ো ; বলেন, দেবতা বনলে আর মানুষ থাকবে না তোমরা।

রায়সাহেবের মনে শঙ্কা জাগিল। সাধু মহাত্মাতে তাঁহারও বিশ্বাস ছিল ; বড়লোকদের প্রায়ই থাকে। দুঃখীজন আত্মচিন্তায় যে শান্তি পায়, তাহার জন্য রায়সাহেবের মনও লালায়িত ছিল। সংসারে যখন আর্থিক কষ্ট ও সংগ্রাম আসে তখন মনে হয়, যাই, সংসারের দিক থেকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাই, একান্ত নির্জনে বসিয়া মোক্ষ চিন্তা করি। সাধারণ লোকের মত ইঁহারও ধারণা যে সংসারের বন্ধন আত্মোন্নতির পথে বাধা স্বরূপ, আর এই সব ছাড়িয়া যাইতে পারাই আদর্শ জীবন। কিন্তু সন্ন্যাস ছাড়া এই সব বন্ধন কাটাইবার উপায় কি ?

তাই প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, উনি সন্ন্যাস নেওয়াকে উপহাস করেন, তবে নিজে সন্ন্যাস নিলেন কেন ?

উনি আর সন্ন্যাস নিলেন কবে ? উনি তো বলেন, শেষ দিনটি পর্যন্ত মানুষকে কাজ করে যেতে হবে। ওঁর উপদেশের মূলতত্ত্ব হোল বিচারের স্বাধীনতা।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, এর মধ্যে বিচার-স্বাতন্ত্র্যের কথা কি করে এল ?

বুঝতে তো আমিও কিছু পারি না, একদিন এসে ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন। উনি বলেন, সকলকে ভালবাসলেই সত্যকার জীবন লাভ হয়, আর এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করেন, শুনে মুগ্ধ হয়ে যাই।

মিস মালতী ওঁকে দেখেন নি ?

আপনি অবাক করলেন, এর মধ্যে মালতীর কথা কি করে এল ?

ইহাদের কথা শেষ হইতে পারিল না, হঠাৎ সামনেকার ঝোপের ভিতর হইতে সর্‌সর্ শব্দ শোনা গেল। খান্না উঠিয়া পড়িল, আর প্রাণ বাঁচাইবার প্রেরণায় রায়সাহেবের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। ঝোপের পিছন হইতে একটি চিতা বাঘ বাহির হইয়া আসিল, আর ধীরে ধীরে সামনের দিকে চলিতে লাগিল।

রায়সাহেব তৎক্ষণাৎ বন্দুক উঠাইয়া তাক করিলেন, কিন্তু খান্না বলিল, এ আপনি কি কোরছেন? খামখা ওকে গুলি করে কি হবে? যদি ঘুরে রুখে আসে?

ঘুরবে আবার কি? ওখানেই শুয়ে পড়তে হবে।

তবে আমাকে ঐ টিবিটার ওপর উঠতে দিন। আমার শিকারে অত শখও নেই, হাতও নেই।

তবে আপনি কি শিকার খেলতে এসেছিলেন?

কপাল আর কি!

রায়সাহেব বন্দুক নামাইয়া লইলেন। বলিলেন, বড় চমৎকার শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেল, এরকম স্থযোগ কমই আসে।

আমি তো আর থাকতে পারছি না। এ বড় বিপদের জায়গা।

আচ্ছা, এক আধটা শিকার তো মারতে দিন। খালি হাতে ফেরা যে বড় লজ্জার কথা।

আপনি অনুগ্রহ করে আমায় গাড়ীর কাছে পৌছে দিন, তারপর নেকড়ে মারুন, বাঘ মারুন, যা খুসি।

আপনি দেখছি, মিঃ খান্না, বড় ভয়কাতুরে।

মিছিমিছি প্রাণটা খোয়ানোতে বাহাদুরি নেই।

বেশ, আপনার ইচ্ছে হয়, ফিরে যান।

একলা?

রাস্তা বেশ পরিষ্কার।

তা হবে না, আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

রায়সাহেব অনেক বুঝাইলেন, খান্না কিছুতে বুঝিল না। ভয়ে উহার মুখ শাদা হইয়া গেল। ঐ সময়ে যদি জঙ্গল হইতে একটা শিয়ালও বাহির হইত, তবে বোধ হয় খান্না ভয়ে মূর্ছা যাইত। সে বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে লাগিল।

ঘামে তাহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া রায়সাহেবকে উহার সঙ্গে ফিরিতে হইল।

অনেকটা দূর আসিবার পর খান্নার হুঁস হইল। বলিল, মরতে ডরাই না, তবে সাধ করে মরণের মুখে পা দিতে চাওয়া বোকামি।

যান যান, একটা চিতাবাঘ দেখে তো ভয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল!

আমার মতে শিকার করা বর্বর যুগের সংস্কার। তার পর থেকে মানুষ সভ্যতার পথে বহুদূর চলে এসেছে।

আমি কিন্তু মিস মালতীর কাছে আপনার সব ফাঁস করে দেব।

অহিংসাবাদী হওয়া আমি লজ্জার মনে করি না।

ওহো, ঐ বুঝি আপনার অহিংসাবাদ! সাবাস্ বাহাদুরি! খান্না গর্বভরে কহিল, নিশ্চয়ই, অহিংসাবাদের জন্যই তো আমি ওরকম করেছি। আপনারা বুদ্ধ আর শঙ্করের নাম নিয়ে বড়াই করেন, এদিকে পশুহত্যা করেন। কার লজ্জা পাওয়ার কথা—আপনাদের, না আমার?

খানিকক্ষণ দুইজনে চুপচাপ পথ চলিতে লাগিলেন, হঠাৎ খান্না বলিল, আচ্ছা, তবে আপনি কবে আসবেন? আমার তো ইচ্ছা, আপনি পলিসির ফরম আজই ভর্তি করে দিন, আর চিনির কলের শেয়ারের কাগজটাও। আমার কাছে ফরম দুখানা মজুদই আছে।

রায়সাহেব চিন্তিত মুখে বলিল, আমি একটু ভেবে নিই।

এর মধ্যে ভাববার কিছুই নেই।

* * *

তৃতীয় দলে ছিলেন মির্জা খুরশেদ আর মিঃ তন্খা। খুরশেদের কাছে অতীত আর ভবিষ্যৎ কিছু নয়, শাদা কাগজের মতই শূন্য, সে জানে শুধু বর্তমানকে। অতীতের জন্য অনুতাপ আফ্‌শোষ নাই, ভবিষ্যতের ভাবনাও নাই। যাহা কিছু সামনে আসে তাহাতেই উঠিয়া পড়িয়া লাগে। বন্ধুদের দলে ও ছিল আনন্দের পুতুল। কাউনসিলে উহার মত উৎসাহী সভ্য আর নাই। যে প্রশ্নটির পিছনে লাগিত, মন্ত্রীদের কাঁদাইয়া ছাড়িত। কাহাকেও রেয়াৎ করিত না, মাঝে মাঝে পরিহাসও করিত। কেবল আজিকার কথাই ভাবিতে জানে, কালিকার কথা মনেও করে না। রাগ তাহার এমন প্রবল যে বুক ঠুকিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে, আবার অপরাধীকে নম্র হইতে

দেখিলে গলিয়া যাইবে। কাহারও অহঙ্কার দেখিলে ও তাহার সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া দেয়। লোককে ধার দিলেও উহার মনে থাকে না, আবার কাহারও কাছে ধার করিলেও শুধিবার কথা ও ভুলিয়া যায়। দুইটি শখ ওর আছে, কবিতা লেখা, আর মদ খাওয়া। স্ত্রীজাতি ওর কাছে কেবল ফুর্তির জিনিস। হৃদয় জিনিসটা ওর বহুদিন আগেই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে।

মিঃ তন্‌খা সুবিধাবাদী লোক। মাল পাঠাইতে, ব্যবসার ফন্দী ফিকির বাহির করিতে, ঝগড়া বাধাইতে, বালি থেকে তেল বাহির করিতে, লোকের মুখ বন্ধ করিতে, কারে পড়িলে ল্যাজ গুটাইয়া পলায়ন করিতে ওস্তাদ। চাই কি, বালুর উপর দিয়া নৌকা চালাইতে, পাথরের বুকে ঘাস জন্মাইতেও সে পারিবে। তালুকদারের দায়ে মহাজনের কাছে থেকে কর্জ যোগাড় করিয়া দেওয়া, নূতন কোম্পানী খোলা, ইলেকশনের সময় প্রার্থী দাঁড় করানো, এই সব হইল তাহার ব্যবসা। বিশেষত ইলেকশনের সময় তাহার বরাত খুলিয়া যাইত। কোন কেন্দ্রে নির্বাচনপ্রার্থী দাঁড় করাইয়া ও তাহার জন্য প্রাণ দিয়া খাটিত, আর দশ বিশ হাজার পকেটে করিত। যখন কংগ্রেসী দলের প্রাধান্য ছিল, তখন কংগ্রেসী প্রার্থীকে সাহায্য করিত, আবার যখন সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের হিড়িক আসিল, তখন ও হিন্দুমহাসভার হইয়া কাজ করিল। কিন্তু ওর এই ডিগবাজী খাওয়ার সপক্ষে ও এমন সব যুক্তি দেখাইতে পারিত যে, কেহ টুঁ শব্দ করিতে পারিত না। সহরে সম্ভ্রান্ত যত লোক, যত আমলা অফিসার, যত গণ্যমান্য ব্যক্তি, সকলেই ওর দোস্ত। অনেকে হয়তো মনে মনে ওর নীতি সমর্থন করিত না, কিন্তু ওর স্বভাবে এমন একটি মাধুর্য ছিল, যাহার জন্য কেহ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না।

মির্জা খুরশেদ রুমালে মুখের ঘাম মুছিয়া লইয়া বলিল, আজকের দিনটা কিন্তু শিকার করার জন্য নয়। এমন দিনে কাব্যচর্চা কোরতে হয়।

তন্‌খা সমর্থন করিয়া বলিল, যা বলেছেন, এই বাগানটা কি চমৎকার!

একটু পরেই তন্‌খা মামলার কথা উঠাইল। এবারকার ইলেকশনে অনেক কিছু গোল হবে, আপনার বোধ হয় একটু মুসকিলই হবে।

মির্জা একটু বিরক্ত ভাবে বলিল, আমি এবার দাঁড়াচ্ছিই না।

তন্‌খা বলিল, কেন?

বাজে বকবক্ কে করে? করে লাভই বা কি? আমার আর এই

ডেমোক্রেসির ওপর ভক্তি নেই। কাজ তো খুব—খালি মাস মাস টাকা নেওয়ার বুদ্ধি। লোকের চোখে ধূলো দেওয়ার উৎকৃষ্ট ছল। এর চাইতে একজন গভর্ণর থাকে সেও ভালো, হোক সে হিন্দুস্থানী বা ইংরেজ, তাতে আসে যায় না। যে গাড়ীকে একটা ইঞ্জিন স্বচ্ছন্দে হাজার হাজার মাইল নিয়ে যেতে পারে, তাকে দশ হাজার জোয়ান লোকেও তেমন জোরে টানতে পারে না। আমি তো সব দেখে শুনে কাউনসিলের উপর বিরক্ত হয়ে গেছি। আমার শক্তি থাকলে এসব কাউনসিল জ্বালিয়ে দিতাম। আমরা আজ যাকে ডেমোক্রেসি নাম দিয়েছি, কার্যত তা কেবল বড় বড় ব্যবসাদার আর জমীদারদের রাজ্য। আর কিছু নয়। ইলেকশনেও সেই লোকই জেতে, যার হাতে আছে টাকার থলি। টাকার জোরে তার সব কিছু আসান হয়। বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় মৌলবী, বড় বড় লিখিয়ে পড়িয়ে লোক, যারা নিজেদের মর্জিমত সাধারণের মনকে চালিয়ে নেয়, সবাই ঐ সোনার বেদীর নীচে মাথা নত করে। আমি তো ঠিক করে ফেলেছি, এবার ইলেকশনের ধারে পাশেও যাব না। আমার কাজ হবে এবার এই ডেমোক্রেসিকে বাধা দেওয়া।

মির্জা সাহেব কোরানের আয়াত হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, প্রাচীন কালের বাদসাহদের আদর্শ কত উচ্চ ছিল। আমরা আজ সেদিকে চাহিবারও যোগ্য নই, চোখ ঝলসাইয়া যাইবে। খাজনার এক পয়সা বাদসাহের নিজের কাজে খরচ করার অধিকার ছিল না। বাদসাহ পুথি নকল করিয়া, কাপড় শেলাই করিয়া, ছেলেদের পড়া বলিয়া দিয়া, আপনার খরচ চালাইয়া লইতেন। মির্জা সাহেব এরকম আদর্শ নরপতির এক লম্বা ফিরিস্তি দিতে পারিত। কোথায় সেই সব আদর্শ প্রজাপালক রাজারা, আর কোথায় আজকালকার এই মন্ত্রীর দল যাহাদের মাসে মাসে চাই পাঁচ ছয় সাত হাজার টাকা নগদ। একে ডেমোক্রেসি বলে, না লুট?

এমন সময় একপাল হরিণ চোখে পড়িল। মির্জার মুখে চোখে শিকারের উৎসাহ ফুটিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বন্দুক উঁচাইয়া গুলি ছুঁড়িল। কালো রং-এর একটি হরিণ আহত হইয়া পড়িল; 'মেরেছি, মেরেছি' বলিতে বলিতে মির্জা ছুটিয়া চলিল, খুসিতে একেবারে শিশুর মত চঞ্চল চরণে, দৌড়াইতে দৌড়াইতে, লাফাইতে লাফাইতে, তালি দিতে দিতে ছুটিল।

কাছেই একটা গাছের উপর একটি লোক কাঠ কাটিতেছিল। সেও

চটপট গাছ থেকে নামিয়া মির্জার সঙ্গে ছুটিয়া চলিল। হরিণটির গলায় গুলি লাগিয়াছিল, পা কখানা তখনও কাঁপিতেছে, চোখ দুটি পাথরের মত নিস্পন্দ।

কাঠুরিয়া করুণভাবে বলিল, বড় ভাল জানোয়ার ছিল, একমণের কম ওজন হবে না। বলেন তো আমি বয়ে আপনার জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি।

মির্জা নীরব। হরিণের স্থির, করুণ চোখ দুটির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। আহা, এক মিনিট আগেও এ জীবিত ছিল! কি ভীরু এরা, একটা পাতার খস্ খস্ শব্দেও কাণ খাড়া করে লাফিয়ে ওঠে, আর দৌড়ে পালায়। নিজের স্বজন আর ছানাপোনা নিয়ে ভগবানের দেওয়া মাঠে ঘাস খাচ্ছিল, আর এখন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। এখন ওর চামড়া ছাড়িয়ে নাও, খণ্ড খণ্ড করে কাটো, মাংসের কিমা বানাও, কিছুই ও জানবে না। ওর ঐ ক্রীড়াময় চঞ্চল জীবনে যে আনন্দ ছিল, যে আকর্ষণ ছিল, এই নির্জীব দেহে তার কি একটুও অবশিষ্ট আছে! কি সুন্দর গড়ন, কি চমৎকার চোখ দুটো, আর কি কোমল দেখতে! ওর উচ্ছল প্রাণের আনন্দ আমারও প্রাণে কি আনন্দের তরঙ্গ তুলত, আর ওকে লাফিয়ে চলতে দেখে আমারও মন চাইত লাফিয়ে নেচে বেড়াতে। ও জীবনের সহজ আনন্দ অকারণে বিকিরণ করে বেড়াত, যেমন করে ফুল করে তার সুগন্ধ বিতরণ। এখন ওকে এরকম দেখে গ্লানিতে মন ভরে যাচ্ছে।

কাঠুরিয়া বলিল, সাহেব, কোথায় নিয়ে যেতে হবে? আমাকেও দুচার পয়সা দিয়ে দেবেন।

মির্জার যেন ধ্যান ভঙ্গ হইল, বলিল, বেশ, উঠিয়ে নিয়ে চল। কোথা যাবে?

আপনি যেখানে নিতে হুকুম দেন।

না, তোর যেখানে ইচ্ছা, আমি তোকে এটা দিয়ে দিচ্ছি।

কাঠুরিয়া তো অবাক! কানে শুনিলেও এমন কথা কি বিশ্বাস হয়!

মাপ করবেন সাহেব, আপনি শিকার করেছেন, আমি কি করে খাই?

না রে না, আমি খুসি হয়েই দিচ্ছি, তুই নিয়ে যা। তোর বাড়ি কতদূর?

আধ ক্রোশ হবে হুজুর।

তা চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। দেখবো, তোমার ছেলেমেয়ে কেমন খুসি হয়।

সাহেব, আমি এরকম নিতে পারি না। আপনি এতদূর থেকে এসেছেন, এই দারুণ রোদে শিকার করেছেন, আর আমি কি করে নিয়ে নিই!

নে, নে, দেরি করিস না। আমি বুঝেছি, তুই বড়ো ভালোমানুষ। কাঠুরিয়া তো ভয়ে ভয়ে আর থাকিয়া থাকিয়া মির্জার মুখের দিকে দেখিতে দেখিতে হরিণটিকে উঠাইয়া লইল। হঠাৎ হরিণটি রাখিয়া দিয়া সোজা দাঁড়াইয়া বলিল, সাহেব, আমি বুঝেছি, তোমরা এ মাংস খাও না।

মির্জা হাসিয়া বলিল, ব্যস, ব্যস, তুই খুব বুঝেছিস, এখন তোল হরিণটা, চল ঘরে চল।

মির্জাজীর ধর্মের জন্য এমন কিছু মাথাব্যথা ছিল না। দশ বৎসর যাবৎ সে একদিনও নমাজ পড়ে নাই। দুমাসে একদিন ব্রত পালন করিত। সেদিন অবশ্য একদম নির্জলা উপবাস। কিন্তু কাঠুরিয়ার মনে এই যে বিশ্বাস জন্মিয়াছে হরিণ উহাদের অখাদ্য, এ বিশ্বাস সে ভাঙ্গিতে চাহিল না।

কাঠুরিয়াও নিশ্চিন্ত মনে হরিণটা ঘাড়ে তুলিয়া বাড়ির দিকে চলিল। তন্‌খা তখন পর্যন্ত উদাসীনভাবে ঐখানেই গাছের নীচে দাঁড়াইয়াছিল। রৌদ্রের মধ্যে কষ্ট করিয়া হরিণের কাছ পর্যন্ত যাওয়ার কি দরকার! এতক্ষণ সময় কিসে লাগিতেছে তাহার বুদ্ধিতে কুলায় না; কিন্তু যখন দেখিল মির্জা উলটা দিকে কাঠুরিয়ার সঙ্গে চলিয়াছে, তখন কাছে গিয়া বলিল, একি, আপনি রাস্তা ভুলে গেলেন নাকি?

মির্জা কৃত্রিম অপরাধীর মত মুখ করিয়া বলিল, আমি এ গরীব বেচারাকে শিকারটা দিয়ে দিয়েছি, আর এখন চলেছি ওর ঘরের দিকে, আপনিও আসুন না।

তন্‌খা আশ্চর্যভাবে মির্জার দিকে চাহিয়া বলিল, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে!

জানি না, হতেও পারে।

শিকার একে কেন দিয়ে দিলেন?

কেন জানেন, এটা পেলে ওর যা আনন্দ হবে, আপনার আমার তা হবে না।

তন্‌খা বিরক্ত হইয়া বলিল, যাক, ভেবেছিলাম কেমন মজা করে কাবাব খাব, তা আপনি সব মাটি করে দিলেন। ভাল, রায়সাহেব আর মেহতা কিছু না কিছু তো আনবেই, কোন ভাবনা নাই। আমি এই ইলেক্‌শনের ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে কিছু বলতে চাই। আপনি নিজে না দাঁড়ান, নাই দাঁড়ালেন, যার যেমন মর্জি; কিন্তু যে লোক দাঁড়াচ্ছে তার যাতে ষোল আনা উশুল হয়

তাতে তো আপনার অমত নেই? আপনার কাছে আমি কেবল এইটুকু চাই, আপনি কাউকে বলবেন না যে আপনি দাঁড়াবেন না। আপনি আমাকে শুধু এইটুকু অনুগ্রহ কোরবেন। খাজা জামাল তাহের এই শহর থেকে দাঁড়িয়েছে। জমিদারেরা তো সবাই ওকেই ভোট দেবে, অফিসারেরাও ওকেই ষোল আনা সাহায্য কোরবে। কিন্তু পাবলিকের কাছে আপনার যা প্রভাব তার কাছে ওর সব চাপা পড়ে যাবে। চান তো দশ বিশ হাজার টাকা আপনি ওর কাছ থেকে পেতে পারেন, আর ওর খাতিরের লোক হয়ে যেতে পারেন···না, না, আমার কথাটা শুনে নিন। আপনাকে কিছু কোরতে হবে না, আপনি চুপচাপ বসে থাকবেন। আমি আপনার পক্ষ থেকে একটি মেনিফেস্টো বার করবো, আর দেখবেন সন্ধ্যা না হতে নগদ দশ হাজার আপনার ঘরে এসে গেল।

মির্জা সাহেব ঘৃণাভরে উহার দিকে চাহিয়া বলিল, আপনার ঐ টাকা আর আপনি—দুই-ই আমি নিন্দার বস্তু মনে করি।

মিস্টার তন্‌খা একটুও বিরক্ত হইল না, গায়েই মাখিল না। আপনি যত খুসি নিন্দা করুন, কিন্তু টাকার নিন্দা করে নিজেরই লোকসান কোরবেন।

এরকম টাকা খাওয়া আমি হারাম মনে করি।

আপনি কোরান শরীফের এত ভক্ত তো ছিলেন না।

লুটের টাকা নেওয়া পাপ, এ জানবার জন্য খুব বেশি বিদ্যার দরকার হয় না।

যাই বলুন, এ ব্যাপারে আপনি নিজের ভাল বুঝতে পারছেন না।

আজ্ঞে, না।

আচ্ছা, তবে একথা থাক। একটা বীমা কোম্পানীর ডিরেকটার হতে তো আপনার আপত্তি নেই? আপনাকে কোম্পানীর একটা শেয়ারও কিনতে হবে না। আপনি শুধু নিজের নামটা দেবেন।

আজ্ঞে না, আমার তাতেও মত নেই। আমি সবই ছিলাম—কোন কোম্পানীর ডিরেকটার, কারো ম্যানেজিং এজেন্ট, কারো চেয়ারম্যান। ধন ঐশ্বর্য আমার পায়ে লুটাত। আমি জানি, টাকা থাকলে আরাম আর বিলাসের কত উপকরণ সংগ্রহ করা যায়; কিন্তু এও জানি, ঐশ্বর্য মানুষকে কিরকম স্বার্থপর করে তোলে, কিরকম কপট, ধূর্ত আর হৃদয়হীন করে দেয়।

আর কোন প্রস্তাব করিতে উকিল সাহেবের সাহসে কুলাইল না। মির্জাজীর

বুদ্ধি আর প্রভাবের প্রতি যে আস্থা ছিল, তাহা যেন অনেক খানি কমিয়া গেল। তন্‌খার কাছে অর্থই সব, কাজেই যে লোক লক্ষ্মীকে এভাবে অবজ্ঞা করে, তাহার সঙ্গে উহার মিল হওয়া সম্ভব কি ?

হরিণ-কাঁধে কাঠুরিয়া ইতিমধ্যে অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে দেখিয়া মির্জা সাহেব জোরে পা চালাইয়া দিল, স্থূলাঙ্গ তন্‌খা পিছনে পড়িয়া রহিল।

সে চিৎকার করিয়া বলিল, মির্জা সাহেব, শুনুন শুনুন, আপনি যে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।

না থামিয়াই মির্জা সাহেব বলিল, ও বেচারা ভারি বোঝা মাথায় নিয়ে কেমন জোরে হেঁটে চলেছে, আর আমরা খালি হাতপায় ওর সমান যেতে পারবো না ?

কাঠুরিয়া একটা পাথরের উপর হরিণটি রাখিয়া একটু দম নিতেছিল। মির্জা বলিল, হাঁপিয়ে গেছিস, না রে ?

কাঠুরিয়া সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, খুব ভারি, সাহেব !

দে, দে, খানিকটা পথ আমি নিয়ে যাই। কাঠুরিয়া হাসিয়া ফেলিল। দেখিতে তো মির্জা গোলগাল, উহার অপেক্ষা কত বড় সড়, আর তাহার তুলনায় কাঠুরিয়া তো রোগাপটকা। তবু সে হাসিল—দেখিয়া মির্জাকে কে যেন চাবুক মারিল।

কি রে, হাসছিস কেন ? ভেবেছিস আমি নিতে পারবো না ?

কাঠুরিয়া মাপ চাহিল , সাহেব, আপনারা বড়লোক, এসব ভারি কাজ করা, বোঝা বওয়া, এ-তো আমাদের মত মজুরদের কাজ !

আরে, আমার গায়ে তোর দ্বিগুণ জোর।

তাতে কি হয় বাবু !

নিজের শক্তির এ অপমান মির্জা সাহেবের সহ্য হইল না। সে তাড়াতাড়ি হরিণটা কাঁধে ফেলিয়া চলা শুরু করিল, কিন্তু কি মুসকিল, পঞ্চাশ পা না যাইতেই মনে হইল কাঁধ বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইবে, পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আর চোখে সরষে ফুল দেখিতে লাগিল। মন শক্ত করিয়া আরও কুড়ি পা চলিল, তারপর একটু দাঁড়াইল। উহার মনে হইল, মরা হরিণের দেহে বুঝি কেহ পাথর ভরিয়া দিয়াছে। মনে হইল, আচ্ছা, একবার মিঃ তন্‌খার ঘাড়ে যদি এই বোঝা চাপান যায় তবে কেমন মজা হয় ! ঐ যে মশকের মত মোটা শরীর থপ থপ করিয়া হাঁটিতেছে, একবার উহার মজা দেখিলে হয়। কিন্তু এই বোঝা নামাই কি

করিয়া! উহারা দুইজন তো বলিবে, খুব জোয়ান মর্দর মত চলিয়াছে, কিন্তু পঞ্চাশ পা চলিতেই গলার স্বর চিঁ চিঁ করিতেছে।

কাঠুরিয়া খোঁচা দিয়া বলিল, বলুন সাহেব, কেমন লাগছে, খুব হালকা?

মির্জার তখন বোঝাটা সত্যই একটু হালকা মনে হইতেছিল, বলিল, তুমি যতটা পথ নিয়ে এসেছ ততদূর তো আমিও নিয়ে যাব।

বাবু, অনেক দিন ধরে আপনার ঘাড় ব্যথা কোরবে।

তুই কি ভাবিস, আমি অমনই মোটা, গায়ে জোর নেই আমার?

না বাবু, আমি এখন আর তা মনে করি না। তবে আপনি হয়রান কেন হবেন, ঐ পাথরটার ওপর একটু বোঝাটা নামিয়ে নিন।

আমি আরো এতটা পথ ওকে নিয়ে যেতে পারি।

কিন্তু আমার যে খারাপ লাগছে, আপনি বোঝা বয়ে যাচ্ছেন, আর আমি খালি হাত পায়ে চলেছি।

মির্জা তখন পাথরের উপর হরিণটা রাখিল, ইতিমধ্যে তন্‌খা আসিয়া পৌঁছিল।

মির্জা গম্ভীর স্বরে বলিল, জনাব, এবার তো আপনার বইবার পালা। উকিল সাহেবের চোখে মির্জার এই কাজে এমন কিছু মহত্ত্ব ছিল না, সে বলিল, আমাকে মাপ কোরবেন, আমার মাথা খারাপ হয় নি।

সত্যি বলছি, খুব বেশি ভারি নয়।

আচ্ছা, থাক না।

দেখুন মিঃ তন্‌খা, আমি কথা দিচ্ছি, আপনি আমার কাছে যা কিছু পেশ করবেন সব মঞ্জুর হবে যদি আপনি খালি একশ পা এটা ঘাড়ে করে নিয়ে চলেন।

আমি এরকম বাজি ধরি না।

আমি আপনাকে ধোঁকা দিচ্ছি না, বন্ধু, আপনি দাঁড়াতে বলেন দাঁড়াব, বসতে হুকুম দিলে বসব। যে কোম্পানীর ডিরেকটার, মেম্বার, অংশীদার হোতে বলবেন, তাই হব। খালি আপনি একশ পা এই বোঝাটা ঘাড়ে করে নিয়ে যাবেন। আমি এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাই, যে দরকার পড়লে সব কিছু কাজই করতে পারে।

তন্‌খার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মির্জা কথা দিলে কথা রক্ষা করে, তাহা

উহার জানা ছিল। আর হরিণ এমন কতই বা ভারি হইবে? মির্জা তো এতদূর লইয়া আসিয়াছে। খুব বেশি হইলে না হয় হাঁপাইয়া উঠিবে, প্রাণে তো মরিবে না। এদিকে অস্বীকার করিলে স্বর্ণ সুযোগ চলিয়া যায়। এমন কোন পাহাড়ের মত ইহা ভারি হইবে? খুব বেশি তো চার পাঁচ মণ। দুই চার দিন না হয় ঘাড়ের ব্যথা থাকিবে। পকেটে টাকা আসিলে অল্প বিস্তর রোগ তো বিলাসের জিনিস।

একশ পা যেতে হবে?

হাঁ, একশ। আমি গুণতে গুণতে যাব।

দেখবেন, ফাঁকি দেবেন না যেন।

ফাঁকি দেওয়ার পাত্র আমি নই।

তন্‌খা জুতার ফিতা খুলিয়া ভাল করিয়া বাঁধিল, গায়ের কোটটা খুলিয়া কাঠুরিয়ার হাতে দিল, পাতলুনটা উঁচু করিয়া পরিল, মুখের ঘাম রুমালে মুছিয়া ফেলিল, তার পর এমন ভাবে হরিণের দিকে তাকাইল, যেন শূলে উঠিতে চলিয়াছে। তারপর হরিণটাকে কাঁধের উপরে উঠাইবার চেষ্টা করিল। দুই তিন বার জোরে টানাটানির পর লাশ তো কাঁধে উঠিল, কিন্তু তন্‌খার ঘাড় যে উঁচু হয় না। কোমর বাঁকিয়া যায়, হাঁপ ধরিয়া যায়, এই বুঝি লাশ মাটিতে ফেলিয়া দেয়, এমন সময় মির্জা উহার সাহায্যের জন্য হাত বাড়াইল। তন্‌খা এমন ভাবে পা বাড়াইল যেন কাদায় পিছল মাটির উপর দিয়া চলিতেছে। মির্জা অভয় দিয়া বলিল, সাবাস বীর, সাবাস জোয়ান!

তন্‌খা আর এক পা চলিল, মনে হইল ঘাড় এখনি ছিঁড়িয়া পড়িবে। মির্জা বলিল, মার দিয়া কেল্লা, বেঁচে থাক জোয়ান!

তন্‌খা আর দুই পা গেল, চোখ দুইটি বুঝি ঠিকরাইয়া পড়ে।

ব্যস্, আরেকবার জোরে চালাও বন্ধু, একশ পায়ের চুক্তি উঠিয়ে নিচ্ছি, পঞ্চাশ পা গেলেই হবে।

উকিল সাহেবের অবস্থা কাহিল। মরা হরিণ বাঘের মত উহার ঘাড়ে চাপিয়া আছে, উহার বুকের রক্ত শুষিয়া লইতেছে। শরীরের সমগ্র শক্তি জবাব দিয়া বসিয়াছে। কেবল লোভ লৌহ যন্ত্রের মত বুকের মধ্যে আঁটিয়া বসিয়াছে, এক দুই নয়, পঁচিশ হাজারে টিল ছোঁড়া হইয়াছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এত বড় প্রাপ্তির আশাও হার মানিয়া গেল। লুব্ধ তন্‌খার কোমর ফাটিয়া

গেল, চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া গেল, আর লাশ মাথায় সে পাথুরে জমির উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

মির্জা তাড়াতাড়ি আসিয়া উহাকে তুলিয়া ধরিল, নিজের রুমাল দিয়া উহার মুখে হাওয়া করিল, আর আস্তে আস্তে পিঠটা চাপড়াইতে লাগিল।

বন্ধু, তুমি তো খুব চেষ্টা করেছ, কিন্তু ভাগ্য যে বিরূপ। তন্‌খা হাঁপাইতে হাঁপাইতে জোরে শ্বাস লইয়া বলিল, আপনি তো আজ আমায় মারবার উপক্রম করেছিলেন, বেটা দুমণের কম হবে না ওজনে।

মির্জা হাসিতে হাসিতে বলিল, কিন্তু ভাইজান, আমিও তো এতটা পথ নিয়ে এসেছি ওকে।

উকিল সাহেব খোসামোদ আরম্ভ করিল, আমার তো ইচ্ছা ছিল আপনার ফরমাস খেটে দিই। আপনি মজা দেখাতে চেয়েছিলেন, তা দেখলাম। এখন আপনার কথা রাখতে হবে।

তা আপনি চুক্তি পালন তো করেন নি!

চেষ্টা তো প্রাণ দিয়ে করেছি।

এমন তো কথা ছিল না।

ইতিমধ্যে কাঠুরিয়া হরিণটি ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া জোরে জোরে হাঁটিয়া চলিয়াছে। ও যেন দেখাইতে চায় যে, তোমরা কুঁথিয়া ককাইয়া দশ পা আনিয়াই মনে করিও না যেন খুব বাজি মাত করিলে। আমি দুর্বল হইলেও এ বিষয়ে তোমাদের আগে আগে চলিব।

একটা নালা পথে পড়িল, তবে জল খুব কম। নালার অপর পারে ছোট একটি টিবির উপর পাঁচ ছয় ঘরের একটি ছোট বস্তি, একটা তেঁতুল গাছের তলায় কতগুলি ছেলে খেলিতেছিল। কাঠুরিয়াকে দেখিতে পাইয়া সবাই ছুটিয়া আসিল আর জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল, বাবা, কে মেরেছে, কোথায় মারল, কোনখানে গুলি লেগেছে, আহা এটারই কেন লাগল, আর কোন হরিণের তো লাগেনি। কাঠুরিয়া হুঁ হাঁ বলিতে বলিতে তেঁতুল গাছের তলায় পৌঁছিল। হরিণটা নামাইয়া ভদ্রলোক দুইটির জন্য চারপাই আনিতে ছুটিল। উহার চারিটি ছেলেমেয়ে ততক্ষণে হরিণকে নিজেদের চার্জে নিয়া নিয়াছে, আর পাড়ার অন্য ছেলেদের হাঁকাইয়া দিতে শুরু করিয়াছে।

সকলের ছোট ছেলেটি বলিল, এটা আমার। উহার আগের বোনটি,

বয়স চোদ্দ পনেরো, সে গণ্যমান্য অতিথিদের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, চুপ, নইলে সেপাই ধরে নেবে।

মির্জা ছেলেদের খেপাইবার জন্য বলিল, তোমাদের নয়, এটা আমার। ছেলেটি হরিণের উপর চড়িয়া বসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, আমার বাবা যে আনল।

বোনটি শিখাইয়া দিল, ভাই বল্ না, হাঁ, তোমারই। শিশুদের মা ছাগলের জন্য ঘাস পাতা ছিঁড়িতেছিল, দুইটি নবাগত ভদ্রলোককে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া বাহিরে আসিল। উহার লজ্জা হইতে লাগিল, কি ময়লা কাপড় উহার পরনে, তাও ছেঁড়া, হাঁটু পর্যন্ত আসে। এই বেশে অতিথির সম্মুখে কি করিয়া যাওয়া যায়? আর না গেলেই বা চলে কি? একটু জল টল তো দিতে হইবে।

এখনও দুপুরের কিছু দেরি আছে, কিন্তু মির্জা সাহেব ঠিক করিলেন দুপুরটা এদের গাঁয়েই কাটাইবেন। গাঁয়ের সব লোককে ডাকিয়া জড়ো করিলেন। মদ আনিতে হুকুম দিলেন, মাংস রান্না হইল, নিকটেই বাজার, সেখান হইতে ঘি ময়দা আসিল। সারা গাঁকে ভোজ দেওয়া হইল। ছোট বড়, স্ত্রী পুরুষ সবাই মজা করিল। পুরুষেরা খুব মদ খাইল, আর মত্ত হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত গান বাজনা করিল, আর মির্জাজী বালকের সঙ্গে বালক হইয়া, মাতালের সঙ্গে মাতাল সাজিয়া, বুড়োদের সঙ্গে বুড়ো বনিয়া, আবার জোয়ানদের সঙ্গে জোয়ান সাজিয়া খুব মিশিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে সকলের সঙ্গে উহার এত ঘনিষ্ঠতা জন্মিল, মনে হইবে এই গাঁয়ে উহার কত কালের বাস। ছেলেরা তো উহার সঙ্গে সাঁটিয়া রহিল। কেহ উহার বুটিদার টুপি লইয়া মাথায় পরে, কেহ উহার রাইফেল নিয়া ঘাড়ে ফেলিয়া দেখে, কেহ উহার হাতঘড়ি নিয়া হাতে পরিয়া সকলকে দেখায়। মির্জা নিজেও যথেষ্ট পরিমাণে ধেনো মদ খাইয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে সমান তালে উহাদের গান গাহিতে লাগিল।

সূর্যাস্তের সময় যখন ইহারা গাঁয়ের লোকের কাছে বিদায় লইবে তখন গ্রামের ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ সকলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের আগাইয়া দিতে বহুদূর আসিল। কত জনে কাঁদিতে লাগিল। এমন বড়লোক শিকারী উহাদের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়া মিশিয়া ফুর্তি করিয়া গেল, এরকম সৌভাগ্য উহাদের জীবনে এই প্রথম। ইহারা নিশ্চয় কোন রাজারাজড়া, নতুবা এমন দিলদরিয়া হওয়া কি সম্ভব? আবার কবে ইহাদের দর্শন মিলিবে!

একটু গিয়া মির্জা পিছন ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, বেচারাদের কত না আহ্লাদ হোল। আমারও আজকের দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইচ্ছা হয়, এমনই সহজ আনন্দ যদি রোজ জুটতো।

তন্‌খা গভীর বিরক্তিভরে বলিল, আপনার তো আনন্দের দিন গেল, কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগে নি। কাজের কথা তো কিছুই হোল না। দিন ভোর কাটলো পাহাড় জঙ্গলে হয়রানিতে, আর এখন ঘরে ফিরে চলেছি যেমনকার তেমনই।

মির্জা নির্দয়ভাবে বলিল, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে মিলতে পারলাম না।

ইহারা দুই জনে যতক্ষণে বটগাছের তলায় আসিয়া পৌছিল, ততক্ষণে অন্য দুই দলও ফিরিয়াছে। মেহতার মুখ যেন তালাবন্ধ। মালতী বিমনা, একটু দূরে একলা বসিয়া। তাহার এই ভাব একেবারে নূতন, এমন কখনো হয় না। রায়সাহেব আর খান্নার খাওয়া জোটে নাই, ক্ষুধায় তাহারা কাতর, মুখে কথা নাই। উকিল সাহেব অপ্রসন্ন, কারণ মির্জা উহাকে এমন ভাবে নাচাইল। একমাত্র মির্জা সাহেবের মন অলৌকিক প্রসন্নতায় পূর্ণ।

## ৮

যেদিন হইতে হরির ঘরে গাই আসিয়াছে, সেদিন হইতে ঘরের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। ধনিয়ার তো এমন অবস্থা, দর্প চাপিয়া রাখিতে পারে না। যখনই যাও, দেখিবে সে গোরুর সেবায় লাগিয়া আছে।

ভুষি ফুরাইয়া গিয়াছিল। আখে অল্প অল্প কটু গন্ধ পাওয়া যাইতেছে, উহাই কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গোরু ছাগলকে খাওয়াইতে হইতেছে। কবে বৃষ্টি পড়িবে, নতুন ঘাস গজাইবে, এই আশায় সকলে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। আষাঢ়ের মাঝামাঝি, তাও বর্ষা নামিল না।

সহসা একদিন বৃষ্টি নামিল, আষাঢ়ের প্রথম ধারাবর্ষণ হইল। কিষাণ লাঙ্গল নিয়া মাঠে গেল বীজ বুনিতে—এমন সময় রায়সাহেবের পেয়াদা আসিয়া বলিল, বাকি শোধ না দিলে কেহ মাঠে হাল চালাইতে পারিবে না। কিষাণদের মাথায় যেন বাজ পড়িল। আগে তো কখনো এত কড়াক্কড় হয় নাই, এবার কেন এই হুকুম? গ্রাম তো ছাড়িয়া যাওয়া যায় না, আর ক্ষেত না চাষ করিলে টাকা

শুধিবে কি করিয়া? সেই ক্ষেত হইতেই দিবে তাড়াইয়া? সকলে মিলিয়া পেয়াদার কাছে কাঁদিয়া পড়িল। পেয়াদার নাম পণ্ডিত নোখেরাম। লোকটি মন্দ নয়। কিন্তু হুকুম যে মালিকের। ও তাহা ঠেলিতে পারে না। এই তো সেই দিন, রায়সাহেব হরির উপর কত সদয় ভাব দেখাইলেন, কত ভাল ভাল কথা বলিলেন, আর আজই বেচারা কিষাণদের উপর এই জুলুম! হরির মনে হইল, এখন একবার মালিকের কাছেই যায়, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, গিয়া লাভ হইবে না, কর্মচারীকে একবার যে হুকুম দিয়াছেন তাহার কি নড়চড় করিবেন? তাহা ছাড়া আর কেহ যদি কিছু না বলে, তবে সেই বা আগ বাড়াইয়া গিয়া খারাপ নাম কিনিবে কেন? বাজ যদি সকলের মাথায় পড়িল, সেও মাথা পাতিয়াই লইবে।

কিষাণদের মধ্যে সোরগোল পড়িয়া গেল। সবাই ছুটিল, গাঁয়ের মহাজনের কাছে যদি ধার পাওয়া যায়। গাঁয়ে আজকাল মঙ্গরু সাহারই নাম ডাক। এই বছরটা উহার খুব লাভের বরাত দেখা যাইতেছে। গম আর তিসিতে উহার কম আয় হয় নাই। পণ্ডিত দাতাদীন আর দুলারী সাহুয়াইনেরও কারবার মন্দ চলে না। সবচেয়ে বড় মহাজন হইল ঝিংগুরী সিংহ। সে আবার শহরের এক বড় মহাজনের দালাল। উহার অধীনে বেশ কয়েকটি লোক খাটে, তাহারা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া লেন-দেনের কাজ করে। এ ছাড়াও আরো মহাজন আছে, যাহারা লেখাপড়া না করিয়া টাকায় দুই আনা সুদে ধার দেয়। গাঁয়ের লোকদের টাকা সুদে খাটানোর এমনই শখ, যাহার হাতে কুড়ি পঁচিশটি টাকা জমিল, সে-ই মহাজন হইয়া বসিল। হরিও একসময় মহাজনি করিয়াছে। তখন উহার এত প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, আজও লোকে ভাবে হরির হাতে লুকানো টাকা আছে। তবে সে টাকা গেল কোথায়? কেহ চুরি বাটপাড়ি করে নাই, হরি দানধ্যান, তীর্থভ্রমণ কিছু করে নাই, খাইয়া উড়ায় নাই, তবে টাকা গেল কিসে?

কেহ কেহ টাকায় আনা সুদে ধার করা ঠিক করিল, কেহ টাকায় দুই আনায়। হরির আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। যাহাদের আগের ধারই বাকি পড়িয়া আছে, তাহারা কোন মুখে আবার ধার করিতে যায়? ঝিংগুরী সিংহ ছাড়া আর কেহ তো চোখে পড়ে না। সে কাগজ লেখায় পাকা, নজরানা আলাদা লেখে, দস্তুরী আলাদা, স্ট্যাম্পের দাম আলাদা ধরে। তাহা ছাড়া এক বছরের সুদ কাটিয়া রাখিয়া টাকা ধার দেয়। পঁচিশ টাকার কাগজ লিখাইয়া

অতি কষ্টে তুমি সতেরোটি টাকা পাইবে। কিন্তু এই দুঃসময়ে করাই বা কি? রায়সাহেবের জুলুমবাজি, তাহা না হইলে এসময় কেন অন্যের কাছে হাত পাতিতে হইবে?

ঝিংগুরী সিংহ বসিয়া দাঁতন করিতেছিল। বেঁটে, মোটা, টাকপড়া, কালো, মস্ত একটা নাক আর তাহাতে প্রকাণ্ড এক জোড়া গোঁফ লোকটি যেন একটি ভাট। আর সত্যই খুব রসিক। এ গাঁয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি পাতাইয়া পুরুষদের শালা আব মেয়েদের শালী-শালাজ বানাইয়া খুব রঙ্গ করিত। ছেলেরা উহাকে পথে দেখিতে পাইলে চিৎকার করিয়া বলিত, পণ্ডিতজী, নমস্কার, আর সে চটপট আশীর্বাদ করিত, চোখ কানা হোক, তোর ঘরে আগুন লাগুক, মৃগী রোগ হোক ইত্যাদি। ছেলেরা এই সকল আশীর্বাদ-বাণীতে হাসিয়া লুটাইত, কেহ ভুল বুঝিত না। কিন্তু টাকা লেন-দেনের ব্যাপারে লোকটি বড়ই কড়া। সুদের এক পাই কখনও ছাড়ে না, আর সময় হইলে পয়সা না নিয়া কেহ উহার ঘরের দরজা মাড়াইতে পারে না।

এ হেন লোককে নমস্কার করিয়া হরি নিজের বিপত্তির কথা বলিল। ঝিংগুরী সিংহ রসিকতা করিয়া বলিল, কি হে, তোমার সব টাকা গেল কোথায়?

ঠাকুর, হাতে যদি আগেকার কিছু টাকা থাকতো, তবে কি মহাজনের হাত থেকে মাথাটা ছাড়িয়ে আনতাম না? কেউ কি সখ করে অপরের কাছে সুদ গুণতে চায়?

তোমাদের তো রেওয়াজ দেখি যে সুদের টাকা জীবনভর দিয়ে যাবে, তাও আসল এক পাই শুধবে না।

কোথা পাই বাবুসাহেব, খাওয়াই জোটে না ভাল করে। ছেলে জোয়ান হয়ে উঠেছে, কি উপায়ে তার বিয়ে দেব তার ঠিক নেই। এদিকে বড় মেয়েও বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। টাকা থাকলে আর কিসের জন্য তা পুঁতে রেখেছি?

যেদিন ঝিংগুরী সিংহ হরির বাড়িতে গোরু বাঁধা দেখিয়াছে, সেই দিন হইতে উহার উপর নজর দিয়াছে। গোরুটার যেমন সুন্দর গড়ন, তাতে পাঁচ সেরের কম দুধ নিশ্চয় দেয় না। মনে মনে আঁটিয়া রাখিয়াছিল যে হরিকে বেকায়দায় ফেলিয়া গোরুটি আত্মসাৎ করিতে হইবে। আজ সেই সুযোগ উপস্থিত।

বলিল, আচ্ছা ভাই, মানলাম তোমার হাতে পয়সাকড়ি নেই। যত টাকা চাও নিয়ে যাও। তবে তোমার ভালোর জন্যেই বলি কি, কিছু গয়নাগাঁটি থাকলে তা বাঁধা দিয়ে টাকাটা নাও। দলিল লেখাপড়া করতে গেলে সুদও বেশি পড়ে, তাছাড়া নানান ঝামেলা।

হরি দিব্য করিয়া বলিল, ভাই, সোনার একটি সুতোও নেই আমার ঘরে। ধনিয়ার হাতে বালা আছে, তাও গিল্টী করা।

মুখে সমবেদনার ভাব ফুটাইয়া ঝিংগুরী সিংহ বলিল, আচ্ছা, তবে এক কাজ কর, তোমার ঘরে যে নতুন গোরুটি দেখেছি, ঐটে আমায় বেচে টাকা নাও। সুদ, স্ট্যাম্প, দলিল দস্তাবেজ সব হাঙ্গাম বেঁচে যাবে। আর পাঁচ জনে যে দাম দিতে চায় তাই আমিও দেব। তোমার ভাবে মনে হচ্ছে, গাইটা তুমি বড় শখ করে কিনেছ, ওকে বেচতে চাও না, তা এই বিপদ থেকেও তো উদ্ধার পেতে হবে?

হরি প্রথমে তো এই প্রস্তাব হাসিয়াই উড়াইয়া দিল, আমল দিতেই চাহিল না। কিন্তু সিংহজী তাহার কূটবুদ্ধিতে অন্য মহাজনদের দারুণ প্যাঁচকসা ইত্যাদি বিষয় এমন ভীষণ ভাবে উহাকে ব্যাখ্যা করিল যে শেষে উহার মনেও কথাটা গাঁথিয়া গেল। ঠাকুর তো ঠিকই বলিতেছে, হাতে টাকা আসিলেই আবার গাইটি ফিরাইয়া লইতে পারিব। এদিকে যদি ত্রিশ টাকা ধারের জন্য দলিল লিখাই, তবে হাতে আসিবে বড় জোর পঁচিশ টাকা, তাহার পর যদি দু তিন বছরে শোধ দিতে না পারি তো নিশ্চিত সেটা একশ হইয়া দাঁড়াইবে। পূর্ব অভিজ্ঞতায় সে জানে, ঋণ এমন অতিথি যে একবার আসিয়া ঘাড়ে চাপিলে আর নামিবার নাম করে না।

মুখে বলিল, আচ্ছা, ঘরে যাই, সবার সঙ্গে পরামর্শ করে যা ঠিক হয় বলব।

পরামর্শ আবার কি করবে? ওদের বলে দেবে যে টাকা ধার নিতে হলে নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছু নেই।

ঠাকুর, আমি আপনার কথা বুঝেছি, এখুনি এসে জবাবটা দিয়ে যাব।

কিন্তু ও ঘরে আসিয়া যেই কথাটি বলিল, অমনি সমস্বরে সকলে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। ধনিয়ার গলা তো কমই, দুই মেয়ে চিৎকারে দুনিয়া মাথায় করিল—দেব না আমাদের গাই, যেখান থেকে পার টাকা আন। সোনা এমন

কথা পর্যন্ত বলিল যে, আমাকে বেচিয়া টাকা আন, গাইটার চাইতে কিছু বেশিই আসিবে। হরি মহা সমস্যায় পড়িল।

মেয়ে দুইটির সত্যই গাই-অন্ত প্রাণ; রূপা তো উহার গলা জড়াইয়া পড়িয়া থাকিত, উহাকে না খাওয়াইয়া একটি দানাও মুখে তুলিত না। গোরুটাও কি গভীর স্নেহভরে উহার হাত চাটিয়া দিত, আর কেমন প্রেমভরা চোখে উহার দিকে চাহিয়া থাকিত। শীঘ্রই উহার কেমন সুন্দর বাছুর হইবে, এখনই তো তাহার নামকরণ হইয়া গিয়াছে, 'মটরু'। বাছুরটা তো উহাদের বিছানায়ই ঘুমাইবে। এই গোরুটিকে নিয়া দুই বোনে কত ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। সোনা বলে গোরু উহার দিকে বেশি করিয়া দেখে, রূপা বলে উহারই দিকে। ইহার মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয় নাই, তাই দুইজনের দাবিই কায়েম রহিয়াছে।

এদিকে হরি ভালমন্দ পাঁচরকম বুঝাইয়া ধনিয়াকে কিছু রাজি করিয়া আনিয়াছে। হাঁ, এক বন্ধুর কাছ থেকে গাই ধার করিয়া আনিয়া অপরের কাছে তাহাকে বেচিয়া দেওয়া খারাপ কাজ সন্দেহ নাই, তবে তেমন দুরবস্থায় পড়িলে ধর্মই বেচিতে হয়, এ আর বেশি কি? এই জন্যেই না লোকে বিপদকে এত ডরায়? গোবর অবশ্য তেমন কিছু আপত্তি করিল না। সে আজকাল অন্য ব্যাপারে মাতিয়া আছে। অবশেষে স্থির হইল যে, মেয়ে দুইটি ঘুমাইয়া পড়িলে চুপিচুপি গিয়া গোরুটা ঝিংগুরী সিংহকে দিয়া আসা হইবে।

দিন কোন ক্রমে কাটিল। সন্ধ্যা হইয়াছে। আটটা-না বাজিতে দুই বোনে খাওয়া দাওয়া করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গোবর এই করুণ দৃশ্যটা দেখিতে চায় না, সে কোথায় বাহির হইয়াছে। গাভীটি ইহাদের বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য ও কেমন করিয়া দেখিবে? চোখের জল সে কেমন করিয়া বাধা দিবে? হরি বাহিরে কঠিন হইলেও উহার মনও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এমন কোন মায়ের দুলাল কি নাই যে আজ পঁচিশটা টাকা উহাকে ধার দেয়, ও না হয় পঞ্চাশ টাকা তাহাকে শোধ দিবে। গোরুটির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে উহার মনে হইল, সজল চোখে করুণ চাহনি দিয়া গোরুটি যেন বলিতেছে, আমাকে চারি দিন রাখিয়াই তোমার সাধ মিটিয়া গেল? তুমি না কথা দিয়াছিলে, প্রাণ থাকিতে আমাকে পরের কাছে বেচিবে না? এই তোমার কথার দাম? আমি তো তোমার কাছে কোন কথার খেলাপ করি নাই। শুকনো শাকনা যাহা কিছু খাইতে দিয়াছ, তাহাই খাইয়া তো আমি সন্তুষ্ট ছিলাম!

ধনিয়া বলিল, মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে, এইবেলা নিয়ে যাও না তাড়াতাড়ি! বেচবেই যদি, তবে এখনই নিয়ে যাও।

হরি ধরা গলায় বলিল, আমার যে হাত সরে না ধনিয়া, মহাজনের মুখ আর দেখবো না। থাক, থাক, সুদেই টাকা ধার করবো। ভগবান দিন দিলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। তিন চার শ ধার হলেই বা ভয় কি? একবার আখটা ভাল উঠলেই হবে।

ধনিয়া গর্ব আর অনুরাগে ভরা দৃষ্টি মেলিয়া বলিল, তা নয় তো কি? এত তপস্যার পর একটা গোরু ঘরে এসেছে, তা নাকি বেচা যায়? নিয়ে এসো কাল টাকা ধার করে, আর পাঁচটা যেমন করে চলে যাচ্ছে, এ টাকাও তেমনই শুধে দেব।

ঘরের ভিতরে বড় গুমোট, হাওয়া একেবারে বন্ধ, গাছের একটা পাতাও নড়ে না। মেঘে আকাশ ছাইয়া আছে, তবু বৃষ্টির দেখা শোনা নাই। হরি গোরুটিকে বাহিরে নিয়া বাঁধিয়া রাখিল। ধনিয়া একবার বলিল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? হরি যেন শোনেই নাই, এমন ভাবে বলিল, একটু বাতাসের জায়গায় নিয়ে বাঁধছি, আরামে থাকবে। ওরও প্রাণ আছে তো? গোরুটা বাঁধিয়া সে শোভা নামে তাহার এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। শোভার কয় মাস যাবৎ হাঁপানির ব্যামো হইয়াছে। ওষুধ পথ্যের সংস্থান করার শক্তি নাই; খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নাই, অথচ প্রাণপাত খাটিতে হয়। শোভা ধীরস্থির, সহিষ্ণু প্রকৃতির, ঝগড়া ঝাঁটি থেকে যোজন দূরে থাকে, কাহারও কথায় থাকে না, নিজের কাজ করিয়া যায়। হরির উহাকে বড় ভালো লাগে, সেও হরিকে ভালবাসে। দুইজনের মধ্যে টাকা পয়সার কথা শুরু হইল, আর এই আলোচনার কেন্দ্র হইল রায়সাহেবের নূতন আদেশ।

এগারোটা বাজিতেই হরি ঘরে ফিরিল, ভিতরে যাইবে এমন সময় মনে হইল কে যেন গোরুটার কাছে দাঁড়াইয়া। জিজ্ঞাসা করিল, কে রে ওখানে দাঁড়িয়ে?

হীরা বলিল, দাদা আমি, তোমার উনন থেকে একটু আগুন নিতে এসেছি।

হরির উনন থেকে আগুন নিতে আসিয়াছে, এই সামান্য কথাতেই হীরা যে ওর ভাই সেই পরিচয় মিলিবে। গাঁয়ে আরো তো উনন আছে। সব জায়গা থেকেই আগুন নিতে পারা যায়। হীরা যে আর কোথাও না গিয়া

ওর কাছে আসিয়াছে, সে তো তাহাকে আপনার মনে করে বলিয়াই। সারা গাঁয়ের লোক অবশ্য এখানে আসে আগুন নিতে, কারণ এঘর সকলের চেয়ে সম্পন্ন; কিন্তু হীরার কথা ভিন্ন। তাও আবার সেই দিনের ঝগড়ার পর! হরির মনে কপটতা নাই, রাগ তাহার হইয়াছে বটে, কিন্তু মন পরিষ্কার!

সে স্নেহমাখা স্বরে বলিল, তামাক আছে, না আমি দেব?

না, তামাক আছে, দাদা।

শোভার আজ বড় বাড়াবাড়ি।

কোন ওষুধ খাবে না, তো কি করা যাবে? ওর মতে তো ডাক্তার বৈদ্য, হাকিমি শাস্ত্র, সব বাজে। ভগবান যেন যত বুদ্ধি সব ওর আর ওর স্ত্রীর ঘটেই ঢেলে দিয়েছেন।

হরি চিন্তিত ভাবে বলিল, এইটেই ওর খারাপ। কাউকে নিজের সমান মনে করে না। অবশ্য অসুখের সময় সবাই খিটখিটে হয়ে যায়। তোর মনে আছে, যেবার তোর ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, ওষুধ নিয়ে বাইরে ফেলে দিতিস! আমি তোর হাত দুটো চেপে ধরে রাখতাম, আর তোর বৌদি মুখের মধ্যে ওষুধ জোর করে ঢেলে দিত। তুই ওকে কত গালাগালি করতিস।

হাঁ, নিশ্চয় মনে আছে দাদা, সে কথা কি ভুলতে পারি? তোমরা যদি অত করে না বাঁচাতে তবে আজ তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া কে কোরতো?

হরির মনে হইল হীরার গলার স্বর যেন ভারি ভারি, গলা ধরা ধরা; বলিল, আর ভাই ঝগড়াঝাঁটি তো মানুষের স্বভাব। আর নিজের লোকের সঙ্গেই তো ঝগড়া, পরের সঙ্গে কি হয়? ঘরে চার পাঁচ জন লোক থাকলে তবেই না বাদবিসম্বাদ, যার একা ঘর তার সঙ্গে ঝগড়া ঝামেলা করে কে?

দুই ভাই একসঙ্গে তামাক খাইতে লাগিল, তাহার পর হীরা ফিরিয়া গেল আর হরি অন্দরে প্রবেশ করিল।

ধনিয়া রাগত সুরে বলিল, দেখ তোমার উপযুক্ত পুত্রের কীর্তি দেখ, এতখানি রাত হয়েছে, তা বাবুর সাঁঝবেড়ানো শেষ হোল না। আমি সব জানি। সব খবর পেয়ে গেছি। ভোলার ঐ যে বিধবা মেয়েটা আছে না, ওর খপ্পরে পড়ে গেছে।

হরির কানেও একথার আভাস পৌছিয়াছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস করে নাই। গোবর তো ছেলেমানুষ, সে এসবের কি জানে?

বলিল, কে তোকে বলল ?

ধনিয়া রণচণ্ডী মূর্তি ধরিয়া বলিল, তোমার কাছেই শুধু লুকানো আছে, তা ছাড়া সব জায়গায়ই তো এই নিয়ে চর্চা চলেছে। তোমার ছেলেটা বোকা, ওদিকে সে তো সাতঘাটের জল খাওয়া মেয়ে। এক আঙ্গুলে তুলেই একে নাচাচ্ছে, আর ছেলে মনে করছে ওর জন্য বুঝি বা প্রাণই দিচ্ছে। তুমি এখনও ওকে বোঝাও, নইলে পরে একটা পাকাপাকি কথা ঠিক করে ফেললে তখন পথ থাকবে না।

গোরুর ব্যাপারে হরির মনটা তখন ছিল খুব প্রসন্ন, মজা করিবার জন্য বলিল, তা মন্দ কি, ঝুনিয়া দেখতে শুনতে বেশ ভালো, ওকেই বিয়ে করুক না, এর চেয়ে সস্তায় বৌ আর কোথায় পাবে ?

এই ঠাট্টা ধনিয়াকে তীরের মত বিঁধিল, বলিল, এঘরে আসবে ঝুনিয়া ? বিধবা ছুঁড়ীর মুখ পুড়িয়ে দেব না ? গোবরের প্রাণ চায়, সে যেখানে খুসি নিয়ে যাক।

ধর, গোবর এই ঘরেই নিয়ে এল।

বেশ, তোমার দুই মেয়ে কার গলায় ঝোলাবে বল, তা ভেবে দেখো। ভাই-বেরাদরিতে কে তোমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কোরবে, কেউ তোমার দরজাও তো মাড়াবে না।

ও তার পরোয়া করে কি ?

আমি এত সহজে আমার ছেলে ছাড়ছি না। আমি এত করে মানুষ করে তুললাম, আর ঝুনিয়া এসে রাজত্ব কোরবে ! মুখে আগুন অমন মেয়ের।

এমন সময়ে হঠাৎ গোবর ঘরে ঢুকিয়া ভয়চকিত স্বরে বলিল, বাবা সুন্দরিয়ার কি হয়েছে ? ও তো পড়ে আছে, আর বুক ধড়ফড় করছে।

হরি রান্নাঘরে গিয়া খাইতে বসিয়াছিল, থালা সামনে ঠেলিয়া দিয়া বাহিরে আসিল, আর বলিল, কি অলক্ষুণে কথা মুখ দিয়ে বার করছিস ! এই তো ওকে দেখে এলাম, বেশ শুয়ে ছিল।

তিনজনে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল, প্রদীপ নিয়া দেখিল, সুন্দরীর মুখ দিয়া ফেনা পড়িতেছে, চক্ষু পাথরের মত নিশ্চল, পেট ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর পা চারটি একদম মেলিয়া দিয়াছে। ধনিয়া মাথা চাপড়াইতে লাগিল, হরি তাড়াতাড়ি ছুটিল দাতাদীন পণ্ডিতের কাছে। গাঁয়ের মধ্যে ঐ একজনই

পশুচিকিৎসার কিছু জানে। পণ্ডিতজী ঘুমাইয়া ছিল, শুনিয়াই দৌড়াইয়া আসিল—দেখিতে দেখিতে সারা গাঁয়ের লোক আসিয়া হরির ঘরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। গাইকে নিশ্চয় কেহ বিষ খাওয়াইয়াছে, লক্ষণ স্পষ্ট। কিন্তু গাঁয়ে এমন শত্রুতা কে করিবে? এ গ্রামে তো এমন লোক দেখি না, তা বাহিরেরই বা নূতন কে গ্রামে আসিয়াছে? হরির কাহারও সঙ্গে শত্রুতা নাই যে সন্দেহ করিবে। হীরার সঙ্গে অবশ্য বাদ-বিসম্বাদ কিছু হইয়াছে, কিন্তু সে তো ভাইয়ে-ভাইয়ে হামেশাই অমন হয়। এদিকে গাভীর মৃত্যুতে হীরারই সর্বাপেক্ষা বেশি দুঃখ দেখা যাইতেছে। সে খুব ধমকাধমকি করিতে লাগিল, কে এমন কাজ করিয়াছে পাইলে তাহার রক্ত পান করিবে। সত্য বটে, হীরা বদ্‌রাগী, তবু এমন নীচ কাজ সে করিতে পারে না।

আধা রাতভর লোকের ভিড়, আর জল্পনা-কল্পনা চলিল। সবাই হরির দুঃখে দুঃখিত হইয়া দুষ্কৃতকারীকে গালি দিতে লাগিল। এ সময় যদি তাহাকে হাতে পাওয়া যাইত তবে তাহার প্রাণে বাঁচা শক্ত হইত। আর এই রকম সব ব্যাপার হইলে গোরু ছাগল আর তো বাহিরে বাঁধিতে পারা যাইবে না, এখন তো সকলেরই জানোয়ার রাতভর বাহিরেই পড়িয়া থাকে। কাহারও সেজন্য ভাবনার কিছু ছিল না; এ এক নূতন বিপত্তি ঘটিল। আর কি সুন্দর গাইটা, পূজা করিবার মত! পাঁচ সেরের কম দুধ দিত না। এক এক বাছুর শ টাকা আনিতে পারিত। আর তো দেরিও ছিল না প্রসবের—ইতিমধ্যে এই বজ্রপাত!

সকলে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলে ধনিয়া হরিকে দোষ দিতে লাগিল। তোমাকে যতই বোঝাই, তুমি চল নিজের মতে। যেই দেখলাম তুমি গোরুটা খুলে উঠোনের দিকে চলেছ, আমি বলি বাইরে নিও না ওকে। আমাদের সময় খারাপ পড়েছে, না জানি কবে কি হয়। তা তো শুনবে না। ওর গরম লাগছে! এখন তো খুব ঠাণ্ডা হয়েছে, আর তোমারও হাড় জুড়িয়েছে। ঠাকুর গোরুটা চাইল, দিয়ে দিলে মাথা থেকে একটা বোঝাও নেমে যেত, আর বাধ্যবাধকতাও হোত, কিন্তু তা হবে কেন—তাহলে যে এই তামাশা দেখতে পেতে না। একটা খারাপ কিছু হবার আগে এমনিভাবেই বুদ্ধিভ্রংশ হয়, নইলে এতদিন ঘরে বাঁধা থাকত, গরম লাগল না, কোন অসুখ হোল না। এত তাড়াতাড়ি সবাইকে চিনে ফেলেছিল, মনেও হোত না বাইরে থেকে এসেছে।

বাচ্চা ছেলেপুলেরা তো ওর শিং ধরে খেলা করত, তা মাথা একটু নাড়ত না। যা কিছু ওর নাদে ঢেলে দিতাম, চেটে পুটে সবটা খেয়ে নিত। ও ছিল লক্ষ্মী, আমার মত অভাগার ঘরে থাকবে কেন? সোনা রূপাও গোলমালে জেগে গেছে, আর দেখে শুনে কান্না শুরু করেছে। আহা, গোরুটার সেবার ভার তো ওদের দুজনের উপরই বেশি ছিল। ও ছিল ওদের খেলার সাথী। দুই বোনে খেয়ে উঠবে, আর অমনই দুজনে দুই রুটি নিয়ে ছুটবে সুন্দরীকে খাওয়াতে। কেমন সুন্দর জিভ বার করে ওদের হাত থেকে খেয়ে নিত, যতক্ষণ না ওদের হাতের কয়েক গ্রাস পেত সোজা দাঁড়িয়ে থাকত। আমার কপালই ফুটো।

গোবর আর মেয়ে দুইটি কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—হরিও শুইয়া পড়িল। মাথার কাছে জলের ঘটি রাখিতে ধনিয়া উহার কাছে আসিলে হরি আস্তে আস্তে বলিল, তোর পেটে যদি একটাও কথা থাকে। কিছু শুনিস তো সারা গাঁয়ে ঢাক পিটিয়ে বেড়াস।

ধনিয়া প্রতিবাদ করিল, ভাল রে ভাল, আমি আবার কোন কথা ঢাক পেটালাম যে আমার নামে এই বদনাম!

আচ্ছা, তোর কাকে সন্দেহ হয়?

আমার তো কাউকেই সন্দেহ হয় না, মনে হয় বাইরের কেউ করেছে।

কাউকে বলবি না তো?

বলবো কেন, বললে কি গাঁয়ের লোক আমায় গয়না গড়িয়ে দেবে?

কাউকে যদি বলিস তবে মেরেই ফেলবো।

আমায় মেরে ফেললে তোমার কিছু সুখ হবে না, এ বয়সে আর বৌ মিলবে না। আমি যতদিন আছি ততদিনই তোমার এই ঘর সংসার ঠিক আছে। আমি মরলে মাথা চাপড়ে কাঁদতে হবে। এখন আমার সব কিছুই খারাপ, তখন চোখের জল ফেলতে হবে।

আমার কিন্তু হীরার ওপর সন্দেহ হোচ্ছে।

মিছে, একদম মিছে কথা। হীরার এমন হীন প্রবৃত্তি নয়। ওর মুখটাই খারাপ।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, তোর মাথার দিব্যি।

তুমি নিজের চোখে দেখেছ? কখন?

এই তো, আমি শোভাকে দেখে ফিরেছি, হঠাৎ দেখি সুন্দরিয়ার খাওয়ার

নাদের কাছে হীরা দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম, কে রে, বললে, আমি হীরা, একটু আগুন নিতে এসেছি। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলল, আমাকে তামাক খাওয়াল। ও ফিরে গেল, আমি ঘরে ঢুকলাম, আর তুমি গোবরের কথা নিয়ে হল্লা শুরু কোরলে। আমার বোধ হয় আমি গোরুকে বেঁধে যেই শোভার কাছে গিয়েছি, ও এসে সুন্দরীকে কিছু খাইয়েছে। আর তখন হয় তো এসে দেখছিল, মরেছে কি না।

ধনিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, এই রকমই হয়, ভাইয়ের গলা কাটতে পর্যন্ত বাধে না! উঃ, হীরার মন এত নোংরা! হায় হায়, এদেরই আমি খাইয়ে পরিয়ে এতটা বড় করেছি!

যাক, এখন শো গিয়ে, ভুলেও কিন্তু কারু কাছে মুখ খুলিস না।

কেন? ভোর হতে দাও একবার, আমি নিয়ে যাব বাছাধনকে থানায়। না যাই তো আমি বাপের বেটী নই। এই খুনেকে ভাই বল? ভাইয়ের উপযুক্ত কাজ বটে। বেশ, শত্রুই যদি হয় তবে খোলাখুলি তার সঙ্গে শত্রুতা কর, তাতে পাপ হবে না। এরকম লোককে ছেড়ে দিলেই পাপ।

হরি ধমক দিয়া বলিল, ভাল হবে না বলছি ধনিয়া, মহা অনর্থ হবে। ধনিয়া গদগদ স্বরে বলিল, অনর্থ কেন, অনর্থের বাপ হোক। আমি ওকে শ্রীঘর না পাঠিয়ে ছাড়ব না। তিন বছর ওকে জাঁতা পেষাব, পুরো তিন বছর। ও যদি ছাড় পায় তো দিব্যি লাগবে। তীর্থ কোরতে হবে, লোক খাওয়াতে হবে। বেকসুর পার পেয়ে যাবে, বাছাধন মনেও না করে। ছেলের মাথায় হাত রেখে তোমাকেই সাক্ষী মানব।

ধনিয়া ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল, আর বাহিরে শুইয়া শুইয়া হরি নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল। ওর পেটেই যখন কথাটা রহিল না, তখন ধনিয়ার পেটে কি আর থাকিবে! আর ও তো পরামর্শ শুনিবার মেয়ে নয়। একবার জেদ ধরিলে ও কাহারও কথায় তাহা ছাড়িবে না। আজ হরি জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ভুল করিয়া বসিল।

চারিদিক নীরব, আর অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। শুধু বলদ দুটির গলার ঘণ্টাধ্বনি মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে। উহাদের দশ পা দূরেই মরা গাইটি পড়িয়া রহিয়াছে, আর হরি ঘোর অনুতাপে এপাশ ওপাশ করিতেছে। এ অন্ধকারে কোথাও একটু আলোকের রেখা দেখা যায় না।

৯

সেদিন সকালে হরির ঘরে এক মহা বিভ্রাট। হরি ধনিয়াকে মারিতেছে, আর ধনিয়া হরিকে গালি দিতেছে। মেয়ে দুইটি বাবার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, আর গোবর মাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় বার বার হরির হাত ধরিয়া উহাকে পিছনে ঠেলিয়া দিতেছে। কিন্তু যেই ধনিয়ার মুখ থেকে কোনও গালি বাহির হয়, অমনি হরি কোনও রকমে হাত ছাড়াইয়া আসিয়া ধনিয়াকে দুইচার ঘুসি লাথি বসাইয়া দেয়। এই প্রচণ্ড ক্রোধ যেন উহার গোপন কোন শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। সারা গাঁময় কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেল। বুঝাইবার ছুতা করিয়া লোক তামাশা দেখিতে আসিয়াছে। হাতের লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে শোভাও আসিয়া হাজির। দাতাদীন ধমক দিয়া বলিল, কি ব্যাপার হরি, তুমি কি পাগল হয়েছ? ঘরের লক্ষ্মীর গায়ে কখনও হাত দিতে আছে? তোমার তো এ ব্যাধি ছিল না। হীরার ছোঁওয়া লাগল নাকি?

তাহাকে প্রণাম করিয়া হরি বলিল, আপনি এ নিয়ে কিছু বলবেন না, আমি আজ ওর বদ্ অভ্যাস ছাড়াব তবে ছাড়ব। আমি যতই ওকে কিছু বলি না, ও ততই নাই পেয়ে মাথায় চড়ছে।

ধনিয়া রাগে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মহারাজ, আপনি সাক্ষী রইলেন। আমি আজ একে আর এর খুনে ভাইকে জেলে পাঠিয়ে তবে জলস্পর্শ করবো। এর ভাই বিষ খাইয়ে আমার গোরু মেরেছে, আর আমি যাই তার নামে থানায় রিপোর্ট লেখাতে চলেছি অমনি এই খুনে আমায় মারতে লেগেছে। ওর সেবায় আমি জীবনপাত করেছি, আজ তারই এই পুরস্কার মিলছে।

দাঁতে দাঁত ঘসিয়া, রাগে রক্তচক্ষু হইয়া হরি বলিল, আবার ঐ কথা মুখে এনেছিস? তুই কি দেখেছিস হীরা আমার গোরুকে বিষ খাইয়েছে?

আচ্ছা, তুই দিব্যি করে বল তো, হীরাকে গোরুর নাদের কাছে দাঁড়াতে দেখেছিলি, কি না?

হাঁ, আমি শপথ করছি, দেখি নি।

ছেলের মাথায় হাত রেখে বলতে হবে।

গোবরের মাথার উপর কম্পিত হাতখানা রাখিয়া ধিক্কার ভরা স্বরে হরি বলিল, ছেলের মাথার দিব্যি, আমি হীরাকে নাদের কাছে দেখি নি।

ধনিয়া মেঝের উপর থুতু ফেলিয়া বলিল, তোর মিথ্যে কথা বলা দেখে ঘেন্না ধরে যায়। তুই নিজের মুখেই কাল রাতে বলেছিস যে হীরাকে গোরুর নাদের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিস, আর আজ এখন ভাইয়ের পক্ষ নিয়ে মিছে কথা বলছিস! কি ঘেন্না! আমার বেটার মাথার একটি চুলও যদি খসে তো তোর ঘরে আমি আগুন লাগাব। ভগবান, মানুষ নিজের মুখে একটা কথা বলে তারপর এমন নির্লজ্জের মত তাকে ঘুরিয়ে নিতে পারে?

হরি পা ঠুকিয়া বলিল, ধনিয়া, রাগ বাড়াস নি, ভাল হবে না বলছি।

কি করবি? মারছিস, আরো মার। যদি তুই বাপের বেটা হস তবে আমায় মেরে ফেলে আজ জল মুখে দিবি। দুষমন আমায় মেরে মেরে কাল্সে পড়িয়ে দিয়েছে, তাও আশা মেটে নি। আমাকে মেরে ভাবছে নিজে খুব মস্ত বীর। ভাইদের কাছে ভিজে বেড়ালটি, খুনে বদমায়েস কোথাকার!

তারপর বিনাইয়া বিনাইয়া ধনিয়া কাঁদিতে লাগিল, এই ঘরে আসিয়া উহার কতই না সহিতে হইল, ঘরভরা লোককে পেট ভরিয়া খাওয়াইতে গিয়া কত দিন উহার শুধু জল খাইয়াই কাটিয়াছে, একটি একটি করিয়া পয়সা ক্রিয়াকর্মের জন্য সঞ্চয় করিয়াছে, কত ক্লেশ অভাব সহ্য করিয়াছে। সে সব ত্যাগের আজ এই পুরস্কার? ভগবান বসিয়া বসিয়া এত অন্যায় দেখিয়াও উহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছেন না। গজের আর দ্রৌপদীর রক্ষার জন্য বৈকুণ্ঠ হইতে তিনি ছুটিয়া গিয়াছিলেন। আজ কেন এমন গভীর ঘুমে অচেতন?

জনমত আস্তে আস্তে ধনিয়ার দিকে টলিল। কাহারও সন্দেহ রহিল না যে হীরাই গোরুটিকে বিষ দিয়াছে। হরি যে একদম মিথ্যা শপথ করিয়াছে, এ কথাও লোকে পুরাপুরি বিশ্বাস করিয়া ফেলিল। বাপের এই মিথ্যা শপথ আর তার দরুণ নিজের বিপদের আশঙ্কা গোবরকে হরির প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিল। ইহার পর দাতাদীন যখন তিরস্কার করিল, তখন হরিকে হার মানিতে হইল। সে চুপচাপ বাহিরে চলিয়া গেল। সত্যের জয় হইল।

দাতাদীন শোভাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি ব্যাপার, তুমি কিছু জান শোভা?

মাটিতে বসিয়া পড়িয়া শোভা বলিল, আমি তো মহারাজ, আট দিন ঘরের

বাইরেই যেতে পারি নি। হরিদাদা মাঝে মাঝে গিয়ে এটা ওটা দিয়ে আসতেন, তাতেই চলে যাচ্ছে। কাল রাত্তিরেও তো আমার কাছে গিয়েছিলেন। কে কি কোরলো, আমি কিছুই জানি না। হাঁ, কাল সন্ধ্যেবেলা হীরা আমাদের ঘরে গিয়েছিল খুরপী চাইতে; বলেছিল, একটা গাছের গোড়া খুঁড়তে হবে। তারপর থেকে ওর সঙ্গে আর দেখা হয় নি!

ধনিয়া এতখানি সায় পাইয়া বলিল, পণ্ডিতদাদা, এ ঐ হীরারই কাজ। শোভার ঘর থেকে খুরপী নিয়ে কোন গাছড়া খুঁড়ে সেই বিষ আমার গোরুকে খাইয়েছে। সেদিন রাত্তিরে যে ওদের সঙ্গে ঝগড়া হোল, সেই দিন থেকে ও ওৎ পেতে বসে ছিল।

দাতাদীন বলিল, এ কথা যদি সত্যি হয় তবে ওর গোহত্যার পাপ লাগবে। পুলিস কিছু করুক বা নাই করুক, ধর্ম তো দণ্ড না দিয়ে ছাড়বে না। যা তো রূপো, হীরাকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি, পণ্ডিতদাদা ডেকেছে। যদি ও গোহত্যা না করে থাকে তবে গঙ্গাজল হাতে নিয়ে দেবতার থানে গিয়ে শপথ কোরবে।

ধনিয়া বলে, মহারাজ, ওর দিব্যি দেওয়ার কোনও মানে নেই, বললে তখনি দিব্যি কাটবে। আর, ইনিই যখন মিথ্যা শপথ করে ধর্মাত্মা বনলেন, তখন হীরার কথায় কি বিশ্বাস!

এই কথায় গোবর বলিল, বেশ মিথ্যা দিব্যিই কাটুক, বংশ লোপ পেয়ে যাক। বুড়োরাই বেঁচে থাক, আমাদের জোয়ানদের বাঁচার দরকার কি?

রূপা মুহূর্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, পণ্ডিতদাদা, কাকা ঘরে নেই। কাকী বললেন, কাকা কোথায় চলে গিয়েছে।

দাতাদীন লম্বা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, কোথায় গেছে, তুই জিজ্ঞাসা করিস নি? ঘরে লুকিয়ে নেই তো? যা তো সোনা, তুই একবার ভাল করে দেখে আয়।

ধনিয়া ইহাতে বলিয়া উঠিল, দাদা ওকে আর পাঠাবেন না, হীরার মাথায় খুন চেপেছে, কি জানি কি করে বসে।

দাতাদীন লাঠিগাছটি সামাল দিয়া নিজেই গেল আর খবর নিয়া আসিল, হীরা সত্যই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। পুনিয়া বলিয়াছে, সে লোটা কম্বল লাঠি সব সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। পুনিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, কোথায় যাইতেছে, কিন্তু সে

জবাব দেয় নাই। ও পাঁচটা টাকা একটা কৌটায় রাখিয়াছিল, এখন সেই টাকাটাও নাই, সম্ভব টাকাটাও হীরা লইয়া গিয়াছে।

ধনিয়া শান্ত ভাবে বলিল, মুখে চুন কালি মেখে কোথাও পালিয়েছে। শোভা বলিল, পালাবে কোথা? গঙ্গাস্নানে যায় নি তো? ধনিয়ার মনে সন্দেহ হইল, গঙ্গা নাইতে গেলে টাকা সঙ্গে নেওয়া কেন? এখন কোন পর্ব নাই।

এ সন্দেহের নিরসন হইল না—ধারণা আরো দৃঢ় হইল।

আজ হরির ঘরে হাঁড়ি চড়ে নাই। বলদ দুটিকেও কেহ দানাপানি দেয় নাই। সমস্ত গাঁয়ে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; জায়গায় জায়গায় দুই চারিজন করিয়া লোক জমা হইয়া কেবল এই বিষয়েরই আলোচনা করিতেছে। হীরা নিশ্চয় কোথাও পলাইয়াছে। দেখা হইলে তো মিটিয়া যাইত, কিন্তু এখন জেলও খাটিতে হইবে, আবার গোহত্যার পাপও লাগিবে। ভয়ে পলাইয়াছে। পুনিয়াও কাঁদিতেছিল—কাহারও কথা শুনিল না, কি জানি কোথায় গেল!

যেটুকু বাকি ছিল, সন্ধ্যার সময়ে থানার দারোগা আসিয়া সেটুকু পুরাইয়া দিল। গাঁয়ের চৌকিদার তাহার কর্তব্য পালন করিয়াছে, তাহার রিপোর্ট পাইয়া দারোগাও তাহার কর্তব্য করিতে হাজির। ব্যস, এখন গ্রামবাসীকে দারোগার সেবার কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। দাতাদীন, ঝিংগুরী সিংহ, নোখেরাম, উহার চার পেয়াদা, মংগরু সাহু, লালা পটেশ্বরী—সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল আর দারোগার কাছে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। হরিও কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—ও তো এমন ভয় পাইয়াছে যেন ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইতে হইবে। ধনিয়াকে যখন মারিতেছিল তখন শরীরে কি তেজ, আর এখন দারোগার কাছে আসিয়া ওর হাত পা যেন কচ্ছপের মত ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে। দারোগার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে অন্তর যেন ছবির মত স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল, লোকের মন বুঝিতে দারোগাজী নিপুণ। মনোবিজ্ঞান না পড়িলেও ব্যবহারিক জ্ঞান তাহার পাকা; বেশ বুঝিল যে, আজ সকালে ভাল লোকেরই মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে। হরির মুখ দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে, ইহাকে শায়েস্তা করিতে একটি ভ্রূকুটির ওয়াস্তা।

দারোগা প্রশ্ন করিল, তোর কাকে সন্দেহ হয়?

হরি মাটিতে প্রায় লুটাইয়া পড়িয়া জোড়হাতে বলিল, আমার কারো ওপর সন্দেহ নেই, গোরু স্বাভাবিক মরণ মরেছে। বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। —

ধনিয়া পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এ কথায় তাড়াতাড়ি বলিল,

কখনো না, তোমার ভাই হীরা গোরুকে মেরেছে। সরকার এমন মূর্খ নয় যে তুমি যা কিছু বলবে সব মেনে নেবেন। ইনি এসেছেন, জিজ্ঞাসা করে যাচাই করতে।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিল, এ কে ?

উপস্থিত অনেকেই দারোগার সঙ্গে এক আধটি কথা বলিতে পাওয়ার জন্য হাঁকু পাঁকু করিতেছিল। এই প্রশ্নের সুযোগ পাইয়া সমস্বরে সকলে বলিয়া উঠিল, উহারই স্ত্রী সরকার সাহেব,—আর আমিই প্রথম বলিয়াছি এই কল্পনায় খুসি হইয়া উঠিল।

তবে একে ডাক, আমি সব আগে এর জবানবন্দী লিখব। আর ঐ হীরা কোথায় ?

মোড়লেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, ও তো সরকার সাহেব, আজ ভোরে উঠেই চলে গেছে।

আমি ওর ঘর খানাতালাসি কোরবো।

খানাতল্লাসি ! হরির বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। হীরার ঘর সার্চ হইবে, আর হীরা ঘরে নাই ! হরি বাঁচিয়া থাকিতে, তাহার চোখের সামনে ইহা হইতে দিবে না। ধনিয়া যেখানে খুসি চলিয়া যাক। ও যখন হরির ইজ্জত নষ্ট করিতেই বদ্ধপরিকর, তখন হরির ঘরে ও থাকিবে কেন ? যাক, গলিতে গলিতে ঘুরিয়া দশের গলাধাক্কা খাক, তখন বুঝিবে।

গাঁয়ের উপস্থিত বিশিষ্ট লোকেরা কানাঘুসা করিতে লাগিল, কি উপায়ে এই বিপত্তিকে ঠেকান যায়। দাতাদীন টাকপরা মাথাটি দুলাইয়া বলিল, এ সব কেবল টাকা আদায়ের ফন্দী—হীরা তার ঘরে কি লুকিয়ে রেখেছে জিজ্ঞাসা কর দেখি।

পটেশ্বরীলাল বেজায় লম্বা, লম্বা বলিয়া অবশ্য বেকুব নয়। লম্বা কালো মুখ আরো লম্বা করিয়া সে বলিল, এদের আসাই বা কিসের জন্য, আর এলে পর কিছু না নিয়ে ফেরে কবে ?

ঝিংগুরী সিংহ হরিকে ডাকিয়া আনিয়া কানে কানে বলিল, যা পার দিয়ে দাও, নইলে ছাড়ান নেই।

দারোগা এইবার বেশ দৃঢ় স্বরে বলিল, এবার আমি হীরার ঘর তালাসি কোরবো।

হরির মুখ এই কথায় এমন সাদা হইয়া গেল যেন শরীরের সমস্ত রক্ত কে চুষিয়া খাইয়াছে। উহার ঘর খানাতল্লাসি হইল, কি হীরার ঘর হইল, উহার কাছে একই কথা। না হয় হীরা পৃথক হইয়াছে, কিন্তু সারা দুনিয়া জানে ও হরির ভাই। কিন্তু উহার যে এখন কোন ক্ষমতাই নাই। হাতে টাকা থাকিলে ও হয় তো এখনই পঞ্চাশটি টাকা দারোগাকে দিয়া বলিত, সরকার সাহেব, আমার মান ইজ্জত তোমার হাতে। কিন্তু ওর হাতে যে বিষ খাইবার মত পয়সাও নাই। ধনিয়ার হাতে হয় তো দুই চার টাকা পড়িয়া আছে, কিন্তু ও শয়তানী কি তাহা দিবে? মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মত উহার মাথা ঝুঁকিয়া পড়িল, নিজের অপমানের তীব্র বেদনা মাথায় লইয়া ও নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

দাতাদীন উহাকে সচেতন করিবার জন্য বলিল, এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না হরি, টাকার যোগাড় করতে হবে।

হরি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, কি চেষ্টা কোরবো মহারাজ! আগেকার দেনাই মাথায় চেপে বসে আছে, আবার কোন মুখে ধার চাইব! তবে এ সঙ্কটে যদি কেউ উদ্ধার করে তো প্রাণ দিয়ে তার কড়ি শুধব। আর আমি মরে গেলেও গোবর দেনা শোধ দেবে।

গাঁয়ের মোড়লেরা পরামর্শ করিতে বসিল, দারোগাকে কত টাকার কথা বলা যায়। দাতাদীন বলে পঞ্চাশ টাকা, ঝিংগুরী সিংহ বলিল, একশর একপয়সা কমে যে হইবে তাহা মনে হয় না। নোখেরামেরও তাহাই বিশ্বাস। আর হরির কাছে তো একশ টাকা আর পঞ্চাশ টাকা দুইই সমান। খানাতল্লাসির বিপত্তিটা তো উহার মাথা হইতে নামুক। পূজা দিতেই হইবে—দেখ, কতদূর চড়াইতে হয়। মরা মানুষকে এক মণ কাঠে পোড়াও বা দশ মণে পোড়াও, তাহার কি আসে যায়?

কিন্তু পটেশ্বরী এমন অন্যায় কথা শোনে নাই। ডাকাতি হয় নাই, খুন হয় নাই, শুধু খানাতল্লাসি করিতে আসিয়াছে, ইহার জন্য কুড়ি টাকাই যথেষ্ট।

নেতারা উহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, বেশ, তবে তুমিই দারোগার সঙ্গে কথাবার্তা চালাও। আমরা ওর ধারে পাশেও যাচ্ছি না, কে চোখরাঙানি সইবে?

পটেশ্বরীর পায়ের উপর মাথা রাখিয়া হরি বলিল, ভাই সাহেব, আপনি আমায় উদ্ধার করুন। যতদিন বাঁচব, আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

দারোগাজী তাহার বিশাল বক্ষ আর বিশালতর উদরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া এইবার বলিল, হীরার ঘর কোনটা বল, এবার আমার তালাসি শুরু হবে।

পটেশ্বরী একটু আগাইয়া গিয়া দারোগার কানে কানে বলিল, ঘর তালাস করে কি হবে হুজুর? ওর ভাই আপনার হুকুম মানতে প্রস্তুত।

দুইজনে একটু দূরে সরিয়া গিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিল।

লোকটা কি রকম?

বড়ই গরীব হুজুর, খাওয়ারই সংস্থান নেই।

সত্যি?

হাঁ হুজুর, ধর্ম সাক্ষী করে বলছি।

গোটা পঞ্চাশেক টাকাও নেই ঘরে?

তবে কি বলছি হুজুর! দশ টাকা যদি থাকে তো মনে করবো হাজার টাকার সমান। পঞ্চাশ টাকা তো জন্মে এরা চোখে দেখে না। যদি দেখে তো মহাজনের দৌলতে।

দারোগাজী এক মিনিট ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল, তবে আর ওকে চাপ দিয়ে লাভ কি? যে নিজেই মরে রয়েছে, তাকে আমি মারি না।

পটেশ্বরী দেখিল, চাল বুঝি ভেস্তে যায়। বলিল, না হুজুর, এ কাজ কোরবেন না, তাহলে আমরা কোথা যাই? আমাদের আর এ ভিন্ন ক্ষেত খামার কই?

তুমি এ তল্লাটের পাটোয়ারী, তোমার এমন কথা?

তা হুজুর, এরকম কোনও ব্যাপারে আপনাদের দৌলতে আমাদেরও দুপয়সা জোটে বই কি! নতুবা পাটোয়ারীকে কে পোছে?

আচ্ছা, যাও, ত্রিশ টাকা পাইয়ে দাও, আমার কুড়ি তোমার দশ।

তা আমরা চারজন প্রধান আছি, সেটা মনে রাখবেন।

আচ্ছা, বেশ, আধা আধি হবে; যাও, তাড়াতাড়ি কর, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

পটেশ্বরী গিয়া ঝিংগুরীকে বলিল, ঝিংগুরী ইসারায় হরিকে ডাকিয়া নিজের ঘরে নিয়া গেল, ত্রিশটি টাকা গুণিয়া উহাকে হাওলাত দিয়া বলিল, আজই

কাগজ লিখিয়ে নিও, তোমার মুখ দেখে দয়া হোল, তাই তোমার ভালমানষির পরে বিশ্বাস রেখে অমনি টাকাটা দিচ্ছি।

হরি টাকা কয়টি গামছার কিনারায় বাঁধিয়া লইয়া প্রসন্নমুখে দারোগার দিকে চলিল।

সহসা ঝড়ের মত কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ধনিয়া উহার হাত হইতে গামছাখানা ছিনাইয়া লইল। গেরো শক্ত ছিল না। টান লাগিতেই খুলিয়া গেল, আর টাকাগুলি মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ সাপিনীর মত সে ফোঁস করিয়া উঠিল, এ টাকা কোথা নিয়ে চলেছিস, বল। ভালো চাও তো টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এসো, নইলে আমি বলে যাচ্ছি ভালো হবে না। ঘরের লোক না খেতে পেয়ে মরছে, আর ইনি দান ধ্যান করতে বসেছেন, আমার পরনে একখানা কাপড় জোটে না, আর আঁজলভরা টাকা নিয়ে ইনি চলেছেন ইজ্জত বাঁচাতে। এতই বড় ইজ্জত! যার ঘরে ইঁদুরও খেতে পায় না তারও মান ইজ্জত! দারোগা তালাস কোরবে, করুক না। কি নেবে, নিক না? এক তো একশ টাকার গোরু গেল, তার ওপর আবার এই পঞ্চাশ! বা রে ইজ্জতদার!

হরি কোনমতে রাগ চাপিয়া রাখিল, তাহার সর্ব শরীর ঠক ঠক করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, নেতাদের মাথা নীচু হইয়া গেল, আর দারোগার মুখও একটু শুকাইয়া গেল, এ রকম অপমান লাঞ্ছনা সে জীবনে কখনও দেখে নাই।

হরি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনে এই প্রথমবার ধনিয়া এত লোকের সমক্ষে এ ভাবে উহার মাথা নীচু করিয়া দিল, ও এই মাথা আর কেমন করিয়া উঠাইবে।

তবে দারোগাজীও এত সহজে হার মানিবার পাত্র নহে। খোঁচা দিয়া বলিল, আমার তো মনে হচ্ছে এ শয়তানী বুঝি হীরাকে ফাঁসাবার জন্য নিজেই গাইকে বিষ দিয়েছে।

ধনিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, হাঁ, দিয়েছি তো। আমার নিজের গোরু আমি মেরেছি, তাই কি? অন্য কারু গোরু তো নয়। তোমার বিচারে যদি তাই ঠিক হয়, তবে তাই লিখে নাও, দাও আমার হাতে হাতকড়া। তোমাদের ন্যায় বিচার আর তোমাদের বুদ্ধির দৌড় কত, সব আমার জানা আছে। দুধকে দুধ জলকে জল বলা এক কথা, আর গরীবের গলায় ছুরি

দেওয়া আরেক কথা। হরি ধনিয়ার দিকে ছুটিয়া চলিল, চোখে তাহার যেন অগ্নি বর্ষণ হইতেছে। গোবর তাড়াতাড়ি আসিয়া দুইজনের মাঝে দাঁড়াইয়া বলিল, থাম বাবা, থাম বলছি, খুব হয়েছে। শীগগির পেছনে সরে যাও, নইলে আমি বলে দিচ্ছি, আমার মুখ আর দেখতে হবে না। তোমার গায়ে হাত তুলব না, এত চামার নই, তবে নিজের গলায় ফাঁসি লাগাব।

হরি পিছু হটিয়া গেল, আর ধনিয়া বাঘের মত আগাইয়া আসিয়া বলিল —তুই সর তো গোবর, দেখি ও আমার কি কোরতে পারে। দারোগাজী স্বয়ং উপস্থিত। দেখি, এর কেরামতিটা দেখি। ঘর তালাসি করলে ওর মান যায়, আর সারা গাঁয়ের সামনে নিজের বৌকে মারধর করতে ওর ইজ্জত হানি হয় না! এ না হলে আর বীর! খুব তো বাহাদুরি! তবে পুরুষের সঙ্গে লড়। যে তোমার আশ্রিত, তাকে মেরে কি বাহাদুরি! ভাবে যে, আমাকে ভাতকাপড় দিয়ে কিনে রেখেছে। বেশ, আজ থেকে নিজের ঘর সামলে নিক। দেখিয়ে দেব, এই গাঁয়েই বসে ওর চোখের সামনে জাঁতা পিষে দিন গুজরাণ করব, আর ওর চেয়ে ভাল খাব পরব। ইচ্ছা হলে ও যেন দেখে আসে।

হরিকে এবার হার মানিতে হইল, ও বুঝিল স্ত্রীর কাছে পুরুষ কত দুর্বল, কি রকম নিরুপায়।

নেতারা ইতিমধ্যে টাকাগুলি কুড়াইয়া লইয়াছিল, এবার দারোগাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। ধনিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, যার টাকা নিয়েছ তাকে দিয়ে দাও, আমরা কারো কাছে ধার করব না, আর যা দেবার ও-ই দেবে, আমি একটি পাইও দেব না—এজন্য যদি হাকিমের এজলাস পর্যন্ত যেতে হয়, তাতেও রাজী। জমিদারের বাকি শুধবার জন্যে আমরা পঁচিশটা টাকা চেয়েছিলাম, তা কেউ দেয় নাই। আর আজ ঠন ঠন করে আঁজলাভরা টাকা বার করে দিয়েছে। আমি সব জানি। এখানেই সব ভাগ বাটরা হচ্ছিল। সকলেরই মুখ মিষ্টি। এরাই নাকি গাঁয়ের মুখ্য—এ সব ডাকাতেরা আছে গরীবের রক্ত চুষতে। সুদ আসল, আধা সওয়া, নজর-নজরানা, ঘুসঘাস, যা কিছু নিতে হবে অমনি গরীবদের লুটতে হবে। ওদের আবার স্বরাজ মিলবে! জেলে গেলে স্বরাজ মেলে না—স্বরাজ মেলে ধর্ম আর ন্যায় দিয়ে।

নেতাদের মুখে কে যেন কালি মাখাইয়া দিল, দারোগার মুখে যেন ঝাঁটা মারিল। মান বাঁচাইবার জন্য সকলে মিলিয়া হীরার ঘরের দিকে গেল।

চলিতে চলিতে দারোগা স্বীকার করিল, হাঁ, বাহাদুর মেয়ে বটে!

পটেশ্বরী বলিল, একে কি সাহস বলে হুজুর—মেয়ে ভারি ক্যাটকেটে। এরকম মেয়েকে গুলি করে মারতে হয়।

একা তোমাদের আচ্ছা নাকাল করেছে তো। তোমরা তো ছিলে চারজনা।

তা হুজুরেরও পনেরোটা টাকা খসে গেল।

আমার কি খসে? ও না দেয়, গ্রামের মাতব্বররা দেবে, পনেরোর বদলে পুরো পঞ্চাশ পেয়ে যাব। নেও, তোমরা চটপট ব্যবস্থাটা করে ফেল।

পটেশ্বরীলাল হাসিয়া বলিল, হুজুর তো খুব ফুর্তিবাজ।

দাতাদীন বলিল, বড়লোকের লক্ষণই এই। এমন সব ভাগ্যবানের দর্শন কোথায় মেলে?

দারোগাজী কঠোর স্বরে বলিল, এ সব খোসামোদ পরে করো, এখন তো পঞ্চাশটা টাকা নগদ বের কর। আর দেখ, এটা জেনে রেখো, এ বিষয়ে গাফিলতি হোলে তোমাদের চার জনের ঘর তালাস করব। খুব সম্ভব, হরি আর হীরা দুজনকে ফাঁসাবার জন্য তোমরাই এ ধোঁকাটি সৃষ্টি করেছ।

নেতারা এতক্ষণ ভাবিয়াছিল, দারোগা বুঝি ঠাট্টা করিতেছে।

ঝিংগুরী সিংহ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, পাটোয়ারী সাহেব, বের কর পঞ্চাশ টাকা।

নোখেরাম উহাকে সমর্থন করিয়া বলিল, তাইতো, এটা তো পাটোয়ারী সাহেবেরই এলাকা, ওরই কাজ আপনাকে খুসি করে দেওয়া।

পণ্ডিত নোখেরামের এক্কা আসিয়া পড়িল। দারোগাজী একটি খাটিয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, তোমরা কি ঠিক কোরলে? টাকা দেবে, না, খানাতালাসি হবে?

দাতাদীন আপত্তির সুরে বলিল—কিন্তু হুজুর···

আমি ওসব কিন্তু টিন্তু শুনতে চাই না।

ঝিংগুরী সিংহ প্রতিবাদ করিল, সরকার, এরকম সরাসরি···

দারোগা বলিল, আমি এই পনেরো মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে পঞ্চাশ টাকা

না পেলে তোমাদের চারজনের ঘরই তালাসি হবে। আর গণ্ডা সিংহকে জান তো? ওর হাতে যে মার খায় তাকে জল পর্যন্ত চাইতে হয় না।

পটেশ্বরীলাল গরম হইয়া বলিল, আপনার খুসি হয়, তালাসি করুন। এ তো আচ্ছা তাজ্জব,কার দোষে কে ধরা পড়ে।

আমি পঁচিশ বছর ধরে থানার দারোগাগিরি করে আসছি।

কিন্তু এমন জুলুম তো কখনো হয় নি।

এখনই কি হয়েছে? বল তো জুলুম কাকে বলে দেখিয়ে দিই। এক এক জনকে পাঁচ পাঁচ বছর ঘুরিয়ে আনব। আমার বাঁ হাতটা নাড়লেই দেখতে পাবে। এক ডাকে সারা গাঁয়ের লোককে কালাপানি পার করে দিতে পারি। এমন ভুল করো না।

চারিজনে একার মধ্যে বসিয়া পরামর্শ করিল।

কি হইল বুঝা গেল না, তবে হাঁ, দারোগার মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আর এই চার সাধুর মুখে যেন চাবুক পড়িল।

দারোগা ঘোড়ায় চড়িয়া চলিল দেখিয়া চার নেতা পিছন পিছন ছুটিতে আরম্ভ করিল। ঘোড়া বহুদূর ছুটিয়া চলিলে বেচারাদের ফিরিতে হইল, মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন প্রিয়জনের সৎকার করিয়া শ্মশান হইতে ফিরিতেছে।

দাতাদীন সহসা বলিল, আমার শাপ ওর না লাগে তো আর এ মুখ দেখাব না।

সমর্থন করিয়া নোখেরাম বলিল, এ রকম ধন কখনো থাকে না।

পটেশ্বরী ভবিষ্যদ্বাণী করিল, পাপের ধন গোক্ষিলে খায়। ঝিংগুরী সিংহের আজ ঈশ্বরের ন্যায়পরতায় অবিশ্বাস জন্মিয়া গেল। ভগবান কোথায়, জানি না; থাকিলে কি এই রকম জুলুম দেখিয়াও পাপীর দণ্ডবিধান করিতেন না!

এই সময়ে ইহাদের মুখগুলি হইয়াছিল ঠিক ছবি তুলিয়া রাখিবার মত।

## ১০

হীরার কোন খোঁজ নাই। দিন চলিয়া যাইতেছে। হরি যতদিন যতদূর পারিল দৌড়ধাপ করিল, তারপর হার মানিয়া চুপচাপ হইয়া গেল। ক্ষেত

খামারেরও দেখা শুনা করিতে হয়। একলা কতই বা মানুষে পারে? আর আজকাল আপনার ক্ষেতের চাইতে পুনিয়ার ক্ষেতের পিছনেই ওকে খাটিতে হয় বেশি। একলা পড়ায় পুনিয়া যেন আরো প্রচণ্ড হইয়াছে। ওকে খোসামোদ করিতেই হরির সময় কাটিয়া যায়। হীরা থাকিতে পুনিয়াকে খানিক দাবাইয়া রাখিতে পারিত। ও চলিয়া যাইবার পর হইতে পুনিয়া হইয়াছে নিরঙ্কুশ। হরি আর হীরার জমি একত্র। পুনিয়া অবলা মেয়ে, ওর সঙ্গে হরি কি বিরোধ করিবে? পুনিয়া হরির ভালোমানষির খবর বেশ জানে। তার সুযোগ নিতেও ছাড়ে না। ভালোর মধ্যে এই হইয়াছে যে কারকুন সাহেব পুনিয়ার বাকি খাজনার জন্য তেমন বেশি উৎপাত করে নাই, সামান্য পূজা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিয়াছে। শ্রাবণ মাসে ধান্য রোপণের এমন ধূম যে হরি তার নিজের ক্ষেতে ধান বোনার লোক পায় না—তাও পুনিয়ার ক্ষেতে ধান না বুনিলে চলে কি করিয়া? হরি রাত জাগিয়া উহার ক্ষেতে ধান বুনিল। সেই তো এখন উহার রক্ষক। পুনিয়া যদি দুঃখ পায় তো লোকে হরিকেই উপহাস করিবে। ফলে হইল এই যে, হরির ক্ষেতে ধান খুব কম হইল, কিন্তু পুনিয়ার ফসল রাখিতে ঘরে কুলায় না।

সেই বিপদের দিন হইতেই হরি আর ধনিয়ার মন কষাকষি চলিতেছিল। গোবরের সঙ্গেও হরির বাক্যালাপ বন্ধ। মা আর ছেলে মিলিয়া উহাকে যেন নির্বাসন দিয়াছে। আপনার ঘরেই ও পরবাসী। দুই নৌকায় পা দিলে যে দুর্গতি, হরির হইয়াছে তাই। গাঁয়েও আর উহার তেমন প্রতিপত্তি নাই। আপনার সাহসের বলে ধনিয়া গাঁয়ের মেয়েদের নয়, পুরুষদেরও নেতৃত্ব লাভ করিয়াছে। এক মাস পর্যন্ত আশপাশের সকল গ্রামেই এই ব্যাপার লইয়া খুব চর্চা চলিল। এমন কি, কোথাও কোথাও ধনিয়াকে অলৌকিক রমণী বলিয়া ধারণা হইল। 'জান, মেয়েটার নাম ধনিয়া, ওর উপর মা ভবানীর বিশেষ দয়া। দারোগা যেদিন ওর স্বামীর হাতে হাতকড়া লাগাইল, ও মা ভবানীকে স্মরণ করিল। ভবানী উহার শরীরে আবির্ভূত হইলেন। উহার শরীরে সে কি প্রচণ্ড শক্তি জাগিল! ও এক ঝটকায় স্বামীর হাতকড়া খুলিয়া ফেলিল, আর দারোগার গোঁফ ধরিয়া টানিয়া, মাটিতে ফেলিয়া, তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিল। দারোগা অনেক অনুনয় বিনয় করিলে তবে ছাড়িয়া দিল।' কতদিন পর্যন্ত তো দলে দলে লোক ধনিয়াকে দেখিতে আসিতে লাগিল। এখন অবশ্য

কথাটা পুরানো হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু গাঁয়ের লোকের কাছে ধনিয়ার সম্মান খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ওর সাহস অদ্ভুত, দরকার পড়িলে ও পুরুষের কান কাটিয়া দিতে পারে।

কিন্তু ধীরে ধীরে ধনিয়ার মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। হরিকে দিনরাত পুনিয়ার ক্ষেতে লাগিয়া থাকিতে দেখিয়াও ও কিছু বলিল না। এ যে হরির উপর বিরক্ত হইয়া, তাহা নয়, পুনিয়ার উপর ওর কৃপার ভাব জাগিতেছিল। হীরার গৃহত্যাগেই ওর প্রতিশোধ স্পৃহা চুকিয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে হরি জ্বরে পড়িল। ঋতু পরিবর্তনের দরুণ ঘরে ঘরে জ্বর হইতেছিল, হরিও তাহার কবলে পড়িল। আর কয়েক বছর পরে জ্বর হইলে সে বাকি সব শুধিয়া লইতে পারিত। এক মাস যাবৎ হরি খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িয়া আছে। জ্বরে হরিকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু একটা লাভ হইল, ধনিয়ার মন গলাইয়া দিল। লোকটা যদি মরিয়াই যায় তো উহার সঙ্গে কিসের ঝগড়া? এই রকম দশায় পড়িলে শত্রুকেও লোকে মায়া করে আর এ তো নিজের স্বামী। হউক নিতান্ত মন্দ, কিন্তু ইহার সঙ্গেই তো জীবনের পঁচিশটি বৎসর কাটিয়াছে, ইহারই সঙ্গে সুখ ভোগ করিয়াছে, ইহারই সঙ্গে দুঃখের দিন পার করিয়াছে। ভাল হউক আর মন্দ হউক, উহার আপনার জন তো বটে। বুড়া না হয় সকলের সমক্ষে গায়ে হাত তুলিয়াছে, চূড়ান্ত নাকাল করিয়াছে। কিন্তু এখন তো সেজন্য কত লজ্জিত। চক্ষু তুলিয়া চাহিতে পারে না। খাইতে আসে, মাথা নীচু করিয়া খাইয়া যায়, খাইয়াই উঠিয়া পড়ে। ভয় পায়, পাছে আমি কিছু বলিয়া বসি।

হরি সারিয়া উঠিল, ইতিমধ্যে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মিলন হইয়া গিয়াছে। একদিন ধনিয়া বলিল, আচ্ছা, তোমার ওরকম ভীষণ রাগ কোত্থেকে এল! আমারো তো তোমার ওপর কম রাগ হয়নি, কিন্তু তা বলে গায়ে হাত কিছুতে উঠবে না।

সলজ্জভাবে হরি বলিল, আর ও কথা তুলিস না ধনিয়া; আমার ঘাড়ে যেন ভূত চেপেছিল। এর জন্যে যে কত দুঃখু পেয়েছি, তা আমিই জানি।

যদি আমি রাগের চোটে ডুবে মরতাম?

অরে, তবে আমি কাঁদবার জন্যে বেঁচে থাকতাম? তোর চিতাতেই আমার লাসও পুড়ত।

আচ্ছা, চুপ কর। বাজে বকতে হবে না।

গোরুটা তো গেলই, কিন্তু আমার মাথায় এক সর্বনাশ চাপিয়ে গেল। পুনিয়ার এই ব্যাপারটা আমাকে শেষ করে দিল।

এই জন্যেই তো বলি, ভগবান, বাড়ির বড় কোরো না। ছোটকে তো কেউ উপহাস করে না। ভাল মন্দ সবই বড়র ওপর দিয়ে যায়।

মাঘ মাস। শীতের বৃষ্টি নামিয়াছে। চারিদিক অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। একে তো শীতের রাত, তাহাতে মাঘের বর্ষা ; বাজের শব্দে মনে হয়, যেন প্রলয়ের গর্জনে বিশ্ব ডুবিয়া যাইবে। কি ঘোর অন্ধকার! তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারিয়া হরি পুনিয়ার মটর ক্ষেতের ধারে নিজের ঝুপড়ির মধ্যে শুইয়া রহিল। মনে করিয়াছিল, শীতের কথা ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। কিন্তু হরির শতচ্ছিদ্র জীর্ণ মেরজাই আর বাহিরে বন্দুকের গুলির মত শীতের বৃষ্টির ফোঁটা, এই দুই প্রবল শত্রুর সামনে আসিবার মত সাহস ঘুমের নাই। আজ তামাকও মেলে নাই যে তামাক টানিয়া মনকে ভুলাইয়া রাখিবে। টীকার আগুন করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু ঠাণ্ডায় তাহাও নিভিয়া গিয়াছে। ফাটা ফাটা পা দুটি পেটের কাছে গুঁজিয়া, হাত দুখানা জাঙ্গিয়ার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া, ছেঁড়া কম্বলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া, নিজের গরম নিশ্বাসে হরি শরীরটাকে গরম করিবার চেষ্টা করিল। মেরজাইটা তৈরি করিয়াছিল আজ পাঁচ বৎসর আগে, তাও ধনিয়া বহু জবরদস্তি করিয়া বানাইয়াছিল। সেই যেবার গাঁয়ে কাবুলীওয়ালা আসিয়াছিল, কাপড়টা কিনিয়া ধনিয়া কত গালি খাইয়াছিল। আর, কম্বলটা তো উহারও জন্মের আগে হইতে ব্যবহার করা হইতেছে। শৈশবে বাপের সঙ্গে হরি এই কম্বলের নীচে ঘুমাইয়াছে, যৌবনে এই কম্বল গায়ে দিয়াই গোবরকে নিয়া রাত্রি কাটাইয়াছে, আর আজ বার্ধক্যেও ঐ কম্বলই উহার সাথী। কিন্তু আজ তো চিবাইয়া খাইবার মত দাঁত নাই, আজ উহার দাঁতে ব্যথা। জীবনে এমন দিন তো কখনো আসিল না যে, মহাজনের দেনা, জমিদারের খাজনা শোধ দিয়া হাতে কিছু বাঁচিল ; মাঝখান থেকে আজ ও এক নূতন ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া গেল। কিছু যদি না করে তো, লোকে হাসিবে, আর করিলেও সন্দেহ জাগে, লোকে কিছু বলে না তো! সবাই ভাবে, ও বুঝি পুনিয়ার সর্বস্ব লুটিয়া নিজের ঘর বোঝাই করিতেছে। ওর লাভ তো খুবই হইল, উপরন্তু কলঙ্কের ভাগী হইতে হইল। ওদিকে ভোলা কয়বার বলিয়া

পাঠাইয়াছে, উহার বিবাহের কি ব্যবস্থা হইল, সংসার যে আর চলে না। এদিকে শোভা একাধিক বার বলিয়াছে, পুনিয়া হরিকে ভাল চোখে দেখে না। তা কি করা? পুনিয়ার সংসারের কাজকর্ম তো দেখিতেই হইবে, সে সুখেই হোক, বা দুঃখেই হোক। ধনিয়ার মনও এখন পর্যন্ত পুরাপুরি পরিষ্কার হয় নাই। এখন পর্যন্ত উহার মন ভারি হইয়া আছে। সকলের সম্মুখে উহাকে মারা আমার উচিত হয় নাই। যাহার সঙ্গে পঁচিশ বৎসর ঘর করিলাম, গাঁ শুদ্ধ লোকের সামনে তাহার গায়ে হাত তোলা বড়ই ছোটলোকের কাজ হইয়াছে। অবশ্য আমাদের ঘরের কথা বে-আবরু করিতে ধনিয়া কসুর করে নাই। আমার সামনে দিয়া এমন ভাবে চলিয়া যায়, যেন আমাকে চেনেও না। কিছু বলিতে হইলে সোনা-রূপাকে মাঝে রাখিয়া কাজ চালায়। দেখিতেছি, উহার কাপড় ছিঁড়িয়া কি হাল হইয়াছে—তবু কাল যখন সোনার জন্য কাপড়ের কথা বলিল, নিজের শাড়ীর নামও একবার করিল না—যদিও সোনার শাড়ী হয়তো তালি লাগাইয়া আর দুতিন মাস চলিতে পারে, আর ওর শাড়ী একদম ন্যাকড়া হইয়া গিয়াছে। তা, আমিই বা ওর মনস্তুষ্টির জন্য কি করিলাম? ওকে খুসি করিবার জন্য দুই চার কথা বলিলেই কি বড় মান যাইবে? এই তো হয়, ও দুই চারিটা কটু কথা বলে, একটু রাগ করে, আর আমার গায়ে গিয়া লাগে; বুড়া হইয়া দেখিতেছি উল্লুক হইয়া গিয়াছি। এবারকার অসুখে দেখিতেছি একটু নরম হইয়াছে, না হইলে কত দিন যে মুখ ফুলাইয়া থাকিত, জানি না।

আজ দুই জনে যা কথাবার্তা হইয়া গেল তাহাতে মনে হয়, সব মিটিয়া গেল। ধনিয়া প্রাণ খুলিয়া সব বলিয়াছে, আর হরিও শুনিয়া গদগদপ্রায়। ভাবে মনে হয়, পারিলে ধনিয়ার পায়ে লুটাইয়া পড়ে, আর বলে, আমি তোকে মেরেছি, আচ্ছা, এই নে, আজ মাথা পেতে দিচ্ছি, যত খুসি মার আমাকে, যত পারিস, গাল দে!

হঠাৎ ওর কুঁড়ে ঘরের সামনে চুড়ির ঝংকার শোনা গেল। ও কান খাড়া করিল, হাঁ, সত্যই কেহ আসিয়াছে। সম্ভবত পাটোয়ারীর মেয়ে, নয় পণ্ডিতজীর বৌ হইবে। মটর তুলিতে আসিয়াছে বুঝি। জানি না কেন এদের এই রকম মতি গতি। সারা গাঁয়ের মধ্যে ভাল খায় পরে, ঘরে হাজার হাজার টাকা পুঁতিয়া রাখিয়াছে, সুদের ব্যবসা করে, লেন দেন করে, ঘুস খায়, দস্তুরি নেয়, কোন না কোন প্রকারে গরীবকে শোষণ করিয়া টাকা জোটায়, তবু এমন স্বভাব। যেমন

বাপ, তেমনই তো সন্তান হইবে। নিজে আসিতে পারে না, এদিকে স্ত্রীকে পাঠায়। এখন যদি উঠিয়া গিয়া হাত ধরিয়া ফেলি, তবে কোথায় থাকে? আমাদের বলে ছোট লোক, ঐ তো উঁচুদরের লোক—কি ছোট মন! স্ত্রীলোকের হাত ধরাও আমার কর্ম নয়। নে ভাই উঠিয়ে নে, যত খুসি মটর উঠিয়ে নে। মনে কর, আমি ধারে কাছেও নাই। বড় হইয়া যদি নিজের লজ্জা না বাঁচায়, তবে ছোটকে তো তার মান বাঁচাইতে হইবে।

আরে, এ তো দেখি ধনিয়া চিৎকার করিতেছে।

ধনিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, জেগে আছ, না ঘুমিয়ে পড়েছ? হরি তাড়াতাড়ি উঠিয়া কুটিরের বাহিরে আসিল। ভাবিল, আজ দেখিতেছি দেবী প্রসন্ন হইয়াছে, হরিকে বর দিতে আসিতেছে; এই জল ঝড়ের রাত, তাহাতে প্রচণ্ড শীত, এতদূর আসা ভয়েরও বটে। নিশ্চয় কোন বিশেষ কথা আছে। মুখে সে বলিল, এই ঠাণ্ডায় কি ঘুম আসে? তুই এই হাড়কাঁপানো শীতে বেরিয়েছিস কেন? খবর ভাল তো?

হাঁ, সব ভাল।

গোবরকে পাঠিয়ে আমাকে ডাকলেই হোত।

ধনিয়া উত্তর করিল না। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া মাচার উপর বসিয়া বলিল, গোবরের কথা কি বলছ, ও আমার মুখে চুনকালি দিয়েছে। যা ভয় করেছিলাম তাই-ই হয়েছে।

কি রে, কি হয়েছে? কাউকে মারপিট করে বসেনি তো?

কি করেছে আমি তো খুব জানি! যাও, জিজ্ঞাসা করগে সেই বিধবা ছুঁড়িকে।

কোন বিধবা ছুঁড়ি? কি বলছ, পাগল হলে নাকি?

হাঁ, আমি পাগল হব কেন? বুক ফুলে দশ হাত হয়েছে।

হরির মনে কিঞ্চিৎ আভাস জাগিতেছে। ব্যস্ত হইয়া সে বলিল, খুলেই বল না, কোন বিধবা মেয়ের কথা বলছ?

ঐ গো, সেই ঝুনিয়া, আর কে।

তা ঝুনিয়া কি এখানে এসেছে নাকি?

কে জানে, সে কোথায় যায়।

গোবর ঘরে নেই নাকি?

গোবরের কোন খবর নেই। সে কোথায় পালিয়েছে। এদিকে মেয়ে তো পাঁচ মাসের পোয়াতি।

এতক্ষণে হরি সব কিছু বুঝিল। গোবরের এত বারবার গোয়াল পল্লীতে যাওয়া দেখিয়াই ওর খটকা লাগিয়াছিল, কিন্তু এতদূর গড়াইয়াছে তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই। জোয়ান বয়সে হাসি ঠাট্টা সবাই করে, তাহাতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু নীল আকাশের গায়ে যে তুলার গোলা উড়াইতে দেখিয়া ও একদিন মনে মনে হাসিয়াছিল, তাহাই যে উহার সারা আকাশ ছাইয়া অন্ধকারে ঢাকিয়া দিবে, ইহা বুঝি দেবতাদেরও জানা ছিল না। গোবর এমন লম্পট! সেই সরল গোঁয়ার যুবক, যাকে ও এতদিন পর্যন্ত শিশু ভাবিয়াছে! কিন্তু হরির মনে খাওয়ার চিন্তা, পঞ্চায়েতের ভয়, ঝুনিয়া কি করিয়া ঘরে থাকিবে, এসব কোন কথাই জাগিল না, উহার ভয় হইল গোবরের জন্য। ছেলেটা লাজুক, আনাড়ি, তাহাতে অভিমানী—না জানি কি অনর্থ করিয়া বসে।

ঘাবড়াইয়া গিয়া হরি বলিল, ঝুনিয়া কিছু বলেনি গোবর কোথায় গেছে? ওকে সম্ভব বলে গেছে!

ধনিয়া ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি কি আক্কেলের মাথা খেয়েছ? ওর মন পড়ে আছে এখানে, ও যাবে কোথায়? নিশ্চয় লুকিয়ে আছে। দুধ অল্পটুকু খেলেও নষ্ট। আমি তো এখন ভেবে পাচ্ছি না এই কালামুখী ঝুনিয়াকে নিয়ে কি করি। আমার ঘরে তো আমি একদণ্ডও থাকতে দেব না। যেদিন থেকে ঐ গোরু আনতে গেল, সেদিন থেকে দুজনের মাখামাখি। পেট না হোলে এখনও কিছু মুখ খুলত না—পেট হওয়ায় ঝুনিয়া ভড়কে গেছে। বলছে, চল কোথাও পালিয়ে যাই। গোবর ঠেকিয়ে রাখছিল। একটা মেয়ে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাবে ঠিক পাচ্ছে না। আজ যখন ও মাথা খুঁড়ে বলতে লাগল, কোথাও নিয়ে চল, নইলে আত্মহত্যা কোরব, তখন গোবর কি করে? বলে যে চল, আমার ঘরে গিয়ে থাকবে, কেউ কিছু বলবে না। আমি মাকে রাজী করিয়ে নেব। আর অমনি ঐ কালামুখী ওর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। খানিকদূর তো গোবর ওর আগে আগে বেশ এল, তার পর কি জানি কোথায় কেটে পড়েছে। ও ছুঁড়ি দাঁড়িয়ে থেকে থেকে গোবর ফেরে না দেখে এখানে চলে এসেছে। আমি বলে দিয়েছি, যেমন

কাজ করেছ, ভোগ তার ফল। লক্ষ্মীছাড়ী আমার ছেলেকে নষ্ট করেছে। সেই থেকে মেয়েটা কাঁদতে শুরু করেছে। উঠবে না। বলে, এ মুখ নিয়ে ঘরে কেমন করে ফিরি। হায় ভগবান, এমন ছেলে দেওয়ার চেয়ে আমাকে বাঁজা রাখলে না কেন? ভোর না হতে সারা গাঁয়ের লোক কাঁউ মাঁউ করে উঠবে। আমার মনে হোচ্ছে বিষ খেয়ে নিই। এ আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, ওকে ঘরে আমি থাকতে দেবই না। গোবর চায় তো মাথায় করে রাখুক। আমার ঘরে এসব লম্পটদের জায়গা নেই। তুমি যদি এর মধ্যে কথা বল, তবে হয় তুমি ঘরে থাকবে নয় আমি থাকব।

হরি বলিল, তোর সঙ্গে বনবে না তো ওকে ঘরে ঢুকতে দিলি কেন?

আমি কি সাধ করে ডেকেছি। আর এখন এত যে বলছি, মেয়ে কিছুতে উঠবে না, ধন্না দিয়ে পড়ে আছে।

চল, দেখি গিয়ে কেমন না ওঠে। গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব।

ঐ দাড়িওআলা ভোলা সব দেখে শুনে চুপ করে ছিল। এমন বেহায়া বাপও হয়!

ও কি করে জানবে এদের পেটে এমন জিলিপির প্যাঁচ।

জানে না আবার কি? রাতদিন গোবর ওদের ঘরে ঘুর ঘুর করে ঘুরে বেড়ায়—তা দেখেও কি চোখ ফোটে না? অন্ধ নাকি?

চল যাই, ঝুনিয়াকেই জিজ্ঞাসা করি।

দুইজনে ক্ষেতের মাচান হইতে নামিয়া গাঁয়ের দিকে চলিল, হরি বলিল, পাঁচ প্রহর রাত হয়ে গেছে।

তা হবে, তাও সারা গাঁ কি ঘুম ঘুমাচ্ছে। চোর এলে গাঁয়ের সর্বস্ব নিয়ে যেতে পারে।

চোর এসব গাঁয়ে আসে না, ধনিয়ার ঘরে যায়।

ধনিয়া ব্যস্তভাবে হরির হাত ধরিয়া বলিল, দেখ, সোরগোল করো না যেন। সবাই জেগে যাবে, আর পাঁচটা কথা হবে।

হরি কঠোর স্বরে বলিল, আমি ওসব বুঝি না। হাত ধরে টেনে তুলব আর গাঁয়ের বার করে দেব। একদিন তো লোকে জানবেই। আজই জানুক। ও আমার ঘরে এল কেন। গোবরের কাছে যাক না। যখন কুকাজ করছিল, আমাদের কি জিজ্ঞাসা করেছিল?

ধনিয়া আবার উহার হাত ধরিয়া ধীরভাবে বলিল, দেখ, তুমি যদি ওর হাত ধর, ও চেঁচিয়ে উঠবে।

তা, চেঁচাক।

তা দেখ, এতখানি রাত হয়েছে, আর আজকের মত অন্ধকার—এর মাঝে ও যাবেই বা কোথায়? তাও তো ভাবতে হয়।

ও যেখানে খুসি যাক, আমার ঘরে ওর জায়গা নেই।

তা তো বটে, তবে এত রাতে এ অবস্থায় ঘর থেকে বার করে দেওয়াও উচিত নয়। এখন পা ভারি হয়েছে, কোথায় পড়ে পিছলে গেলে উলটো বিপত্তি হবে। এরকম অবস্থায় কত কিছু হয়ে যেতে পারে।

তা, ও মরুক বাঁচুক, আমার তাতে কি? যেদিকে খুসি যাক। ওর জন্য আমার মুখে কেন কালি পড়ে? আমি তো গোবরকেও বাড়ি থেকে বার করে তাড়িয়ে দেব।

ধনিয়া গভীর চিন্তা করিয়া বলিল, দেখ, কালি যা লাগার লেগেই গেছে। যতদিন বেঁচে আছি এ মুছবে না। গোবর নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে।

গোবর কেন ডোবাবে, এই মেয়েই ডুবিয়েছে। গোবর তো বাচ্চা—ওর খপ্পরে পড়েই এ দশা।

যে ডোবাক, ডুবে তো গেছে।

দুইজনে কথা বলিতে বলিতে ঘরের দরজায় আসিয়া পড়িল। ধনিয়ার অন্তরের এই মাতৃস্নেহ যেন অন্ধকারের মধ্যেও উহার চিন্তাজর্জর মুখখানাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। দুইজনেরই হৃদয়ে যেন বিগত যৌবনের ভাবটি জাগিয়া উঠিল। এই বিগতযৌবনার অন্তরাল হইতে বালিকা ধনিয়া যেন হরির চক্ষুর সামনে ফুটিয়া উঠিল—আজ হইতে পঁচিশ বৎসর আগে যে ধনিয়া উহার জীবনমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিল। উহার আলিঙ্গনে কি বাৎসল্য—যাহা সকল কলঙ্ক, সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূরে ঠেলিয়া হৃদয়ের কাছে টানিয়া লয়।

দুইজনে কবাট ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। পীলসুজের উপর তেলের কুপিটি জ্বলিতেছিল আর প্রদীপের ঈষৎ উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, ঝুনিয়া হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া দরজার দিকে মুখ করিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। সে যেন সেই আনন্দের জ্যোতি রেখাটি খুঁজিতেছে যাহা অল্পকালের জন্য নিজের মোহিনী মূর্তিতে চোখ ভুলাইয়া আজ একেবারে লোপ পাইল।

নিজের অদৃষ্ট প্রতিকূল, লোকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ বাণে জর্জরিত উহার হৃদয় আশ্রয়-তরু খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। গোবরকে পাইয়া মনে করিয়াছিল, নীড় মিলিয়াছে—এখানে সুখ শান্তি মিলিবে। কিন্তু আজ ও দেখিতেছে সেই সুখের আবাস দুইদিনের জন্য চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়া বিলাস বিভব সব শুদ্ধ আলাদীনের রাজপ্রাসাদের মত অন্ধকারে লুকাইয়া গেল। ভবিষ্যৎ এক ঘোর দানবের মত সম্মুখে মুখ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে হরিকে ঢুকিতে দেখিয়া ও কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া হরির পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বাবা, আমার আর কেউ নেই, তোমরাই আছ। চাই মারো, চাই কাটো; কিন্তু তাড়িয়ে দিও না।

হরি নীচু হইয়া স্নেহভরে ওর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, ভয় নেই মা, ভয় নেই। তোর ঘর, তোর বাড়ি, আমরাও সব তোর, এখানেই থাক তুই। ভোলার মেয়ে তুই, আমারও মেয়ে। আমি বেঁচে থাকতে তোর ভয় নেই। আমার কাছে যতদিন আছিস কেউ বাঁকা কথাটি তোকে বলতে পারবে না। ভাত কাপড় যা লাগে, আমি দেব, তুই নিশ্চিন্ত থাক।

সান্ত্বনায় গলিয়া গিয়া ঝুনিয়া হরির পায়ের উপর আরো লুটাইয়া পড়িল, বাবা আজ থেকে তুমি আমার বাপ, আর মা, তুমি আমার মা। আমি মাতৃহীন। আমাকে আশ্রয় দাও, নইলে আমার বাবা আর দাদা কাঁচা চিবিয়ে খাবে।

স্নেহ ও করুণার আবেশ ধনিয়া আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বলিল, তুই যা, ঘরে গিয়ে বোস, বাবা দাদাকে আমি দেখে নেব। সংসারে শুধু ওদেরই রাজত্ব নয়। বেশি করে তো তোর গয়নাগুলি নিয়ে নেবে। নিক, ছুঁড়ে ফেলে দিস।

এই অল্পক্ষণ আগেই ধনিয়া ঝুনিয়াকে কুলটা, কালামুখী, কলঙ্কিনী, আরো কত কি বলিয়াছিল, ঝাঁটা মারিয়া ঘর হইতে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। এখন উহার মুখে এতখানি স্নেহ, আশ্বাস আর ক্ষমার কথা শুনিয়া হরির পা ছাড়িয়া ঝুনিয়া উহারই পায়ে লুটাইয়া পড়িল। আর ধনিয়ার মত সতীসাধ্বী যে নাকি হরি ছাড়া কোন পুরুষের দিকে চক্ষু তুলিয়া চাহেও নাই, সে এই পাপিষ্ঠা বালিকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিল, সান্ত্বনা

বাক্যে উহার ভীত চকিত হৃদয়কে শান্ত করিতে লাগিল—যেমন করিয়া পক্ষীমাতা আপনার শাবককে বক্ষে লুকাইয়া রাখে তেমনই আদরে উহাকে বুকে টানিয়া লইল।

হরির ইঙ্গিতে ধনিয়া উহার জন্য খাবার ব্যবস্থা করিতে গেলে ও জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বেটি, গোবর কোথায় গেল, তুমি কিছু জান ?

ঝুনিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, আমাকে তো কিচ্ছু বলে যায়নি। আমার জন্য তোমাদের উপর···বলিতে বলিতে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

হরি আর ব্যাকুলতা ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, বলিল, আচ্ছা, আজ যখন তোমার কাছে গেল, ওকে কি খুব বিষণ্ণ দেখলে ?

কথা তো বলছিল হেসে হেসে, মনের খবর ঈশ্বর জানেন।

আচ্ছা, তোমার মন কি বলে ? ওকি গাঁয়েই আছে, না, বাইরে গেছে ?

আমার তো সন্দেহ হয়, বাইরেই কোথাও চলে গেছে।

আমারও তাই মনে হোচ্ছে। কিছু অনর্থ ই বুঝি ঘটে। আমি তো আর ওর শত্রু নই। ভালমন্দ যাই হোক, ওকে বোঝাতে পারতাম। এরকম ভাবে পালিয়ে গিয়ে আমাকেই মহা মুসকিলে ফেলে গেল।

ঝুনিয়ার হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া যাইতে যাইতে ধনিয়া বলিল, কাপুরুষ কোথাকার, যার হাত ধরেছিস তাকে কোথায় বিয়ে করবি না তার মুখে কালি ঢেলে ভেগে পড়া! এবার আসুক না, দেখি কে ঘরে উঠতে দেয়।

হরি ওখানেই পীঁড়ের উপর শুইয়া পড়িল। গোবর কোথায় গেল, এই প্রশ্ন ব্যাকুল পক্ষীর মত উহার হৃদয়াকাশকে আলোড়িত করিতে লাগিল।

## ১১

গাঁয়ে এই রকম একটা অসাধারণ কাণ্ড ঘটিয়া গেলে যতদূর ঘোঁট পাকান, সোরগোল হওয়া স্বাভাবিক, সবই হইল। একমাস পর্যন্ত ঝুনিয়ার দুই ভাই লাঠি হাতে গোবরকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিল। ভোলা তো দিব্য করিয়া বসিল, এই গাঁয়ের মাটি আর মাড়াইবে না। ঝুনিয়ার মুখ দর্শন করিবে না। দ্বিতীয়বার বিবাহের সম্বন্ধে হরির সঙ্গে যাহা কিছু কথাবার্তা ছিল, আজ সব ভাঙ্গিয়া গেল। এখন ও ঠিক করিল, গাইয়ের দাম নগদ হরির কাছে আদায় করিবে, দিতে বিলম্ব হইলে নালিশ রুজু করিয়া উহার ঘরবাড়ি নিলামে

চড়াইবে। এদিকে গাঁয়ের লোকেরা হরিকে জাতিচ্যুত করিয়াছে। কেহ তাহাকে কলকে দেয় না, তাহার বাড়ির জলস্পর্শ করে না। উহার জল বন্ধ করিবারও কথা হইয়াছিল, কিন্তু ধনিয়ার চণ্ডীমূর্তি একবার দেখিয়াছে, তাই সাহস করিয়া সম্মুখে কেহ যাইতে পারে নাই। সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া ধনিয়া বলিয়াছে, আমাকে যে জল তুলিতে বাধা দিবে, তাহার রক্তের সঙ্গে নিজের রক্ত মিশাইয়া ছাড়িব। এই আস্ফালনে সকলের তেজ শীতল হইয়া গেল। সকলের চেয়ে ঝুনিয়ার দুঃখই বেশি—তাহারই জন্য এই সব উপদ্রব, এদিকে গোবরের কোনও সন্ধান নাই। নানা দুঃখে বেচারা সারা দিন ঘরে বন্ধ। বাহিরে মুখ দেখাইবার জো নাই। বাড়ির বাহির হইলে চারিদিক হইতে বাক্যবাণ এমন জর্জর করিয়া তোলে যে, প্রাণ বাঁচান দায়। সারাদিন ঘরের কাজকর্ম করে, আর ফাঁক পাইলেই একটু কাঁদিয়া লয়। অষ্টপ্রহর ভয়ে বুক কাঁপে, এই বুঝি ধনিয়া কিছু বলিয়া বসে। রান্নাটা করিতে পারে না, কেননা কেহ উহার হাতে খাইবে না, কিন্তু আর সব কাজ সে আপনার ঘাড়ে টানিয়া লইয়াছে। গাঁয়ের যেখানে তিন চার জন স্ত্রীপুরুষ একত্র হয়, সেইখানেই উহার কুৎসা।

একদিন ধনিয়া হাট হইতে ফিরিতেছিল, পথে পণ্ডিত দাতাদীনের সঙ্গে দেখা। ধনিয়া মাথা নীচু করিল, কোন ফাঁকে তাহাকে এড়াইয়া চলিয়া আসিতে চায়। কিন্তু দাতাদীন ছাড়িবার পাত্র নয়, টিটকারি দিবার সুযোগ পাইলে ছাড়ে কে? টিপ্পনি করিয়া বলিল,—কি ধনিয়া, গোবরের খবর কিছু পেলি? এমন কুপুত্রের জন্ম দিয়ে সারা বংশের নাম ডুবিয়ে দিলি!

ধনিয়ার মনেও এই ধরণের কথা জাগিত। উদাস ভঙ্গীতে বলিল, মানুষের যখন খারাপ সময় আসে, তখন মতিগতিও এমনি হয়। আর কি বলি, বাবা?

দাতাদীন বলিল, যাই বল, ঐ দুষ্টাকে ঘরে রাখা তোমার উচিত নয়। দুধে মাছি পড়লে লোকে মাছিটা ফেলে দিয়ে দুধটা খায়। একবার ভেবে দেখ কি দুর্নাম আর নিন্দা কুড়োচ্ছ। এই কুলটাকে যদি ঘরে না রাখতে তবে কিছুই হোত না। ছেলেরা তো এরকম ভুলচুক করেই। যতদিন না ব্রাহ্মণ খাওয়াবে আর ভাই-বন্ধুকে ভোজ দেবে, ততদিন উদ্ধার পাবে কি করে? কিছু হোত না, যদি ওকে ঘরে ঠাঁই না দিতে। হরি না হয় পাগল, তাই বলে কি তোমারও বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেল?

দাতাদীনের ছেলে মাতাদীন এক চামারনীর সঙ্গে ফাঁসিয়াছে; একথা গাঁয়ের সকলেই জানে। তবে সে ফোঁটা দেয়, তিলক কাটে, পুথিপত্র ঘাঁটে, ভাগবত কথকতা করে, ধর্মসংস্কারের কাজ করে। কাজেই উহার প্রতিষ্ঠা তিলমাত্র কমে নাই। নিত্য-স্নান-পূজায় সে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লয়। ধনিয়া জানে, ঝুনিয়াকে আশ্রয় দেওয়ার দরুণই যত অনর্থের সঞ্চার। কেমন করিয়া যেন উহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল, নতুবা সেইদিন সেই অন্ধকার রাত্রেই তো উহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিত। তবে তো এত ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইত না। আর এ ভয়ও উহার হয়, ঠাঁই না দিলে ঝুনিয়া যাইত কোথায়? নদীর জলে ঝাঁপ দেওয়া বা কূয়ায় ডুবিয়া মরা ভিন্ন উহার কি গতি হইত? একটা প্রাণের—এক কেন, দুইটি প্রাণের—বিনিময়ে কি উহার মর্যাদা রক্ষা করা যাইত? আর ঝুনিয়ার গর্ভের এই শিশু, এ তো ধনিয়ারই কলিজার টুকরা। লোকে হাসিবে ভয়ে উহার প্রাণ নাশ করিবে? তাছাড়া, ঝুনিয়ার দীন. বিনম্র ভাবও উহার মন গলাইয়া দিয়াছিল। বাড়ির বাহিরে গেলে এসকল জ্বালা বিদ্রূপ তো উত্যক্ত করে, তবু ঘরে ফিরিবামাত্র ঝুনিয়া যখন ঠাণ্ডা জলের ঘটি নিয়া সযত্নে পা দুটি ধোওয়াইয়া দেয় তখন উহার রাগ যে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। বেচারা নিজের দুঃখে লজ্জায় মরমে মরিয়া আছে, উহাকে আর দাগা দিয়া লাভ কি?

ধনিয়া তীব্রস্বরে দাতাদীনকে বলিল, মহারাজ, লোকলজ্জা বা খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা আমার কাছে এত বড় নয় যে তার জন্য প্রাণিহত্যা কোরব। বিয়ে হয় নাই সেকথা ঠিক, কিন্তু আমার ছেলে তো ওর হাত ধরেছে। কোন মুখে একে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিই? ঐ কাজই বড় বড় লোক করে চলেছে, তাতে তাদের কলঙ্ক হয় না, লোকে নিন্দাও করে না। আর গরীব লোক করলে তাদের মর্যাদা নষ্ট হয়, নাক কাটা যায়। বড়লোকের কাছে অন্যের প্রাণের চেয়েও নিজের নাকটা বড় জিনিস হতে পারে, আমাদের কাছে অতটা নয়।

দাতাদীন হার মানিবার পাত্র নয়। এ গাঁয়ের সে হইল নারদ—এখানকার কথা ওখানে, ওখানকার কথা এখানে বহিয়া আনা, এই হইল তাহার ব্যবসা। সে চুরি করে না, তাহাতে বিপদের আশঙ্কা আছে; চোরকে লেলাইয়া দেয়। কিন্তু চোরাই মাল ভাগ-বাটোয়ারার সময়ে ঠিক হাজির থাকে। কোথাও

নিজের গায়ে ধূলা লাগিতে দেয় না। জমিদারকে আজ পর্যন্ত এক পাই খাজনা দিল না, ক্রোকের পরওয়ানা আসিলে কূয়ায় লাফাইয়া পড়িতে যায়, নোখেরামের জন্য বাঁচিয়া যায়; নিজে কিন্তু চাষীদের সুদে টাকা ধার দেয়। কোনও মেয়ের গহনা গড়াইতে হইবে, দাতাদীন অমনই হাজির। বিয়ে-শাদি ঘটাইতে উহার পরম আনন্দ, নামও হয়, দক্ষিণাও মেলে। অসুখ-বিসুখে রোগীর মর্জি বুঝিয়া ও ওষুধপত্র, ঝাড়ফুঁক, সব কিছুই করে। আর এমন চালাক, জোয়ানের সঙ্গে জোয়ানের মত, ছেলের সঙ্গে ছেলের মত, বুড়ার সঙ্গে বুড়ার মত হইয়া মিশিতে জানে। চোরের বন্ধু, আবার সাধুরও। গাঁয়ের কেহ উহাকে বিশ্বাস করে না। অথচ উহার কথাবার্তায় এমন যাদু আছে যে লোকে বারবার ঠকিয়াও উহারই শরণ লয়।

মাথা আর দাড়ি নাড়িয়া ও বলিল, এ তো ঠিকই বলছ ধনিয়া, ধার্মিক-লোকের উচিত কথা; তবে কি জান, লৌকিক রীতি অনুসারে তো চলতে হয়।

লালা পটেশ্বরীও একদিন হরিকে এ ভাবে গঞ্জনা দিয়াছিল। সে তো এই গাঁয়ে পরম ধার্মিক বলিয়া পরিচিত। প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের কথা শোনে; এদিকে নিজে পাটোয়ারী বলিয়া ক্ষেত চাষ করা, জল দেওয়া, সব কিছু কাজ বেগার খাটাইয়া লয়, আর চাষীদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লয়। সারা গাঁ উহার ভয়ে কাঁপে। গরীব লোককে পাঁচ দশ টাকা করিয়া ধার দিয়া আজ কয়েক হাজার টাকার সম্পত্তি করিয়াছে। চাষীদের কাছ থেকে ফসল লইয়া কাছারির আর পুলিশের আমলাদের সে ভেট দিয়া থাকে। সারা এলাকার লোক এজন্য উহাকে চিনিয়া রাখিয়াছে। যদি কেহ উহার কবলে না পড়িয়া থাকে, তো সে দারোগা গণ্ডা সিং—সম্প্রতি এই তল্লাটে আসিয়াছে। পাটোয়ারী লোকের উপকারও করে। জ্বরের সময় কুইনিন বিতরণ করিয়া সে নাম কেনে, আরোগ্য হইলে কুশল সংবাদ লইতে অবশ্য যায়। ছোটখাট ঝগড়-ঝাঁটি আপোষে মিটাইয়া দেয়, গ্রামের বিয়ে চূড়োর ব্যাপারে নিজের পালকি, কার্পেট, ভাল আসবাবপত্র বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করিতে দিয়া লোকের উপকার করে; সুযোগ পাইলে লইতে ছাড়ে না, তবে যার খায় তার কাজও করে। লালা হরিকে বলিল, হরি, তুমি একি ব্যাধি ঘরে পুষেছো?

হরি পিছন ফিরিয়া বলিল, লালাজী, কি বলছ, শুনতে পাইনি।

পা চালাইয়া আসিয়া হরিকে ধরিয়া ফেলিয়া পটেশ্বরী বলিল, বলছি আর কি? বলছি যে, ধনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি তোমারও বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে? ঝুনিয়াকে তার বাপের বাড়ি পাঠাচ্ছ না কেন? অনর্থক লোকের কাছে মুখ হাসাচ্ছ; কে জানে কার ছেলে ওর পেটে, আর তুমি বেশ ঘরে ঠাঁই দিয়ে বসে আছ! তোমার এখনো দু দুটো মেয়ের বিয়ে বাকি, জানি না, কি করে পার হবে।

এই ধরণের আলোচনা আর মঙ্গলকামনা শুনিতে শুনিতে হরির ক্লান্তি আসিয়া পড়িয়াছিল। বিরক্ত হইয়া সে বলিল, লালাজী, সে সব আমিও বুঝি, তা তুমিই বল না, আমি কি কোরতে পারি। আমি বার করে দিলেই কি ভোলা ঝুনিয়াকে ঘরে নেবে? সে রাজি থাকে তো আমি এখনি ওকে পৌছে দিতে পারি। তুমি যদি ওকে রাজি করাতে পার তবে আমি চিরজন্ম তোমার কেনা হয়ে থাকব। কিন্তু ওখানে ভোলার দুই ছেলে তো পারলে একে খুন করে ফেলে। এ রকম অবস্থায় আমি কি করে ওকে তাড়িয়ে দিই? এক পাষণ্ড তো ওর হাত ধরে দাগা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আমিও যদি তাড়িয়ে দিই তবে এই অবস্থায় কোথাও জনমজুরিও তো করতে পারবে না। শেষে যদি ডুবে কি পুড়ে মরে, তো পাপ কার লাগবে? আর মেয়ের বিয়ে—সে তো ভগবানের হাতে। যখন সময় আসবে, উপায়ও হয়ে যাবে। আমাদের ঘরে তো মেয়ে আইবুড়ো কখনও থাকে নাই, তা জ্ঞাতিকুটুম্বের ভয়ে খুনের কাজ আমি করতে পারি না।

হরি লোকটি নম্র স্বভাবের। সর্বদা সে মাথা নীচু করিয়া চলে, আর বাক্যবাণ হজম করিয়া লয়। হীরা ভিন্ন ওর অমঙ্গল কেহ চাহে না; কিন্তু সমাজ এত বড় অনর্থ কি করিয়া সহিবে? উহারও দেখ কি জবরদস্তি, বুঝাইলেও বুঝিতে চাহে না। স্বামী স্ত্রী দুই জনে যেন স্পর্ধাভরে সমাজকে বলিতেছে—দেখি, কতদূর করিতে পার। সমাজও দেখাইয়া দিবে, সমাজের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কেহ সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না।

সেই দিন রাত্রিতেই এই সমস্যা বিচারের জন্য গ্রামবিধাতাদের বৈঠক বসিল।

দাতাদীন বলিল, কাউকে নিন্দা করা আমার স্বভাব নয়। সংসারে কোন কুকর্মটা হয় না? তাতে তোমার আমার কি? কিন্তু ঐ যে ধনিয়া, ও তো

আমার সঙ্গে লড়তে চায়। ভাইদের ঠকিয়ে হাতে দু পয়সা করেছে, এখন কুপথে যাবে না তো কি? ছোট জাত, পেট ভরে রুটি খায় আর বাঁকা পথে চলে, তাই না শাস্ত্রে বলে, ছোট জাতের মুখে মারো লাথি।

হুঁকায় টান দিতে দিতে পটেশ্বরী বলিল, ছোট জাতের দোষই এই যে, যেই দুপয়সা হাতে এল অমনই মেজাজ গেল বিগড়ে। আজ হরি এমন মেজাজ দেখাল, আমি মানে মানে চুপ করে রইলাম। নিজেকে ও যে কি ভাবে, জানি না। ভেবে দেখ, এ রকম দুর্নীতি চলতে থাকলে গাঁয়ের দশা কি হবে। ঝুনিয়াকে দেখে অন্য বিধবাদের মন বিচলিত হবে না? আজ ভোলার বাড়িতে এ ব্যাপার হোল, কাল তোমার আমার ঘরেও হবে। সমাজ তো চলে ভয়ের বশে। আজ যদি সমাজের বাঁধন আলগা হয় তো দেখবে, সংসারে কত না অনর্থ হবে।

ঝিংগুরী সিংহের দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রী পাঁচটি ছেলেমেয়ে রাখিয়া মারা যায়, তখন উহার বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। তবু আবার বিবাহ করিল, এবং সেই স্ত্রীর সন্তান হইল না দেখিয়া সে তৃতীয়বার বিবাহ করিয়াছে। এখন তাহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর, আর ঘরে দুই দুইটি যুবতী স্ত্রী। উহাদের দুই জনের সম্বন্ধে নানারকম কথা শোনা যায়। অবশ্য ঠাকুর সাহেবের ভয়ে সুযোগ মিলিলেও কেহ কিছু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। স্বামীর আবরণের আড়ালে সব কিছুই চলে। মুসকিল তাহাদেরই যাহাদের কোনও আবরণ নাই। ঠাকুর সাহেব স্ত্রীদের খুব কঠোর শাসনে রাখে, আর বড়াই করে যে, উহাদের ঘোমটা পর্যন্ত কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু ঘোমটার আড়ালে কত কি যে চলে, তাহার খবর কে রাখে?

সেই ঝিংগুরী বলিল, এমন মেয়ের তো মাথা কাটতে হয়। এই কুলটাকে ঘরে রেখে হরি সমাজের মধ্যে বিষ ঢুকিয়েছে। ওর মত লোককে গাঁয়ে থাকতে দেওয়ার মানে সারা গাঁকে ভ্রষ্ট করা। রায়সাহেবকে একথা জানাতে হবে। স্পষ্ট বলে দিতে হবে, এ সব ব্যভিচার গাঁয়ে চলতে দিলে আর কারো আবরু বজায় থাকবে না।

কারকুন পণ্ডিত নোখেরাম বিশিষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণ। ইহার ঠাকুরদাদা কোন রাজার দেওয়ান ছিল, কিন্তু সর্বস্ব ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিল। ইহার বাপও রামনামের আওতায়ই জীবন কাটাইয়াছে। নোখেরাম

সেই ভক্তির ধারা পাইয়াছে। ভোর বেলায় সে পূজায় বসে, বেলা দশটা পর্যন্ত বসিয়া রামনাম লেখে, কিন্তু ভগবানের সান্নিধ্য হইতে উঠিবামাত্র উহার মানবতা উগ্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়া উহার কাজকর্ম কথাবার্তা সব কিছু বিষাক্ত করিয়া তোলে। রায়সাহেবকে জানাইবার প্রস্তাবে উহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। ফোলা ফোলা গালের মধ্যে ঢুকিয়া যাওয়া চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া সে বলিল, এর মধ্যে রায়সাহেবকে জিজ্ঞাসা করবার কি আছে? আমার যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। বলে দাও না, একশ টাকা জরিমানা—অমনই এখনই গ্রাম ছেড়ে পালাবে, আর এদিকে আমি জমি বেদখল করবার ব্যবস্থাও করে দিচ্ছি।

পটেশ্বরী বলিল, কিন্তু খাজনা যে সব চুকিয়ে দিয়েছে?

ঝিংগুরী সিংহ সমর্থন করিল, হাঁ, খাজনার জন্য তো ত্রিশ টাকা আমার কাছ থেকে ধার নিয়েছে।

নোখেরাম গর্বভরে বলিল, কিন্তু এখনো রসিদ তো দিই নাই। খাজনা যে চুকিয়ে দিয়েছে, তার সাক্ষী প্রমাণ কই?

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, হরির উপর একশ টাকা জরিমানা চাপানো হইবে। কেবল এক দিন গাঁয়ের সব লোকদের জড়ো করিয়া তাহাদের মজুরি লওয়ার অভিনয় করা প্রয়োজন। ইহাতে দশ পনেরো দিন দেরি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আজই রাত্রিতে ঝুনিয়ার একটি পুত্রসন্তান জন্মিল, সুতরাং পরদিনই গ্রামের বৈঠক বসিল। নিজেদের কাজের পরিণাম শুনিবার জন্য হরি আর ধনিয়া দুইজনকেই ডাকা হইল। এত ভিড় যে তিল ধারণের স্থান নাই। পঞ্চায়েতের আদেশ হইল যে হরিকে নগদ একশ টাকা আর ত্রিশ মণ ফসল জরিমানা দিতে হইবে।

সেই বিপুল জনসভায় ধনিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিল, গ্রামপঞ্চায়েৎ, জেনে রেখো যে গরীবকে নির্যাতন করে সুখ পাবে না। আমরা তো মরে যাব, এই গাঁয়ে থাকব কি না থাকব জানি না, তবে আমাদের শাপ তোমাদের অবশ্য লাগবে। আমাদের ওপর এই কড়া জরিমানা বাহাল করা হোল কিসের জন্য, না, আমরা একে রাস্তায় বার করে দিয়ে ভিখিরী সাজাই নাই? এই কি তোমাদের ন্যায় বিচার?

পটেশ্বরী বলিল, ও তো তোর বৌ নয়, ও তো ভ্রষ্টা।

হরি ধনিয়াকে বলিল, কেন কথা বাড়াস ধনিয়া ? পঞ্চায়েতের মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। তাদের বিচারে যা ন্যায় ধর্ম হয়েছে, তা মাথা পেতে নিতে হবে। ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয় যে আমরা গাঁ ছেড়ে চলে যাব, তা হলে যেতেই হবে। যাওয়া না যাওয়া কি আমার হাতে ? গ্রামপঞ্চায়েৎ, আমার যা কিছু আছে সবই এখন খামারে। এখনও একদানাও ঘরে আসে নি। তোমরা যতটা চাও নিয়ে নাও। সবটা চাও, তাই নাও। ভগবান আমাদের মালিক। যদি কম পড়ে, তবে আমার ঐ বলদ দুটিকে নিয়ে নাও।

দাঁত কড়মড় করিয়া ধনিয়া বলিল, আমি না দেব এক দানা ফসল, না দেব এক কড়ার জরিমানা। যার শক্তি আছে, চলুক, আমার কাছ থেকে আদায় করবে। তাজ্জব ব্যাপার! মনে ভেবেছে, সাজা দেওয়ার বাহানা করে এর সব জমি কেড়ে নেবে, তারপর আর একজনকে দিয়ে দেবে, ফের নজরানা আদায় করবে। বাগান টাগান বেচে দিয়ে মজা করে সব লুটে নেবে। ধনিয়া বেঁচে থাকতে তা হবে না, তোমাদের মনের সাধ মনেই রয়ে যাবে। আমরা চাই না সমাজে থাকতে, সমাজে থেকে আমাদের এমন কিছু স্বর্গলাভ হবে না। এখনও নিজেরা খেটে খাচ্ছি, তখনও খেটে খাব।

হাত জোড় করিয়া ধনিয়ার কাছে আসিয়া হরি বলিল, তোর পায়ে পড়ি, তুই চুপ কর। আমরা সবাই সমাজের দাস, এর বাইরে যেতে পারি না। ওরা যা সাজা দিচ্ছে, মাথা পেতে মেনে নে। একঘরে হয়ে থাকার চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল। আজ যদি মারা পড়ি, তবে এই ভাইবন্ধুরাই তো দেহের সংকার করবে। এরা তরায়, তবে না তরবো ? পঞ্চায়েৎ, জোয়ান ঐ ছেলের মুখ দেখা যদি ভাগ্যে না ঘটে, তবে খামারের ফসল ছাড়া আর আমার দেবার কি আছে ? আমি আপনাদের অমান্য কোরবো না। পঞ্চায়েৎ যদি আমার কাচ্চাবাচ্চার ওপর দয়া করে মাপ করে, ভাল, নইলে আমাকে তো হুকুম মানতেই হবে।

ধনিয়া মুখ ঘুরাইয়া চলিয়া গেল, আর হরি এক প্রহর রাত পর্যন্ত আঁটি আঁটি ফসল তুলিয়া দিয়া ঝিংগুরী সিংহের গাড়ী বোঝাই করিল। কুড়ি মণ যব, পাঁচ মণ গম, ঐ পরিমাণ মটর, কিছু ছোলা আর তিসি। একলা লোক, আর দুই গৃহস্থের বোঝা। এতটা যে হইয়াছে তাহাও ধনিয়ার দৌলতে। ঘরের সমুদয় কাজ ঝুনিয়া সারিয়াছে, আর ধনিয়া মেয়ে দুইটি নিয়া ক্ষেতে গিয়া জুটিয়াছে।

দুই জনে ঠিক করিয়াছিল, গম আর তিসি বেচিয়া খাজনার এক কিস্তি শোধ দিয়া যদি কিছু বাঁচে তো সুদের খানিকটা শোধ করিবে। যবটা খাওয়া চলিবে, একটু আঁটসাঁটভাবে খরচ করিলে কোন না পাঁচ ছয় মাস কাটিবে, ততদিনে জোয়ার, মকাই আর ধানের সময় আসিয়া পড়িবে। উহাদের সকল আশা আজ ধূলিসাৎ হইল। ফসল তো হাতছাড়া হইলই, উপরন্তু একশ টাকার দায় মাথার উপর ঝুলিয়া রহিল। এখন পেট চলিবে কি দিয়া তাহারই ঠিকানা নাই। ওদিকে গোবরের কি হইল, ভগবানই জানেন। না খবর, না পাত্তা। আরে, হৃদয় যদি এতই নরম, তবে এ কাজ করিলে কেন? ভবিতব্যতা ঠেকাইবে কে? পঞ্চায়েতের আতঙ্কেই হরি নিজের মাথায় বহিয়া ফসল তুলিয়া দিতেছিল—এ যেন নিজের হাতে নিজের কবর খোঁড়া। জমিদার, মহাজন, সরকার—কাহার এত প্রভাব? ছেলেপুলে কাল কি খাইবে, এই চিন্তায় প্রাণ শুকাইয়া যায় সত্য, তবু সমাজের ভয় পিশাচের মত মাথায় চড়িয়া গুঁতা দিতে থাকে। জ্ঞাতিগোষ্ঠীর বাহিরে আসিয়া জীবন যাপন করার কথা ইহারা ভাবিতেও পারে না। বিবাহ, অন্নপ্রাশন, চূড়া, কর্ণবেধ, জন্মমৃত্যু—সকল বিষয়ে ইহারা সমাজের হাতের পুতুল। সমাজের ভয়, বৃক্ষের মত ইহাদের জীবনের পরতে পরতে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। তাহার বাহিরে আসিলে ইহাদের জীবন বিশৃঙ্খল, লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইবে।

গোলায় যখন মণ দেড়েকের মত যব বাকি, তখন ধনিয়া কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া হরির হাত ধরিয়া ফেলিল—আচ্ছা, খুব হয়েছে, এবার থাম। সমাজের ভয়ে ও লজ্জায় সবই তো দিয়ে দিলে। এখন বাচ্চাদের জন্য কিছু রাখবে, না, সবই ওদের ভাঁড়ে তুলে দিতে হবে? আমি তোমার কাছে হার মানছি। ভাগ্যদোষে তোমার মত বেকুবের হাতে পড়েছিলাম।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া বাকি ফসলটা টুকরিতে তুলিয়া দিতে দিতে হরি বলিল, তা হবে না ধনিয়া। পঞ্চায়েতের চোখে ধূলো দিয়ে এক দানাও আমি রাখবো না, পাপ হবে আমার। আমি নিয়ে গিয়ে সব কিছুই ওখানে ঢেলে দেব—তার পর পঞ্চায়েৎ যদি দয়া করে আমার ছেলেপুলের জন্য কিছু ছাড়ে তো দেবে, নইলে ঈশ্বরই আছেন।

ধনিয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল, এ তো পঞ্চায়েৎ নয়, এরা রাক্ষস, পাকা রাক্ষস। এরা চায় আমাদের জায়গা জমি ছিনিয়ে নিয়ে মেরে নিতে। জরিমানাটা

ছল মাত্র। তোমাকে কত বোঝাচ্ছি, তা তোমার চোখ কানা ; এই পিশাচদের কাছে তুমি দয়ার প্রত্যাশা কর, ভাবছ, এরা দু-দশ মণ ছেড়ে দেবে! সে গুড়ে বালি।

হরি যখন কিছুতে শুনিল না, তবু টুকরি মাথায় উঠাইয়া লইল, তখন ধনিয়া শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া দুই হাতে টুকরিটা টানিয়া ধরিল—এ আমি কিছুতে নিতে দেব না, মেরে ফেললেও না। মরতে মরতে আমি এ শস্য কেটেছি, পহর রাত ভর ক্ষেতে জল দিয়েছি, রাত জেগে পাহারা দিয়েছি, সে কি ঐ পঞ্চায়েতের লোক গোঁফে তা দিয়ে ভোগ করবে আর আমার কাচ্চাবাচ্চা না খেয়ে শুকিয়ে মরবে বলে ? তোমার একার সাধ্য কি ছিল এতটা করার! আমিও আমার কচি দুটোকে নিয়ে কম করিনি। এই টুকরি তুমি সোজা রেখে দাও, না তো বলে দিচ্ছি, আজ চিরদিনের মত সম্পর্ক ঘুচে যাবে।

হরি ভাবনায় পড়িল। ধনিয়ার কথার মধ্যে সত্য আছে। বাচ্চাদের মেহনতের ফল কাড়িয়া লইয়া পঞ্চকে দিবার উহার কি অধিকার? ও ঘরের মালিক তো এই জন্যই যে, সকলকে পালন করিবে, সকলের রোজগার কাড়িয়া লইয়া পঞ্চায়েতের চোখে ভাল হইবে বলিয়া তো নয়। টুকরি হাত হইতে পড়িয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল, তুই ঠিকই বলেছিস ধনিয়া। অন্যের ভাগ নেবার আমার কোন অধিকার নেই। যা পড়ে আছে তুই নিয়ে যা, আমি গিয়ে পঞ্চায়েৎকে বলব এখন।

ফসলের ঝুড়ি ঘরে নামাইয়া রাখিয়া মেয়ে দুইটিকে লইয়া ধনিয়া গলা ছাড়িয়া নাতির কল্যাণে গান গাহিতে শুরু করিল, সারা গাঁ যেন জানিতে পারে, উহার ঘরে শিশু জন্মিয়াছে। আজ এই প্রথম ঘটিল যে শুভ জাতকর্মের গানে গাঁয়ের কোনও মেয়ে আসিল না। আঁতুড় ঘর হইতে ঝুনিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে, মঙ্গলগান গাহিবার কোন দরকার নাই। কিন্তু ধনিয়া কি শোনে? বেরাদরি যদি উহাদের মুখ না চাহে তো উহারাও বেরাদরির পরোয়া করিবে না। ঠিক ঐ সময়ে হরি আশি টাকার জন্য ঝিংগুরী সিংহের কাছে নিজের ঘরখানা বাঁধা দিতেছিল। ইহা ভিন্ন সাজার টাকা সে কোথা হইতে যোগাড় করিবে? তিসি, গম আর মটরে কুড়িটাকার সংস্থান হইয়াছিল। বাকি টাকার জন্য ঘরখানা লিখিয়া দিতে হইল। নোখেরামের তো ইচ্ছা ছিল, বলদ দুইটিও বিকাইয়া যায়, কিন্তু পটেশ্বরী আর দাতাদীন বাধা দিল। বলদ দুইটি গেলে

হরি চাষ করিবে কি দিয়া! বেরাদরি ওর সম্পত্তি হইতে টাকা উশুল করিবে, কিন্তু তাহারা তো চায় না যে হরি গাঁ ছাড়িয়া চলিয়া যায়! এই কারণে বলদ দুইটি বাদ পড়িল।

ঘরের বন্ধকনামা লিখাইয়া রাত এগারোটা বাজিতে হরি যখন ঘরে ফিরিল, তখন ধনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত পর্যন্ত ওখানে তোমার কি কাজ ছিল?

হরির সমস্ত রাগ গিয়া গোবরের উপর পড়িল—আর কি কাজ বল, কুপুত্রের কর্মের ফল ভোগ করছিলাম। অভাগা নিজে তো আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালিয়েছে, সে আগুন নেভাবার ভার আমার। আশি টাকায় ঘর খানা লিখে দিতে হোল। কি করি বল? এখন হুঁকো চল হোল। সমাজের লোক আমাদের মাঁফ করেছে।

ঠোঁট কামড়াইয়া ধনিয়া বলিল, ভারি হোল! হুঁকো বন্ধ ছিল, তাতে আমাদের কি এসে যাচ্ছিল! এই যে চার পাঁচ মাস কারু হুঁকোয় টান দাওনি তাতে কি বড় ছোট হয়ে গিয়েছ? আমি ভাবি, তুমি এত বোকা হলে কি করে? আমার কাছে তো খুব বুদ্ধিমান, খুব কথা ফোটে, আর বাইরে গেলে মুখ অমন বন্ধ হয়ে যায় কেন? নিয়ে খেয়ে বাপ দাদার চিহ্ন এই ঘর খানা সম্বল ছিল, তাও তুমি আজ খতম করে দিলে। তিন চার বিঘে জমি আছে, তাও কাল এমনি করে লিখিয়ে দাও, তারপর পথে পথে ভিক্ষা করে খেও। আমি বলি, তোমার মুখের মধ্যে জিভ কি ছিল না, পঞ্চকে জিজ্ঞাসা কোরতে পারলে না. তোমরা কোথাকার সাধু সজ্জন যে অন্যের সাজা দিতে আস? তোমাদের মুখ দেখলেও যে পাপ হয়!

হরি ধমক দিল, চুপ কর, বেশি বকিস না। বেরাদরির চক্রান্তে এখনো পড়িস নাই কিনা, তাই। পড়লে আর মুখ দিয়ে রা বেরোত না।

ধনিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি কোন পাপ করেছি যে বেরাদরির ভয় কোরবো—কারু ঘরে চুরি করেছি না সিঁধ কেটেছি। মেয়েমানুষ রাখাটা পাপ, না, রেখে ছেড়ে দেওয়াটা পাপ! মানুষের এত বেশি ভালমানষি ভাল নয়। অতি ভালমানষির ফল হয় যে কুকুরেও লাথি মারে। আজ ওখানে হয় তো তোমার বাহবা পড়ে গেছে, সমাজের মর্যাদা রক্ষা করেছ। আমার ভাঙ্গা কপাল; তাই তোমার মত পুরুষের হাতে পড়েছি। কখনো সুখের ভাত জুটল না।

আমি কি তোর বাবার পায়ে ধরে সেধেছিলাম নাকি? ওই তো আমার গলায় ঝুলিয়ে দিল।

ওঁর বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, এ ছাড়া আর কি বলি? জানি না কি দেখে বাবা ভুলেছিলেন। এমন কিছু রূপও তোমার ছিল না।

ঝগড়া অনুরাগের ভূমিতে আসিয়া ঠেকিল। আশি টাকা না হয় গিয়াছে, কিন্তু লাখ টাকার ধন মাণিক তো ঘরে আসিয়াছে, উহাকে তো কেহ ছিনাইয়া লইবে না। গোবর যদি ঘরে ফিরিয়া আসে তবে ধনিয়া নতুন কুঁড়ে বাঁধিয়াও সুখে থাকিবে।

হরি প্রশ্ন করিল, ছেলে কার মত হয়েছে?

ধনিয়া হাসিমুখে জবাব দিল, একেবারে হুবহু গোবরের মত। সত্যি বলছি।

বেশ হৃষ্ট পুষ্ট তো?

হাঁ, বেশ সুন্দর হয়েছে।

## ১২

সেদিন রাত্রিবেলা গোবর যখন ঝুনিয়ার সঙ্গে পথে বাহির হইল, ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল, মনে হইল উহার নাক কাটা গিয়াছে। ঝুনিয়াকে দেখিয়া সারা গাঁয়ে দারুণ বলাবলি শুরু হইবে, চারিদিক হইতে লোকে কত হায় হায় করিতে থাকিবে, ধনিয়া কতই না গালি দিবে, এ সব ভাবিতে ভাবিতে তাহার পা যেন কে পিছনে টানিয়া ধরিল। হরিকে অবশ্য ও অত ভয় করে না। জানে, সে একবার ধমকাধমকি করিবে, পরে শান্ত হইয়া যাইবে। ওর ভয় ধনিয়াকে, সে হয়তো বিষ খাইবে, ঘরে আগুন জালিয়া দিবে। না, এখন ঝুনিয়াকে লইয়া ঘরে যাইতে ওর সাহস হয় না।

কিন্তু ধনিয়া যদি ঝুনিয়াকে ঘরে ঢুকিতেই না দেয়, ঝাঁটা লইয়া মারিতে আসে, তবে ও বেচারি যাইবে কোথায়? নিজের ঘরে তো ফিরিতেই পারে না, যদি কুয়ায় ঝাঁপ দেয় বা গলায় দড়ি দেয়, তবে কি হইবে? গোবর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কাহার শরণ লইবে?

না, মা এত নিষ্ঠুর নয় যে মারিতে ছুটিয়া আসিবে। রাগের মাথায় দুই চারিটা গালি গালাজ করিবে; কিন্তু ঝুনিয়া যখন তাহার পা জড়াইয়া কাঁদিতে থাকিবে, তখন তাহার উপর দয়া হইবেই। ততদিন গোবর নিজে কোথাও

লুকাইয়া থাকিবে ; তাহার পর গণ্ডগোল থামিয়া গেলে ধীরে সুস্থে ও একদিন ঘরে ফিরিবে, মাকে মানাইয়া লইবে। ইহার মধ্যে কোথাও যদি মজুরি জুটিয়া যায়, আর দুই চারি টাকা হাতে লইয়া ফিরিতে পারে, তবে মায়ের মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে।

ঝুনিয়া বলিল, আমার তো বুক ধড়াস ধড়াস করছে। আগে কি জানতাম তুমি আমার গলায় এমন পাথর ঝুলিয়ে দেবে! কি কুক্ষণেই না জানি তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। গোরু নিতে তুমি যদি না আসতে তবে এ সব কিছুই হোত না। তুমি আগে আগে যাও, যা কিছু বলার বা শোনার শেষ করে নাও, আমি পেছন্ পেছন আসছি।

গোবর বলিল, না না, তুমিই আগে যাও। গিয়ে বল যে হাটে জিনিসপত্র বেচে বাড়ি ফিরছিলে, রাত হয়ে গেল, এখন কি করে ফিরবে। ইতিমধ্যে আমি গিয়ে পড়ব।

ঝুনিয়া চিন্তিত মুখে বলিল, তোমার মা যা রাগী মানুষ। আমার তো ভয়ে প্রাণ কাঁপছে। আমায় যদি মারতে শুরু করে, তবে কি করব?

গোবর সাহস দিল, না, মার স্বভাব ওরকম নয়। আমাদের গায়ে পর্যন্ত একদিন হাত তোলে না, তা তোমাকে কি মারবে? দেখো, মার যা বোঝা-পড়া করার, আমার সঙ্গে কোরবে, তোমাকে একটি কথাও বলবে না।

গাঁ নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। গোবর ঠেলিয়া দিয়া বলিল, তাহলে তুমি যাও।

ঝুনিয়া মিনতি করিয়া বলিল, তুমিও যেন দেরি করো না।

তুই যা তো, আমিও এক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

আমার যে কি হোচ্ছে তা আমিই জানি। তোমার ওপর রাগ হোচ্ছে।

আরে, তুই এত ভয় পাচ্ছিস কেন, আমিও তো এলাম বলে।

এর চাইতে ভালো হোত যদি অন্য কোথাও দুজনে চলে যেতাম।

নিজের ঘর থাকতে পালিয়ে যাব কেন? তোর মিথ্যেই ভয়।

শীগগির আসছ তো?

হাঁ, হাঁ, এখুনি আসছি।

আমায় ফাঁকি দিচ্ছ না তো? আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে যদি কোথাও পালিয়ে যাও?

আমি এত নীচ নই ঝুনা ; একবার যখন তোমার হাতে হাত মিলিয়েছি তখন মরণ পর্যন্ত আর ছাড়ব না।

ঝুনিয়া ঘরের দিকে চলিল। গোবর এক মুহূর্ত দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার উপর পড়িতে উদ্যত লাঞ্ছনাগুলি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে ওর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আচ্ছা, সত্যই যদি মা মারিতে যায়! উহার পা যেন মাটির সঙ্গে সাঁটিয়া গেল। ও যেখানে দাঁড়াইয়া, সেখানটা আর ওর বাড়ির মাঝে কেবল ছোট একটা আমবাগান। ঝুনিয়ার কালো ছায়া ধীরে ধীরে উহার চোখের আড়াল হইয়া আসিল। উহার জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রবল হইয়া উঠিল। কানের শক্তি এত বাড়িয়া গেল, ও যেন এখান হইতেই শুনিতেছে মা ঝুনিয়াকে গালাগালি করিতেছে। মনের এমন অবস্থা হইল, যেন মাথায় কেহ হাতুড়ি পিটাইতেছে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। একটু পরে ও দেখিল, ধনিয়া যেন ঘর হইতে বাহির হইয়া পথ ধরিয়া কোথাও চলিল। বোধ হয় বাবার কাছে চলিল, বাবা হয়তো খাইয়া দাইয়া মটর ক্ষেত পাহারা দিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে। সেও মটর ক্ষেতের দিকে চলিল। যব আর গমের ক্ষেত মাড়াইয়া ও এমন ছুটিয়া চলিল যেন পিছনে কেহ তাড়া করিয়া আসিতেছে। ঐ তো বাবার ঝুপড়ি। ও থামিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঝুপড়ির সামনে বসিয়া পড়িল। উহার অনুমান ঠিকই হইয়াছে। পৌছিয়াই ধনিয়ার কথা শুনিতে পাইল। ওঃ, কি আশ্চর্য, মার প্রাণ এত কঠিন। এক অনাথা মেয়ের উপর এতটুকু দয়া হইল না। আমি যদি এখন সামনে গিয়া জোর গলায় বলি, ঝুনিয়াকে তিরস্কার করিবার তোমার অধিকার নাই, তবে সমস্ত চুকিয়া যায়। বাবাও দেখি বিগড়াইয়াছে। ঝুনিয়াকে যদি ইহারা মারপিট করে তবে আমি সহ্য করিব না। ভগবাম, তুমিই ভরসা! এই বিপদে পড়িব তাহা কি আগে জানিতাম! ঝুনিয়া আমাকে কি কাপুরুষ, নীচ আর ধূর্ত মনে করিবে! কিন্তু উহার গায়ে লোকে হাত তোলে কি করিয়া? কেমন করিয়াই বা বাড়ির বাহির করিয়া দেয়! ঘরে কি আমার ভাগ নাই? ঝুনিয়ার গায়ে হাত তুলিলে আজ কুরুক্ষেত্র বাধাইব। যতদিন সন্তানকে রক্ষা করিবে ততদিনই মা-বাপ। সন্তানের উপর মমতাই যদি না থাকিল. তবে আর কিসের মা-বাপ!

এদিকে হরি যখন ঝুপড়ি হইতে বাহির হইল, পা টিপিয়া টিপিয়া গোবরও তাহার পিছু পিছু চলিল। কিন্তু দরজার কাছে আলো দেখিয়া আর পা চলে

না—ঐ আলোর সামনে ও যাইতে পারিবে না, অন্ধকারে মিশিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। উহার সাহস একেবারে লোপ পাইল। হায়, নিরপরাধ বেচারি ঝুনিয়াকে ইহারা কতই না জানি লাঞ্ছনা করিবে, আর সে দাঁড়াইয়া দেখিবে। খেলার ছলে ও যে আগুনের ফুলকি ছুঁড়িয়াছিল তাহা যে একদিন এত বড় হইয়া সমস্ত খামার জ্বালাইয়া দিবে একথা সে ভাবে নাই। ওর এমন সাহসও নাই যে কাছে গিয়া বলে, হাঁ, আমিই আগুনের ফুলকি জ্বালাইয়াছি। যে সব বেড়া দিয়া মনকে ও শক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, আজ ভূমিকম্পের মত সব ধ্বসিয়া নীচে পড়িয়া গেল। ও পিছন ফিরিয়া চলিল; ঝুনিয়াকে এখন কি করিয়া এ মুখ দেখাইবে?

এক শ পা হাঁটিল, কিন্তু সে হাঁটা এমন যেন কোন সিপাহী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইতেছে। মনে পড়িল, কয়েক দিন আগেই ও ঝুনিয়াকে ভালবাসা ও বিবাহের কত কথাই না বলিয়াছে! যৌবন অভিসারের মধুর স্মৃতি মনে উদয় হইল—যখন নবীন প্রেমের উন্মাদনায় ও নিজের মন প্রাণ সর্বস্ব ঝুনিয়ার পায়ে ঢালিয়া দিয়াছিল। বিরহিনী বিহঙ্গিনীর মত ছোট্ট ঘরের কোণে ঝুনিয়ার কি সে নিঃসঙ্গ জীবন! সেখানে না ছিল পুরুষের মত্ত আগ্রহ, অধীর উল্লাস, না ছিল শিশুকণ্ঠের মধুর কাকলী। কিন্তু ব্যাধের ছলনা আর জালও তো ছিল না। সেই নিঃসঙ্গতার মাঝে গোবর কি একটু আনন্দ সঞ্চার করিতে পারিয়াছিল? কে জানে! কিন্তু ঘোর বিপদে তো ফেলিয়াছে। ও সামলাইয়া লইল। পলায়মান সৈনিক যেন একজন সঙ্গীর ডাক শুনিয়া পিছন ফিরিল।

ও যখন ঘরের সামনে আসিল, তখন দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কবাটের ফাঁক দিয়া আলোর ক্ষীণ রেখা বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে। ও সেই ফাঁক দিয়া উঁকি মারিল। দেখিল, ধনিয়া আর ঝুনিয়া বসিয়া আছে, হরি দাঁড়াইয়া। ঝুনিয়ার ফোঁপানি শোনা যাইতেছে, আর ধনিয়া বলিতেছে, বেটি তুই আয়, আমার ঘরে বসবি চল। তোর বাবা আর ভাইদের আমি দেখে নেব। আমরা বেঁচে থাকতে তোর কোন কথার ভয় নেই। কেউ বাঁকা চোখে তোর দিকে চাইতে সাহস কোরবে না। গোবর একেবারে গলিয়া গেল। হায়, ওর শক্তি থাকিলে বাবা মাকে সোনা দিয়া মুড়িয়া রাখিত, বলিত, বাবা, মা, তোমাদের একটুও কাজ কোরতে হবে না, শুধু আরামে থাক, খাও দাও, আর যত খুসি দান ধ্যান কর। ঝুনিয়ার জন্য আর ওর ভাবনা নাই। ও তাকে যে আশ্রয়

দিতে চাহিয়াছিল তাহা মিলিয়াছে। এখন যদি ঝুনিয়া ওকে প্রতারক ভাবে, তাহাতেও ক্ষতি নাই। ঘরে ও তখনই ফিরিবে যখন টাকার জোরে গাঁয়ের লোকের মুখ বন্ধ করিতে পারিবে, আর বাবা মা ওকে বংশের কলঙ্ক না বলিয়া কুলতিলক মনে করিবে। মনের উপর আঘাত যত গভীর হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও হয় তেমনই গভীর। এই অপকীর্তি আর কলঙ্কের ভয় গোবরের হৃদয়ের অন্তস্তল মথিত করিয়া এমন রত্ন তুলিয়া বাহির করিয়াছে, যাহা এতদিন সুপ্ত ছিল। আজ প্রথম উহার মনে দায়িত্ববোধ জাগিল, সঙ্গে সঙ্গে আসিল দৃঢ় সংকল্প। এতদিন ও ভাবিত, যতদূর সম্ভব কম খাটিয়া বেশি খাওয়াই উহার ন্যায্য অধিকার, বাড়ির অন্য পাঁচজনের মত উহারও কিছু কর্তব্য আছে একথা উহার মনেই উঠিত না। আজ বাপ মায়ের এই উদার ক্ষমা উহার হৃদয়কে আলোকে রাঙাইয়া দিল। ধনিয়া আর ঝুনিয়া যখন ভিতরের ঘরে চলিয়া গেল, হরির সেই ঝুপড়িতে বসিয়া ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিতে লাগিল।

শহরে মাটিকাটারা পাঁচ ছয় আনায় রোজ খাটে, ও শুনিয়াছে। ও যদি ছ আনা পায় আর এক আনায় খরচ চালাইতে পারে তবে তো পাঁচ আনা রোজ বাঁচিবে। মাসে দশ টাকা হইবে—বছরে সওয়া শ। সওয়া শ টাকার থলি লইয়া যখন ঘরে ফিরিবে, তখন কাহার সাধ্য টুঁ শব্দটি করে! ঐ দাতাদীন আর পটেশ্বরী আসিয়া ওর কথায় সায় দিবে। আর ঝুনিয়া, সে তো গর্বে ফুলিয়া উঠিবে। দুই চারি বৎসর যদি ও এই ভাবে উপায় করিতে পারে, তবে ঘরের সব দারিদ্র ঘুচিয়া যাইবে। এখন তো বাড়ির সকলের উপার্জন একত্র করিলেও সওয়া শ হয় না—আর ও একলাই সওয়া শ কামাইবে। লোকে বলিবে, জনমজুর খাটে—তা বলুক। মজুর খাটা পাপ নয়, আর ছ আনা রোজ কিছু চিরদিন থাকিবে না, কাজে পাকা হইলে মজুরিও বাড়িবে। তখন বাবাকে বলিবে, এখন তুমি ঘরে বসিয়া ঠাকুর দেবতার নাম কর। এই ক্ষেতে প্রাণপাত করা ছাড়া ওর আর আছে কি? সবার আগে চার পাঁচ সের দুধ দেয় এমন একটা পশ্চিমা গোরু কিনিবে, আর বাবাকে বলিবে, তুমি গোরুর সেবা কর, তাহাতে তোমার সংসারের কাজও হইবে, পরলোকের সেবাও হইবে।

আর কি চাই—এক আনায় ওর দিন গুজরাণ হইবে না? ঘর ভাড়া করার কি দরকার? কাহারও দরজায় পড়িয়া থাকিবে। কত মন্দির আছে, ধর্মশালা আছে। তা ছাড়া যাহার কাছে মজুর খাটিবে, সে কি শুইবার জায়গা দিবে

না? আটা তো টাকায় দশ সের, এক আনায় আড়াই পোয়া। তা গোবর তো এক আনার আটাই খাইয়া ফেলিবে। কাঠ, ডাল, নুন, শাক, তরকারি এসব তবে কোথা হইতে আসিবে? দুই বেলার জন্য যে একসের আটা চাই! না, খাবার কথা থাক। এক মুঠা ছোলা খাইয়াও লোকের চলে। আবার পুরী, হালুয়াও খাওয়া যায়। যেমন জোটে। ও তো আধ সের আটা খাইয়া দিন-ভর ফুর্তিতে কাজ করিতে পারে। এখান ওখান হইতে ডালপালা কুড়াইয়া আনিলে লাকড়ির কাজ চলিয়া যাইবে। কোন দিন এক পয়সার ডাল কিনিবে, কোন দিন এক পয়সার আলু। আলু ভাজিয়া লইবে। 'দিন কাটানো—আরাম করার কথা তো নয়। পাতার উপর আটা মাখিব, শুকনো ডালের আগুনে রুটি সেঁকিয়া, আলুর চচ্চড়ি রাঁধিয়া লইব, আর মজাসে খাওয়া সারিয়া শুইয়া পড়িব। বাড়িতেই কোন্ দুই বেলা রুটি জোটে? এক বেলা তো কতদিন খই মুড়ি খাইতে হয়। আমি এক বেলা মুড়ি খাইয়া কাটাইব।'

ভয় হইল, যদি কখনও মজুরি না জোটে, তবে ও কি করিবে। কিন্তু কেনই বা জুটিবে না? ও যদি প্রাণ দিয়া কাজ করে তবে শত শত লোক উহাকে ডাকিবে। সকলে কামই চায়, চাম চায় না—কাজেরই আদর, চেহারার নয়। এখানেও তো কতদিন শুকাইয়া থাকিতে হয়, কতদিন পালা পড়ে, আখের ক্ষেতে পোকা হয়, যবের শীষে স্যাঁতা লাগে, সরিষায় পোকা ধরে, কত রকম দুর্দৈব ঘটে। ও যদি কোথাও রাতের কাজও পায়, তবে ছাড়িবে না। দিনভর মজুরি করিয়া রাত্রিবেলা কোথাও চৌকিদারি করিবে। রাত্রি-বেলা খাটিয়া দিলে যদি আরও দুই আনা উপায় হয়! তাহা হইবে চাঁদির টাকার সমান। বাড়ি ফিরিবার সময়ে ও সকলের জন্য শাড়ী লইয়া যাইবে। ঝুনিয়ার জন্য নিশ্চয় এক জোড়া কঙ্কণ গড়াইয়া লইবে, আর বাপের জন্য একটা পাগড়ি।

এই ভাবের মনোরম চিন্তার জাল বুনিতে বুনিতে ও শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঠাণ্ডায় ঘুম আসিবে কোথা হইতে? কোন মতে রাত কাটাইয়া ও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, আর লখনৌয়ের পথ ধরিয়া চলিল। মোটে তো বিশ ক্রোশ, সন্ধ্যার মধ্যে পৌছিয়া যাইবে। গাঁয়ের কেই বা ওদিকে আসে যায়। আর ও ঠিকানাও লিখিয়া পাঠাইবে না। কে জানে, বাবা যদি একদিন গিয়া হাজির হয়। একটা অনুশোচনা রহিল—কেন ঝুনিয়াকে পরিষ্কার বলিয়া দিল না

যে, তুই ঘরে যা, আমি চট্ করিয়া দু পয়সা রোজগার করিয়া আসিব? কিন্তু এ কথা বলিলে সে কি আর ঘরে যাইত—বলিত, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। উহাকে ঘাড়ে করিয়া ও কোথায় কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইবে?

বেলা বাড়িয়া চলিল। রাত্রে কিছু খাওয়া হয় নাই, এখন ক্ষুধায় পা চলিতে চায় না। ইচ্ছা করে, কোথাও একটু জিরাইয়া লয়। পেটে একটু কিছু না দিয়া আর ও চলিতে পারে না, কিন্তু হাতে যে একটা পয়সাও নাই। পথের ধারে একটা জাম গাছ, তাহা হইতে কিছু জাম পাড়িয়া পেট ঠাণ্ডা করিয়া আবার চলিতে শুরু করিল। এক গ্রাম হইতে গুড় জ্বাল দেওয়ার সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। এখন আর মন মানিল না। আখ মাড়াইয়ের কাছে গিয়া দড়ি আর ঘটি চাহিয়া জল তুলিয়া আঁজলা ভরিয়া জল খাইতে বসিয়াছে, একজন চাষী বলিল, আরে ভাই, শুধু জল খাবে, সামান্য একটু মিষ্টি তো খেয়ে নাও। এই বছরটাই তোমরা গুড় বানিয়ে নাও, আসছে বছর তো কল বসবে, সব আখ কলওয়ালা কিনে নেবে। গুড়ের দরে চিনি পেলে কে আর আমাদের গুড় কিনতে আসবে?—সে একটা বাটি করিয়া গুড়ের কয়েক খণ্ড পাটালি গোবরের সামনে ধরিল। গোবর গুড় খাইয়া জল পান করিল। তাহার পর বুড়া জিজ্ঞাসা করিল, তামাক খাও তো? গোবর এখনো উহা ধরে নাই শুনিয়া বুড়া প্রসন্ন হইয়া বলিল, খুব ভাল, বড় বদ্ অভ্যাস এটা। একবার ধরলে জীবনে ছাড়া যায় না।

ইঞ্জিনে কয়লা জল পড়িল, এবার উহার গতি বাড়িল। শীতের দিন, দেখিতে দেখিতে দুপুর গড়াইয়া আসিল। এক জায়গায় গোবর দেখিল, গাছের নীচে এক যুবতী স্বামীর সঙ্গে সত্যাগ্রহ করিয়া বসিয়া আছে। স্বামী কাছে দাঁড়াইয়া সাধিতেছে। পথের দুই একটি লোক তামাসা দেখিবার জন্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। গোবরও দাঁড়াইল। আমাদের জীবন-নাটকে মান-লীলার চেয়ে মুখরোচক জিনিস আর কি আছে?

যুবতী স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমি যাব না, যাব না, যাব না।

পুরুষটি যেন চরম কথা শুনাইয়া বলিল, যাবে না?

না, যাব না।

যাবে না?

না।

পুরুষটি তখন উহার চুল ধরিয়া টানিতে গেল। যুবতী মাটিতে শুইয়া পড়িল; হার মানিয়া পুরুষ বলিল, আমি আবার বলছি, উঠে বাড়ি চল।

স্ত্রী দৃঢ়স্বরে বলিল, টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললেও আমি সাত জন্মে তোমার ঘরে যাব না।

আমি তোর গলা কাটব।

কাটো, ফাঁসি যেতে হবে।

এবার উহার চুল ছাড়িয়া দিয়া পুরুষটি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। পুরুষত্বের শেষ সীমায় আসিয়াছে; ইহার বেশি উহার সাধ্য নাই।

একটু পরে উ ্য়া দাঁড়াইয়া ও আবার বলিল, তুই কি চাস বল।

যুবতীও উঠিয়া বসিল, কিন্তু নিশ্চিন্ত ভাবে বলিল, আমি কেবল এই চাই যে তুই আমায় ছেড়ে দে।

তোকে বলতে হবে, কি হয়েছে।

আমার বাপ-মাকে কেন গাল দেয়?

কে তোর বাপ-মাকে গাল দিয়েছে?

নিজের ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।

তুই চল, তবে তো জিজ্ঞাসা কোরবো।

তুই আবার জিজ্ঞাসা করবি! সে সাহস আছে! গিয়ে তো মায়ের আঁচলে মুখ ঢেকে শুবি। ও তোমার মা হতে পারে, আমার কেউ নয়। তুই ওর গাল শোনগে, আমি কেন শুনবো? একখানা রুটি খাই; তা চারখানা রুটির মত কাজ করে দিই; কেন লোকের খোঁটা শুনবো? আমি তোমাদের এক আধলারও ধার ধারি না।

কলহের এই অভিনয়ে রাস্তার লোকগুলির বেশ মজা লাগিতেছিল কিন্তু শীঘ্র শেষ হইবার কোন আশা ছিল না, পরস্পরের মানে বাধিতেছিল। এক এক করিয়া লোক সরিয়া পড়িতে লাগিল। পুরুষটির নির্দয়তা গোবরের বড়ই খারাপ লাগিতেছিল। ভিড়ের মধ্যে কিছু বলিতেও পারে না। ভিড় পাতলা হইলে বলিল, ভাই, স্বামী-স্ত্রীর কথার মধ্যে কথা বলা উচিত নয়, কিন্তু এইটুকু দরদ না থাকাও ভাল নয়।

পুরুষটি চক্ষু পাকাইয়া বলিল, তুমি কে হে?

গোবর নিঃশঙ্ক ভাবে বলিল, আমি যেই হই, অন্যায় দেখলে সকালেরই খারাপ লাগে।

পুরুষটি ঘাড় কাৎ করিয়া বলিল, দেখে তো মনে হয় বৌ এখনো আসেনি, তাও এত দরদ!

বৌ এলেও এমন করে চুলের ঝুঁটি ধরে টানবো না।

আচ্ছা, বেশ, নিজের পথ দেখ। আমার বৌ, আমি মারবো, কাটবো, যা খুসি কোরবো। তুমি বলার কে? সোজা চলে যাও, এখানে দাঁড়িয়ো না।

গোবরের উষ্ণ রক্ত আরো উষ্ণ হইয়া উঠিল। ও কেন চলিয়া যাইবে—রাস্তা তো কাহারো একলার নয়—সরকারি রাস্তা। ও যতক্ষণ, খুসি দাঁড়াইবে। কাহারও অধিকার নাই, এখান হইতে উহাকে সরাইয়া দেয়।

ঠোঁট কামড়াইয়া পুরুষটি বলিল, তুমি তবে অমনি যাবে না? আসব?

কোমরে গামছা বাঁধিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া গোবর বলিল, তুমি আস আর নাই আস, আমি তো তখনি নড়ব যখন আমার ইচ্ছা হবে।

তবে দেখছি, হাত পা না জখম করে তুমি যাবে না?

কার হাত পা ভাঙ্গবে, কে জানে?

তুমি যাবে কি না?

না।

পুরুষটি হাত মুঠা করিয়া গোবরের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ঠিক ঐ সময়ে মেয়েটি স্বামীর ধুতি ধরিয়া টানিতে টানিতে গোবরকে বলিল, আচ্ছা বাপু, তুমি কেন সাধ করে লড়তে এসেছ, নিজের পথ দেখ না কেন? এটা কি একটা তামাসা! আমাদের নিজেদের ঝগড়া, কখনো ও আমাকে মারে, কখনো আবার আমি ওকে গাল দিই। তাহাতে তোমার কি?

এই তিরস্কারের পর গোবর ওখান হইতে সরিয়া পড়িবার জন্য তৈরি হইল, মনে মনে বলিল, এমন মেয়ের মার খাওয়াই উচিত।

গোবর চলিয়া গেলে যুবতী স্বামীকে ধমক দিল, তুমি সকলের সঙ্গেই লড়তে যাও কেন? ও এমন কি খারাপ কথাটা বলেছে যার জন্য তোমার এত লাগল? অন্যায় কাজ কোরলে দুনিয়ার লোক মন্দ বলবেই; কিন্তু ভাল কাজ কোরলে কেবল ঘরের লোকই জানে। তা অমন ছেলেটি, নিজের বোনের জন্য ওকে ঠিক কোরলে না কেন?

স্বামী সন্দিগ্ধ স্বরে বলিল, এখনও কি আর ও আইবুড়ো বসে আছে ?

একবার না হয় জিজ্ঞাসা করে নিতে।

তাড়াতাড়ি দশ পা দৌড়াইয়া গিয়া পুরুষটি গোবরকে ডাকিল, ও হাতের ইঙ্গিতে থামিতে বলিল। গোবর ভাবিল, ইহার মাথায় বুঝি পুনরায় ভূত চাপিয়াছে, তাই ডাকিতেছে। মার না খাইলে ওর শিক্ষা হইবে না। নিজের গাঁয়ে কুকুরও বাঘ হইয়া দাঁড়ায় ; তা আসুক না, দেখি।

কিন্তু উহার মুখে তো লড়িবার মত ভাব দেখিতেছি না, বরং যেন বন্ধুত্বের আহ্বান দেখা যাইতেছে। ও আসিয়া গোবরকে নাম ধাম জাত গোত্র সব জিজ্ঞাসা করিল, গোবরও ঠিক ঠিক বলিয়া দিল। ঐ লোকটির নাম কোদই।

কোদই হাসিয়া বলিল, আমাদের দুজনের মধ্যে যুদ্ধ হতে হতে বেঁচে গেল। তুমি চলে আসার পর আমার মনে হোল, তুমি ঠিকই বলেছ, আমি অনর্থক তোমাকে গালমন্দ করেছি, বলি, ঘরে কিছু ক্ষেত খামার তো আছে, না ?

গোবর বলিল, পাঁচ বিঘের মৌরসী ক্ষেত আছে, একখানা হালও আছে।

আমি তোমাকে যে সব গালমন্দ দিয়েছি, তার জন্য ক্ষমা করো ভাই। রাগে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। বৌটা অনেক গুণের, রূপেও লক্ষ্মী, কিন্তু জানি না কেন, মাঝে মাঝে ওর ঘাড়ে ভূত চাপে। আচ্ছা, তুমিই বল, মায়ের ওপর আমার কি জোর আছে ? উনিই তো জন্ম দিয়েছেন, এতটা বয়স অবধি পালন করেছেন। কোন কথায় যদি আমাকে কিছু কথা বলতে হয় তবে আমি বৌকেই তো বলবো। ওর উপরেই যে আমার জোর। তুমিই ভেবে দেখ, আমি তো এমন কিছু করিনি ; হাঁ, চুল ধরে টানাটা ঠিক হয় নাই, তবে কি জান, মেয়ে জাত, একটু জোর না খাটালে বশ মানে না। ও চায়, মার সঙ্গে ভিন্ন হয়ে যেতে ; তুমিই বল, কেমন করে ভিন্ন হই, কার সঙ্গে ভিন্ন হই ! নিজের মায়ের সঙ্গে ! যে মা জন্ম দিলেন ! একাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

গোবরের এবার মত বদলাইতে হইল। বলিল, মায়ের সম্মান করা তো সকলের বড় ধর্ম, ভাই ! মায়ের ঋণ, কে কবে শোধ করতে পারে ?

কোদই উহাকে নিজের বাড়ি যাইতে নিমন্ত্রণ করিল। আজ তো গোবর কোনমতেই লখনৌ পৌছিতে পারিবে না, দুই এক ক্রোশ যাইতে যাইতেই সন্ধ্যা হইয়া যাইবে। রাত্রিটা কোথাও না কোথাও কাটাইতেই হইবে।

গোবর মজা করিয়া বলিল, বৌ রাজি আছে?

না রাজি হলে কি হবে?

ও তো আমাকে এমন ধমকানি দিল যে লজ্জায় বাঁচি না।

ও নিজেই এখন সেজন্য দুঃখ কোরছে। চল, আমার মাকে একটু বুঝিয়ে বলবে। আমার তো কিছু বলতেই ইচ্ছা হয় না। মারও তো একটু ভেবে দেখা উচিত যে ওর মা-বাপকে গাল দিলে ওর কিরকম লাগে। আমারও বোন আছে। দুদিন পরে তারও বিয়ে হবে। ওর শাশুড়ী যদি আমাদের গাল দেয় তবে ও কি সইতে পারবে? সব দোষই বৌয়ের নয়। মায়েরও দোষ আছে। সব কথায় যদি মা নিজের মেয়ের তুলনা করেন, তবে খারাপ লাগবেই। তবে ওর একটা গুণ আছে যে, রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে যায়, গাল খেয়ে মুখে মুখে পালটা জবাব দেয় না।

গোবর রাত্রির জন্য ঠাঁই খুঁজিতেছিল, কোদইয়ের সঙ্গে চলিল। দুইজনে আবার সেইখানে আসিল যেখানে ঐ যুবতী বসিয়া আছে। এখন তো উহার গৃহলক্ষ্মীর রূপ। মাথায় অল্প ঘোমটা, মুখে সলজ্জ ভাব।

কোদই ঠাট্টা করিয়া বলিল, এ তো আসতেই চাইছিল না, বলে, কেন? ঐ মুখনাড়া শুনে ওর বাড়ি কে যাবে?

ঘোমটার আড়াল হইতে গোবরের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া যুবতী বলিল, এইটুকুতেই ভয়, বৌ এলে তখন পালাবে কোথায়?

গাঁ আসিয়া পড়িল, ঠিক গ্রাম নয়, একটা পল্লী, দশ বারো খানা বাড়ি। অর্ধেক খাপড়ার ঘর, অর্ধেক খড়ের। নিজের ঘরে পৌঁছিয়া কোদই খাটিয়া বাহির করিয়া আনিয়া উপরে একটি শতরঞ্চি বিছাইল, তারপর সরবত আনিতে বলিয়া তামাক সাজিতে বসিল। অল্পক্ষণের মধ্যে ঐ যুবতী সরবত আনিয়া হাজির করিল, তারপর জলের ছিটা দিয়া গোবরের কাছে যেন মাপ চাহিল। ও যখন ননদাই হইবে, তখন এখন হইতেই উহার সঙ্গে ঠাট্টা চালাকি করিবে না কেন?

## ১৩

অন্ধকার থাকিতেই গোবর উঠিয়া পড়িল, আর কোদইয়ের কাছে বিদায় লইল। সকলের ধারণা হইয়াছিল, উহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কাজেই

বিবাহের কথা কেহ আর উঠায় নাই। উহার স্বভাবে, উহার ব্যবহারে, গৃহের সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কোদইয়ের মাকে তো ও এত আদর আপ্যায়ন করিল, মায়ের মত সম্মান দিয়া কথা বলিল যে তিনি খুসি হইয়া গেলেন। গোবর বলিল, মা, তুমি সত্যিই বড়, সত্যিই ভক্তির পাত্র। শত জন্মেও ছেলে মায়ের ঋণ শোধ করতে পারে না, সহস্র জন্মেও না, কোটি জন্মেও না……

এই অশেষ শ্রদ্ধাভক্তি পাইয়া বুড়ী আনন্দে আটখানা। ইহার পর গোবর যাহা কিছু বলে সবই তাহার ভাল লাগে। বৈদ্য রোগীকে একবার সুস্থ করিয়া তুলিলে রোগী তাহার হাতে বিষও যাচিয়া খায়। এই যে বৌ আজ রাগ করিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল, তাহাতে মাথা হেঁট হইল কাহার? বৌকে কে জানে? কাহার মেয়ে, কাহার নাতনী, সে খবর তো কেহ রাখে না? ওর বাপ বোধ হয় ঘেসেড়া……

বুড়ী জোর গলায় বলিল, ঘেসেড়াই বটে, পাকা ঘেসেড়া। যেদিন ভোরে উঠে ওর মুখ দেখবে সেদিন কপালে জলও জুটবে না।

গোবর বলিল, তবেই দেখ, ওকে তো লোকে উপহাস করবে না, নিন্দে হবে তোমার আর তোমার স্বামীর। যে কেউ শুনবে, জানতে চাইবে ও কাদের বৌ। তা ছাড়া, ও এখনও ছেলেমানুষ, অবোধ। আর ছোট ঘর থেকে এসেছে, ভাল ব্যবহার শিখবে কোথা থেকে? এই বুড়ো তোতাপাখীকে এখন তোমাকেই রামনাম শেখাতে হবে। মারধর করলে তো ও শিখবে না, শিখবে যদি তোমার আদর আর ভালবাসা পায়। শাসন করবে বই কি, তবে বেশি বকাবকি করো না। ওর তো কিছু হবে না, মাঝখান থেকে তোমারই অপমান।

গোবরকে এবার চলিতে হইবে। বুড়ী গোবরকে গুড় আর ছাতু খাইতে দিল। গাঁয়ের কয়েকজন লোক মজুর খাটিতে শহরে যাইতেছিল, গোবর তাহাদের সঙ্গে জুটিয়া গেল। কথায় বার্তায় সময় কাটিল, নয়টা বাজিতে বাজিতে সকলে আমিনাবাদের বাজারে গিয়া পৌছিল। গোবর অবাক হইয়া গেল, শহরে এত লোক আসে কোথা হইতে, এ যে লোকের উপর লোক আসিয়া পড়িতেছে!

সেদিন বাজারে চার পাঁচ শ-এর কম মজুর ছিল না। রাজমিস্ত্রী, ছুতার, কামার, মাটিকাটা, নেওয়ারের খাট বোনার লোক, মাথায় করিয়া মাটির ঝুড়ি

বহিবার লোক, পাথরকাটা—কাহারও অভাব ছিল না। লোকের ভিড় দেখিয়া গোবরের মন দমিয়া গেল। এই অসংখ্য লোকের কোথা হইতে কাজ মিলিবে? উহার হাতে কোন হাতিয়ারও নাই যে দেখিয়া লোকে বুঝিবে, উহার কি কাজ। কেন লোকে উহাকে কাজ দিবে? হাতিয়ার বিনা কেই বা উহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে!

ক্রমে এক এক করিয়া লোকে কাজ পাইয়া গেল। কেহ কেহ নিরাশ হইয়া ঘরে ফিরিল। যাহাদের কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিল না, তাহাদের বেশির ভাগ বুড়া আর অকর্মা। তাহাদের মধ্যে গোবরও ছিল। কিন্তু আজ ওর খাওয়াটা মজুদ আছে, কোনও দুঃখ নাই।

এমন সময়ে মির্জা খুরশেদ মজুরদের মধ্যে আসিয়া জোর গলায় বলিল, মজুর চাই, ছআনা রোজ পেলে কে কে কাজ করবে? তারা আমার সঙ্গে চলে এস। পাঁচটায় ছুটি পাবে।

পাঁচ দশ জন রাজমিস্ত্রী ও ছুতার বাদে আর সকলে উহার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইল। চারিশত জীর্ণ শীর্ণ লোকের এক লম্বা ফৌজ রচনা হইল। আগে আগে মির্জা সাহেব—এক মোটা লাঠি কাঁধে, পিছনে পিছনে ভেড়ার পালের মত চলিল কাতারে কাতারে এই বুভুক্ষু শীর্ণলোকের দীর্ঘবাহিনী।

মির্জাকে এক বুড়া জিজ্ঞাসা করিল, সাহেব, কি কাজ করতে হবে?

মির্জা সাহেব যে কাজের কথা বলিল, তাহাতে সকলে আরও ভয় পাইয়া গেল—কেবল নাকি কপাটি খেলিতে হইবে! এ কেমন ধারা লোক যে শুধু কপাটি খেলিবার জন্য ছয় ছয় আনা মজুরি দিতে চায়? পাগল নয় তো? মেলা টাকা হইলে অনেকের মাথা খারাপ হইয়া যায়। আবার বিস্তর পড়াশুনা করিলেও লোক পাগল হয়। কাহারও সন্দেহ হইল, ইহার কোন মতলব নাই তো? এখান হইতে লইয়া গিয়া পরে যদি বলে যে, কোন কাজ নাই, তবেই বা কে কি করিবে? মর্জি হয় কপাটি খেলাক, লুকোচুরি বা ডাণ্ডাগুলি যাহা খুসি খেলিতে দিক, মজুরির পয়সাটা দিলেই হয়। এরকম মাথা-খারাপ লোকের ভরসা কি?

গোবর ভয়ে ভয়ে বলিল, হুজুর, আমার কাছে খাবার কিছু নাই, পয়সা পেলে কিছু কিনে খাই।

মির্জা তৎক্ষণাৎ ছয় আনা পয়সা উহার হাতে দিয়া লোভ দেখাইতে

লাগিল। কারও ভাবনা নাই, যেতে যেতেই সবার মজুরির পয়সা দিয়ে দেব।

শহরের বাহিরে মির্জার অল্প সল্প কিছু জমি ছিল। মজুরেরা গিয়া দেখে, মস্ত একটা হাতা ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে, মাঝে ছোট একটি খড়ের ঘর, আর সেই ঘরে একটি টেবিল ও খানকয়েক চেয়ার পাতা রহিয়াছে। টেবিলের উপর কয়েকখানা বই। লতাপাতায় ঘরটিকে খুব সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছে। হাতার একদিকে আম, লেবু আর পেয়ারার চারা লাগানো হইয়াছে, অন্যদিকে ফুলের গাছ। হাতার বেশির ভাগ জমি পতিত। মির্জা সকলকে এক সারিতে দাঁড় করাইয়া দিয়া প্রথমেই মজুরি বাঁটিয়া দিল। লোকটা যে পাগল, সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না।

গোবর তো আগেই পয়সা পাইয়াছিল। মির্জা উহাকে ডাকিয়া নিয়া গাছে জল দিবার কাজে লাগাইল। উহার কপাটি খেলিতে হইবে না। মনে একটু খটকা লাগিল। এই বুড়াদের তুলিয়া তুলিয়া আছাড় দিত; যাক, পরোয়া নাই, অনেক কপাটি খেলিয়াছে ও। আর পয়সা তো পুরাই পাইয়া গিয়াছে।

আজ কত যুগ পরে এই স্থবির জরাগ্রস্ত মানুষগুলির কপাটি খেলার সৌভাগ্য হইল। বলিতে কি, ইহাদের অধিকাংশের মনেই পড়ে না, জীবনে কখনও কপাটি খেলিয়াছে কিনা। জীবনভর তো শহরের জাঁতাকলে পিষিয়া মরিতেছে। ঘরে ফিরিতে এক প্রহর রাত পার হইয়া যায়, শুকনা পোড়া যাহা কিছু জোটে খাইয়া পড়িয়া থাকে।

প্রভাত হইলে আবার সেই কর্মচক্র! জীবনে রস নাই, আনন্দ নাই, কেবল বোঝা বহিয়া বেড়ান। আজ অবসর পাইয়া বুড়াও যেন জোয়ান হইয়া গেল। আধমরা বুড়া, কঙ্কালসার চেহারা, দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, পেটে পিঠে এক হইয়া গিয়াছে, সেও ধুতি মালকোচা মারিয়া, লুঙ্গি শক্ত করিয়া বাঁধিয়া, তাল ঠুকিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল, বুড়া হাড়ে যেন যৌবনের বাতাস লাগিয়াছে। চটপট দুই দল হইল, দুইজন নায়ক স্থির হইল, কোন দলে কে থাকিবে তাহা বাছা হইল, বারোটার মধ্যে খেলা শুরু হইয়া গেল। শীতের মিঠে-রোদ এই কপাটি খেলার যোগ্য সময়ও বটে।

ওদিকে হাতার গেটে মির্জা সাহেব তামাসার টিকিট বিতরণ করিতেছে।

এই ধরণের কোন না কোন পাগলামি উহার মাথায় সর্বদা চাপিয়া আছে। উহার খেয়াল, বড়লোকের পয়সা লইয়া গরীবকে বিলাইয়া দিবে। বুড়াদের এই কপাটি খেলার বিজ্ঞাপন কয়েকদিন যাবৎ দেওয়া হইয়াছে। বড় বড় পোস্টার আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। হাতে হাতে নোটিশ বিলি হইয়াছে। এই খেলা সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব ব্যাপার, ইহার বৈশিষ্ট্য ইহার একান্ত নিজস্ব। ভারতের বৃদ্ধদেরও আজ কতখানি শক্তি আছে যাহাদের ইচ্ছা আসিয়া দেখুক, দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করুক। যাহারা দেখিবে না, তাহারা পসতাইবে। এমন সুযোগ আর মিলিবে না। দশ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া দুই আনার টিকিট ছিল। তিনটা বাজিতে বাজিতে সমস্ত হাতাটি ভরিয়া উঠিল। মোটর আর ফিটনগাড়ীর সারি বাড়িয়া চলিল। দুই হাজারের কম লোক হইবে না। বড় লোকদের জন্য চেয়ার বেঞ্চির বন্দোবস্ত ছিল। সাধারণের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাটি।

মিস মালতী, মেহ্‌তা, খান্না, তন্‌খা, রায়সাহেব—সকলেই উপস্থিত।

খেলা শুরু হইলে মির্জা মেহ্‌তাকে বলিল, আসুন ডাক্তার সাহেব, আপনাতে আমাতেও এক পাটি হয়ে যাবে।

মিস মালতী বলিল, ফিলসফারে আর ফিলসফারেই জুটি ভাল হবে।

গোঁফে তা দিয়া মির্জা বলিল, তা আপনি কি ভাবেন আমি ফিলসফার নই? আমার পরীক্ষা পাশ আর ডিগ্রী নাই, কিন্তু আমিও দার্শনিক। মেহ্‌তাজী, আপনি আমার পরীক্ষা নিতে পারেন।

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, আপনি আদর্শবাদী না বস্তুতান্ত্রিক?

দুই-ই।

তা কি করে হবে?

বেশ হতে পারে। যখন যেখানে ভাল দেখেছি, তখন তাই নিয়েছি।

তবে কি আপনার নিজস্ব কোন মতামত নাই?

যে কথার আজ পর্যন্ত কোন মীমাংসা হোল না, কখনো হবেও না, তার সম্বন্ধে একটা মত আমার কি থাকতে পারে! আর লোকে চোখ নষ্ট করে বই মুখস্থ করে যে ফল পায় আমি এমনিতেই তা পেয়ে গেছি। আপনিই বলুন, কোন দার্শনিক নিজের বুদ্ধির বোঝা ঘাড়ে করা ছাড়া আর কিছু করেছেন কি?

ডাক্তার মেহতা আচকানের বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, তা আসুন, আপনি আর আমি একহাত খেলে নিই। লোকে মানুক আর নাই মানুক, আমি আপনাকে ফিলসফার বলে স্বীকার করি।

মির্জা খান্নাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার জুটি খুঁজে দেব?

মালতী উৎসাহ দিয়া বলিল, হাঁ, হাঁ, এঁকে নিতেই হবে মিঃ তন্‌খার সঙ্গে।

খান্না হাসিয়া বলিল, না মশাই, আমায় মাপ কোরবেন।

মির্জা রায়সাহেবকে বলিল, আপনার জন্য জুটি ধরে আনব?

রায়সাহেব বলিলেন, আমার জুটি তো ওঙ্কারনাথ, কিন্তু আজ তাঁকে দেখাই যাচ্ছে না।—খালি গায়ে, কেবল জাঙ্গিয়া পরিয়া, মির্জা আর মেহতা মাঠে গিয়া হাজির। একজন এক দলে, অন্যজন অপর দলে। খেলা আরম্ভ হইল।

জনতা বুড়া খেলোয়াড়দের দেখিয়া হাসিতে লাগিল, হাততালি দিতে লাগিল। কেহ বা গালি দিতে আরম্ভ করিল, আবার কেহ কেহ খেলার হারজিত লইয়া বাজি ধরিতে লাগিল। বাঃ দেখ্ ঐ বুড়ো ঠাকুরদাকে! কি জোরে ছুটেছে, ঐ বোধ হয় সকলকে 'মোর' করিয়া ফিরিবে। ঐরে, ঐ দলে যে ওর দাদা দেখছি। দুজনে কেমন চাল বদল করছে। ঐ বুড়ো হাড়ে এত তেজ! হবে না? এরা যা ঘি খেয়েছে আমরা ততখানি জলও খেতে পাই না। লোকে বলে ভারতের ধন বাড়ছে। হবেও বা। আমি তো দেখছি ঐ বুড়োরা যা খেলছে, ওদের কাছে জোয়ানদের আজ মুশকিল আছে। ঐদিকে এক বুড়ো একে দাবিয়ে দিয়েছে। বেচারার ছুটে পালাবার জন্য কি চেষ্টা, কিন্তু পারবে বলে মনে হয় না। একজনকে তিনজনে জড়িয়ে ধরেছে।

এইভাবে লোকে নানা আলোচনা করিতে লাগিল। উহাদের সমস্ত দৃষ্টি খেলার মাঠে, খেলোয়াড়দের আঘাত প্রতিঘাত, লাফ ঝাঁপ, ধরপাকড়, আর উহাদের মধ্যে কে মরিল, কে বাঁচিল, এ সকলে লোক তন্ময় হইয়া রহিল। কখনো চারিদিক হইতে উচ্চ হাসির শব্দ, কখনো কোন অন্যায় দেখিয়া লোকের ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও শব্দে চিৎকার—মহা সোরগোল। কিন্তু যে কয়জন বেশি দামের টিকিট কিনিয়া উচ্চে বসিয়াছিল, তাহারা এই খেলায় তেমন আমোদ পাইতেছিল না। তাহারা ইহা অপেক্ষা উঁচুদরের কথাবার্তায় মগ্ন।

খান্না জিঞ্জারের গেলাস খালি করিয়া সিগার ধরাইল, আর রায়সাহেব

বলিলেন, আমি তো আপনাকে বলেই দিয়েছি, ব্যাঙ্ক কিছুতে এর চাইতে কম সুদে দেবে না, আর এ ব্যাপারে আমি আপনার দলেই আছি।

রায়সাহেব আরামে গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, আপনার মতে কি তবে লোকগুলোকে উলটো ছুরি দিয়ে গলা কাটতে হবে? এ আপনি কি বলছেন!

ঠিকই বলছি। সূর্যপ্রতাপসিং-এর কাছে আপনি সাত টাকা সুদ নিয়েছেন, আমার কাছে চেয়েছেন নয় টাকা, আবার কৃতজ্ঞতাও বজায় রাখতে চান! তা হবে না কেন?

খান্না হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন এটা একটা হাসিরই কথা। ওর মত সর্ত হলে আমি আপনার কাছ থেকেও ঐ সুদই নেব। আমি ওর পৈতৃক জমি বাঁধা রেখেছি, ও জমি আর ওর হাতে ফিরে যাবে না।

আমিও একটা জমি দিয়ে দেব। শতকরা নয় টাকা সুদে ধার নেওয়ার চেয়ে এক টুকরো ফাল্‌তু জমি ছেড়ে দেওয়াই ভালো।' আমার জ্যাকসন রোডের বাড়ির আপনি খদ্দের ঠিক করে দিন। কমিশন পাবেন।

ঐ বাড়ির সুবিধা করা কিছু মুশকিল। আপনি তো জানেন, বস্তী থেকে ও বাড়িটা অনেক দূর। তা হোক, তবু দেখবো। আপনি কি রকম দাম আন্দাজ করেন?

রায়সাহেব বলিলেন, একলাখ পঁচিশ হাজার। বাড়ির সঙ্গে জমিও আছে পনেরো বিঘা। খান্না স্তম্ভিত হইয়া গেল। বলিল, আপনি পনেরো বছর আগেকার স্বপ্ন দেখছেন, রায়সাহেব। এটা তো জানেন যে এদিককার জমির দাম এখন পঞ্চাশ পার্সেণ্ট কমে গেছে।

রায়সাহেবের কথাটা ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন, আজ্ঞে না, পনেরো বছর আগে এর দাম ছিল দেড় লাখ।

আচ্ছা, আমি খদ্দেরের খোঁজে থাকব, আমাকে কিন্তু 'আপনার পাঁচ পার্সেণ্ট কমিশন দিতে হবে। অন্যের কাছে বুঝি দশ পার্সেণ্ট পাবেন, তা এত টাকা নিয়ে করবেন কি?

আচ্ছা, আপনি যা চান দেবেন। আমি রাজী আছি। চিনির শেয়ার কিন্তু আপনি এখনো কেনেন নি। আর মোটে কয়েকটা শেয়ার আছে। পরে হাত কামড়াবেন। বীমার পলিসিও আপনি নিলেন না। আপনাদের এই টাল-

বাহানাটা বড় খারাপ। নিজের লাভের ব্যাপারেই যদি আপনি এমন দোনামনা করেন তবে আপনাদের মত লোকের কাছ থেকে অন্যরা কি পাবে? এইজন্যই বলে বড়লোকের বুদ্ধি চড়ে বেড়ায়। আমার ওপরে ছেড়ে দিন, দেখবেন, আপনার তালুকদারি আমি জমিদারি বানিয়ে দেব।

মিষ্টার তন্‌খা মালতীর উপর টোপ ফেলিতেছিল। মালতী স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে, সে এই ইলেকশনের ঝামেলায় পড়িতে চায় না; কিন্তু এত সহজেই হার মানিবার পাত্র তন্‌খা নয়। টেবিলের উপর কনুই ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা, এদিকটা আর একটু ভেবে দেখুন। আমি বলে দিচ্ছি, এমন সুযোগ আর পাবেন না। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, আপনি দাঁড়ালে রানীসাহেবা চন্দ্রার এক আনা সম্ভাবনাও নাই; আমি কেবল চাই কাউনসিলে এমন লোক যাবে যাদের দেশের জন্য দরদ আছে, দেশের কিছু কাজ যারা করেছে। যে মেয়ে ভোগ বিলাস ছাড়া কিছু জানে না, যে দেশের জনসাধারণকে নিজের লরির পেট্রোলের চেয়ে বেশি দামী মনে করে না, যার কাছে সব চেয়ে ভাল কাজ পার্টি দেওয়া; যে কেবল গভর্ণর আর তার সেক্রেটারিদের পেছন পেছন ঘোরে, কাউনসিলে তার স্থান হওয়া উচিত নয়। নতুন কাউনসিলে প্রতিনিধিদের হাতে অনেক কিছু ক্ষমতা আসবে—তাই আমি চাই না যে অনধিকারীর হাতে সে সব গিয়ে পড়ে।

মালতী উহার হাত হইতে ছাড়া পাইবার জন্য বলিল, কিন্তু মশায়, ইলেকশনের খরচার জন্য দশ বিশ হাজার টাকা আমি কোথায় পাব? রানী-সাহেবা তো দু চার্ লাখ খরচ করতে পারেন। ওঁর মত যদি বছরে পাঁচ ছ হাজার পেয়ে যাই তবে না খরচ করা চলে?

আচ্ছা, আপনি যেতে রাজী কি না তাই আগে বলুন।

যেতে তো রাজী অবশ্য, যদি ফ্রী পাশ পাই।

সে ভার আমার। আপনার ফ্রী পাশই জুটবে।

ক্ষমা কোরবেন, তা হয় না। হারবার জন্য আমি দাঁড়াতে রাজী নই। রানী সাহেবা যখন টাকার থলি খুলে বসবেন, আর এক এক ভোটের জন্য মোহর ছড়াবেন, তখন হয় তো আপনিও গিয়ে ওঁর পক্ষে ভোট দেবেন।

ও, আপনার মতে ইলেকশনে বুঝি কেবল টাকায়ই জেতা যায়।

তা কেন? লোকের ব্যক্তিত্বেরও দাম আছে বৈ কি; তবে একবার জেলে

যাওয়া ছাড়া আমিই বা দেশের জন্য কি করেছি? আর সেবারও তো ঐ রায়সাহেব আর খান্নারই মত নিজের মতলবেই গেলাম। কলিযুগের সভ্যতায় টাকাই সব. বিদ্যা, জাতি, কুল, সেবা, দয়া, সব কিছু টাকার কাছে ছোট। কখনো কখনো ইতিহাসে এমন সময় আসে যখন আন্দোলনের কাছে টাকার মান ছোট হয়ে যায়, কিন্তু সেটা হল ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়! এই আমার নিজের কথাই বলি, কোন গরীব মেয়ে যদি ওষুধ নিতে আসে. ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার দিকে ফিরেও চাই না, কিন্তু যেই একখানা বড় গাড়ী চড়ে কোন বড়মানুষের মেয়ে আসে, অমনই ছুটে যাই, দরজা থেকে আদর করে ডেকে আনি, এমন আপ্যায়িত করি যেন সাক্ষাৎ দেবী এলেন। আমাতে আর রানীসাহেবাতে কোন প্রভেদ নেই। যে রকম কাউনসিল তৈরি হোচ্ছে তার পক্ষে রানীসাহেবাই বেশি যোগ্য।

ওদিকে খেলার মাঠে মেহতার দল হারিতেছিল, অর্ধেকের বেশি খেলুড়ে 'মোর' হইয়াছে, মেহতা জীবনে কখনো কপাটি খেলে নাই। মির্জা কিন্তু পাকা খেলোয়াড়। মেহতার ছুটির দিন অভিনয়ের মহড়া দিতে কাটিয়া যাইত। অভিনয়ে সে অনেক ভাল ভাল অভিনেতাকে চকিত করিয়া দিত, আর মির্জার পক্ষে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ছিল আখড়ায় কুস্তি করা।

মালতীর মন ঐ দিকেই পড়িয়া ছিল, উঠিয়া আসিয়া রায়সাহেবকে বলিল, মেহতার দল কিন্তু অন্যায় রকম মারছে।

রায়সাহেব আর খান্নার মধ্যে জীবনবীমার বিষয় আলোচনা চলিতেছিল; রায়সাহেব ঐ প্রসঙ্গে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এই কথায় মালতী যেন উহাকে একটা বন্ধন থেকে মুক্তি দিল; তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, তাই তো, খুব মারছে।

তা, মির্জা পাকা খেলোয়াড়।

মেহতার এ কি পাগলামি। মিছিমিছি নিজেকে খেলো কোরছে।

এতে খেলো হবার কি আছে? এ তো হাসি তামাসার ব্যাপার।

মেহতার দলের যে বাইরে যাচ্ছে, সেই মরে যাচ্ছে।

একটু থামিয়া বলিল, আচ্ছা, এ খেলায় হাফ টাইম নেই?

খান্নার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপিল। বলিল, আপনি চলেছিলেন মির্জার সঙ্গে মোকাবিলা করতে, ভাবছিলাম এও বুঝি ফিলসফি।

আমি জিজ্ঞাসা করছি, এ খেলায় হাফ টাইম আছে কি না। খান্না আর একটু রাগাইয়া দিল, আর খেলা তো শেষ হয়েই এল, তখন সব চেয়ে মজা হবে, যখন মির্জা মেহ্তাকে চেপে ধরবে, আর মেহ্তা 'চি' বলবে।

আমি তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করি নাই, রায়সাহেবকে জিজ্ঞাসা করছি।

রায়সাহেব বলিলেন, এ খেলায় হাফটাইম কি করে থাকবে, এক এক করে লোক তো সামনে আসে।

বেশ, মেহ্তার দলের আরেকজন 'মোর' হোল।

খান্না বলিল, দেখুন না, একে একে সবাই মরবে, শেষটায় মেহ্তাও মরবে।

মালতী জ্বলিয়া উঠিল, আপনার তো সাহস হোল না খেলতে।

আমি এসব গেঁয়ো খেলা খেলি না, আমার খেলা টেনিস।

হাঁ—টেনিসে আমিই তো আপনাকে কটা গেম দিয়েছি?

আপনার কাছে জিততে কবে বা চেয়েছি?

বেশ, এখন আসুন, আমি প্রস্তুত আছি।

মালতী উহাকে কথা শুনাইয়া দিয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিল। কেহ মেহ্তার জন্য দরদ দেখাইল না। কেহই বলিল না, এবার খেলা শেষ করিয়া দাও। মেহ্তাও অদ্ভুত বোকা, কোন ফিকির করে না কেন? ও নিজের ন্যায়প্রিয়তা দেখাচ্ছে, হেরে ফিরলে তো চারদিক থেকে হাততালি পড়বে। এখন হয়তো ওর দলে আর মোটে কুড়িজন লোক আছে, তা দেখ, লোকগুলি কি খুসি।

খেলার শেষভাগে লোকে অধীর হইয়া পড়িল। কোঁটের দিকে লোক ভাঙ্গিয়া পড়ে আর কি। দড়ি দিয়া যে সীমা দেওয়া হইয়াছিল উৎসুক জনতা তাহা দূর করিয়া ফেলিল। ভলান্টিয়াররা বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বৃথা। এতক্ষণে চরম মুহূর্ত উপস্থিত, মেহ্তার দলে সে একা, উহাকে এখন বোবার পার্ট লইয়া খেলিতে হইবে। এখন হারজিত একমাত্র উহার হাতে, ও যদি বাঁচিয়া নিজের কোটে ফিরিয়া আসিতে পারে তবেই উহার দল বাঁচে। নতুবা উহাকে পরাজয়ের লজ্জা আর গ্লানি মাখিয়া ফিরিতে হইবে। অপর পক্ষের যতজনকে ছুঁইয়া ও নিজের কোটে ফিরিতে পারিবে বিপক্ষে তত জন মোর হইবে আর উহার নিজের দলের ঠিক ততজন বাঁচিয়া উঠিবে। সকলের চোখ মেহ্তার উপরে। ঐ যে মেহ্তা দম নিয়া চলিল। জনতা চারিদিক হইতে আসিয়া কোটের কাছে ভিড় করিল। কি চূড়ান্ত তন্ময়তা লোকের!

মেহতা শান্তভাবে বিপক্ষ দলের দিকে চলিল, জনতা উহার প্রত্যেকটি গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে, কাহারও মাথা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, কেহ গলা উঁচুতে বাড়াইয়া রহিয়াছে। বাতাস গরম হইয়া উঠিয়াছে। উত্তাপ চরমে পৌছিয়াছে। ঐ মেহতা শত্রুর কোর্টে ঢুকিল। দল সরিয়া যাইতেছে। উহাদের দলের এমনই বাঁধুনি যে মেহতার ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে কেহ আসিতেছে না। যাহারা ভাবিয়াছিল মেহতা অন্তত পাঁচ দশটা মোর করিয়া ফিরিবে, তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িল।

এমন সময় হঠাৎ মির্জা এক লাফে কাছে আসিয়া মেহতার কোমর জড়াইয়া ধরিল। মেহতা ছাড়াইবার জন্য জোর করিতে লাগিল, মির্জাকে নিজের কোর্টের দিকে টানিতে লাগিল। লোকেরা এখন উন্মত্তের মত। খেলা না তামাশা—লোকের সন্দেহ জাগিল। মির্জা আর মেহতার মধ্যে কুস্তি হইতেছে। মির্জার দলের কয়েকটি বুড়া এবার মেহতার দিকে লাফাইয়া পড়িয়া উহাকে জড়াইয়া ধরিল। মেহতা চুপচাপ মাটির উপর পড়িয়া—ও যদি কোনক্রমে টানিয়া আর হাত দুই চলিয়া আসিতে পারে তবেই ওর দলের না হোক পঞ্চাশটি লোক বাঁচিয়া উঠিবে, কিন্তু ও যে এক ইঞ্চিও নড়িতে পারিতেছে না। মির্জা উহার ঘাড়ের উপর চড়িয়া আছে। মেহতার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দুইটি হইয়াছে ঢেলা ঢেলা। ঐ শীতের দিনেও টপ টপ করিয়া ঘাম পড়িতেছে। মির্জা তাহার মোটা শরীরটা নিয়া উহার পিঠের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে।

মালতী কাছে যাইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, মির্জা খুরশেদ, এ ঠিক হোচ্ছে না, বাজি সমান সমান, কারও হারজিত নয়।

খুরশেদ মেহতার ঘাড় একটু চাপড়াইয়া বলিল, ও 'চি' বলুক, আমি এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি। 'চি' বলছে না কেন?

মালতী আর একটু আগাইয়া গিয়া বলিল, 'চি' বলবার জন্য আপনি এরকম জবরদস্তি করবেন?

মেহতার ঘাড়ের উপর আরো ঝুঁকিয়া পড়িয়া মির্জা বলিল, নিশ্চয় করবো, আপনি ওকে বলুন, 'চি' বলুক, আমি এখুনি উঠে পড়বো।

মেহতা নিজেই একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মির্জা উহার ঘাড় চাপিয়া ধরিল।

মালতী উহার হাত ধরিয়া টানিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, এ তো খেলা নয়, এ যে রীতিমত শত্রুতার লড়াই।

তাই সই।

আপনি ছাড়বেন না ?

এমন সময় ঠিক যেন ভূমিকম্প হইল। মির্জা সাহেব মাটির উপর পড়িয়া গেল, মেহতা দৌড়াইয়া কোটের দিকে ছুটিল, আর কোথা হইতে হাজার হাজার লোক পাগলের মত টুপি, পাগড়ি, লাঠি ছুঁড়িতে লাগিল। কি করিয়া যে এই ঘোর পরিবর্তন ঘটিল, কেহ বুঝিতে পারিল না।

মির্জা সাহেব মেহতাকে কোলে উঠাইয়া শামিয়ানা পর্যন্ত আনিল। সকলের মুখে শোনা যাইতে লাগিল, ডাক্তার সাহেবই বাজী জিতিয়াছেন। কিন্তু এই হারিতে বসিয়া জিতিয়া যাওয়ায় লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সকলে মেহতার সাহস, দম, আর ধৈর্যের বাহবা দিতে লাগিল।

মজুরদের জন্য আগে হইতে কমলালেবু সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহারই একটা একটা দিয়া উহাদিগকে বিদায় করা হইল। শামিয়ানার নীচে অতিথিদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা ছিল। মেহতা আর মির্জা একই টেবিলে মুখোমুখি বসিল, আর মালতী বসিল মেহতার পাশে।

মেহতা বলিল, আমার আজ এক নতুন জ্ঞান হোল। মেয়েদের সহানুভূতি হারকে জিত বানিয়ে দিতে পারে।

মির্জা মালতীর দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা! এই কথা! এতক্ষণ আমি ভেবে কষ্ট পাচ্ছিলাম যে আপনি একাকী কি রকম করে উপরে এসে গেলেন।

মালতী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, আপনি একদম নাছোড়বান্দা লোক. আজ আমি বুঝলাম।

তা দোষ ওর, ও কেন 'চি' বললে না ?

'চি' আমি কিছুতে বলতাম না, আপনি আমায় মেরে ফেললেও না।

খানিকক্ষণ বন্ধুবান্ধবদের গল্প সল্প চলিল। তাহার পর ধন্যবাদ, অভিবাদন, নমস্কার ইত্যাদির পালা শেষ হইলে অতিথিরা বিদায় লইল। মালতীরও এক জায়গায় যাইবার ছিল। সে চলিয়া গেল। কেবল রহিল মির্জা আর মেহতা। উহাদের তো এখনই স্নান করিতে হইবে। কাদায় মাখামাখি হইয়াছে। এই অবস্থায় পোষাক পরা চলে না। গোবর জল তুলিয়া দিল, আর দুই বন্ধু স্নান করিতে লাগিল।

মির্জা জিজ্ঞাসা করিল—বিয়ে কবে হোচ্ছে ?

মেহতা চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, কার বিয়ে ?

আপনার।

আমার বিয়ে ? কার সঙ্গে ?

না, আপনি একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু এ কি লুকোবার জিনিস ?

না, না, সত্যি বলছি, আমি একদম কিচ্ছু জানি না। আমার বিয়ে হোচ্ছে নাকি ?

তবে কি আপনি ভাবছেন মালতী আপনার বন্ধু হয়ে থাকবেন ?

মেহতা গম্ভীর ভাবে বলিল, আপনার ধারণা নিতান্তই ভুল। মির্জাজী, মিস মালতী হাসি খুসি, খোস মেজাজের লোক, বেশ বুঝদার, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে ওর, আরো অনেক কিছু চমৎকার জিনিস ওর আছে। কিন্তু জীবনসঙ্গিনীর মধ্যে আমি যে সব গুণের কল্পনা করি তা ওর মধ্যে নেই, সম্ভব হবেও না কোন দিন। আমার মানস প্রতিমা হবে ধৈর্য আর ত্যাগের প্রতিমূর্তি, নিজের নীরব সেবায় আর ত্যাগে সে স্বামীর আত্মার অংশ হয়ে যাবে। দেহ পুরুষের থাকে বটে, কিন্তু আত্মা স্ত্রীরই হয়। আপনি বলবেন, পুরুষ কেন নিজেকে ছাড়বে না, স্ত্রীর কাছেই কেন সেই দাবি ? কিন্তু পুরুষের যে সে সাধ্যই নেই। পুরুষ যদি নিজেকে ছাড়ে তবে নিঃশেষ হয়ে যাবে। পুরুষ তো গিয়ে কোন গুহাগহ্বরে বসবে আর ঈশ্বরপ্রাপ্তির স্বপ্ন দেখবে। পুরুষ তেজপ্রধান জীব, নিজের বুদ্ধির অহঙ্কারে ভাবে সে জ্ঞানের আধার, সোজা ঈশ্বরকে পেয়ে যাবে। মেয়েরা পৃথিবীর মত ধৈর্যশীল, শান্ত, সহিষ্ণু। পুরুষের মধ্যে যদি নারীর এই গুণগুলি থাকে তবে তো সে মহাত্মা হয়। কিন্তু মেয়েরা যদি পুরুষের গুণ পায়, তবে হয়ে যায় কুলটা। যে মেয়ে সর্বাংশে মেয়ে, পুরুষেরা তারই দিকে আকৃষ্ট হয়। মালতী আজো আমাকে টানতে পারেনি। আমি আপনাকে কি করে বোঝাই স্ত্রী বলতে আমি কি কি বুঝি। সংসারে যা কিছু সুন্দর আমার মতে মেয়েরা তারি প্রতিমা—আমি যদি মেরেও ফেলি তবু আমার স্ত্রী প্রতিশোধ নেবার জন্য উগ্র হয়ে উঠবে না—তার কাছ থেকে আমি এই আশা করি। ওর চোখের সামনেই যদি আমি কোন মেয়েকে আদর করি তবু ওর মনে ঈর্ষা জাগবে না—এত নির্ভর থাকবে ওর হৃদয়ে। এমন মেয়ে যদি পাই তবে তার পায়ে আমি মাথা বিকিয়ে দিই, তার কাছে নিজেকে সঁপে দিই।

মাথাটি তুলাইয়া মির্জা বলিল, এমন মেয়ে কি তুনিয়ায় নেই ?

মেহতা বলিল, এক কেন, হাজারটি আছে।

একটা দৃষ্টান্ত দাও।

এই ধর, মিসেস খান্না।

খান্না হতভাগা, হীরা পেয়ে ভাবছে কাচের টুকরো। দেখ ভেবে, কি ভালবাসা, আর কি আত্মত্যাগ। খান্নার রূপ-পিয়াসী মনে ওর জন্য বুঝি এক রত্তি ভালবাসাও নেই, কিন্তু আজই যদি খান্নার কোন বিপদ আসে ও খান্নার জন্য প্রাণ দেবে। খান্না যদি কানা খোঁড়াও হয়ে যায় তবু ওর সেবার ঘাটতি হবে না। এখন খান্না ওর কদর বুঝবে না, কিন্তু আপনি দেখে নেবেন, একদিন ওর পা ধোওয়া জল খাবে। আমি এমন বৌ তো চাই না, যার সঙ্গে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা বলা চলে, বা যে আমার প্রুফ দেখে দিতে পারে; আমি চাই এমন মেয়ে যে নিজের ত্যাগ আর ভালবাসা দিয়ে আমার জীবনকে পবিত্র করে তুলবে, উজ্জ্বল করে তুলবে।

দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, খুরশেদ এমন ভাবে বলিল, আপনি খুব খাঁটি কথা বলেছেন মিঃ মেহতা। এমন মেয়ে পেলে আমিও বিয়ে করি। কিন্তু পাব এমন ভরসা হয় না।

মেহতা হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনি খুঁজতে থাকুন, আমিও খুঁজতে থাকবো। হয়তো কোথাও বরাত খুলে যাবে।

কিন্তু মিস মালতী আপনাকে ছাড়বার পাত্রী নন, তা আমি লিখে দিচ্ছি।

এ সব মেয়ে নিয়ে আমোদ করা যায়, বিয়ে করা যায় না। বিয়ে মানে আত্মসমর্পণ।

বিয়ে যদি আত্মসমর্পণ, তো প্রেম কি ?

প্রেম যখন আত্মসমর্পণের রূপ নেয় তখনই নরনারী বিয়ে করে; তার আগে পর্যন্ত প্রেম থাকে বিলাসের বস্তু।

পোষাক পরিয়া মেহতা বিদায় লইল। সন্ধ্যা হইয়াছে। মির্জা গিয়া দেখে, গোবর তখনও গাছে জল দিতেছে। খুসি হইয়া বলিল, এখন তোমার ছুটি। কাল আবার আসবে তো ?

গোবর করুণ স্বরে বলিল, হুজুর, আমি চাকরি খুঁজছি।

চাকরি করবি, তাহলে আমি তোকে কাজ দেব।

কত পাব হুজুর ?

তুই যা চাইবি।

আমি কি বলবো ? আপনার যা ভাল মনে হয় দেবেন।

আমি তোকে পনেরো টাকা দেব আর খুব খাটিয়ে নেব।

খাটিতে গোবর ভয় পায় না। তেমন টাকা পাইলে ও অষ্টপ্রহর কাজ করিতে রাজী। পনেরো টাকা দিবে, তবে তো কথাই নাই। ও প্রাণপাত করিয়াও খাটিবে।

বলিল, একটা ঘর পেলে এখানেই পড়ে থাকি।

হাঁ, হাঁ, থাকার জায়গার ব্যবস্থা আমি করবো। এই ঝুপড়ি ঘরেরই এক কোণে তুই শুয়ে থাকবি।

গোবর যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

## ১৪

পঞ্চায়েতের সাজার কড়ি চুকাইতে হরির সমস্ত ফসলই হাতছাড়া হইল, বৈশাখ কোনমতে কাটিল, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাস পড়িতে না পড়িতে ঘরে এক দানা খাবারও রহিল না। খাইবার লোক পাঁচ পাঁচটি, কিন্তু ঘর একেবারে শূন্য। দুই বেলা না হউক এক বেলা তো পেটে দানা দিতে হইবে। ভরপেট না হউক, আধা পেটা তো চাই। একেবারে না খাইয়া কি থাকা যায় ? কাজেই ধারের চেষ্টা করিতে হয়। গাঁয়ের ছোট বড় সকল মহাজনের কাছেই লুকাইয়া বেড়াইতে হয় জন খাটিবে, কিন্তু রাখে কে ? তা ছাড়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে নিজের ক্ষেতেই অনেক কাজ। আখের গোড়ায় জল দিতে হইবে, কিন্তু খালি পেটে পরিশ্রম করাও যে অসাধ্য।

সন্ধ্যা হইয়াছে, ঝুনিয়ার ছোট বাচ্চাটা কান্না শুরু করিয়াছে। মায়ের ভাগ্যে ভরপেট খাওয়া জোটে না, তা বুকে দুধ কোথা হইতে আসিবে ? সোনা অবস্থাটা বুঝিতে পারে, কিন্তু রূপার কি বুঝিবার বয়স ? রুটির জন্য বার বার চিৎকার করিতেছে, সারা দিন কাঁচা আম খাইয়া কাটাইয়াছে, কিন্তু এখন তো কিছু সার পদার্থ খাইতে হইবে। হরি গিয়াছিল দুলারী সাহুয়াইনের কাছে কিছু ফসল ধার করিতে কিন্তু সে দোকান বন্ধ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। মংগরু সাহু শুধু দিতে অস্বীকার করে নাই, কথাও শুনাইয়া দিয়াছে

—তিন বছর যাবৎ সুদের এক আধলা যে দিতে পারে না, সে আবার ধার চায় কোন মুখে? কপাল যখন খারাপ হয়, তখন এমনই হয়। ভগবানের এ কি বিচার, বোঝা যায় না। যখন পেয়াদার হুমকি পড়িল, তখন কথাটি না বলিয়া উহারা টাকা বাহির করিল, আর আমার টাকা যেন টাকাই নয়। আর স্ত্রী, তার তো মেজাজই বোঝা ভার।

সেখান হইতে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া উদাস মুখে হরি বসিয়া আছে, এমন সময় পুন্নী আগুন চাহিতে আসিল; রান্নাঘরের দরজায় গিয়া দেখে ঘর অন্ধকার; তাই পুন্নী জিজ্ঞাসা করিল, এতখানি দেরি হলো দিদি, এখনো রান্না চড়ালে না।

গোবর যেদিন হইতে নিরুদ্দেশ, সেইদিন হইতে ধনিয়া পুনিয়া আবার পরস্পরে কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। হরির কাছে পুনিয়া একটু কৃতজ্ঞও রহিয়াছে। এখন পুনিয়াও হীরাকে গালি দেয়, বলে, খুনে, গোরু মারিয়া পলাইয়াছে! মুখে কালি লেপিয়াছে, এখন ঘরে ফিরিবে কোন মুখে? আর ঘরে ফিরিলে ও ঘরে পা দিতে দিবে না! গোহত্যা করিতে ওর লজ্জা হইল না? ঠিক হইত যদি পুলিসে ধরিয়া নিত, আর জাঁতা পিষাইত।

ধনিয়া লুকাইতে পারিল না, বলিল, রুটি বানাব কি করে ভাই, ঘরে এক দানা আটাও তো নাই। তোমার মহৎ ভাশুর বেয়াদরির পেট ভরিয়েছে, এখন আমার কাচ্চা বাচ্চা মরুক আর বাঁচুক। সমাজের লোক তো এখন ডেকেও জিজ্ঞাসা করে না।

পুনিয়ার ফসল খুব ভাল হইয়াছিল, আর ও নিজেই স্বীকার করিত যে হরির গুণেই এবার এমন ফসল পাইয়াছে। হীরার দ্বারা হইত না।

পুনিয়া বলিল, তা আমার ঘর থেকে আটা নিয়ে এস না। সেও তো দাদার মেহন্নতেই হয়েছে। সুখের দিনে ঝগড়াঝাঁটি করা চলে, কিন্তু দুঃখের সময় একত্র মিলে মিশে না থাকলে চলে না। আমি কি এমনই কানা, যে লোকের মন দেখতে পাই না? দাদা আমার কাজে সামাল না দিলে আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম!

ও তখনই ঘরে ফিরিল, আর যাইবার সময় সোনাকে সঙ্গে নিল। নিমেষের মধ্যে দুই ঝুড়ি ফসল আনিয়া তাহারা উঠানে হাজির করিল। ঝুড়িভরা যব, দুই মণের কম হইবে না। ধনিয়াকে কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া পুনিয়া আবার নিজের ঘরে গেল। দেখিতে দেখিতে সে আবার

ফিরিয়া আসিল, এবার আনিল বড় এক ঝুড়ি ভরা অড়হর ডাল, বলিল, চল, আমি উননটা ধরিয়ে দিই।

ধনিয়া কাছে গিয়া দেখে, যবের থলির উপর ছোট একটা ডালায় চার পাঁচ সের আটাও রহিয়াছে। জীবনে আজ প্রথমবার ও হার মানিল। চক্ষু দুইটিতে প্রেম আর কৃতজ্ঞতার মাণিক জ্বালিয়া দিয়া বলিল, এ কি করেছিস, ঘর খালি করে সব নিয়ে এলি যে—আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি নাকি?

আঙ্গিনায় ছোট একটি খাটিয়ার উপর ঝুনিয়ার শিশুপুত্র শুইয়াছিল। পুনিয়া উহাকে কোলে লইয়া দুলাইতে দুলাইতে বলিল, তোমাদের আশীর্বাদে আমার এখনো অনেক আছে দিদি, গম এবার পেয়েছি পনেরো মণ আর দশ মণ যব। পাঁচ মণ মটর পেয়েছি। তোমাকে লুকিয়ে কি হবে? আমাদের দুই সংসারেরই চলে যাবে। তারপর ঈশ্বর আছেন!

ঝুনিয়া আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া ছোট শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। পুনিয়া উহাকে আশীর্বাদ করিল। সোনা উননে আগুন দিতে গেল। রূপা জলের জন্য বায়না ধরিল। এতক্ষণকার বাধার পর আবার উহাদের সংসারের চলা শুরু হইল, জলকে আটক করিলে যেমন ঘূর্ণি হয়, শব্দ হয়, গতির বেগ বাড়ে, আবার বাঁধ খুলিয়া দিলে জল শান্ত হয়, মধুর ধ্বনি করিয়া, মন্দগতিতে, বিচিত্র ছন্দে বহিয়া চলে।

পুনিয়া বলিল, সাজার কড়ি দেবার জন্য দাদার কিসের এত তাড়া ছিল?

ধনিয়া বলিল, পঞ্চায়েতের কাছে ভালো মানুষ সাজতে হবে তো!

দিদি, যদি রাগ না কর, তবে আমি একটা কথা বলি।

রাগ কেন কোরবো, বল না?

না, বোলবো না, তুমি যদি চটে যাও!

বলছি তো, রাগ করবো না।

দিদি, ঝুনিয়াকে ঘরে রাখা তোমার ঠিক হয় নাই।

তবে ওর দশা কি হোত? যদি ডুবে মরত!

আমি আমার ঘরে রাখতাম। তাতে তো লোকে কিছু বলত না?

একথা তুই আজ বলছিস। সেদিন তো ঝাঁটা মেরে বিদায় করতি।

এতগুলি টাকা খরচ করলে, এতে যে গোবরের বিয়ে হয়ে যেত।

যা হবার, তাকে কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, পাগল! এখনি হয়েছে কি?

এদিকে ভোলাও যে গোরুর দামের তাগিদ দিচ্ছে। গোরু দিয়েছিল যাতে আমরা ওর বিয়ে ঠিক করে দিই। এখন বলে, বিয়ে আমি কোরবো না, আমার টাকা দিয়ে দাও। ওর দুই ছেলে তো লাঠি হাতে ঘুরছে যে, ওকে মারবে। এই সর্বনাশা গোরু ঘরে এনে আমার ঘর জ্বলে গেল।

আরো খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর আগুন লইয়া পুনিয়া চলিয়া গেল। হরি সব দেখিয়াছিল, এখন ভিতরে আসিয়া বলিল, পুনিয়ার মনটা ভাল।

হীরার মনও তো ভাল ছিল।

ফসলগুলি ধনিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু মনে মনে বড়ই লজ্জা আর অপমান বোধ করিতেছিল। এমনই গ্রহের ফের যে, উহার কাছেও এতটা ছোট হইতে হইল!

হরি বলিল, তুই কারো ভালো দেখতে পারিস না, এই তোর বড় দোষ।

ভালো কেন দেখবো না? ভালোর কি বা আছে? আমার স্বামী ওর ক্ষেতের কাজে জান দিয়ে খাটে নি নাকি? আমি না হয় ওর কাছ থেকে কিছু ফসল নিয়েছি, তা প্রত্যেকটি দানা ওর পুরিয়ে দেব।

বড় জায়ের মনোভাব জানিয়াও হরির প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য মাঝে মাঝে পুনিয়া যাইত; এই সব শস্য ফুরাইয়া গেলে সে আরো দুই এক মণ দিল। কিন্তু যখন চাতুর্মাস্য আসিয়া পড়িল, অথচ বৃষ্টি নামে না, তখন সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিল। শ্রাবণ মাস আসিয়া পড়িল, ঘূর্ণি হাওয়া চলিতেছে। কুয়ার জল শুকাইয়া রহিয়াছে, জলের অভাবে আত্মা শুকাইয়া উঠিল। নদীতে কিছু জল পাওয়া যায় কিন্তু একটু দেরিতে গেলে তাহাও পাওয়া ভার। ইহার পর নদীও জবাব দিল। জায়গায় জায়গায় চুরি ডাকাতি শুরু হইল। সারা দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। শেষ পর্যন্ত ভাদ্র মাসে বর্ষা নামিল আর কৃষকদের ধড়ে প্রাণ আসিল। সেদিন কি আনন্দ, কি উচ্ছ্বাস! পিয়াসী পৃথিবীর যেন বুক শীতল হইল, আর পিপাসার্ত কৃষকের আনন্দ দেখিয়া মনে হইল ইহারা জল তো পায় নাই, পাইয়াছে যেন সোনার মোহর। জল ধরিয়া রাখ, যে যতটা পার। যেখানে ধূ ধূ ক্ষেতে শুকনা বালি উড়িতেছিল, সেইখানে এখন হাল পড়িল। ছেলেরা সকলে মিলিয়া যেখানে যত পুকুর, গড়াই, গর্ত, ডোবা, আছে সব দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুকুরটা আধা ভরিয়াছে, অমনি ছোটে গড়াইয়ের দিকে।

কিন্তু এখন যতই বৃষ্টি হউক, আখের কর্ম সারা। এক এক হাতের বেশি লম্বা হইবে না। মকাই, জোয়ার, আর কোদো ধান হইতে খাজনার কতটুকুই বা শোধ হইবে, মহাজনের পেট তো অর্ধেকও ভরা চলিবে না। তবে হাঁ, এবার হাল চাষ করা যাইবে আর লোকে প্রাণে বাঁচিবে।

মাঘ মাস পার হইলেও যখন ভোলা গোরুর টাকা পাইল না তখন একদিন রাগের মাথায় হরির বাড়ি আসিয়া খুব ধমক দিল, এই তোমার কথার দাম! বলেছিলে আখ উঠলে আমার টাকা দেবে, আখ তো উঠেছে, এবার আন আমার টাকা।

হরি নিজের অবস্থার কথা সকল দিক হইতে বুঝাইয়া বলিলেও যখন ভোলা মানিল না আর দরজার কাছ হইতে নড়িল না, তখন হরি বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, তা মাহাতো, আমার হাতে এখন এক পয়সাও নেই, কেউ আমাকে ধারও দেবে না। আমি কোথা থেকে দেব? ঘরে এক দানা খাবার পর্যন্ত নাই। বিশ্বাস না হয়, ঘরে এসে দেখ। যা পাও, উঠিয়ে নিয়ে যাও।

ভোলা তবু নির্দয়ভাবে বলিল, আমি তোমার ঘর তালাসি করতে যাব কেন? আর তোমার হাতে কি টাকা আছে না আছে তা দিয়েও আমার দরকার নাই। তুমি বলেছিলে, আখ উঠলে আমার টাকা দেবে। আখ তো উঠেছে, এবার আমার টাকা চাই।

তুমিই বল, আমি কি করবো।

আমি কি বলবো?

আমি তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।

তাহলে আমি তোমার বলদ দুটো খুলে নিয়ে যাব।

হরি অবাক হইয়া উহার দিকে চাহিয়া রহিল, নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হয় না। হতবুদ্ধির মত মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভোলা কি উহাকে পথের ভিখারী বানাইয়া ছাড়িবে? বলদ দুইটা লইয়া গেলে তো হাত দুই খানা কাটিয়া ফেলার সামিল হইবে।

হরি অতি দীন ভাবে বলিল, বলদ দুটো নিলে যে ভাই আমার সর্বনাশ হবে। তা তোমার ধর্মে যদি বলে, তাই নাও।

তোমার বাঁচামরায় আমার কিছু আসে যায় না, আমি চাই আমার টাকা।

আর আমি যদি বলি যে আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি?

ভোলার বাক্য সরিল না। এবার ওর যেন নিজের কানকে অবিশ্বাস হইল। হরি এত বড় বেইমানি করিতে পারে, ইহা যেন সম্ভব মনে হয় না।

সে উত্তেজিত ভাবে বলিল, তুমি যদি গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলতে পার আমার টাকা দিয়ে দিয়েছ, তবে আমি মানতে পারি।

তাই বলতেই আমার মন চায়, যে মরতে বসেছে সে কি না করে? কিন্তু আমি বলবো না।

বলতে পার না, তাই বলবে না।

হাঁ ভাই, বলতে পারি না ; ঠাট্টা করছিলাম।

কিছুক্ষণ হরি দোমনা হইয়া রহিল, পরে বলিল, ভোলা ভাই, তুমি আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা কোরছো কেন? ঝুনিয়া আমার ঘরে এসে রয়েছে, তাতে আমার কোন স্বর্গ লাভ হয়েছে? ছেলে বিগড়ে গেছে. তার জন্য দুশ টাকা ভরতুকি দিতে হোল। আমি তো কিছুর মধ্যেই ছিলাম না। আবার তুমি এখন আমায় উৎখাত করতে এসেছ! ভগবান জানেন, পাজি ছেলে কোথায় কি কোরছে. তার বিন্দুবিসর্গ আমি জানতাম না। আমি তো ভাবতাম গান শুনতে যায়। মাঝ রাতে ঝুনিয়া যেদিন আমার ঘরে আসে সেদিন না আমার কানে এল। ঐ সময়ে আমি যদি ঘরে ঠাঁই না দিতাম কি হোত ভাব তো! কার পাল্লায় পড়ে যেত, ঠিক কি?

দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া ঝুনিয়া সকল কথা শুনিতেছিল। উহার মনে হইল বাপ আর বাপ নাই. শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহার ভয় হইল, হরি বুঝি বলদ দুইটি দিয়া ফেলে। ও তাড়াতাড়ি রূপাকে বলিল, দৌড়ে যা, মাকে ডেকে আন। বলবি, যেন দেরি না করে।

ধনিয়া গিয়াছিল ক্ষেতে গোবর দিতে। বৌয়ের ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, কেন ডেকেছিস বৌ, আমি তো শুনে ঘাবড়ে গেছি।

বাবাকে তুমি দেখেছ?

হাঁ, দেখলাম, কসাইয়ের মত দুয়ারে বসে রয়েছে। আমি ওর সঙ্গে কথাই কইলাম না।

বাবার কাছ থেকে আমাদের বলদ দুটো চাইছে।

ধনিয়ার হাত পা পেটে ঢুকিয়া গেল। বলিল, বলদ দুটো চাইছে?

হাঁ, বলছে, হয় আমার টাকা দাও, নইলে তোমার বলদ দুটো খুলে নিয়ে যাব।

তা তোর শ্বশুর কি বলছে ?

উনি বলছেন, তোমার ধর্মে যদি তাই বলে, তবে নিয়ে নাও।

বেশ, খুলে নিক ; কিন্তু এই আমার দরজায় এসে যদি ভিক্ষা না চায় তো আমার নামে থুতু দিও। আমাদের রক্তে যদি ওর বুক জুড়োয়, তো নিক আমাদের রক্ত।

সেই শীতের মধ্যে বাহিরে গিয়া ও হরিকে বলিল, ভদ্রলোক বলদ দুটো নিতে চায়, তা দিচ্ছ না কেন ? ওর পেট ভরুক, আমাদের ঈশ্বর আছেন। আমাদের হাত তো কেটে নেবে না ? এতদিন নিজের ক্ষেতে খাটছি, এবার পরের কাছে জন খাটবো। ঈশ্বরের মর্জি হয়, তো আবার গাই বলদ হবে ; আর মজুর খাটতে হয়, তাতেই বা দোষ কি ? এই রোদে পুড়ে জলে ভিজে ফসল পাই কি না পাই, সে ভাবনা আর থাকবে না। আমি তো জানতাম না ভোলা ভাই আমাদের শত্রু, তাহলে ঐ গোরু এনে নিজেদের মাথায় এই বিপত্তি ডেকে আনতাম না। ওই অলক্ষ্ণে যেদিন থেকে ঘরে এসেছে, ঘর তচ-নচ হয়ে গেল।

ভোলা এতক্ষণ পর্যন্ত যে অস্ত্রটি লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহা বাহির করিল। ও বেশ বুঝিয়াছে, বলদ দুটি ছাড়া ইহাদের আর কিছুই নাই। এই দুইটিকে রক্ষা করিবার জন্য ইহারা সব কিছু করিবে। পাকা তীরন্দাজের মত সে বলিল, তোমরা যদি ভেবে থাক যে আমার বে-ইজ্জতি কোরবে আর তোমরা আরামে বসে থাকবে, তবে ভুল করেছ। তুমি তোমার দুশ টাকার শোকে কাঁদছো, আর আমার যে লাখ টাকার আবরু খসে গেছে ! তোমরা যদি ভাল চাও, তবে যেমন ঝুনিয়াকে ঘরে রেখেছ ঠিক তেমনি এখন ওকে ঘরের বার করে দাও। তাহলে আমি বলদও চাইব না, গোরুর দামও চাইব না। ওর জন্য আমার নাক কান কাটা গেছে, আমি চাই, ও এখন ঠোক্কর খেয়ে বেড়াক। ও এখানে রানী হয়ে বসে আছে, আর ওদিকে আমরা ওর নাম নিয়ে কেঁদে মরি, সে আমি হতে দেখতে পারবো না ; ও আমার মেয়ে, আমি কোলে করে খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছি, আর ভগবান সাক্ষী, আমি ছেলেদের চেয়ে ওকে কখনো আলাদা দেখি নি। কিন্তু আজ ওকে ভিক্ষা করতে দেখে, রাস্তায় পড়া ছোলা কুড়িয়ে খেতে দেখে আমার বুকটা ঠাণ্ডা হবে। বাপ হয়ে আমার হৃদয় যে এমন কঠিন হয়ে উঠেছে, তাই থেকেই বুঝবে আমার কতখানি আঘাত লেগেছে।

এই মুখপুড়ী মেয়ে আমার সাত পুরুষের নাম ডুবিয়ে দিয়েছে। আর তুমি কিনা তাকে ঘরে এনে রেখেছ, এতে আমার বুকের উপর যেন জাঁতা পেষা হচ্ছে, তা কি বোঝ না ?

ধনিয়া যেন পাথর হইয়া গেল ; পরে জোর করিয়া বলিল, তবে বাপু আমার কথাও তোমাকে শুনতে হবে। তুমি যা চাও তা হবে না, শত জন্মেও না। ঝুনিয়া আমাদের প্রাণের সঙ্গে মিশে গেছে। তুমি বলদ দুটো নেবে, তা নাও ; এতে যদি তোমার কাটা নাক জোড়া লাগে তবে লাগুক ; এতে যদি তোমার চোদ্দ পুরুষের ইজ্জত বাঁচে, বাঁচাও। ও যেদিন প্রথম আমার ঘরে এসে দাঁড়াল, আমি ওকে ঝাঁটা নিয়ে মারতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওর চোখের জলের বানে আমার রাগ ভেসে গেল, ওর ওপর আমার দয়া হোল। দাদা, তুমি বুড়ো হয়ে গিয়েছ, তাও ফের একটা বিয়ের জন্য তুমি খেপে গেছ, আর এ তো বাচ্চা।

ভোলা আবেদনভরা দৃষ্টিতে হরির দিকে চাহিয়া বলিল, শুনছ হরি, এর কথা ? আমার দোষ দিও না যেন। বলদ দুটি না নিয়ে আমি এখান থেকে নড়বো না।

দৃঢ়স্বরে হরি বলিল, তাই নিয়ে যাও।

তার পর যেন কাঁদতে শুরু করো না যে আমার বলদ দুটো নিয়ে গেল।

তা আমরা কাঁদবো না।

হরি বলদ দুইটির দড়ি খুলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ছেলে কোলে গোল-ছাপা শাড়ী পরনে ঝুনিয়া আসিয়া কম্পিত স্বরে বলিল, বাবা, এই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আর তোমার যেমন মনস্কামনা তেমনই ভাবে ভিখ্ মেগে নিজের আর ছেলের পেট ভরাবো ; তাও যদি না জোটে, দুজনে কোথাও ডুবে মরবো।

ভোলা খিঁচাইয়া উঠিল, দূর হ আমার সামনে থেকে। ভগবান করুন, তোর মুখ যেন দেখতে না হয়। কুলের কলঙ্কিনী কোথাকার! তোর ডুবে মরাই উচিত।

ঝুনিয়া উহার দিকে চাহিয়াও দেখিল না। উহার মধ্যে যে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে· তাহা নিজেকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে চাহে, হিংসায় নয়, প্রাণ-বিসর্জনে। এই মুহূর্তে যদি ধরণী দ্বিধা হইয়া উহাকে কোলে টানিয়া লইত, তবে ও নিজেকে ধন্য মানিত। যাইবার জন্য ও পা বাড়াইল ; দুই পা যায়

নাই, ধনিয়া ছুটিয়া আসিয়া উহাকে ধরিল, আর স্নেহভরে বলিল, বৌ, তুই কোথা যাচ্ছিস ? চল, ঘরে চল। এটা তোর নিজের ঘর। আমরা থাকতেও যেমন, মরার পরেও তেমন, এই হোল তোর ঘর। সে-ই ডুবে মরুক যে নিজের সন্তানের শত্রু! কি ভাল লোক, মুখ থেকে এমন কথা বার করতে লজ্জাও হোল না! ছোট লোক, আমাদের ওপর জুলুম চালাতে এসেছে। নিয়ে যা, ষাঁড়ের রক্ত খা···

ঝুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মা, বাপ হয়ে যখন আমায় এমন গাল দিল, তখন আমার জলে ডুবে মরাই উচিত। আমার মত অভাগীর জন্য তোমাদের কতই দুঃখ পেতে হোল। যেদিন থেকে আমি পা দিয়েছি, তোমাদের বাড়ি ছারখার হয়ে গেল। তুমি আমাকে যেরকম আদরে রেখেছ, নিজের মাও তা পারে না। এবার মরে যেন তোমার কোলে জন্মাই, এই আমার প্রার্থনা।

ধনিয়া উহাকে নিজের কাছে টানিয়া আনিতে আনিতে বলিল, ও তো তোর বাপ নয়, শত্তুর, খুনে। তোর মা থাকলে আজ ওর দুর্দশার সীমা থাকতো না। ও আবার বিয়ে কোরতে চায়! আসুক না বৌ, জুতো-পেটা না করে তো কি বলেছি!

শাশুড়ীর পিছন পিছন ঝুনিয়া ঘরে গেল। ওদিকে ভোলা খুঁটি হইতে বলদ দুটি খুলিয়া লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ির দিকে চলিল, যেন নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া লুচি পুরীর বদলে অদৃষ্টে জুটিয়াছে জুতা। সে বলিল, খুব হবে, করুক এখন ক্ষেতি, আর বাঁচাক বংশধরকে। সকলেই আমার অপমান করতে চায়। না জানি কোন জন্মের শত্রু, নইলে এমন মেয়েকে কে ঘরে ঠাঁই দেয়। সবাই লজ্জার মাথা খেয়েছে। ও তো আর ছেলের বিয়ে করা বৌ নয়? আর ঐ বিধবা মেয়ে ঝুনিয়ার আক্কেল দেখ—কোন মুখে আবার আমার সামনে এসে দাঁড়ায়! অন্য মেয়ে হলে মুখ দেখাত না। চক্ষে জল পর্যন্ত নাই। যত সব পাজি আর মূর্খের দল। ভাবছে, ঝুনিয়া বুঝি ওদের হয়ে গেল। আরে, যে মেয়ে বাপের ঘরে টিঁকল না, সে কি পরের ঘরে থাকে? সময়টা খারাপ, নইলে ঐ দজ্জাল ধনিয়াকে ঝুঁটি ধরে বাজারের মধ্যে নিয়ে মাটিতে মুখ ঘসে দিতাম। কি গালটাই না দিল আমাকে!

বলদ দুইটির দিকে একবার সে দেখিয়া লইল—কেমন বলদ, কে জানে। না, ভালই মনে হচ্ছে। যেখানে হোক, একশ টাকায় বেচতে পারব। আমার আশি টাকার বেশি উঠে আসবে।

ও গ্রামের বাহিরে আসিতে না আসিতে পিছন হইতে দাতাদীন, পটেশ্বরী, শোভা, আরও এমন দশ পঁচিশ জন লোক আসিয়া জুটিল! ভোলার রক্ত হিম হইয়া গেল। যদি ফৌজদারী বাধে তবে বলদও হাতছাড়া হইবে আর মারও খাইতে হইবে। তবু সে কোমর বাঁধিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। মরিতেই যদি হয় তবে লড়াই করিয়া মরিবে।

কাছে আসিয়া দাতাদীন বলিল, ভোলা, এ তুমি কি অনর্থ বাধালে! ওদের বলদ দুটো খুলে নিলে! ওরা চুপ করে রইল, আর হয়ে গেল? গাঁয়ের সবাই নিজের নিজের কাজে ছিল, তাই খবর পায় নাই। হরি যদি একটু আভাস দিত, তবে একটি একটি করে তোমার চুল টেনে ছিঁড়ত। ভালো চাও তো ফিরিয়ে দিয়ে এসো। আমাদের সঙ্গে চালাকি চলবে না।

পটেশ্বরী বলিল, এ হোল হরির সরলতার ফল। তোমার কাছে ওর ধার আছে, তা আদালতে নালিশ কর, ডিক্রীজারি হোক। তার জন্য ওর বলদ খুলে নেবার কি অধিকার আছে তোমার? এখন যদি নালিশ করে দিই, তবে হাতে হাতকড়া পড়বে।

ভোলা দাবড়ি দিয়া বলিল, তা, লালা সাহেব, আমি তো জবরদস্তি করে আনি নি, হরি নিজে দিয়েছে।

পটেশ্বরী শোভাকে বলিল, শোভা, এই বলদ ওকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। কিষাণ নিজের বলদ খুসি হয়ে দিয়ে দেবে, তবে হালে জুতবে কি?

ভোলা বলদ দুইটির সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, বেশ, আমার টাকা তোমরা পাইয়ে দাও, আমি গোরু ছেড়ে দিচ্ছি। বলদ দিয়ে আমার কি হবে?

আমরা বলদ নিয়ে চললাম, তোমার টাকার জন্য তুমি মামলা কর, নইলে মেরে পুঁতে ফেলবো। তুমি ওকে নগদ টাকা দিয়েছিলে বুঝি? এক অলক্ষুণে গাই ওর ঘাড়ে চাপিয়ে এখন ওর বলদ দুটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে!

ভোলা বলদের সম্মুখ হইতে নড়িল না। গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ভাবখানা এই যে, না মারিলে নড়িবে না। পাটোয়ারীর সঙ্গে মামলায় ও পারিবে কেন?

দাতাদীন এক পা আগাইয়া নিজের বাঁকিয়া পড়া কোমর সোজা করিয়া বলিল, তোমরা সব দাঁড়িয়ে দেখছ কেন, মেরে তাড়িয়ে দাও, আমাদের গাঁ থেকে বলদ খুলে নিয়ে যাবে?

যুবক বংশী বেশ বলিষ্ঠ পুরুষ। সে আগাইয়া আসিয়া ভোলাকে জোরে এক ধাক্কা মারিল। সামলাইতে না পারিয়া ভোলা পড়িয়া গেল। উঠিতে যাইবে, অমনি বংশী আর এক ঘুসি মারিল।

ততক্ষণে হরি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া পড়িয়াছে। ভোলা উহার দিকে কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া বলিল, মাহাতো, তোমাকে ধর্ম সাক্ষী করে বলতে হবে, আমি কি জোর জবরদস্তি করে তোমার গোরু নিয়ে যাচ্ছি?

সঙ্কুচিত হইয়া হরি বলিল, এ আমায় বলেছিল, হয় ঝুনিয়াকে ঘর থেকে বার করে দাও, নয়তো আমার টাকা দিয়ে দাও। তা নইলে ও গোরু খুলে নেবে। আমি বলেছি, আমার হাতে টাকাও নেই, আর ঘরের বৌও আমি তাড়িয়ে দেব না, তা তোমার ধর্ম যদি বলে তবে বলদ দুটো নিয়ে যাও। আমি ওর ধর্মের ওপর ছেড়ে দিলাম, আর ও গোরু দুটো খুঁটি থেকে খুলে নিয়ে গেল।

পটেশ্বরী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, তুমি যখন ওর ধর্মবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিলে, তবে কেন এ জবরদস্তি? ওর ধর্ম বলেছে, তাই ও নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাও ভাই, বলদ তোমারই।

দাতাদীন সমর্থন করিয়া বলিল, হাঁ, ধর্মের কথা উঠলে আর কে কি বলবে?

সকলে তিরস্কার-ভরা চোখে হরির দিকে দেখিতে লাগিল। উহাদের হার মানিয়া ফিরিতে হইল, আর বিজয়ী ভোলা সগর্বে মাথা তুলিয়া বলদ দুটিকে লইয়া চলিল।

## ১৫

মালতী বাহিরে প্রজাপতি, অন্তরে মধুমক্ষিকা। তাহার জীবনে সবটাই হাসিখেলা নয়, শুধু গুড় খাইয়া কে বাঁচিতে পারে! বাঁচিলেও সে জীবন সুখের নয়। ও হাসিঠাট্টা করে, কারণ তাহারও মূল্য পাওয়া যায়। ও যে খোসগল্পে লোকের চমক লাগাইয়া বেড়ায় তাহা কেবল এই জন্য নয় যে হাসিয়া খেলিয়া লোককে মুগ্ধ করাই ও জীবন বলিয়া মনে করে, কিংবা ও নিজেকে নিজের চোখে এতখানি বাড়াইয়া দিয়াছে যে যাহা কিছু করে তাহা নিজের জন্যই করে। তাহা নয়; ও এই জন্যই হাসে খেলে, এই জন্যই ফুর্তি করে যে তাহাতে উহার

কর্তব্যের বোঝা কিছু হালকা হইয়া যায়। উহার বাবা ছিলেন সেই সব বিচিত্র জীবের একজন, যাহারা কথার জোরে লাখ টাকার লেনদেন করে। বড় বড় জোতদার জমীদারদের জোতজমা বিক্রী করাইয়া দেওয়া, উহাদিগকে ধার জুটাইয়া দেওয়া, সদরালাদের ধরাধরি করিয়া মামলা মিটাইয়া ফেলা, এই সব ছিল তাঁহার কাজ। এক কথায়, তিনি ছিলেন দালাল। এই শ্রেণীর লোকের বিশেষ একটা প্রতিভা থাকে। যে কাজে কিছু লাভের প্রত্যাশা সে কাজের ভার তাহারা লয় এবং কোনও না কোনও প্রকারে তাহা সম্পন্ন করে। হয় তো এক রাজকুমারীর সঙ্গে আর এক দেশের রাজপুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিয়া দিল, তাতে দশ বিশ হাজার টাকা পাওয়া গেল। এই দালালেরা যখন ছোট ছোট কাজ করে তখন ইহাদের বলে 'টাউট', আর আমরা তাহাদের ঘৃণা করি। বড় বড় কাজ করিয়া ঐ টাউটরাই রাজারাজড়ার সঙ্গে শিকারে যায়, আর গভর্ণরের টেবিলে চা খায়। মিস্টার কাউল ছিলেন সেই ভাগ্যবানদের একজন। তাঁহার তিনটি কন্যারত্ন ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনজনকেই বিলাতে পাঠাইয়া শিক্ষার উচ্চতম শিখরে পৌছাইয়া দিবেন। অন্যান্য পাঁচজন বড় লোকের মত তাঁহারও বিশ্বাস ছিল, বিলাতে গিয়া পড়াশুনা করিলে মানুষ একটা বিশেষ কিছু হইয়া দাঁড়ায়, ওখানকার জলবায়ুতে মানুষের বুদ্ধি যেন খুলিয়া যায়। কিন্তু তাঁহার এই মনস্কামনার এক-তৃতীয়াংশের বেশি পূর্ণ হয় নাই। মালতী ইংলণ্ডে থাকিতেই তিনি বাতব্যাধিতে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। এখন অতি কষ্টে দুইজন লোককে ধরিয়া চলাফেরা করেন। কিন্তু কথা বলা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কথা বলিতে না পারায় রোজগারও বন্ধ। যাহা কিছু রোজগার ছিল তাহা মুখের কথার জোরেই হইত। কিছু সঞ্চয় করার স্বভাব তাঁহার ছিল না। যেমন অনিয়মিত আয় ছিল, ব্যয়ও তেমনই বেহিসাবি হইত। সেজন্য এই কয়েক বৎসর বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিলেন। সমস্ত দায়িত্ব মালতীর উপরেই আসিয়া পড়িল। মালতীর চার পাঁচ শ টাকায় অত ভোগবিলাস আর ঐ ঠাট কখনও বজায় থাকে? কোনও মতে ছোট দুই মেয়ের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হইত, আর জীবনযাত্রা সাধারণভাবে চলিত। মালতী ভোর হইতে এক প্রহর রাত পর্যন্ত ছুটাছুটি করিত। সে চাহিত, বাবা এখন সাত্ত্বিক ভাবে চলেন, কিন্তু শরাব আর কাবাবের চাকায় বাবা এতই জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে কোনও উপায়েই ছাড়া পাইলেন না; আর কোথাও যখন টাকা জুটিত না তখন এক মহাজনকে

বাংলোখানার উপর হুণ্ডি লিখিয়া দিয়া দুই এক হাজার টাকা ধার করিতেন। মহাজন পুরানো বন্ধু, তাঁহার দৌলতে একদিন লাখ লাখ টাকা কামাইয়াছে, তাই বন্ধুত্বের খাতিরে কিছু বলিত না। অল্পে অল্পে উহার পাওনা পঁচিশ হাজারে উঠিয়াছে। যেদিন খুসি ডিক্রী জারি করিতে পারে, কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে চুপ করিয়া থাকে। আত্মসুখী লোকের কেমন এক নির্লজ্জতা থাকে, কাউলেরও তাহা আছে। ডিক্রী করিলে করুক, তিনি বেপরোয়া। মালতী অপব্যয়ের জন্য বাবাকে শাসন করিত, কিন্তু তাহাদের মা ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবতী, তিনি ভাবিতেন পতিসেবাই নারীজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তিনি মালতীকে বুঝাইতেন। এইজন্য গৃহকলহ হইতে পারে নাই।

সন্ধ্যা হইয়াছে, তবু এখনও গরম হাওয়া চলিতেছে। আকাশ মেঘলা। মালতী আর তাহার বোন দুইটি বাংলোর সম্মুখে ঘাসের উপর বসিয়া আছে। জল না পাইয়া দুর্বাগুলি জ্বলিয়া গিয়াছে, আর নীচের মাটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

মালতী বলিল, মালী কি একদম জল দেয় না ?

মেজ বোন সরোজ বলিল, শূয়ার খালি পড়ে পড়ে ঘুমোয়, কিছু বলতে যাও তো নানারকম বায়না তুলবে।

সরোজ বি. এ. পড়ে। লম্বা ছিপছিপে রোগা চেহারা, মুখের ভাব কাঠখোট্টা, শুকনো। কাহারও কাজ তাহার পছন্দ হয় না, রাতদিন দোষ ধরিয়া বেড়ায়। ডাক্তার বলিয়াছিল, উহাকে পরিশ্রম করিতে দিবেন না, পাহাড়ে পাঠাইয়া দিন, কিন্তু সংসারের অবস্থা সচ্ছল নহে বলিয়া তাহা সম্ভব হয় নাই।

সকলের ছোট বোন বরদার তো হিংসাই হইত—বাড়িশুদ্ধ সকলে কেমন সরোজের মন রাখিতে ব্যস্ত; যে রোগে এমন আদর পাওয়া যায়, তাহা উহার হয় না কেন ? ও ছিল গৌরবর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, চঞ্চল আর গর্বিত স্বভাবের, চোখে মুখে প্রতিভার জৌলুস ঝলক মারে। সরোজ ভিন্ন সংসারের আর সকলকেই ও ভালবাসিত। সরোজের কথার প্রতিবাদ করা উহার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। বরদা বলিল, তা বাবা দিনভর ওকে বাজারে পাঠাচ্ছেন, ওর ফুরসৎ কই ? মরতে সময় পায় না তা পড়ে পড়ে ঘুমোবে !

সরোজ ধমক দিয়া বলিল, ওকে আবার বাবা কবে বাজারে পাঠান রে ! মিথ্যাবাদী কোথাকার !

পাঠান বই কি, রোজ পাঠান। এই তো আজই পাঠিয়েছিলেন। ডেকে জিজ্ঞাসা কোরব ?

হাঁ, এখুনি ডাক, জিজ্ঞাসা করি ওকে।

মালতীর ভয় হইল। দুইজনে গম্ভীর হইয়া থাকিলে টেঁকা দায় হইবে। কথা বদলাইবার জন্য সে বলিল, আচ্ছা, সে হবে এখন। সরোজ, আজ ডক্টর মেহতা তোমাদের ওখানে বক্তৃতা দিলেন বুঝি ?

নাক সিটকাইয়া সরোজ বলিল, হাঁ, বক্তৃতা হয়েছিল ; তবে কারও ভালো লাগে নাই। উনি বলতে শুরু করলেন, সংসারে স্ত্রী আর পুরুষের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক। মেয়েরা যে পুরুষের ভূমিতে এসে দাঁড়াচ্ছে, এটা হল এ যুগের কলঙ্ক। মেয়েরা সব হাততালি দিতে শিষ দিতে আরম্ভ করে দিল, বেচারা লজ্জায় লাল হয়ে বসে পড়লেন। লোকটি একটু মজার ; এমন কথাও বলে ফেললেন যে প্রেম কেবল কবির কল্পনা, বাস্তব জীবনে প্রেমের কোনও পরিচয়ই মেলে না। লেডী হুক্ক ওঁকে নিয়ে খুব মজা কোরলেন।

মালতী কটাক্ষ করিয়া বলিল, লেডী হুক্ক ? উনি এর মধ্যে কথা বলেন কি সাহসে ? তোমাদের কিন্তু ওঁর বক্তৃতাটা শেষ পর্যন্ত শোনা উচিত ছিল। উনি মেয়েদের কি ভাবলেন বল তো ?

পুরোটা শুনবার সবুর সইল কার ? উনি তো যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছিলেন।

তা হোক, তবু তোমরা তো ওঁকে ডেকে এনেছিলে। তাছাড়া ওঁর তো মেয়েদের সঙ্গে কোনও শত্রুতা নাই। আমরা যা সত্য বলে জানি তাই তো প্রচার করি। মেয়েদের খুসি করার জন্য কথা বলার পাত্র উনি নন, সে কথা ঠিক, তবে মেয়েরা যে পথে চলেছে তাই যে ঠিক সে কথাই বা কে বলতে পারে ? সম্ভবত আর কিছুদিন পরে আমাদেরও মত বদলাতে হবে।

ফ্রান্স, জার্মানি আর ইটালির মেয়েদের জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা বোনেদের কাছে বলিয়া মালতী বলিল, ডাঃ মেহতা তো শীগগির উইমেনস লীগের কাছে বক্তৃতা দেবেন।

সরোজের কুতূহল হইল।

সে বলিল, কিন্তু তুমিও তো চাও যে মেয়েরা পুরুষের সমান অধিকার পায় ?

তা অবশ্য চাই, কিন্তু অপর পক্ষ কি বলে তাও তো শুনতে হবে। আমাদের ভুল হোচ্ছে, এমনও হোতে পারে।

এই লীগটি এক নূতন প্রতিষ্ঠান, মালতীর উদ্যোগেই এই শহরে লীগ খোলা হইয়াছে। শহরের সব শিক্ষিত মহিলাই ইহার সভ্য। মেহতার প্রথম বক্তৃতায় মেয়েদের মধ্যে খুব সাড়া পড়িয়াছে, আর উহারা ঠিক করিয়াছে যে উহার খুব জুতসই জবাব দিতে হইবে। জবাব লিখিবার ভার পড়িয়াছে মালতীর উপর। কয়েকদিন যাবৎ মালতী নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তি প্রমাণ খুঁজিতেছে। আরো কয়েকটি মেয়ে নিজের নিজের ভাষণ লিখিবে। যেদিন সন্ধ্যাবেলায় লীগের আসরে মেহতা উপস্থিত হইল, সেদিন কি উৎসাহ লোকের—হলটি ফাটিয়া পড়ে যেন। মেহতারও গর্ব হইল—উহার বক্তৃতা শুনিতে ইহাদের এত উৎসাহ। আর ইহাদের উৎসাহ কেবল চোখে মুখে ফুটিয়া ওঠে নাই—মেয়েরা প্রত্যেকে গহনা জরি বেনারসীতে কি চমৎকার সাজিয়া আসিয়াছে, মনে হইতেছে বুঝি কোন বিবাহসভা। মেহতাকে পরাস্ত করিবার জন্য ইহা .. সমগ্র শক্তি ব্যয় করিয়াছে। কে না বলিবে জাঁকজমক শক্তিকে বাড়াইয়া তোলে? মালতী তো আজকের জন্য নূতন ফ্যাশানের রেশমী শাড়ী, নূতন ছাঁটের ব্লাউস পরিয়াছে, আর ফুলের মালায়, প্রসাধন নৈপুণ্যে চমৎকার সাজে সাজিয়াছে; ঠিক যেন বিবাহের কনে। উইমেনস লীগে এমন সমারোহ আর কখনও দেখা যায় নাই। ডাঃ মেহতা তো একলা—তবু মহিলাদের বুক কাঁপিতেছে। সত্যের স্ফুলিঙ্গমাত্র অসত্যের পাহাড়কে ভস্ম করিয়া ফেলিতে পারে।

সকলের পিছনের সোফায় মির্জা, খান্না আর সম্পাদক মহাশয়ও ছিলেন। রায়সাহেব আসিলেন বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পরে, তাই পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিলেন।

মির্জা বলিল, আসুন, বসবেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?

রায়সাহেব বলিলেন, বেশ আছি ভাই, ওখানে আমার নিশ্বাস আটকে যাবে।

তাহলে আমি উঠে দাঁড়াই, আপনি বসুন।

রায়সাহেব তাহার কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, না না, কিছু দরকার নেই, আপনি বসে থাকুন। আমার যদি ক্লান্ত লাগে তবে আপনাকে উঠিয়ে দিয়ে

নিজে বসে পড়বো। আচ্ছা! মিস মালতী সভানেত্রী হয়েছে! এবার খান্না সাহেব, আমাদের কিছু বকশিশ দিন।

খান্নাসাহেব কাঁদো কাঁদো ভাবে বলিল, এখন মিঃ মেহতার ওপরই মালতীর নজর, আমি তো পড়ে গেছি।

ইতিমধ্যে মিঃ মেহতার বক্তৃতা আরম্ভ হইল।

দেবিগণ, আমার এই সম্বোধনে আপনাদের খটকা লাগবার কোন কারণ নাই। আপনারা সত্যি এ সম্মানের অধিকারী। কিন্তু কখনো কি শুনেছেন কোন মহিলা পুরুষকে সম্বোধন করতে 'দেবতা' শব্দ ব্যবহার করেছে? আপনারা যদি কাউকে দেবতা বলেন, সে মনে কোরবে আপনারাই তাকে দেবতা বানাচ্ছেন। দান করার মত দয়া, শ্রদ্ধা, ত্যাগ এসব আপনাদেরই জন্মগত গুণ। পুরুষের কি আছে যে সে দান করবে? পুরুষ দেয় না, দেওতা নয়—লেওতা, নেয়। তারা অধিকারের জন্য কলহ করে, যুদ্ধ করে, হিংসায় উন্মত্ত হয়……

প্রবল করতালি হইল। রায়সাহেব বলিলেন, মেয়েদের খুসি করার কেমন কৌশল বের করেছে।

এ মন্তব্য 'বিজলী'র সম্পাদকের ভাল লাগিল না, বলিল, এ আর এমন নতুন কথা কি ? আমি তো কতবার এ কথা কাগজে লিখেছি।

মেহতা বলিয়া চলিল, এজন্যই যখন আমি দেখি, আমাদের উন্নতমনা দেবিগণ ঐ দয়া, প্রেম, প্রীতি শ্রদ্ধার জীবনে অসন্তুষ্ট হয়ে হিংসা, কলহ ও সংগ্রামের জীবনের দিকে ছুটতে চান আর মনে করেন ওখানেই সুখের স্বর্গ, তখন আমি আনন্দে তাঁদের অভিবাদন করতে পারি না।

মিসেস খান্না সগর্ব দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিল, মালতী মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

খুরশেদ বলিল, এখন কি বলেন? মেহতা খাঁটি লোক, ওর সাহসও আছে। মুখের ওপর খাঁটি কথাটা বলে দিতে পারে।

বিজলী-সম্পাদক নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, আর সেদিন নেই। যখন মেয়েদের এ রকম ধোঁকা দেওয়া যেত, যখন ওদের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে বলা হোত, তোমরা দেবী, তোমরা লক্ষ্মী, তোমরা মায়ের প্রতিমা।

মেহতা বলিয়া চলিল, পুরুষকে স্ত্রীর বেশে দেখলে, স্ত্রীলোকের কাজ

করতে দেখলে আমার যে রকম দুঃখ হয়, ঠিক সে রকম দুঃখই হয় যখন দেখি মেয়েরা পুরুষের কাজে রত হয়ে নিজেদের মেয়েলি ভাব হারিয়ে ফেলেছে। আমার তো মনে হয় ঐ শ্রেণীর পুরুষদের আপনারা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র মনে করেন না। আর আমি আপনাদের বলতে পারি, পুরুষও ঐ রকম মেয়েকে শ্রদ্ধা করতে, বিশ্বাস করতে বা ভালবাসতে পারে না।

খান্না মুখে আহ্লাদের রেখা ফুটিয়া উঠিল।

রায়সাহেব টুকিলেন, আপনাকে যে বড়ই খুসি দেখছি!

খান্না বলিল, মালতীর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, এখন কি বল?

মেহতার বক্তৃতা চলিতেছে—জীবনের বিকাশক্ষেত্রে আমি পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান শ্রেষ্ঠ মনে করি—যেমন সংগ্রাম, কলহ, দ্বেষ, হিংসার চেয়ে প্রেম প্রীতি, শ্রদ্ধা আর ত্যাগ বড়। আমাদের দেবীরা যদি সৃষ্টি আর পালনের দেবমন্দির থেকে হিংসাদ্বেষের দানবভূমিতে নেমে আসাই শ্রেয় মনে করেন, তবে আমাদের সমাজের কল্যাণ নাই। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পৌরুষের অভিমানে আমরা আমাদের দানবলীলাকেই অধিক মহত্ত্ব দিয়ে আসছি। আপনার ভাইয়ের স্বত্ব কেড়ে নিয়ে, রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে পুরুষ মনে করে জয়ী হল। যে মানবশিশু এই দেবীদের রক্তে সৃষ্ট হোল, বড় হয়ে উঠল, পুরুষ তাকেই একদিন বোমা আর মেশিনগানের কাছে বলি দিয়ে মনে করে, ঐ বুঝি জয়ের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু যখন দেখি আমাদের মায়েরাই কপালে চন্দনতিলক পরিয়ে মাথায় আশীষ দিয়ে সন্তানকে হিংসার রণভূমিতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তখন ভাবি, পুরুষ যে হানাহানি মারামারিকে সংসারের কল্যাণের কারণ মনে করে তাতে আর বিচিত্র কি? এজন্যেই না পুরুষের হিংসাবৃত্তি দিন দিন বেড়ে উঠে দানবের তাণ্ডবলীলায় সংসার ছেয়ে ফেলছে, দলে দলে জীবহত্যা করছে। সবুজ শ্যামল শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আর সমৃদ্ধ লোকালয়গুলিকে অরণ্য করে তুলছে। দেবিগণ, আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, এই দানবলীলার সঙ্গে সহযোগিতা করে আর সংগ্রাম অঙ্গনে নেমে এসে আপনারা সংসারের কি কল্যাণ সাধন করবেন? আমি আপনাদের কাছে মিনতি করি, বিনাশ করা যাদের ধর্ম তারা তাই নিয়ে থাক, আপনারা নিজেদের ধর্ম পালন করুন।

খান্না বলিল, মালতী তো ঘাড় ওঠাতে পারছে না।

রায়সাহেব সমর্থন করিয়া বলিলেন, মেহতা যা বলছে তা যথার্থ সত্য।

বিজলী-সম্পাদক বিরক্ত হইয়া বলিল, তা হোক, কিন্তু একটাও নতুন কথা নয়। নারী আন্দোলনের বিরোধীরা এসব যুক্তিই সর্বদা প্রয়োগ করে। আর আমি এটাও মানতে রাজী নই যে ত্যাগে আর প্রেমে সংসারের খুব একটা শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। সংসারে উন্নতি করতে হোলে চাই পৌরুষ, বুদ্ধি, বল, পরাক্রম আর তেজ।

খুরশেদ বলিল, আচ্ছা, নিজের কথাই গেয়ে যাবেন, না আমাদের শুনতে দেবেন ?

মেহতার বক্তৃতা চলিল—দেবিগণ, যারা বলে স্ত্রী পুরুষের সমান শক্তি, সমান প্রবৃত্তি, কোনও পার্থক্য নেই, আমি তাদের দলে নই। এর চাইতে ভয়ঙ্কর মিথ্যা আমি কল্পনাও কোরতে পারি না। এক টুকরো মেঘ যেমন সূর্যকে ঢেকে দেয় এ সেই রকম অসত্য, যা ক্ষুদ্র হোলেও যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অনুভবকে বুদ্ধির আড়াল করে দেয়। আমি আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি, ঐ ফাঁদে পা দেবেন না। আলো যেমন অন্ধকারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নারীও ঠিক তেমনই পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ক্ষমা, দয়া, ত্যাগ আর অহিংসা মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। নারী এই আদর্শ লাভ করেছে। ধর্ম, অধ্যাত্মজ্ঞান, আর ঋষিতুল্য সাধুদের সাহচর্যলাভ—এসব দিয়ে পুরুষ ঐ লক্ষ্যে পৌছাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনও সফল হয়নি। আমি বলি, পুরুষের সকল যোগ তপ একদিকে, আর নারীর ত্যাগ একদিকে।

খুব হাততালি পড়িল। মহা উত্তেজনা দেখা দিল। রায়সাহেব একেবারে গদগদ হইয়া বলিলেন, মেহতা ঠিক এদের মনের কথাটা বলেছ।

ওঙ্কারনাথ ভাষ্য করিল, কিন্তু সব কথাই পুরানো, পচা। যে মাসে হাজার টাকা নিজের বাবুগিরিতে ওড়ায় তার আবার আত্মবিশ্বাস ! এ কেবল পুরানো ধরণে মেয়ে আর পুরুষকে প্রসন্ন রাখার কৌশল।

খান্না মালতীর দিকে চাহিয়া বলিল, খুব ফুলে উঠছে মালতী, কিন্তু ওর যে লজ্জা হওয়ার কথা।

খুরশেদ খান্নাকে উসকাইয়া দিল, এখন তুমিও একটা কায়দা কর, নইলে মেহতা তোমাকে হারিয়ে দেবে। এখনই তো অর্ধেক জয় ও করে ফেলেছে, আধা ময়দান ও পার হয়ে এসেছে।

খান্না শিষ দিয়া বলিল, আমাকে ও কথা বল না, আমি ওরকম বহু পাখী ফাঁদে ফেলে ফের উড়িয়ে দিয়েছি।

রায়সাহেব খুরশেদের দিকে চোখ ঠারিয়া বলিলেন, আপনি যে আজকাল হামেশাই মহিলা সমাজের দিকে যাতায়াত করছেন, সত্যি বলুন তো কত টাকা চাঁদা দিলেন ?

খান্নার মুখ বিরক্তিতে ছাইয়া গেল ; আমি এসব সমিতিতে চাঁদা দিই না, শিল্পকলার নামে যত সব অপকর্ম করে !

এদিকে মেহতার বক্তৃতা চলিয়াছে—জগতের বড় বড় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সব পুরুষ ; যত মহাত্মা জন্মেছেন, সবাই পুরুষ ; নামকরা যোদ্ধা, রাজনীতি-নিপুণ নেতা, বিচক্ষণ নাবিক, বড় লোক, সকলেই পুরুষ ; কিন্তু এই সকল একত্র করলেই বা কি হয় ? এই সব মহাপুরুষ আর ধর্মপ্রবর্তক, এঁরাও কি সংসারে রক্তের নদী বইয়ে দিয়ে নৈরাশ্যের দিকে নিয়ে যান নাই ? ভাইয়ের গলায় ছুরি বসানো ছাড়া আর কোন বড় কাজ করেছেন বড় বড় যোদ্ধারা ? রাজনীতিবিদের পরিচয় তো রয়েছে কেবল লুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের গায়ে। আর আবিষ্কারকেরা কি করেছেন—মানুষকে মেশিনের গোলাম তৈরি করেছেন, এই তো ? পুরুষের রচনা এই যে সংস্কৃতি, এর মধ্যে শান্তি কোথায় বলুন, সহযোগিতা কোথায় ?

উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ওঙ্কারনাথ বলিল, বিলাসীদের মুখে এসব বড় বড় কথা শুনলে আমার গা জ্বলে পুড়ে যায়।

খুরশেদ তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল ; আপনি, সম্পাদক মশাই, বড় বেরসিক। আজকাল দুনিয়ার নিয়মই হোল, যার যা খুসি বকে যাবে। শুনবার আর হাততালি দেওয়ার লোকেরও অভাব হয় না। কাহিনী শেষ হয়েছে, এবার চলুন। এরকম প্রগল্‌ভ মেহতা কত আসবে যাবে, কিন্তু দুনিয়া ঠিক নিজের তালে চলবে। এতে আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন ?

আমি মিথ্যা কথা শুনে সইতে পারি না।

রায়সাহেব আর এক মাত্রা চড়াইলেন, বলিলেন, কুলটার মুখে সতীর মত কথা শুনলে কার না গা জ্বালা করে ?

ওঙ্কারনাথ আবার বসিল। মেহতার বক্তৃতা চলিতে লাগিল—বাজপাখীকে শিকার কোরতে দেখে হাঁসের কি প্রবৃত্তি হবে যে মানস সরোবরের শান্তি ছেড়ে

এসে পাখী শিকারে লেগে যায়? আর যদি তাই হয়, তাকে কি আপনারা প্রশংসা কোরবেন? হাঁসের ঠোঁট তেমন ধারালো নয়, চোখে তেমন তেজ নাই, নখে তেমন ধার নাই, পাখায় তেমন জোর নাই, ওর তেমন রক্তের পিপাসাও নাই। এসব অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টায় ও যদি উঠে পড়ে লাগে তবু কি বাজের সমান হতে পারবে? কিন্তু একটা কথা ঠিক, বাজ হওয়ার চেষ্টায় ও হাঁস আর থাকবে না, সেই হাঁস যার কাজ হোল মুক্তো বাছা।

খুরশেদ ভাষ্য করিল, এতো কবিত্বের কথা। পুরুষ বাজ যেমন শিকার করে, মাদি বাজও তেমনই শিকার করে।

ওঙ্কারনাথ খুসি হইয়া বলিল, এই তর্কের জোরেই আপনি ফিলসফার প্রতিপন্ন হোচ্ছেন।

খান্না এবার অন্তরের ঝাল ঝাড়িয়া দিল—ফিলসফার তো কত, ফিলসফারের পিণ্ডি। তাকেই ফিলসফার বলে যে……

ওঙ্কারনাথ বাকিটা পূরণ করিয়া দিল, যে জীবনে সত্যপথ থেকে টলে না। এই পাদপূরণ খান্নার পছন্দ হইল না, সে বলিল, আমি সত্য-টত্য বুঝি না, আমি তাকেই ফিলসফার বলি যে সত্যিকারের ফিলসফার।

খুরশেদ ফোড়ন দিল, শোভান আল্লা, আপনি যে ফিলসফারদের খুব তারিফ কোরছেন। বাঃ! সে-ই ফিলসফার যে ফিলসফার। কেনই বা নয়?

মেহতা বলিয়া চলিয়াছে—আমি এ কথা বলি না যে মেয়েদের বিদ্যার দরকার নাই, বরং পুরুষের চেয়ে বেশি দরকার আছে। মেয়েদের শক্তির প্রয়োজন নাই, এমন কথা আমি কখনও বলি না; প্রয়োজন তো আছেই, বরং বেশি আছে। কিন্তু সে বিদ্যা সে শক্তি চাই না, যাতে পুরুষেরা সংসারকে বানিয়েছে হিংসার লীলাক্ষেত্র। আপনারা যদি ঐ বিদ্যা আর ঐ শক্তিরই সাধনা করেন, তবে সংসার মরুভূমি হয়ে যাবে। ধ্বংস আর হিংসার পথে আপনাদের বিদ্যা ও অধিকার নয়, সৃষ্টি আর পালনের পথে আপনাদের বিদ্যা, ঐখানেই আপনাদের অধিকার। আপনারা কি মনে করেন, ভোটের জোরে মানবজাতির উদ্ধার হবে, না আদালত কাউনসিলে কলম পিষে মুখ ছুটিয়ে দেশের উপকার হবে? এই কৃত্রিম, নকল, সর্বনাশা অধিকার পাবার জন্য কি আপনারা সেই পরম অধিকার ছাড়তে চান, যা প্রকৃতি আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছেন?

সরোজ এতক্ষণ দিদির কথায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এই কথার পর আর পারিল না। জোরে বলিয়া উঠিল, আমরা পুরুষের সমান ভোট চাই।

আরও কয়েকটি যুবতী চিৎকার করিল, ভোট, ভোট!

ওঙ্কারনাথ উঠিয়া জোর গলায় বলিল, নারীজাতির বিরোধীদের পাগড়ি নীচু হোক, মাথা হেঁট হোক।

মালতী টেবিল চাপড়াইয়া বলিল, সকলে শান্ত হোন, পক্ষে বা বিপক্ষে যিনি যা বলতে চান তাঁকে পূরো সময় দেওয়া হবে বলতে।

মেহতা বলিল, ভোটপ্রথা নূতন যুগের মায়াজাল, কলঙ্ক, এটা মরীচিকা, এর মধ্যে আছে ফাঁকি; এর মায়াচক্রে পড়ে আপনারা না পারেন এদিকে যেতে, না পারেন ওদিকে যেতে। কে বলে আপনাদের কর্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ? কে বলে আপনাদের সেখানে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ নাই? আমরা সকলে আগে মানুষ, তবে অন্য কিছু। এই জীবন আমাদের আবাস। এখানেই আমাদের সৃষ্টি, এখানেই স্থিতি, এখানেই সকল কাজকর্ম। এ ক্ষেত্র যদি পরিমিত হয়, তবে অপরিমিত ক্ষেত্র কোথায় পাব? পরস্পরে পরামর্শ করে যেখানে চুরি চলে, সেই বৃহত্তর সংসারকে কি সংঘর্ষের স্থান বলব? যে কারখানায় মানুষ আর মানুষের ভাগ্য রচিত হোচ্ছে, সেই কারখানা ছেড়ে আপনারা যেতে চান এমন জায়গায় যেখানে লোক পিষে যাচ্ছে, যেখানে মানুষের মুখে রক্ত উঠে আসে।

মির্জা বলিল, পুরুষের জুলুমই তো ওদের মধ্যে এই বিদ্রোহের ভাব এনে দিয়েছে।

মেহতা বলিল, নিশ্চয়ই, পুরুষের অন্যায় তো ষোল আনা। কিন্তু এটা তো তার উত্তর নয়। অন্যায় দূর করুন, কিন্তু নিজেকে দূর করে নয়।

মালতী বলিল, মেয়েরা অধিকার চায় যাতে তারা ন্যায্য অধিকারের উপযুক্ত ব্যবহার কোরতে পারে, আর পুরুষ যদি সুযোগের অপব্যবহার করে তাহলে তাকে তারা যাতে নিবৃত্ত কোরতে পারে।

উত্তরে মেহতা বলিল, সংসারে সব চেয়ে বড় অধিকার পাওয়া যায় ত্যাগে আর সেবায়। সে অধিকার আপনারা পেয়ে গিয়েছেন। এই অধিকারের কাছে ভোট তো সামান্য কথা। আমার দুঃখ হয় যে, আমার বোনেরা পশ্চিমের আদর্শকেই শ্রেয় বলে মেনে নিয়েছেন—যেখানে মেয়েরা আপনাদের পদমর্যাদা

খুইয়ে ফেলেছেন, ভর্ত্রীর মহিমময় পদবী থেকে নেমে এসে হয়েছেন বিলাসের বস্তু। পশ্চিমের স্ত্রী স্বাচ্ছন্দ্য চায় যাতে দিন দিন অধিকতর বিলাসের উপকরণ জোটে। বিলাসিতা কখনও আমাদের জননীদের আদর্শ ছিল না, সেবার আদর্শ ছিল বলেই তাঁরা সারা সংসারের উপর কর্তৃত্ব করতে পেরেছেন। পশ্চিমের যা ভালো তা অবশ্য নিয়ে নিন। সংস্কৃতির আদানপ্রদান চিরকাল হয়ে আসছে, কিন্তু অন্ধ অনুকরণ মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ। পশ্চিমের নারী আজ গৃহিণী হোতে চায় না। ভোগের অপরিমিত লালসা ওদের উচ্ছৃঙ্খল করে তুলেছে। লজ্জা আর গাম্ভীর্য, যা নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ, তাকে আজ ওরা চঞ্চলতা আর আমোদপ্রমোদের কাছে আহুতি দিচ্ছে। যখন দেখি, আমাদের শিক্ষিত মেয়েরা নিজের রূপকে, সুডোল বাহুযুগলকে, নিজের নগ্নতাকে জাহির কোরে মনে করে খুব সুন্দর সাজ হয়েছে, তখন তাদের ওপর আমার দয়াই হয়। লালসা ওদের এমন অন্ধ করে দিয়েছে যে নিজেদের লজ্জা, শালীনতা ওরা রক্ষা করতে জানে না। মেয়েদের এর চেয়ে অধোগতি আর কি হোতে পারে ?

রায়সাহেব হাততালি দিলেন। এমন জোর হাততালি পড়িল যেন পটকাবাজি পুড়িতেছে।

মির্জা সাহেব সম্পাদক মহাশয়কে বলিল, এর জবাব তো আপনিও দিতে পারছেন না ?

বিরক্ত ভাবে সম্পাদক বলিল, সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে এই একটা কথা এ ঠিক বলেছে।

তবে তো আপনিও মেহতার দলেই হয়ে গেলেন।

আজ্ঞে, না ; আমার মত লোক কারো প্রতিধ্বনি করে না। এর জবাব আমি খুঁজে বার করবো, বিজলী মারফৎ দেখবেন।

ও, তবে দেখছি, আপনারা আসল জিনিস খোঁজেন না, কেবল নিজের পক্ষের হয়ে লড়তে চান।

রায়সাহেব এক হাত নিয়া নিলেন, এর পরও আপনি সত্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলে অভিমান করেন !

সম্পাদক মহাশয় অবিচলিত—উকিলের কাজ মক্কেলের ভালো দেখা, সত্য মিথ্যা দেখলে তার চলে না।

তা হলে বলুন, আপনি মেয়েদের উকিল।

আমি তাদেরই ওকালতি করি যারা দুর্বল, অসহায়, রুগ্ন।

বড় বেহায়া তুমি, বন্ধু!

মেহতাজী বলিতেছিল—আর, এটাও পুরুষের ষড়যন্ত্র। দেবীদের উঁচু চূড়োর থেকে নামিয়ে নিজেদের সমান করার জন্য তারাই ষড়যন্ত্র করে, যারা ভীরু কাপুরুষ, বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব বহন করার শক্তি যাদের নেই, অবাধ কাম-ক্রীড়ার তরঙ্গে ভেসে যারা যাঁড়ের মত অন্যের শ্যামল সুন্দর ক্ষেতে ঢুঁ মেরে নিজের ভোগলালসা তৃপ্ত করতে চায়। পশ্চিমে এদের ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে; তাই মেয়েরা সেখানে হয়েছে প্রজাপতি। আমার বলতে লজ্জা হয় যে এই ত্যাগ আর তপস্যার ভূমি আমাদের ভারতবর্ষের মেয়েদের ওপরও ঐ হাওয়া খানিকটা বইতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ করে আমার শিক্ষিত বোনেদের ওপর ঐ মায়াজাল বড় বেশি রকম ছেয়ে যাচ্ছে। তারা আজ গৃহিণীর আদর্শ ত্যাগ করে রঙ্গীন প্রজাপতির ধর্ম গ্রহণ করছে।

সরোজ উত্তেজিত হইয়া বলিল, আমরা পুরুষের উপদেশ চাই না। পুরুষের যদি নিজের বিষয়ে স্বাধীনতা থাকে, মেয়েদেরও নিজেদের বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য আছে। মেয়েরা এখন বিয়ে করাটাকে পেশা মনে করতে নারাজ। যাকে ভালবাসবে কেবলমাত্র তাকেই ওরা বিয়ে করবে।

খুব জোর হাততালি পড়িল, বিশেষ সম্মুখের সারিগুলি হইতে, যেখানে মেয়েরা ছিল।

মেহতা জবাব দিল, তোমরা যাকে প্রেম বল তা কেবল ফাঁকি, তা শুধু উদ্দীপ্ত লালসার বিকৃত রূপ, যেমন আজকাল ভিক্ষা চাইবার জন্য লোকে সন্ন্যাসের ভেক নিচ্ছে। বৈবাহিক জীবনে এ প্রেম যদি কম থাকে, মুক্ত বিলাসে তো মোটেই নাই। সত্যিকার আনন্দ, সত্যিকার শান্তি আছে কেবল সেবাব্রতের মধ্যে; সেখানেই অধিকারের স্রোত, সেখানেই শক্তির উৎপত্তি। সেবাই হল সেই সিমেণ্ট, যা দম্পতিকে আজীবন স্নেহ ও সাহচর্যে একত্র জোড়া দিয়ে রাখতে পারে, বড় বড় আঘাতেও যাতে তাদের ওপর দাগ না পড়ে। সেবার যেখানে অভাব, সেখানেই বিবাহবিচ্ছেদ, সেখানেই পরিত্যাগ, সেখানেই অবিশ্বাস। পুরুষের জীবন-নৌকোয় কর্ণধার হবার কাজ আপনাদের—আপনারা চাইলে নৌকো ঝড় তুফানের মধ্যে দিয়ে পার করে দিতে পারেন আর আপনারা অসাবধান হলে নৌকো ডুববে, সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও ডুবে যাবেন।

বক্তৃতা শেষ হইল। বিষয়টি বিতণ্ডামূলক, কয়েকটি মেয়ে প্রতিবাদ করার অনুমতি চাহিল। কিন্তু অনেক দেরি হইয়া গিয়াছিল, সেজন্য বক্তাকে ধন্যবাদ দিয়া মালতী সভা বন্ধ করিল, তবে ঘোষণা করিল যে আগামী রবিবার কয়েকটি মেয়ে এ বিষয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিবে।

রায়সাহেব মেহতাকে খুব সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন, আপনি আমার মনের কথাটা বলেছেন, এর প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত।

মালতী হাসিল, আপনি কেন সুখ্যাতি করবেন না, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই যে, কিন্তু এত সব উপদেশ বেচারা মেয়েদের ওপর কেন চাপানো, এই সব আদর্শ, ত্যাগ, মর্যাদার ভারে মেয়েদের দুর্বল মাথা যে নুয়ে ভেঙ্গে পড়বে।

মেহতা বলিল, এইজন্য যে, তারা কথাটা বুঝবে।

খান্না তাহার বড় বড় চোখের দৃষ্টি মেলিয়া যেন মালতীর মনের কথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ডাক্তার সাহেবের এ বিচার আমার তো মনে হয় একশ বছরের পুরানো কথা।

মালতী কটু কণ্ঠে বলিল, কোন সিদ্ধান্তের কথা বলছেন ?

এই সেবা, ত্যাগ, এসব কর্তব্যের কথা।

ও, এসব বুঝি আপনার খুব পুরানো মনে হয় ? তা অনুগ্রহ করে নতুন কিছু বলুন না ? দাম্পত্য জীবন কিসে সুখের হয়, তার কোন টাটকা নতুন পন্থা আপনার জানা আছে নাকি ?

খান্না পড়িল বিপদে—কথাটা বলিল মালতীকে খুসি করিবার জন্য, আর সে-ই উঠিল চটিয়া। বলিল, সে পন্থা তো মেহতার জানা আছে।

ডাক্তার সাহেব তো তাঁর কথা বলেই দিলেন, কিন্তু আপনি বলছেন ওসব মামুলি পুরানো কথা, কাজেই নতুন রাস্তা আপনাকেই বাতলাতে হবে। আপনি কি জানেন না যে, জগতে এমন কতকগুলি কথা আছে যা কখনো পুরানো হয় না ? সমাজে এ ধরণের সমস্যা হামেশাই ওঠে আর চিরদিনই উঠতে থাকবে।

মিসেস খান্না উঠিয়া বারান্দায় চলিয়া গিয়াছিল। মেহতা কাছে গিয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, আমার বক্তৃতা সম্বন্ধে আপনার রায় কি, বলুন।

মিসেস খান্না চোখ নীচু করিয়া বলিল, বেশ বলেছেন, খুব ভালো বক্তৃতা হয়েছে, তবে কিনা এখনো বিয়ে করেন নি—এখন পর্যন্ত মেয়েরা দেবী, শ্রেষ্ঠ,

কর্ণধার, সব কিছু। বিয়ে করুন, তারপর জিজ্ঞাসা করবো, এখন মেয়েরা কি। আর বিয়ে আপনাকে করতেই হবে, কেননা আপনি বলেছেনঃ যারা বিয়ে করাকে এড়িয়ে বেড়ায়, তারা কাপুরুষ।

মেহতা হাসিল, ওরই জন্যে তো জমিন তৈরি করে নিচ্ছি।

মিস মালতীর সঙ্গে মানাবেও বেশ।

তা হতে পারে, তবে এক শর্ত আছে, ওকে আপনার পায়ের কাছে বসে কিছুদিন ধরে নারীধর্ম কি শিখে নিতে হবে।

ও তো স্বার্থপর পুরুষের কথা। বলি, আপনি কি পুরুষের কর্তব্য শিখে নিয়েছেন?

এই তো ভাবছি, কার কাছে শিখি?

মিস্টার খান্না আপনাকে খুব ভাল করে শিখিয়ে দিতে পারেন।

মেহতা উচ্চ হাসিয়া বলিল, না, পুরুষের কর্তব্যও আমি আপনার কাছেই শিখব।

ভাল কথা, আমার কাছ থেকেই শিখুন। প্রথম কথা এই যে, ভুলে যান যে নারী শ্রেষ্ঠ, আর সমস্ত দেখাশোনার ভার তার ওপর; পুরুষই হল শ্রেষ্ঠ, তারই ওপর গৃহকর্মের সমস্ত ভার। নারীর মধ্যে কর্তব্য, সেবা, সংযম, ক্ষমা সব কিছু পুরুষই জাগিয়ে দিতে পারে; যদি পুরুষের মধ্যে এ সবের অভাব থাকে, তবে স্ত্রীর মধ্যেও সে অভাব থেকে যাবে। নারীদের এই যে আজকার বিদ্রোহ, এর কারণ হচ্ছে পুরুষের মধ্যে এসব গুণের অভাব।

মির্জা সাহেব আসিয়া মেহতাকে কোলের উপর উঠাইয়া লইয়া বলিল, সাবাস!

মেহতা জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া বলিল, আমার যুক্তি আপনার ভাল লেগেছে?

যুক্তি যেমনই হোক, খুব লাগসই হয়েছে। আপনি একেবার অসাধ্য সাধন করে নিয়েছেন। যে নাকি কোন দিন আপনার বক্তৃতার প্রশংসা করে নি, সেও আজ আপনার শিষ্য হয়ে উঠেছে।

মিসেস খান্না একটু মৃদুস্বরে বলিল, আগে নেশা কাটুক, তবে বলবেন।

মেহতা উদাসীন ভাবে বলিল, আমার মত বইয়ের পোকাকে কোন মেয়ে পছন্দ করবে? আমি যে পাক্কা আদর্শবাদী।

খান্নাকে মোটরের দিকে যাইতে দেখিয়া মিসেস খান্নাও ঐ দিকে চলিল। মির্জাও বাহিরে চলিয়া গেল। মেহতা মঞ্চের উপর হইতে ছড়িখানা লইয়া

বাহিরে আসিবে, এমন সময় মালতী আসিয়া সাগ্রহে উহার হাত ধরিয়া বলিল, আপনি এখন যেতে পাবেন না ; চলুন, আজ বাবার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব, আর ঐখানেই খেয়ে আসবেন।

মেহতা অস্বীকার করিয়া বলিল, না, না, আমাকে ক্ষমা করবেন। সরোজ আমাকে খেয়ে ফেলবে। ওসব মেয়েদের আমি বড় ডরাই।

আচ্ছা, আপনার ভয় নেই, আমি ভার নিচ্ছি, ও মুখই খুলতে পাবে না।

বেশ, আপনি যান, আমি একটু পরে আসছি।

না, তা হয় না। আমাদের গাড়ী নিয়ে সরোজ চলে গেছে। আমাকে পৌছোতে তো আপনার যেতেই হবে।

দুই জনে মেহতার গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী রওয়ানা হইল। একটু পরে মেহতা জিজ্ঞাসা করিল, আমি শুনেছি খান্না সাহেব তার স্ত্রীকে মারে। সেই থেকে আমার ওর ওপর বিতৃষ্ণা হয়ে গিয়েছে। যে এমন ধারা বর্বর তাকে আমি মানুষ মনে করি না। এদিকে দেখায় যেন মেয়েদের কতই হিতৈষী। তুমি ওকে কখনো বুঝিয়ে দেখেছ ?

মালতী উদ্বেগের স্বরে বলিল, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, এক হাতে তালি বাজে না।

আমি তো এমন কোন কারণ কল্পনাও করতে পারি না যার জন্যে লোকে নিজের স্ত্রীকে মারতে পারে।

যদি স্ত্রীর তেমন ধারা মুখ খারাপ হয় ?

হোক না, কত হবে ?

আপনি তবে আলাদা জাতের লোক।

আচ্ছা, স্বামী যদি বদ্ মেজাজের হয়, তাহলে তোমার মতে কি তাকে হাণ্টার দিয়ে চাবকাতে হবে ?

স্ত্রীর যতটা ক্ষমাগুণ থাকে, পুরুষের তা থাকতে পারে না। আপনি নিজেও তো আজ একথা স্বীকার করেছেন।

তাহলে মেয়েদের ক্ষমাশীলতার এই পুরস্কার ! আমার তো মনে হয়, তুমি খান্নার সঙ্গে মাথামাখি করে ওকে আরও আসকারা দিচ্ছ। তোমাকে ও যতটা ভালবাসে, ভক্তি করে, তার জোরে তুমি অনায়াসে ওকে সোজা করতে পার, কিন্তু ওর পক্ষ নিয়ে তুমি নিজেও ওর দোষের ভাগী হোচ্ছ।

মালতী উত্তেজিত হইয়া বলিল, তুমি এ সময়ে এ কথাটা অনর্থক তুলছো। আমি কারু মন্দ করতে চাই না, কিন্তু তুমি এখনও গোবিন্দী দেবীকে চেন না? তুমি ওঁর ভোলা-ভোলা, শান্ত ভাব দেখে ভাব উনি বুঝি দেবী। আমি ওঁকে অতখানি উঁচু জায়গা দিতে রাজী নই। আমার দুর্নাম রটাবার জন্য উনি যত চেষ্টা করেছেন, আমাকে যে রকম আঘাত দিয়েছেন, সব যদি বলে যাই তবে তুমি অবাক হয়ে যাবে, আর তোমাকেও মানতে হবে যে ও রকম মেয়ের এ রকম ব্যবহারই প্রাপ্য।

আচ্ছা, তোমার ওপর ওঁর এত বিদ্বেষের কোন কারণ নিশ্চয়ই আছে।

তা ওঁকেই জিজ্ঞাসা কোরো। অন্যের মনের খবর আমি কি করে জানবো।

তা ওঁকে না জিজ্ঞাসা করেও আন্দাজ করা যায়—যদি কোন পুরুষ আমার আর আমার স্ত্রীর মাঝখানে আসতে সাহস করে তবে আমি তো তাকে গুলি করে মারি, নইলে নিজের বুকেই গুলি চালাই। তেমনি আমি যদি আমার স্ত্রীর আর আমার মাঝে কোন মেয়েকে এনে ফেলি তবে আমার স্ত্রীও নিশ্চয় তার যা খুসি করতে পারবে। এ রকম ব্যাপারে আমি আপোষ মানতে রাজী নই। আর এ মনোবৃত্তি বিজ্ঞানসম্মত নয়, এটা আমরা অরণ্যবাসী পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি। আজকালকার দিনে কেউ কেউ হয়তো বলবে, এ রকম ব্যবহার অসভ্য, অসামাজিক। এ বিষয়ে আমি কোন নিয়মের তোয়াক্কা রাখি না, আমার ঘরে আমার নিজের নিয়মই খাটবে।

মালতী ঝাঁজের সঙ্গে প্রশ্ন করিল, কিন্তু আপনি কি করে ধরে নিচ্ছেন যে আপনার সূত্র অনুসারে আমি খান্না আর তার স্ত্রীর মাঝে এসে পড়তে চাচ্ছি? আপনার এ অনুমানে আমাকে অপমান করা হোচ্ছে। আমি খান্নাকে আমার জুতোর তলার সমানও মনে করি না।

অবিশ্বাসের সুরে মেহতা বলিল, মিস মালতী, এটা আপনার মনের কথা নয়; আপনি কি সারা দুনিয়ার লোককে বোকা ভাবেন নাকি? দুনিয়া শুদ্ধ লোক যা দেখছে, মিসেস খান্নাও যদি তা মনে করেন তবে তাঁকে দোষ দিই কি করে?

মালতী রাগিয়া উঠিল—দুনিয়ার লোক অন্যের নিন্দে কোরতে আমোদ পায়; এই তাদের স্বভাব। আমি তা কি করে বদলাব; কিন্তু এটা মিথ্যা কলঙ্ক। তবে হাঁ, আমি এতটা কর্কশ নই যে খান্না কাছে এলেই তাকে

গালাগাল কোরব। আমার কাজে সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, সকলকে বিনীত অভিবাদন করা—এগুলো নিছক দরকার। তাতে যদি কেউ অন্য অর্থ বার করে তবে সে—সে—

মালতীর গলার স্বর ভারি হইয়া আসিল, মুখ ফিরাইয়া রুমাল বাহির করিয়া সে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। দুই এক মিনিট বাদে সে বলিল, অন্য পাঁচ জনের মত তুমিও আমাকে···আমার এই দুঃখ···তোমার কাছ থেকে আমি এটা আশা করি নি।

তাহার পর হঠাৎ নিজের দুর্বলতার কথা মনে করিয়া তাহার খারাপ লাগিল। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আমাকে নিন্দা করার আপনার কোন অধিকার নাই। আপনিও যদি সেই সব পুরুষের দলে হন যারা স্ত্রী পুরুষ একসঙ্গে দেখলেই খারাপ না ভেবে থাকতে পারে না, তবে ফুর্তি করে তাই করুন। আমি এতটুকু গ্রাহ্য করি না; যদি কোন মেয়ে পাঁচ রকম বাহানা নিয়ে আপনার কাছে যাওয়া আসা করে, আপনাকে তার দেবতার মত মনে করে, প্রত্যেক কথায় আপনার পরামর্শ নিতে আসে, আপনার ইশারা পাওয়া মাত্র আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তৈরী থাকে, তা হলে আমি জোর করে বলে দিতে পারি, আপনি তাকে উপেক্ষা কোরবেন না। এ রকম মেয়েকে আপনি যদি ফিরিয়ে দেন তো আপনি মানুষ নন। এর বিরুদ্ধে আপনি যত যুক্তি প্রমাণ নিয়ে আসুন, আমি কিছুতেই মানবো না। আমি তো বলি, উপেক্ষা দূরে থাক, আপনি সে মেয়ের পাধোয়া জল খাবেন, আর অল্প দিনের মধ্যেই সে আপনার হৃদয়েশ্বরী হবে। আমি আপনার কাছে হাত জোড় কোরে বলছি, খান্নার নাম আমার সামনে মুখে আনবেন না।

এই আগুনে যেন হাত সেঁকিতে সেঁকিতে মেহতা বলিল—একটা সর্ত আছে, খান্নাকে যেন আপনার সঙ্গে না দেখি।

আমি মনুষ্যত্ব হারাতে পারি না। উনি যদি আসেন তবে আমি দূর দূর কোরব না।

ওঁকে বলবেন, ভদ্রলোকের মত স্ত্রীর সঙ্গে আস্নেন যেন।

আমি নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে কারো কথা বলা ঠিক মনে করি না। আমারও সে অধিকার নাই।

তাহলে আপনি কারো মুখ বন্ধ করতে পারবেন না।

ততক্ষণে মালতীদের বাংলো আসিয়া পড়িয়াছে। গাড়ী থামিল। মালতী গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল, আর নমস্কার না করিয়াই চলিয়া গেল। মেহতাকে খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, সে কথাও মনে রহিল না। ওর ইচ্ছা করিতেছিল, এক কোণে গিয়া বেশ খানিকটা কাঁদিয়া লয়। গোবিন্দী আগেও আঘাত করিয়াছিল ; কিন্তু আজ সে যে আঘাত করিল, তাহা বড়ই গভীর, বড়ই ব্যাপক, বড়ই মর্মভেদী।

## ১৬

রায়সাহেবের কাছে যখন খবর পৌছিল যে মহালে একটা ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, আর হরির কাছ থেকে গাঁয়ের পঞ্চায়েৎ জরিমানা উশুল করিয়া লইয়াছে, তখনই তিনি নোখেরামকে ডাকাইয়া জবাব তলব করিলেন—উঁহাকে কেন ইহার এত্তেলা দেওয়া হয় নাই। এমন নিমকহারাম ঠকের স্থান তাঁহার দরবারে নাই।

নোখেরাম এতখানি গালি খাইল, তাহার পর একটু গরম হইয়া বলিল, আমি তো আর একা ছিলাম না. শুধু, গাঁ-এর আর পাঁচজনও ছিল। আমি একা কি করতাম ?

রায়সাহেব তাহার ভুঁড়ির দিকে বর্শার মত শাণিত দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন—বোকো না হে! তোমার সে সময় বলা উচিত ছিল, যতক্ষণ সরকারে এত্তেলা না হয়, পঞ্চায়তের জরিমানা আমি দিতে দেব না। আমার আর আমার প্রজাদের মধ্যে কথা বলবার অধিকার পঞ্চায়েতের কি আছে ? এই বাঁধা-বাঁধি ছাড়া মহালে আর কি আমদানীর পথ আছে ? উশুলের টাকা তো গেল সরকারের ঘরে। বকেয়া প্রজারা দিল চেপে। তবে আমি যাই কোথায় ? তোমার মাথাটা খাব নাকি ? বছরে এই লাখ টাকা যে খরচ হয় তা আসে কোত্থেকে! দুঃখ এই যে দুই পুরুষ ধরে মাতব্বরগিরি করলেও আজ তোমাকে আমার এ কথা বোঝাতে হয়। হরির কাছ থেকে কত টাকা উশুল হল ?

নোখেরাম আমতা আমতা করিয়া কহিল—আশি টাকা।

নগদ ?

নগদ ওর কাছে কোথায় থাকবে হুজুর! কিছু ধান দিল, বাকিটার জন্য বাড়িখানা লিখে দিল।

রায়সাহেব স্বার্থ ছাড়িয়া হরির পক্ষ লইলেন—আচ্ছা, তাহলে নিজে আর বকধার্মিক পঞ্চায়েতে মিলে আমার এক মাতব্বর প্রজাকে উৎখাত করে দিলে! জিজ্ঞাসা করি, আমার এলাকায় আমাকে খবর না দিয়ে আমার প্রজার কাছ থেকে জরিমানা আদায় করার তোমাদের কী অধিকার ছিল? এই কথা নিয়ে যদি আমি চাই তো তোমায়, ঐ জালিয়াৎ পাটোয়ারী, আর ধূর্ত পণ্ডিতকে সাত-সাত বছরের জন্য জেলে পাঠাতে পারি। নিজেরা ভেবেছ যে তোমরাই এখানকার বাদশা! আমি বলে দিচ্ছি, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত জরিমানার পুরো টাকাটা আমার কাছে পৌছানো চাই; নইলে ভাল হবে না। আমি এক এক জনকে যাঁতা পিষিয়ে ছাড়ব। যাও; হাঁ, হরিকে আর তার ছেলেকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

নোখেরাম গলার স্বর নামাইয়া বলিল—ওর ছেলে তো গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে। যে রাত্রে এ কাণ্ডটা ঘটল, সেই রাত্রেই পালিয়েছে।

রায়সাহেব রাগ করিয়া বললেন—মিথ্যা বলো না। তুমি জান, মিথ্যা কথা শুনলে আমার গায়ে যেন জ্বালা ধরে যায়। আমি আজ পর্যন্ত কোথাও শুনি নাই যে কোনো যুবক তার প্রেমিকাকে ঘর থেকে বের করে পরে নিজে যায় পালিয়ে। যদি পালাতেই হবে, তবে ও মেয়েটাকে আনল কেন? এর মধ্যেও নিশ্চয় তোমাদের কোন দুষ্টুমি আছে। তুমি যদি গঙ্গায় ডুব দিয়েও নিজের সাফাই দাও, তাহলেও মানব না। নিজের সমাজের মর্যাদা তোমাদের কাছে প্রিয়, সেই মর্যাদা রক্ষার জন্য নিশ্চয় তাকে ধমকে থাকবে; বেচারা না পালিয়ে আর করে কী!

নোখেরাম এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না। কর্তা যা কিছু বলিয়াছেন তাহা ঠিক। সে এ-ও বলিতে পারিল না যে আপনি নিজে আসিয়া সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া নিন। বড়লোকদের রাগ হইলে পুরাপুরি আত্ম-সমর্পণ চাই। নিজের বিরুদ্ধে একটা কথাও তাঁহারা শুনিতে পারেন না।

পঞ্চায়েৎ রায়সাহেবের এই মীমাংসা শুনিল, আর তাহাদের নেশা ছুটিয়া গেল। ধান এখনও যেমনকে তেমন পড়িয়া আছে; কিন্তু টাকা তো কবে উড়িয়া গিয়াছে।' হরির বাড়ি রেহান লেখা হইয়াছিল; কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ঐ বাড়ি পোছে কে? হিন্দু স্ত্রী যেমন স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মালিক হইয়া থাকে, কিন্তু পতি তাহাকে ত্যাগ করিলে তাহার মালিকানা থাকিতে পারে না, তেমনি এই

ঘরের দাম হরির কাছে লাখ টাকা, কিন্তু উহার আসল দাম কিছুই না। আর এদিকে রায়সাহেব টাকা না লইয়া মানিবেন না। এই হরিই গিয়া কাঁদিয়া আসিয়া থাকিবে। ভয় হইয়াছিল পটেশ্বরীলালের সব চেয়ে বেশি। তাহার তো চাকরিই চলিয়া যাইবে। এই গভীর সমস্যা লইয়া চারজন বিচার করিতেছিল; কাহারও বুদ্ধি খুলিতেছিল না। একজন আর একজনের দোষ দিতেছিল। খুব এক চোট ঝগড়া হইল।

পটেশ্বরী ভয়ে ভয়ে ঘাড় হেলাইয়া বলিল—আমি মানা করেছিলাম, হরির কথায় আমাদের চুপচাপ করে থাকাই ভাল। গোরুর মামলায় সকলকে জরিমানা দিতে হল। এ মামলায় লোকসান দিয়েই ছাড় নাই। একেবারে চাকরি বিসর্জন দিতে হবে; কিন্তু তোমাদের টাকার অভাব ছিল না। বের কর একজন বিশ বিশ টাকা। এখনো দিলে মঙ্গল। রায়সাহেব রিপোর্ট করে দিলে সকলে বাঁধা পড়বে।

দাতাদীন ব্রহ্মতেজ দেখাইয়া বলিল—আমার কাছে বিশ টাকা কেন, বিশ পয়সাও নাই। ব্রাহ্মণ ভোজন হল, হোম হল। তার জন্য কিছু খরচ হয় নাই কি? রায়সাহেবের কি সাহস যে আমায় জেলে নিয়ে যায়? ব্রহ্মদত্যি হয়ে ঘরকে ঘর শেষ করে ফেলব। এখনও কোনও ব্রাহ্মণের পাল্লায় তো বাছাধন পড়েন নাই।

ঝিংগুরী সিংহও এই মর্মে কিছু বলিল। ও রায়সাহেবের চাকর নয়; ও হরিকে মারে নাই, পেটে নাই, কোনও চাপ দেয় নাই। হরি যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিত, তবে তাহার সুযোগও দেওয়া হইয়াছিল, এজন্য তাহার অপরাধ সাব্যস্ত করা যায় না। কিন্তু নোখেরামের এত সহজে নিস্তার নাই। সে মজার সঙ্গে বসিয়া বসিয়া রাজত্ব করিতেছিল। মাহিনা তো দশ টাকার বেশি নয়, কিন্তু বৎসরে এক হাজার টাকারও বেশি আয়, শত শত লোকের উপর হুকুম চালানো, চার চার জন পেয়াদা হাজির, বেগারে সমস্ত কাজ হইয়া যাইতেছে, থানাদার পর্যন্ত বসিতে চেয়ার দেয়। এ জ্ঞান তাহার ছিল কোথায়! আর পটেশ্বরী তো চাকরির বদলে মহাজন হইয়া পড়িয়াছিল। যাইবে কোথায়! দুই তিন দিন ধরিয়া সে এই চিন্তায় বিভোর ছিল যে এই বিপদ হইতে কি করিয়া উদ্ধার পাওয়া যায়। শেষটায় এক পথের সন্ধান মিলিল। কখনো কখনো কাছারিতে সে দৈনিক 'বিজলী' দেখিতে পাইত; যদি এক

গুপ্ত নামে সম্পাদকের কাছে পত্র দেওয়া যায় যে রায়সাহেব কেমন করিয়া প্রজাদের থেকে জরিমানা আদায় করেন, তাহা হইলে বাছাকে নেওয়ার পরিবর্তে দিতে হইবে। নোখেরামও এই মতে আসিল ; দুইজনে মিলিয়া কোন মতে এক পত্র লিখিল, ও রেজিস্টারী ডাকে তাহা পাঠাইয়া দিল।

সম্পাদক ওঙ্কারনাথ তো এমনি ধারা পত্রের সন্ধানে থাকিতেন। চিঠি পাইয়াই তাড়াতাড়ি রায়সাহেবকে জানাইলেন। তিনি এমন এক সংবাদ পাইয়াছেন, যাহা তিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন না ; কিন্তু সংবাদদাতা এমন প্রমাণ দিয়াছে যে সহসা অবিশ্বাসও করা চলে না। এ কথা কি সত্য যে রায়-সাহেব নিজের এলাকায় একজন প্রজার নিকট হইতে আশি টাকা জরিমানা এইজন্য উশুল দিয়াছেন যে তাহার পুত্র একজন বিধবাকে ঘরে গ্রহণ করিয়াছে ! সম্পাদকের কর্তব্য তাঁহাকে বাধ্য করিতেছে যে তিনি এই ব্যাপারের সন্ধান করিবেন ও জনহিতকল্পে তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন। অবশ্য রায়সাহেব এ বিষয়ে যাহা কিছু বলিতে চাহেন, সম্পাদক মহাশয় তাহাও প্রকাশ করিয়া দিবেন। সম্পাদক মহাশয় নিজের মনে মনে চাহিতেছেন যে এই খবর ভুল হউক ; কিন্তু ইহার মধ্যে খানিকটা সত্য থাকিলেও উহা প্রকাশ করিতে তিনি বাধ্য হইবেন। বন্ধুত্ব তাঁহাকে কর্তব্যপথ হইতে হটাইতে পারিবে না।

পত্র পাইয়া রায়সাহেব শিরে করাঘাত করিলেন। প্রথমটায় তো তিনি এতখানি উত্তেজিত হইলেন যে ওঙ্কারনাথকে গুণিয়া হাণ্টারের পঞ্চাশ ঘা বসাইয়া বলিয়া আসেন, ঐ পত্র যেখানে ছাপিতে হইবে এ সংবাদটাও যেন সেইখানেই ছাপা হয় ; কিন্তু তাহার পরিণামের কথা ভাবিয়া মনকে শান্ত করিলেন। তাড়াতাড়ি তাহার সহিত দেখা করিতে চলিলেন, দেরি করিলে ওঙ্কারনাথ যদি ও সংবাদ ছাপিয়া দেয়, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত যশে কালিমা পড়িয়া যাইবে।

ওঙ্কারনাথ ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া, আজকার পত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্য কি লিখিবে সেই চিন্তায় বসিয়া আছে ; কিন্তু পক্ষীর মত মনটা উড়্ উড়্ করিতেছে। তাহার ধর্মপত্নী রাত্রে তাহাকে এমন কিছু কথা বলিয়াছে যাহা এখনও কাঁটার মত তাহাকে বিঁধিতেছে। কেহ তাহাকে দরিদ্র বলে, হতভাগ্য বলে, বেকুব বলে, তাহা একটুও খারাপ লাগে না ; কিন্তু 'পুরুষত্ব নাই' একথা তাহার পক্ষে অসহ্য। আর নিজের স্ত্রীর কি অধিকার আছে এ কথা বলিবার ! তাহার কাছ থেকে তো এইটুকুই আশা করা যায় যে কেহ একথা উঠাইলে সে তাহার

মুখবন্ধ করিয়া দেয়। সে নিজে নিশ্চয় এমন কোনও টিপ্পনী ছাপে না, যাহাতে তাহার মাথায় কোনও বিপদ পড়িতে পারে। ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তবে সে পা ফেলে। এই আইনের যুগে আর কিই বা সে করিতে পারে; কিন্তু সাপের গর্তে কেন সে হাত ঢুকাইয়া দেয় না? এই জন্যই তো, যে তাহার ঘরের লোকেরা কষ্টে না পড়ে! তাহার সহিষ্ণুতার এই পুরস্কার! কী অবিচার! তাহার কাছে টাকা নাই, বেনারশী শাড়ী কি করিয়া আনিতে দিবে? ডাক্তার শেঠ আর প্রোফেসর ভাটিয়া আর জানি না কার কার স্ত্রী বেনারসী শাড়ী পরিয়া থাকে, ও তাহার কি করিবে! ওর স্ত্রী কেন অন্য শাড়ীওয়ালীদের নিজের খদ্দরের শাড়ী দেখাইয়া লজ্জিত করে না? তার নিজের তো এই প্রথা যে কোনও বড় লোকের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে মোটার চেয়ে মোটা কাপড় পরিয়া লয়, আর কথা উঠিলে তার জুৎসই জবাব দিবার জন্য তৈয়ারি থাকে। তাহার স্ত্রীর মধ্যে এই আত্মাভিমান নাই কেন? অন্যের ঠাট দেখিয়া ও কেন বিচলিত হইয়া যায়? ওর তো বোঝা উচিত যে ও এক দেশভক্তের পত্নী। দেশভক্তের হাতে। তাহার ভক্তি ছাড়া আর কি সম্পত্তি আছে! আজ ইহা সম্পাদকীয় প্রধান মন্তব্যের বিষয় করিতে হইবে এ কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন রায়সাহেবের মামলার দিকে আসিয়া পৌঁছিল। রায়সাহেব ও ইঙ্গিতের কি উত্তর দেন—দেখিতে হইবে। যদি তিনি নিজের সাফাই গাহিতে পারেন, তবে তো কথাই নাই, কিন্তু যদি তিনি মনে করেন যে চাপে, ভয়ে কিংবা পরীক্ষায় পড়িয়া ওঙ্কারনাথ নিজের কর্তব্য সাধনে বিমুখ হইবে, তাহা হইলে ভুল করিবেন। এই সমস্ত তপ ও সাধনার পুরস্কার ইহা ছাড়া আর কি মিলিবে যে সুযোগ পাইলে সে এই সব আইনমাফিক ডাকাতির গুমোর ফাঁক করিয়া দিবে! রায়সাহেবের যে খুবই প্রতিপত্তি, সে কথা বেশ ভাল করিয়াই সে জানে। কাউনসিলের মেম্বর তো তিনি আছেন বটেই, কর্তৃপক্ষের নিকটেও উঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি; ইচ্ছা করিলে তাহার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা চালাইতে পারেন, গুণ্ডা দিয়া রাস্তায় চলিতে চলিতে মার খাওয়াইতে পারেন, কিন্তু ওঙ্কার ঐ সমস্ত ভয়ে ভীত নয়। যতক্ষণ তাহার দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ সে শত্রুদের কায়দা করিতে থাকিবে।

হঠাৎ মোটরকারের আওয়াজ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া নিজের লেখাটা আরম্ভ করিয়া দিল। পরক্ষণেই রায়সাহেব তাহার ঘরে পদার্পণ করিলেন।

ওঙ্কারনাথ না করিল তাঁহাকে অভ্যর্থনা, না করিল কুশলপ্রশ্ন, না দিল চেয়ার। সে এমন ভাবে তাকাইয়া দেখিল যেন কোনও বাদী তাহার আদালতে আসিয়াছে, আর কর্তৃত্ব মিশানো স্বরে প্রশ্ন করিল, আমার চিঠি পেয়েছিলেন তো! আমি ও পত্র লিখতে বাধ্য ছিলাম না, নিজে ও ব্যাপারের যাচাই করতাম; কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে মতকে কিছু না কিছু হত্যা করতেই হয়। এই সংবাদের মধ্যে কিছু সত্য আছে কি?

রায়সাহেব উহার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারিলেন না; যদিও এ পর্যন্ত তিনি জরিমানার টাকাটা পান নাই, পাইলে সোজাসুজি অস্বীকার করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি দেখিতে চাহিতেছিলেন, এ লোকটির কত দৌড়!

ওঙ্কারনাথ দুঃখ প্রকাশ করিতে করিতে বলিল—তবে তো ও সংবাদ বের করে দেওয়া ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। আমার দুঃখ এই যে আমাকে নিজের পরম হিতৈষী এক বন্ধুর সম্বন্ধে আলোচনা করতে হল; কিন্তু কর্তব্যের সামনে মানুষ কিছুই নয়; সম্পাদক যদি নিজের কর্তব্য সম্পাদন করতে না পারে তা হলে এই আসনে বসবার তার কোনও অধিকার নাই।

রায়সাহেব চেয়ারের উপর বসিয়া গেলেন আর পানের খিলিতে মুখ ভরিয়া দিয়া বলিলেন—কিন্তু আপনার সত্যি সত্যি এ ভাল হবে না। আমার তো যা কিছু হবার তা পরে হবে, আপনি হাতে হাতে দণ্ড পাবেন; আপনি যদি বন্ধুদের গ্রাহ্যই না করেন, তবে আমিও আপনাকে গ্রাহ্য না করতে পারি।

শহীদের ভাব দেখাইয়া ওঙ্কারনাথ কহিল—আমার তো এ ভয় হয় নাই কখনও। যে দিন আমি পত্র সম্পাদনের ভার নিয়েছি, সেই দিনই আমি প্রাণের মায়া ছেড়েছি, আর আমার বিবেচনায় সম্পাদকের মৃত্যু তখনই সব চাইতে স্পৃহণীয়, যখন সে ন্যায় ও সত্য রক্ষা করবার জন্য নিজেকে বলিদান করে।

ঠিক কথা। আমি আপনার বেছে নেওয়াটা স্বীকার করি। এ পর্যন্ত আপনাকে বন্ধু বলে মনে করে এসেছি; কিন্তু আপনি এখন লড়াই করতে তৈয়ার, তবে লড়াই হোক। শেষাশেষি আমি আপনাকে পত্রিকার পাঁচগুণ চাঁদা দিই কেন? শুধু এই জন্য যে ও পত্র যাতে আমার গোলাম হয়ে থাকে। ভগবান আমাকে ধনী বানিয়েছেন। আপনার হাতে পীড়া নই আমি। সাধারণ চাঁদা পনেরো টাকা; পঁচাত্তর টাকা দিই, যাতে আপনার মুখ বন্ধ থাকে। আপনি যখন মরাকান্না কাঁদতে থাকেন আর সাহায্যের জন্য আবেদন করেন—আর এমনি

তো তিনমাস অন্তর আপনার আবেদন বের হয় না, এমনটা বড় কমই হয়ে থাকে—প্রত্যেক বার আমি আপনাকে কিছু না কিছু সাহায্য করে থাকি। কেন দেওয়ালি, দশহরা, হোলিতে আপনার বাড়ি উপহার পাঠিয়েছি; আর বছরে পঁচিশবার আপনাকে নিমন্ত্রণ করি? কেন? আপনি ঘুস নেওয়া ও কর্তব্য করা একসঙ্গেই দুটো চালাতে পারেন না।

ওঙ্কারনাথ উত্তেজিত হইয়া বলিল—আমি কখনও ঘুস নেই না।

রায়সাহেব ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—এ ব্যবহার যদি ঘুস না হয়, তো ঘুষ কাকে বলে? আমায় একটু বুঝিয়ে দিন। আপনি কি মনে করেন, আপনি বাদে আর সব গাধা, নিঃস্বার্থভাবে আপনার অভাব পূরণ করে যাচ্ছে! বের করুন আপনার খাতা আর বুঝিয়ে দিন, এ পর্যন্ত আমার জমিদারি থেকে আপনি কত টাকা পেয়েছেন। আমার বিশ্বাস, দেখতে পাবেন হাজার হাজার টাকা। আপনি যদি স্বদেশী-স্বদেশী চিৎকার করে বিদেশী ওষুধ আর জিনিসের বিজ্ঞাপন ছাপতে লজ্জাবোধ না করেন, তবে আমি কেন নিজের প্রজাদের কাছ থেকে দণ্ড, ক্ষতিপূরণ, আর জরিমানা নিতে লজ্জা পাব! এটা মনে করবেন না যেন যে আপনিই শুধু কিষাণদের হিতের কাজ হাতে নিয়েছেন। ওদের সঙ্গে আমার বাঁচা-মরার সম্বন্ধ, আমার চেয়ে অধিক হিতৈষী ওদের আর কেউ হতে পারে না, কিন্তু আমার দিন চলবে কেমন করে! অফ্‌সরদের নেমন্তন্ন করবো কোথা থেকে, শত শত সম্ভ্রান্ত লোকের প্রয়োজন কি করে পূরণ করি! আমার বাড়ির যা খরচ, তা আপনি হয়তো জানেন। তা আমার ঘরে কি টাকা গাছে ধরে! আসবে তো সেই প্রজাদের ঘর থেকেই। আপনি হয়তো মনে করবেন, জমিদার ও তালুকদার সংসারের সমস্ত সুখ ভোগ করে। তাদের অবস্থা যে কি, সে সম্বন্ধে আপনার কোনও জ্ঞান নাই। যদি তারা ধর্মাত্মা হতে চায়, তবে তো বেঁচে থাকাই কঠিন। অফ্‌সরদের ডালি না দিতে পারলে যেতে হবে জেলখানা। আমরা বিছা নই যে সকলকে অনায়াসে কামড়ে বেড়াব। গরীবের গলা টেপা খুব আনন্দের কাজও নয়; কিন্তু ঠাট রেখে চলতে হবে তো। আপনি যেমন আমার জমিদারির লাভ ভোগ করতে চান, তেমনই আর সকলে আমাকে মনে করে আমি বুঝি সোনার মুরগি! আমার বাংলোয় এলে দেখাব, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে কি ঝক্কি সামলাতে হয়। কেউ কাশ্মীর থেকে শাল দোশালা নিয়ে এসেছে, কেউ আতর ও তামাকের এজেন্ট, কেউ

বা বই ও পত্রিকার দালাল, কেউ জীবনবীমার লোক, কেউ গ্রামোফোন নিয়ে মাথার ওপর এসে হাজির, কারও বা আর কিছু চাঁদা চাই। এমন লোক তো অগুণ্‌তি। সকলের সামনে কি নিজের বিপদের কাহিনী নিয়ে বসা যায়? এরা কি আমার দরজায় আসেন, দুঃখের কাহিনী শুনতে! আসেন আমাকে উল্লুক বানিয়ে কিছু সরাবার জন্য। আজ যদি ঠাট রাখার কথা ছেড়ে দিই, চারদিক থেকে হাত তালি পড়বে। হাকিমদের যদি ডালি না দিই, তাহলে বিদ্রোহী বলে মনে করবে। তখন তো আপনি আপনার লেখা দিয়ে আমায় রক্ষা করবেন না। কংগ্রেসে যোগ দিলাম, তার ক্ষতিপূরণ এখনও করে যাচ্ছি। 'ব্ল্যাকবুকে' নাম ঢুকে গেছে! আমার ঘাড়ে কতখানি ধার, সে কথাও আপনি কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন; যদি সব মহাজন ডিক্রী করে নেয়, তাহলে আমার হাতের এই আংটি পর্যন্ত বিক্রী হয়ে যায়। আপনি বলবেন, এই আড়ম্বর বজায় রাখি কেন; তা বলুন। সাতপুরুষ যে আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছি, তার থেকে এখন বাইরে যাওয়া যায় না। ঘাস কাটা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনার জমি নাই, জায়দাদ নাই, মর্যাদার ঝামেলা নাই, আপনি নির্ভীক হতে পারেন; কিন্তু আপনিও গ্যাঁট হয়ে বসে থাকেন। আপনি খবর রাখেন কি, আদালতে কত ঘুস চলে, কত গরিব খুন হয়ে যাচ্ছে, কয়জন মেয়ে ভ্রষ্ট হচ্ছে? লিখবার সামর্থ্য আছে? লেখবার জিনিস আমি প্রমাণ শুদ্ধ দিচ্ছি।

ওঙ্কারনাথ কিছু নরম হইয়া বলিল, যদি কখনও প্রয়োজন হয়, আমি পিছপা হব না।

রায়সাহেব কিছু নরম হইয়া বলিলেন, হাঁ, আমি স্বীকার করি; দুই এক ক্ষেত্রে আপনি সাহস দেখিয়েছেন; কিন্তু আপনার দৃষ্টি রয়েছে সর্বদা আপনার লাভের দিকে, প্রজার হিতের দিকে নয়। চোখ গরম করবেন না, মুখ লাল করবেন না। আপনি যখনই আসরে নেমেছেন, তার শুভ পরিণাম হয়েছে ঐ। আপনার সম্মান, প্রভাব, আয় সবই বেড়েছে। কিন্তু আমার ওপরও যদি ঐ চাল চেলে থাকেন; তবে আমি আপনার খাতির করতে প্রস্তুত। টাকা দেব না, কারণ সেটা হবে ঘুস। আপনার স্ত্রীর জন্য কোনও গহনা গড়িয়ে দেব। রাজি আছেন? এখন আমি আপনাকে সত্য করে বলি, আপনি যে সংবাদ পেয়েছেন সেটা ভুল। কিন্তু একথাও জানিয়ে দিতে চাই যে অন্য সব ভাইদের মত আমিও প্রজাদের কাছ থেকে জরিমানা নিয়ে থাকি, আর বৎসরে দশ পাঁচ হাজার টাকা

আমার হাতে আসে; আপনি যদি আমার মুখের এই গ্রাস কেড়ে নিতে চান, তাহলে আপনি অভাবের মধ্যেই থাকবেন। আপনিও সংসারে সুখে থাকতে চান, আমিও চাই। ন্যায় ও কর্তব্যের ধ্বনি তুলে যদি আমাকেও জেরবার করেন, নিজেও জেরবার হন, তাতে লাভ কি? মনের কথা বলুন। আমি আপনার শত্রু নই। আপনার সঙ্গে কতবার এক টেবিলে এক চৌকিতে বসে খেয়েছি। একথাও জানি যে আপনি কষ্টে আছেন। আপনার অবস্থা হয়তো আমার চেয়েও খারাপ। হাঁ, যদি আপনি হরিশ্চন্দ্র হবেন বলে দিব্যি করে থাকেন তো আপনার খুসি। চললাম।

রায়সাহেব চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ওঙ্কারনাথ তাঁহার হাত ধরিয়া সন্ধির ভাবে বলিল—না, না, এখন আপনাকে বসতে হবে। আমি আমার 'পোজিশন' পরিষ্কার করে দিতে চাই। আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন, তার জন্য আমি আপনার কাছে ঋণী। কিন্তু এখানে মতবাদের কথা এসে পড়ছে, আর আপনি জানেন যে মতবাদ মানুষের প্রাণের থেকেও প্রিয়।

রায়সাহেব চেয়ারে বসিয়া একটু মিষ্ট স্বরে বলিলেন—আচ্ছা ভাই, যা ইচ্ছা লেখ। তোমার মতবাদ আমি ভাঙ্গতে চাই না। কি আর হবে, বদনাম হবে। হাঁ, কত দূর নামের পিছনে ছুটব! এমন কে তালুকদার আছে যে প্রজাদের ওপর অল্প বিস্তর অত্যাচার করে না? কুকুর যদি মাংস রক্ষাই করবে, তো খাবে কি? আমি এই পর্যন্ত করতে পারি যে ভবিষ্যতে আপনার এই রকম কোনও সুবিধা না মেলে; যদি আমার ওপর আপনার কিছু বিশ্বাস থাকে তো এবার ক্ষমা করুন। আর কোনও সম্পাদককে এভাবে খোসামোদ করতাম না, তাকে সমস্ত বাজারের মধ্যে মার খাওয়াতাম। কিন্তু আপনার সঙ্গে আছে বন্ধুত্ব; এজন্য আমায় চেপে যেতেই হবে, এটা হল সংবাদপত্রের যুগ। সরকার পর্যন্ত তাদের ভয় করে, আমার কথা কি। আপনি যা ইচ্ছা করুন, এ ঝগড়া তো শেষ করে দিন। বলুন, আজকাল কাগজের অবস্থা কি? কিছু গ্রাহক বাড়ল?

ওঙ্কারনাথ অনিচ্ছার ভাবে বলিল—কোন না কোন মতে কাজ চলে যাচ্ছে, বর্তমান অবস্থায় এর চেয়ে আর কিছু বেশি আশা রাখি না। ধন ও ভোগের লালসা নিয়ে আমি এদিকে আসি নি; এই জন্য আমার কোনও লালসা নাই। জনসাধারণের সেবা করতে এসেছিলাম, আর করেও যাচ্ছি তাই যথাসাধ্য।

রাষ্ট্রের কল্যাণ হোক, তাই আমার কামনা, এক জনের সুখদুঃখের কোনও মূল্য নাই।

রায়সাহেব একটু সহৃদয়তার ভাবে বলিলেন—এ সমস্ত ঠিক, ভাইসাহেব, কিন্তু সেবা করতে গেলেও বাঁচা দরকার। অর্থচিন্তায় একাগ্রচিত্ত হলে আপনি সেবাও তো করতে পারেন না। গ্রাহকসংখ্যা কি মোটেই বাড়ে নাই?

কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে আমি পত্রিকার আদর্শ ছোট করতে চাই না, আমিও যদি সিনেমা-স্টারদের ছবি ও জীবনী ছাপাতে আরম্ভ করি, তাহলে আমার গ্রাহকসংখ্যা বাড়তে পারে; কিন্তু ও তো আমার নীতি নয়। আরও কতকগুলো এমন ফিকির আছে যা দিয়ে পত্রিকা থেকে টাকা রোজগার হতে পারে; কিন্তু আমি সেগুলো গর্হিত মনে করি।

এর ফলে আজ আপনার এতটা সম্মান। আমি এক প্রস্তাব করতে চাই। জানি না, আপনি তাতে রাজি হবেন কি না। আপনি আমার হয়ে এক শ লোকের নামে ফ্রি পত্রিকা পাঠিয়ে দিন; আমি তাদের চাঁদা দিয়ে দেব।

ওঙ্কারনাথ কৃতজ্ঞতায় মাথা নোয়াইয়া বলিল—আমি ধন্যবাদের সঙ্গে আপনার দান গ্রহণ করছি। দুঃখ এই যে, পত্রের বিষয়ে জনসাধারণ একেবারে উদাসীন। স্কুল কলেজ মন্দিরের জন্য টাকার কিছু কমতি নাই; কিন্তু আজ পর্যন্ত একজনও এমন দাতা পেলাম না, যিনি পত্রের প্রচারের জন্য দান করেন—যদিও জনশিক্ষার উদ্দেশ্য অতি অল্প ব্যয়ে পত্রিকার সাহায্যে সিদ্ধ হতে পারে, আর কোনও ভাবে তা সম্ভব নয়। শিক্ষামন্দির যেমন সম্মিলনের দ্বারা পরস্পরের সাহায্য পেতে পারে, সম্পাদকেরাও যদি ঐ ভাবে মিলিত হয়, তবে এ বেচারাদের যতটা সময় ও স্থান বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে দিতে হয় তার আর প্রয়োজন হয় না। আমি আপনার কাছে বিশেষ বাধিত থাকলাম।

রায়সাহেব বিদায় হইয়া গেলেন; ওঙ্কারনাথের মুখের উপর প্রসন্নতার দীপ্তি আসিল না। রায়সাহেব কোনও প্রকারের শর্ত করিলেন না, কোনও বন্ধন লাগাইলেন না, কিন্তু ওঙ্কারনাথ আজ এত জোর মার খাইয়াও এই দান অস্বীকার করিতে পারিল না। অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে তাহার মুক্তির কোনও উপায়ই চোখে পড়িল না। প্রেসের কর্মচারীদের তিন মাসের বেতন বাকি পড়িয়াছিল, কাগজওয়ালার এক হাজার টাকারও বেশি বাকি; এও কি কম হইল যে উহাকে হাত পাতিতে হইল না?

স্ত্রী গোমতী আসিয়া বিদ্রোহের স্বরে বলিল—কী, এখনও কি খাওয়ার সময় হয় নি, না এমন কোনও নিয়ম আছে যে যতক্ষণ একটা না বাজে ততক্ষণ জায়গা থেকে নড়বে না ? কতক্ষণ উনন আগলে বসে থাকব ?

ওঙ্কারনাথ দুঃখিতনেত্রে স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া রহিল। গোমতীর বিদ্রোহ উড়িয়া গেল। স্বামীর অসুবিধা সে বুঝিতে পারিল। অন্য মেয়েদের কাপড়-চোপড় গয়নাগাঁটি দেখিয়া কখনও কখনও তাহার মনে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিত, সে অমনি স্বামীকে কাটা-কাটা দুইচারি কথা শুনাইত, কিন্তু বাস্তবিক তো এ ক্রোধ তাহার স্বামীর প্রতি নহে, নিজের দুর্ভাগ্যের প্রতি, আর তাহার অল্পস্বল্প আঁচ সহজে ওঙ্কারনাথে আসিয়া পৌঁছিত। তাহার তপস্যার জীবন দেখিয়া গোমতীর মনে খচ্ করিয়া বিঁধিত, তাহার জন্য সহানুভূতি জাগিয়া উঠিত ; ব্যস, তাহার মনে এভাব বেশি ক্ষণ থাকিত না। স্বামীর উদাসমুখ দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—উদাস কেন, হজমের কিছু গোলমাল হয়েছে না কি ?

ওঙ্কারনাথ কষ্টে একটু হাসিল—কে উদাস, আমি ? আমি তো আজ যতখানি খুসি, বিয়ের দিনও এত খুসি হই নাই। আজ সকালে পনেরো শ টাকা বউনি হয়েছে। কোন ভাগ্যবানের মুখ দেখেছিলাম।

গোমতীর বিশ্বাস হইল না, বলিল—মিথ্যা কথা। পনেরো শ টাকা তুমি পাবে কোথায় ? হাঁ, পনেরো টাকা বল, মেনে নেব।

না—না, তোমার মাথার দিব্যি, পনেরো শ পেয়েছি। এখখুনি রায়সাহেব এসেছিলেন। এক শ জন গ্রাহকের চাঁদা নিজের তরফ থেকে দেবেন, কথা দিয়ে গেলেন।

গোমতীর মুখের ভাব বদলাইয়া গেল—হাতে পেয়েছ ?

না ; রায়সাহেবের কথাই পাকা।

আমি কোনও তালুকদারের কথাই পাকা হতে দেখি নাই। বাবা ছিলেন এক তালুকদারের কর্মচারী। বছরের পর বছর মাইনে পেতেন না। তাঁর কাজ ছেড়ে দিয়ে আর একজনের কাজ নিলেন। তিনিও দুই বছরে এক পাইপয়সা দেন নাই। একবার বাবা গরম গরম কথা বলেছিলেন, ওরা মার দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এদের কথায় বিশ্বাস নাই।

আমি আজকেই বিল পাঠাব।

পাঠাও ; বলে দেবে, কাল এস। কাল নিজের মহালে চলে যাবে, আর ফিরবে তিন মাসের পর।

ওঙ্কারনাথ ধোঁকায় পড়িয়া গেল। ঠিকই তো, রায়সাহেব যদি পরে দেশে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সে কি করিবে। পুনরায় মন শক্ত করিয়া কহিল—এমন হতে পারে না। অন্তত রায়সাহেবকে আমি এত ধোঁকাবাজ মনে করি না। এখানে তাঁর কিছু বাকি পড়ে নাই।

গোমতী সেই সন্দেহের ভাবেই বলিল—এর জন্যেই তোমাকে আমি বেকুব বলি। যেই কেউ সহানুভূতির কথা বলল, আর তুমি উঠলে ফুলে। এ হল একজন বড় জমিদার। এর পেটে এ রকম কত কথা হজম হতে পারে। যেখানে যত কথা দেয় সবই যদি পূরণ করতে হয়, তা হলে ভিক্ষে করা আছে অদৃষ্টে। আমাদের গাঁয়ের ঠাকুর সাহেব তো দুই-দুই তিন-তিন বছর ধরে দোকানীদের হিসাব করত না। কর্মচারীদের বেতন তো নামমাত্র দিত। সারা বছর কাজ করিয়ে নিয়ে, তারা যখন বেতন চাইত তখন তাদের মারধর করে বিদায় করত। মাইনে বাকি করার জন্যে কবার তো ইস্কুল থেকে ছেলেদের নাম কাটা গেল। শেষে সে ছেলেদেরই স্কুল ছাড়িয়ে বাড়িতে ফিরিয়ে নিল। একবার ট্রেনের টিকিটও চেয়েছিল ধারে। এই রায়সাহেব তো তারই ভাই-বেরাদর। চল, খাবে আর যাঁতা ঘুরোবে, যা আছে অদৃষ্টে। মনে রেখো বড়লোক যদি তোমাকে গাল দেয় সে বরং ভাল ; যদি তোমাকে এক পয়সাও দান করে তবে তার চার গুণ প্রজাদের কাছ থেকে উশুল করে নেবে। এখন ওদের বিষয়ে যা ইচ্ছা লেখ, তখন তো 'ঠাকুর ঠাকুর' করতে হবে।

পণ্ডিতজী ভোজনে বসিল ; কিন্তু গ্রাস যেন মুখে আটকাইয়া যাইতেছিল। শেষটায় মনের বোঝা হালকা না করিয়া আহার করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—যদি টাকা না দেয় তো এমন কায়দা করব যে মনে থাকবে। ওর মাথা আছে আমার হাতে। গ্রামের লোক মিথ্যা খবর দিতে পারে না। সত্যি খবর দিতেই, তাদের প্রাণ যায় বেরিয়ে, মিথ্যা খবর দেবে কি! রায়সাহেবের বিরুদ্ধে এক রিপোর্ট আমার কাছে এসে গেছে। ছেপে দিলে বাছাধনের ঘর থেকে বেরোনো মুস্কিল। আমাকে তো খয়রাৎ করছেন না, খুব চাপে পড়ে এ রাস্তায় আসছেন। প্রথমটায় ধমক চালাচ্ছিলেন, যখন দেখলেন যে তাতে কাজ হবে না, তখন ফেললেন এই চার। আমিও ভাবলাম, শুধু

ইনি ঠিক হয়ে গেলে তো দেশ থেকে অন্যায় চলে যাবে না, তবে কেন এ দান গ্রহণ করব না। আমি নিজের আদর্শ থেকে সরে এসেছি নিশ্চয়; কিন্তু এর ওপর যদি রায়সাহেব দাগা দেয় তো আমাকেও শঠতার আশ্রয় নিতে হবে। গরিবের টাকাকড়ি যে লুটে নেয়, তার টাকাকড়ি লুটবার জন্য নিজেকে বেশি বোঝাতে হবে না, ওতে আমার বাধবে না।

## ১৭

গাঁয়ে এই খবর ছড়াইয়া গেল যে রায়সাহেব পঞ্চায়েৎকে ডাকাইয়া খুব ধমক দিয়াছেন, আর তাহারা যত টাকা উশুল করিয়াছিল সে সমস্ত তাহাদের কাছ থেকে বাহির করিয়া নিয়াছেন; তাহাদের জেলেই পাঠাইতেন, কিন্তু তাহারা হাতে পায়ে ধরিয়া নাকে খৎ দিল, তবে ছাড়িয়াছেন। ধনিয়ার বুকটা জুড়াইয়া গেল, গাঁ-ময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পঞ্চায়েৎকে লজ্জা দিয়া বেড়াইতে লাগিল—গরিবের ডাক মানুষ না শোনে ভগবান শুনছেন। লোকে ভেবেছিল, এদের দণ্ডের টাকা নিয়ে মজা করে ফুলুরি খাবে। ভগবান এমন প্যাঁচ কসেছেন যে মুখ থেকে ফুলুড়ি যাচ্ছে পড়ে। এক একজনকে ডবল ডবল দিতে হচ্ছে। এখন বাড়ি নিয়ে চাট গে যাও।

কিন্তু গোরু বিনা চাষ হয় কি করিয়া? গাঁয়ে ধান বোনা শুরু হইয়া গিয়াছে। কার্তিক মাসে কৃষকের গোরু যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে হাত দুইখানা যেন কাটা পড়ে। হরির দুই হাত কাটা পড়িয়াছিল। অন্য লোকদের ক্ষেতে লাঙ্গল চলিতেছিল, বীজ ফেলা হইতেছিল। কোথাও কোথাও চাষীদের গানের সুর কানে আসিতেছিল। অনাথা অবলার ঘরের মত হরির ক্ষেত ফাঁকা পড়িয়া। পুনিয়ার কাছে গোরু ছিল, শোভারও ছিল; কিন্তু তাহাদের নিজেদের কাজ সারিয়া ফুরসৎ কোথায় যে হরির ক্ষেতে কাজ করিবে? হরি সারাদিন মনমরা হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইত। কখনও এর ক্ষেতে বসিত, কখনও আর একজনের ধান বুনিয়া দিত। এই আশে কিছু কিছু ধান পাইত। ধনিয়া, রূপা, সোনা সকলেই অন্যদের ক্ষেতে ধান বোনার কাজে লাগিয়া থাকিত। যত দিন বোনা চলিত, পেটের রুটি মিলিত;

বেশি কষ্ট হয় নাই! মানসিক কষ্ট তো অবশ্যই হইতেছিল; কিন্তু পেট ভরিয়া খাওয়া জুটিত। প্রতি রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে অল্পস্বল্প ঝগড়া হইত।

কার্তিক মাস চলিয়া গেল, গাঁয়ে মজুরি পাওয়াও কঠিন হইল। এখন সমস্ত ঝোঁক আখের উপর পড়িল, তখনও ক্ষেতে আখ আছে।

রাত্রিকাল। খুব ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। হরির ঘরে আজ খাওয়ার কিছু ছিল না। দিনের বেলায় অল্প মটরভাজা জোগাড় হইয়াছিল; কিন্তু এ সময় চুলা জ্বালিবার কোনও উপায় ছিল না, রূপা ক্ষুধায় কাতর হইয়া দরজার উপর আড় হইয়া অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ঘরে যখন এক দানাও ধান নাই, তখন চাহিবেই বা কার কাছে আর বলিবেই বা কি।

ক্ষুধা যখন আর সহ্য হইল না, তখন সে আগুন চাহিবার বাহানায় পুনিয়ার ঘরে গেল। পুনিয়া বাজরার রুটি, আর বেথুয়া শাক রাঁধিতেছিল। গন্ধে রূপার জিভে জল আসিল।

পুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কী রে, এখনও তোদের ঘরে আগুন জ্বলে নাই না কি?

রূপা দীনভাবে বলিল—আজ তো ঘরে কিছু ছিলই না, আগুন জ্বলবে কি!

তা হলে আবার আগুন মাগতে এলি?

বাবা তামাক খাবেন।

পুনিয়া তাহার দিকে ঘুঁটের আগুন ফেলিয়া দিল। রূপা কিন্তু আগুনটা উঠাইল না, কাছে গিয়া বলিল—তোমার রুটির গন্ধ আছে কাকী! বাজরার রুটি আমার খুব ভাল লাগে।

পুনিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল—খাবি?

মা বকবে।

মাকে বলতে যাবে কে?

রূপা পেট ভরিয়া রুটি খাইল, তার পর এঁটোমুখে ছুটিয়া বাড়িতে আসিল।

হরি মনমরা হইয়া বসিয়াছিল, এমন সময় পণ্ডিত দাতাদীন আসিয়া ডাকিল। হরির বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল। নূতন বিপদ আসিবে না কি! সে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া দরজার সামনে তাঁহার জন্য মোড়া রাখিয়া দিল।

দাতাদীন বসিতে বসিতে অনুগ্রহের ভাবে বলিল—এখনো তো তোমার ক্ষেত পতিত রয়ে গেছে, হরি! তুমি গাঁয়ে কারু কাছে কিছু বল নি। না হলে

ভোলার সাধ্য কি যে তোমার দরজা থেকে গোরু খুলে নিয়ে যায়! থাকতো এখানে লাশ পড়ে। আমি তোমায় পৈতা হাতে নিয়ে বলছি হরি, আমি তোমার দণ্ড লাগাই নাই। ধনিয়া আমাকে হক নাহক বদনাম করে ফিরছে। এ হয়েছে লালা পটেশ্বরী আর ঝিংগুরী সিংহের চালাকি; আমি তো লোকে বলাতে পঞ্চায়েতে বসে গেলাম। ওরা তো আরও কড়া সাজা দেওয়ার তালে ছিল। আমি বলে কয়ে কম করিয়ে দিলাম; কিন্তু এখন সকলে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। ভেবেছিল, এখানে ওদেরই রাজত্ব; জানত না যে, গাঁয়ের রাজা আছেন আর একজন। এখন নিজের ক্ষেতের ধান বোনার কি ব্যবস্থা করছ?

করুণকণ্ঠে হরি বলিল—কি আর বলব মহারাজ! পতিত থাকবে।

পতিত থাকবে! সে তো বড় বিপদ হবে।

ভগবানের যদি এই ইচ্ছা হয়, তাহলে আমার এক্তিয়ার কি।

আমি থাকতে তোমার ক্ষেত কেন পতিত থাকবে? কাল আমি তোমার ধান বোনা সেরে ফেলবো। এখনও ক্ষেতে কিছু রস আছে। দশ দিন পরে না হয় ফসল হবে, তার বেশি তো নয়? আমার তোমার আধা আধি থাকবে। এতে তোমারও লোকসান নাই, আমারও নাই। আজ আমি বসে বসে ভাবছিলাম, মনে ভারি দুঃখ হচ্ছিল, চাষের সব তৈরি, এমন সময় ক্ষেত থাকবে পতিত হয়ে!

হরি চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেল। চার মাস ধরিয়া এই জমিতে সার দিয়াছে, লাঙ্গল দিয়াছে, আর আজ শুধু ধান রোয়াইবার জন্য অর্ধেক ফসল দিতে হইতেছে! ইহাতে কৃতজ্ঞতা কেমন করিয়া আসে; কিন্তু পতিত থাকার চেয়ে তো ভাল। আর কিছু না মিলিলেও খাজনাটা তো বাহির হইয়া আসিবে। না হয়, সবটা না হইলেও বেদখল বন্ধ করা যাইতে পারে।

সে এই প্রস্তাবে রাজি হইয়া গেল।

দাতাদীন প্রসন্ন হইয়া বলিল—তবে চল, আমি এখনই বীজ ধান ওজন করে দিই, যাতে সকালের হাঙ্গাম না থাকে। রুটি খেয়ে নিয়েছ তো?

হরি সলজ্জভাবে—আজ যে ঘরে চুলা জলে নাই, সেকথা জানাইল।

দাতাদীন মৃদু উত্তেজনার সহিত বলিল—আরে! তোমার ঘরে চুলা জলে নাই আর তুমি আমায় বল নাই পর্যন্ত! আমি তোমার শত্রু তো ছিলাম না। এ

কথায় আমার প্রাণ তোমায় দেখে বেঁকে বসছে। ওহে ভালমানষের পো, এতে লজ্জা সরমের কথাটা কি? আমরা সবাই তো এক। তুমি শূদ্র হয়েছ তো কি, আমি ব্রাহ্মণ হলেই বা কি, সবাই তো এক ঘরের। দিন সকলের সমান যায় না। কে জানে, কাল আমারই উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তাহলে আমার দুঃখের কথা তোমাকে না বলে আর কাকে বলব? আচ্ছা, যা হয়েছে, হয়েছে তাড়াতাড়ি চল, তোমাকে দুই এক মণ খাওয়ার ধানও ওজন করে দেব।

আধ ঘণ্টার মধ্যে হরি এক মণ যবের বড় ঝুড়ি মাথায় করিয়া বহিয়া নিয়া আসিল, আর ঘরের জাঁতা চলিতে লাগিল। ধনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সোনার সঙ্গে যব পিষিতে লাগিল। কোন অপরাধের এ শাস্তি ভগবান তাহাকে দিতেছেন?

পরের দিন হইতে ধান বোনা শুরু হইল। হরির সমস্ত পরিবার এ কাজে জুটিয়া গেল, যেন সমস্তটা নিজেদেরই। কয়েকদিন পরে সেচ দেওয়াও হইল এইরূপে। দাতাদীনের মজুর মিলিয়া গেল বিনা পয়সায়। এখন কখনও কখনও তাহার ছেলে মাতাদীনও ঘরে আসিতে আরম্ভ করিল। জোয়ান লোক, খুব রসিক ও কথাবার্তায় পটু। দাতাদীন যাহা কিছু কাড়িয়া কুড়িয়া লইয়া আসিত, তাহা সে রঙ্গ রসে উড়াইয়া দিত। এক চামারনীর সঙ্গে তাহার প্রেম হইয়াছিল, এই জন্য আজ পর্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই। সে ছিল তাহার রক্ষিতা; কিন্তু সারা গাঁ এই রহস্য জানিলেও মুখে কিছু বলিতে পারে নাই। আমাদের ধর্ম হইল আমাদের হেঁসেলে। ভোজন পবিত্র থাকিলে, আমাদের ধর্মের গায়ে কোনও আঁচড় পড়িতে পায় না। রুটি ঢাল হইয়া আমাদিগকে অধর্ম হইতে রক্ষা করে।

এখন ভাগে চাষ হওয়ায় মাতাদীনের ঝুনিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার অবসর হইতে লাগিল। সে অবসর এমন সময়ে হইত, যখন ঘরে ঝুনিয়া ছাড়া আর কেহ থাকিত না; কখনও এক বাহানায়, কখনও অন্য বাহানায়। ঝুনিয়া রূপসী ছিল না, কিন্তু ঝুনিয়ার তারুণ্য ছিল, এবং সে তাহার চামারনী প্রেমিকা হইতে ভাল ছিল। সে কিছুকাল শহরে ছিল, কাপড় চোপড় পরা, কথাবার্তা চালচলন, সুব রুচিত, লজ্জাশীলাও ছিল, স্ত্রীলোকের যাহা সব চেয়ে অধিক আকর্ষণ। মাতাদীন কখনও কখনও তাহার ছেলেকে কোলে লইয়া আদর করিত। ঝুনিয়া খুসি হইয়া যাইত।

এক দিন সে ঝুনিয়াকে কহিল—কি দেখে তুমি গোবরের সঙ্গে এসেছিলে ঝুনা?

ঝুনিয়া লজ্জা পাইয়া বলিল—ভাগ্য টেনে আনল মহারাজ, আর কি বলি!

মাতাদীন দুঃখিত মনে বলিল—বড় বেরসিক লোক। তোমার মত লক্ষ্মীকে ছেড়ে না জানি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে! চঞ্চল স্বভাবের লোক, এই জন্য ভয় হয় যে আর কোথাও ফেঁসে না যায়। এরকম লোককে তো গুলি করে মারা উচিত। পুরুষের ধর্ম হল, যাকে গ্রহণ করেছে তাকে নিয়ে দিন কাটানো। এ কি রে বাবা, একজনের জীবনটা নষ্ট করে নিজে দিচ্ছ অন্যের ঘরে দৃষ্টি!

যুবতী কাঁদিতে লাগিল। মাতাদীন এদিক ওদিক তাকাইয়া তাহার হাত ধরিয়া বুঝাইতে লাগিল—তুমি ওর পরোয়া করছ কেন ঝুনা, চলে গেছে তো চলে যেতে দাও। তোমার কিসের অভাব? টাকা-পয়সা, গয়না-গাঁটি, কাপড়-চোপড়, যা চাই আমার কাছ থেকে নাও।

ঝুনিয়া আস্তে আস্তে হাত ছাড়াইয়া লইল, আর পিছনে হটিয়া বলিল—সব তোমারি দয়া, মহারাজ! আমি তো কোনও জায়গারই নই। ঘর থেকেও গিয়েছি, এখান থেকেও গিয়েছি। না পেলাম সুখ, না হোল ধর্ম। দুনিয়ার রং-ঢং জানতাম না। ওর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে জালে ফেঁসে গেলাম।

মাতাদীন গোবরের নিন্দা করিতে শুরু করিল—ও তো একেবারে বাজারি লোক, না ঘরের, না পরের। দেখ, বাপ-মার সঙ্গে লড়াই। কোথাও পয়সা পেলে চট করে জুয়া খেলবে, চরস আর গাঁজায় তার তো প্রাণ পড়ে আছে। ইয়ারবন্ধুদের সাথে ঘোরা, বৌঝিদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা, এই ছিল ওর কাজ। থানার দারোগা সাহেব বদমায়েসির জন্য ওকে চালান দিতেন, আমরা অনেক খোসামোদ করে তবে ছাড়িয়ে আনি। অন্যের ক্ষেত খামার থেকে ধান উঠিয়ে নিয়ে আসত। কতবার তো ওকে ধরেই ফেলেছিল; গাঁয়ের নাম, বাড়ি কোথায়, এসব বুঝে তবে ছেড়ে দিল।

সোনা বাহিরে আসিয়া বলিল—বৌদি, মা বলেছে, ধান বের করে রোদে দাও, নইলে অনেক চোকলা বেরুবে। পণ্ডিত যেন গোলায় মণখানেক জল ঢেলে দিয়েছে।

মাতাদীন নিজের সাফাই গাহিল—তোদের ঘরে বুঝি বর্ষা হয় নাই? চার মাসে কাঠ পর্যন্ত নরম হয়ে যায়, ধান তো ধান!

এই কথা বলিতে বলিতে সে বাহিরে চলিয়া গেল। সোনা আসিয়া তাহার খেলা নষ্ট করিয়া দিল।

সোনা ঝুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল—মাতাদীন এসেছিল কি করতে?

ঝুনিয়া মাথা ঝাঁকিয়া বলিল—গোরু বাঁধার দড়ি চাচ্ছিল। আমি বলে দিয়েছি, এখানে দড়ি টড়ি নাই।

এ সব হল বায়না। বড্ড খারাপ লোক।

আমার তো মনে হয় খুব ভাল লোক। ওর মধ্যে খারাপটা কি?

তুমি জান না? সিলিয়া চামারনীকে রেখেছে।

তা এতেই লোক খারাপ হয়ে গেল?

আর কিসে লোককে খারাপ বলে?

তোমার ভাইয়াও তো আমাকে নিয়ে এসেছে। সে-ও খারাপ লোক?

এ কথার উত্তর না দিয়া সোনা বলিল—আমাদের বাড়ি আর কখনও এলে দূর করে দেব।

আর যদি ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে যায়?

সোনা লজ্জা পাইল—তুমি তো বৌদি গাল দিচ্ছ।

কেন, এর মধ্যে গালাগালের কি আছে?

আমায় যদি বলে, মুখে আগুন দিই।

তোমার বিয়ে কি হবে কোনও দেবতার সঙ্গে? গাঁয়ে এমন সুন্দর হাসিখুসি জোয়ান আর কে আছে?

তবে তুমি চলে যাও ওর সঙ্গে, সিলিয়ার থেকে লাখ গুণ ভাল হবে।

আমি কেন চলে যাব? আমি তো একজনের সঙ্গে চলে এসেছি, সে ভালই হোক আর মন্দই হোক।

আমিও তবে যার সঙ্গে বিয়ে হবে তার সঙ্গে চলে যাব, সে ভালই হোক আর মন্দই হোক।

আর যদি কোনও বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হয়?

সোনা হাসিল—আমি তার জন্য নরম-নরম রুটি তৈরি করব, তার ওষুধ কুটব-ছাঁকব, তাকে হাত ধরে তুলব, আর সে মরে গেলে মুখ ঢেকে কাঁদব।

আর যদি কোনও জোয়ানের সঙ্গে হয়?

তবে তোমার মাথা, নয় তো কি?

আচ্ছা বল, তোমার বুড়ো ভাল লাগে, না জোয়ান ?

যাকে ভাল লাগে সে-ই জোয়ান, যাকে না লাগে সে-ই বুড়ো।

অদৃষ্টে ঘটুক, তোমার বিয়ে কোনও বুড়োর সঙ্গে হয়, তখন দেখব তুমি কেমন তাকে ভালবাস। তখন তোমার মনে হতে থাকবে, কি করে এই হতভাগা মরে যায়, তাহলে কোনও জোয়ানকে নিয়ে বাস করি।

আমার তো সে বুড়োর ওপর দয়া হয়।

এ বৎসর এদিকে চিনির এক কল খোলা হইয়াছিল। তাহার কারিন্দা ও দালাল গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া কৃষকদের ক্ষেতের আখ দর করিয়া কিনিয়া লইত। সেই কল, মিঃ খান্না যেটা খুলিয়াছিল। একদিন তাহার কারিন্দা এ গ্রামেও আসিল। কৃষকেরা তাহার সঙ্গে দর দস্তর করিয়া বুঝিল, গুড় তৈয়ার করিলে কিছুই বাঁচে না। ঘরে বসিয়া আখের যদি ঐ একই দাম মেলে, তাহলে মাড়াইয়ের মেহনৎ করা কেন ? ক্ষেতের আখ বেচিবার জন্য সমস্ত গ্রাম প্রস্তুত হইল। দর কিছু কম পাইলেও পরোয়া নাই। তখ্‌খনি তো পাওয়া যাইবে ! কারো বলদের দরকার, কারো বাকি বকেয়া মিটাইতে হইবে, কেউ চায় মহাজনের কাছ থেকে মুক্তি। হরির বলদের দাম জোগাড় করা দরকার। এখনও আখের ফলন ভাল হয় নাই, এই জন্য ভয় ছিল যে বিক্রী বুঝি হইবে না। আর যখন গুড়ের দামে মিলের চিনি পাওয়া যাইবে, তখন গুড় লইবে কে ? সকলেই তো বায়না নিয়া নিয়াছে। হরির কমসে কম একশ টাকার আশা ছিল। তাতে এক সাধারণ গোরু আসিবে, কিন্তু মহাজনদের করিবে কি ? দাতাদীন, মংরু, দুলারী, ঝিংগুরী সিংহ, সকলে তো প্রাণ খাইয়া ফেলিল। যদি মহাজনদের দিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে এক শ টাকায় সুদই কুলাইবে না। এমন কোনও যুক্তি দেখা যায় না যে আখের টাকাটা হাতে আসিয়া যায়, আর কেহ জানিতে পারে না। বলদ যখন ঘরে আসিবে, তখন আর কে কি করিয়া লইবে ! গাড়ী জুড়িবে, তো সারা গাঁ দেখিবে, আখ ওজন করিয়া যে টাকা মিলিবে, তাহা সকলে আগেই টের পাইবে। এমন কি, মংরু আর দাতাদীন সঙ্গে সঙ্গে থাকাও সম্ভব। এদিকে টাকা হাতে আসিবে ওদিকে তারা ঘাড়ে ধরিবে।

সন্ধ্যায় আসিয়া গিরিধর জিজ্ঞাসা করিল—তোমার আখ কোন পর্যন্ত যাবে হরিকাকা ?

হরি ফাঁকি দিয়া বলিল—এখনও কিছু ঠিক হয় নাই ভাই, তুমি নিয়ে যাবে কবে?

গিরিধরও ফাঁকি দিল—এখনও তো আমার কিছু ঠিক নাই, কাকা!

অন্য সকলেও এমন ধারা 'উড়ন ঘাই' মারিতে লাগিল, কাহারও উপর কাহারও বিশ্বাস নাই। সকলেই ঝিংগুরী সিংহের ঋণী, আর সকলেরই ইচ্ছা, ঝিংগুরী সিংহের হাতে টাকা পড়িতে না পায়, তাহা হইলে ও তো সব হজম করিয়া ফেলিবে। পরের দিন চাষী যখন টাকা চাহিতে যাইবে, তখন নূতন কাগজ, নূতন নজরানা, নূতন তহুরি। পরের দিন শোভা আসিয়া বলিল—দাদা, এমন কিছু উপায় কর যেন ঝিংগুরীর কলেরা হয়। এমন পড়ে, যাতে আর উঠতে না হয়।

হরি মুচকি হাসিয়া বলিল—কেন, তার ছেলেপুলে নাই?

তার ছেলেপুলে দেখব, না নিজের ছেলেপুলে দেখব? ও তো দুই-দুইজন মেয়ে মানুষ রাখছে আরামে, আর এখানে তো একজনেরও শুকনো রুটি জোটে না, সমস্ত জমা নিয়ে নেবে, এক পয়সাও ঘরে আনতে দেবে না।

আমার অবস্থা তো আরও খারাপ ভাই, যদি হাত থেকে টাকা বেরিয়ে যায় তো একেবারে মারা পড়ব। গোরু বিনা কাজ চলবে না।

এখন তো দুই তিন দিন আখ বইতে লাগবে। যেমনই সমস্ত আখ পৌঁছে যাবে, অমনি জমাদারকে বলব, ভাই, কিছু নিয়ে নে; কিন্তু আখ চট্‌-পট্‌ ওজন কর, দাম দিস পরে। এদিকে ঝিংগুরীকে বলব, এখনো টাকা পাইনি।

হরি চিন্তা করিয়া বলিল—ঝিংগুরী সিং তোমার আমার চাইতে কতগুণ চতুর! শোভা গিয়ে মুনীমের সঙ্গে দেখা করবে, আর তার কাছ থেকেই টাকা নিয়ে নেবে। তুমি আমি চেয়ে থাকব। কল যে খান্নাবাবুর, মহাজনী কুঠিও সেই খান্নাবাবুরই। দুই-ই এক।

শোভা নিরাশ হইয়া বলিল—এ মহাজনি থেকে কখনো গলা বাঁচবে কি না জানি না।

হরি বলিল—এ জন্মে তো ভাই কোনও আশাই নাই। আমি রাজত্বও চাই না, ভোগবিলাসও চাই না, খালি মোটা পরা মোটা খাওয়া, আর সম্মানের সঙ্গে থাকতে চাই। তাও ঘটে না।

শোভা চালাকি করিয়া কহিল—আমি তো দাদা এদের সকলকে এখনই

চমকে দেব। জমাদারকে কিছু পাইয়ে এই কথায় রাজি করে নেব যে টাকা জন্য আমরা খুব দৌড়োদৌড়ি করব। ঝিংগুরী কত দূর দৌড়বে।

হরি হাসিয়া বলিল—এ সবে কিছু হবে না ভাই! ভাল চাও তো ঝিংগুরী সিংহের হাতে পায়ে ধর। আমরা জালে পড়ে গেছি। যতই ফড়-ফড় করবে, ততই বেশি শক্ত টানে পড়বে।

তুমি তো দাদা বুড়োর মত কথা বলছ। কাঠের খাঁচায় আটকে বসে থাকা তো কাপুরুষের কাজ। ফাঁস আরো শক্ত হয়ে লাগবে জোর করলে; কিন্তু গলা ছাড়িয়ে নিতে হলে জোর তো লাগাতেই হবে। এই তো হবে যে ঝিংগুরী ঘর দরজা নিলাম করে নেবে, নিক করে নিলাম! আমি তো চাই যে আমাদের টাকা না দিক; আমরা খিদেয় মরি, লাথি খাই, এক পয়সাও যেন কেউ ধার না দেয়; কিন্তু পয়সা যার আছে সে যদি ধার না দেয় তো সুদ পাবে কোথা থেকে? একজন আমার ওপর চাপ দেবে, তো আর একজন কিছু কম সুদে আমায় ধার দিয়ে নিজের জালে আমাকে ফাঁসিয়ে নেবে। আমি তো সেই দিন টাকা নিতে যাব, যে দিন ঝিংগুরী কোথাও চলে গিয়ে থাকবে।

হরির মনও নড়িয়া উঠিল—হাঁ, এটা ঠিক কথা।

আখ তুলিয়ে দেব। টাকা সুযোগ-সুবিধা দেখে নিয়ে আসব।

ব্যস ব্যস, এই চাল চালো।

পরের দিন প্রাতঃকালে গ্রামের কয়েকজন লোক আখ কাটিতে শুরু করিল। হরিও নিজের ক্ষেতে কাটারি লইয়া পৌঁছিল। ওদিক হইতে শোভাও আসিল তাহার সাহায্য করিতে। পুনিয়া, ঝুনিয়া, ধনিয়া, সোনা—সকলে ক্ষেতে আসিয়া গেল। কেহ আখ কাটে, কেহ বা তাহার ছাল উঠায়, কেহ আঁটি বাঁধে। মহাজনেরা লোককে আখ কাটিতে দেখা মাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়াইল। এক দিক হইতে দুলারী দৌড়ায়, অন্য দিক হইতে মংরু সাহ, আর এক দিক হইতে দাতাদীন, পটেশ্বরী ও ঝিংগুরীর পেয়াদা। দুলারীর হাতে পায়ে মোটা মোটা চাঁদির 'কড়া', কানে সোনার 'ঝুমকো', চোখে কাজল, বিগত যৌবনকে পালিশ করিয়া আসিয়া বলিল—আগে আমার পাওনা টাকা দাও, তবে আখ কাটতে দেব। আমি যতই চুপ করে যাই তোমরা ততই হও বাঘ। দু দু বছর এক আধলা সুদ দাও নাই, আমার সুদেই তো হয় পঞ্চাশ টাকা।

হরি নরম হইয়া বলিল—বৌ ঠাকরুণ, আখ কেটে নিতে দাও, এর টাকাটা

পাওয়া যাবে, তখন যতটা পারি তোমাকেই দেব। না যাচ্ছি গাঁ ছেড়ে পালিয়ে, না আসছে মরণ এত তাড়াতাড়ি। ক্ষেতে থাকলে তো আর আখ টাকা দেবে না!

দুলারী তাহার হাত থেকে আখ ছিনাইয়া লইয়া কহিল—তোমাদের ভাগ্য এত খারাপ হয়েছে তবু হুঁস হয় না!

আজ পাঁচ বৎসর হইল, হরি দুলারীর নিকট হইতে ত্রিশ টাকা লইয়াছিল। তিন বৎসরে তাহা দাঁড়াইয়াছিল একশ টাকায়, তখন দলিল লেখা হইল। দুই বৎসরে তাহার উপরে পঞ্চাশ টাকা সুদ বাড়িয়াছিল।

হরি বলিল—সাহুয়াইন, ভাগ্য তো কোনও দিন খারাপ করে নাই। যদি ভগবান করেন তবে পাই পয়সা পর্যন্ত শোধ করে দেব। আজ জব্দ হয়ে গেছি। যা ইচ্ছা বলে নাও।

সাহুয়াইনেরা যাইতে না যাইতে মংরু সাহ আসিল। মিশ কালো ভুঁড়ি কোমরের নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বড় বড় দুইটা দাঁত যেন কাটিয়া খাইবার জন্য সামনে দিয়া বাহির হইয়াছে, মাথায় টুপি, গলায় চাদর, বয়স এখনও পঞ্চাশের উপর নয়। চলে কিন্তু লাঠি ধরিয়া। গাঁঠে বাত হইয়াছিল; কাশিও ছিল। লাঠি ঘাড়ে করিয়া দাঁড়াইল, আর হরিকে দিল এক ধমক—আগে আমার টাকাটা দিয়ে দাও হরি, তবে আখ কেটো। আমরা টাকা ধার দিয়েছি, দানছত্র খুলি নাই। তিন তিন বছর গেল, না সুদ না ব্যাজ; কিন্তু ভেবো না, তুমি আমার টাকাটা হজম করে যাবে, তুমি মলেও তোমার লাশ থেকে আমি উশুল করে নেব।

শোভা রসিক লোক; বলিল—তাহলে ঘাবড়াচ্ছ কেন সাহজী, এদের লাশের থেকেই উশুল করে নিও। না হয়, দুই এক বছরের আগে-পিছে, দুজনেই তো স্বর্গে যাবে, সেখানে ভগবানের সামনেই হিসাব চুকিয়ে নিও।

মংরু শোভাকে ভালমন্দ বলিল বিস্তর—'জুয়াচোর' 'বেইমান' ইত্যাদি। 'নেওয়ার সময় তো লেজ নাড়ো খুব, দেওয়ার কথা হলেই গোঁ-গোঁ কর। বাড়ি বিক্রী করে নেব; বলদ-টলদ নিলাম করে নেব।'

শোভা আবার টিপ্পনী করিল—আচ্ছা, ঠিক ঠিক বলতো সাহজী, কত টাকা দিয়েছিলে যার থেকে এখন তিন শ টাকা হয়ে গেছে?

তুমি যদি বছর বছর সুদ না দেও, তবে আপনিই বেড়ে যাবে।

প্রথমটায় কত টাকা দিয়েছিলে তুমি, পঞ্চাশ টাকাই তো ?

কতদিন হয়ে গেছে, তা-ও তো দেখ।

পাঁচ ছয় বছর হবে ?

দশ বছর হয়ে গেছে, এগারো বছর চলছে।

পঞ্চাশ টাকায় তিন শ টাকা নিতে তোমার একটুও লজ্জা হয় না ?

লজ্জা হবে কেন, টাকা ধার দিয়েছি না দান খয়রাত চাইছি ?

হরি ইহাকেও কাকুতি মিনতি করিয়া বিদায় করিল। দাতাদীন হরির সঙ্গে ভাগে চাষ করিয়াছিল ; বীজ দিয়া আধা ফসল লইবে। এসময়ে কোন রহস্য করা নীতিবিরুদ্ধ। ঝিংগুরী সিংহ মিলের ম্যানেজারের নিকটে আগেই সব কিছু বলিয়া কহিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই পেয়াদা গাড়িতে আখ বোঝাই করিয়া নৌকা পর্যন্ত পৌছাইয়া আসিতেছিল। গাঁ হইতে নদী আধ মাইল। সারা দিনে এক গাড়ী সাত আট খেপ দিত। আর নৌকা এক খেপে পঞ্চাশ গাড়ীর বোঝা লইত। এইভাবে ব্যবস্থা করিয়া ঝিংগুরী সিংহ সমস্ত এলাকাটা সহজে হাতের মধ্যে রাখিয়াছিল।

ওজন শুরু হইতেই ঝিংগুরী সিংহ মিলের ফটকের উপর আসিয়া বসিল। প্রতিবার আখ ওজন করাইত, দামের 'পরচা' লইত, খাজাঞ্চির কাছ থেকে টাকা উশুল করিত, আর নিজের পাওনা কাটিয়া যাহা থাকিত তাহা চাষীকে দিয়া দিত। চাষী যত কাঁদুক চিৎকার করুক, কাহারও কথা শুনিত না। মালিকের এই হুকুম ছিল ; সে কী করিবে ?

হরি এক শ কুড়ি টাকা পাইল। তাহা হইতে ঝিংগুরী সিংহ নিজের পুরা টাকাটা সুদ সমেত কাটিয়া গোটা পঁচিশেক টাকা হরির সামনে ধরিল।

হরি টাকার দিকে উদাসীন ভাবে দেখিয়া বলিল—এ নিয়ে আমি কি করব ঠাকুর, এটাও তুমি নিয়ে নাও। আমার মজুরি অনেক জুটবে।

ঝিংগুরী মাটিতে পঁচিশ টাকা ছুঁড়িয়া কহিল—নেও কি ফেলে দেও, তোমারই খুসি। তোমার জন্যই মালিকের ধমক খেলাম, আর এখনো রায়-সাহেব মাথার উপর দাঁড়িয়ে যে দণ্ডের টাকা আদায় করবেন। তুমি গরিব বলে দয়া করে এত টাকা দিয়ে দিচ্ছি, নইলে এক আধলাও দিতাম না। যদি রায়সাহেব জোর করেন তো উলটে ঘর থেকে আরো টাকা দিতে হবে।

ধীরে ধীরে হরি টাকাটা উঠাইয়া লইল, বাহিরে আসিতেই নোখেরাম রুখিয়া

দাঁড়াইল। হরি গিয়া তাহার হাতে পঁচিশটি টাকা রাখিয়া দিল, আর কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি পালাইয়া গেল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। শোভাও এতগুলি টাকা পাইয়াছিল। সে বাহিরে যাইতেই পটেশ্বরী পথ আটক করিল।

শোভার সুর বদলাইল। বলিল—আমার কাছে টাকা নাই ; যা ইচ্ছা কর।

পটেশ্বরী গরম হইয়া বলিল--আখ বেচেছ, কি না ?

হাঁ, বেচেছি।

তোমার তো এই কথা ছিল যে আখ বিক্রী করে টাকা দেবে ?

হাঁ, ছিল তো।

তবে দেও নাই কেন ? আর সবাইকে দিয়েছ, কি না ?

হাঁ, দিয়েছি।

তাহলে আমাকে দিচ্ছ না কেন ?

আমার কাছে এখন যা কিছু বেঁচেছে, সব ছেলেপুলেদের জন্য।

পটেশ্বরী ধীর ভাবে বলিল—তুমি তো টাকা দেবেই শোভা, জোড় হাত করে দেবে, আজকেই দেবে। হাঁ, এখন যত চাও, ধোঁকা দাও। এক রিপোর্টের জোরে যাবে ছ মাসের জন্য, পূরো ছ মাসের জন্য, না একদিন বেশি না একদিন কম। এই যে রোজ জুয়া খেলছ, ও এক রিপোর্টে বেরিয়ে যাবে। আমি জমিদার-মহাজনের চাকর নই, সরকার বাহাদুরের চাকর—আর সে সরকার বাহাদুরের রাজত্ব হল দুনিয়াজোড়া, তিনি তোমার মহাজনেরও মালিক, জমিদারেরও মালিক।

পটেশ্বরীলাল চলিয়া গেল। শোভা ও হরি কিছুক্ষণ চুপচাপ করিয়া রহিল। মনে হইল, এই ধিক্কার উভয়ের সংজ্ঞা লোপ করিয়া দিয়া গেল। তখন হরি বলিল—শোভা, এর টাকাটা দিয়ে দাও। মনে কর, আখের ক্ষেতে আগুন লেগেছিল। আমিও সে কথা মনে করে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছি।

আহতকণ্ঠে শোভা বলিল—হাঁ, দিয়ে দেব দাদা। না দিলে যাব কোথায় ?

সামনে দিয়া গিরিধর তাড়ি খাইয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে চলিয়া যাইতেছিল। দুইজনকে দেখিয়া বলিল—ঝিংগুরিয়া গোটাকে গোটা সব নিয়ে গেল হরি কাকা! কামড়ে থাকব, তারও এক পয়সা রাখল না। খুনে কোথাকার! পড়ে পড়ে কাঁদলাম ; তবু পাপিষ্ঠের দয়া হল না।

শোভা বলিল—তাড়ি তো খেয়েছ, তবু বলছ—এক পয়সাও ছাড়ে নাই!

গিরিধর পেট দেখাইয়া বলিল—সন্ধ্যা হয়েছে, এক ফোঁটা জলও যদি গলার তল হয়েছে, তো গোমাংস খেয়েছি। এক আনি একটা মুখে চেপে ছিলাম ; তাই দিয়ে তাড়ি খেলাম। ভাবলাম, বছরভর মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছি, তো একদিন তাড়ি খেয়ে নিই। কিন্তু সত্যি বলছি, নেশা হয় নাই। এক আনায় আবার নেশা হবে কি ! হাঁ, টলছি বটে, যাতে লোকে মনে করে খুব টেনেছি। বড় ভালো হয়েছে কাকা, সব গেছে ! নিয়েছিলাম কুড়ি, তার জায়গায় হয়েছে এক শ যাট, কিছু কম আছে।

হরি ঘরে গেল, আর রূপা ছুটিল জল লইয়া, সোনা আসিল ছিলিম ভরিয়া, ধনিয়া নুন মুড়ি আনিয়া রাখিল, সকলে আশাভরা চাহনিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। ঝুনিয়াও চৌকাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। হরি উদাস হইয়া বসিয়াছিল। কি করিয়া মুখ-হাত ধোয়, কি করিয়া মুড়ি খায় ! এত লজ্জা, এত গ্লানি, যেন খুন করিয়া আসিয়াছে।

ধনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কত টাকার ওজন হল ?

এক শ কুড়ি পেয়েছিলাম ; কিন্তু ওখানেই সব লুট হয়ে গেল। আধলাও বাঁচল না।

ধনিয়ার মাথা হইতে পা পর্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল ; মনে এত উদ্বেগ বাড়িল যে নিজের মুখ নিজেই আঁচড়ায়। বলিল—তোমার মত বোকা লোক ভগবান কেন গড়েছেন, কোথাও দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতাম। তোমার সঙ্গে থেকে সারা জীবন পুড়ে খাক হয়ে গেল, ভগবান মরতেও দেন না যে জঞ্জাল থেকে মুক্ত হই। হাতে ধরে সমস্ত টাকা বোনাইদের দিয়ে দিলে ! এখন আর কোথা থেকে টাকা আসবে, যা দিয়ে গোরু আনবে ! হালে কি আমাকে জুতবে, না নিজেকে জুতবে ? আমি বলছি, বুড়ো হলে, এতটুকু আক্কেল হল না যে গোরুর টাকাটা বের করে রাখ ! কে আর তোমার হাত থেকে কেড়ে রাখত ! পৌষের শীত, কারো গায়ে একটু ন্যাকড়া নাই। নিয়ে যাও সকলকে, নদীতে ডুবিয়ে দাও। তিল তিল করে মরার চাইতে এক দিনে মরে যাওয়াও ভাল। কত দিন পোয়ালে ঢুকে রাত কাটবে, আর পোয়ালে ঢুকেও পোয়াল খেয়ে তো থাকা যাবে না ! তোমার ইচ্ছা হলে ঘাস খাও, আমাকে দিয়ে বাপু ঘাস খাওয়া হবে না।

এই বলিতে বলিতে সে একটু হাসিয়া ফেলিল। এতক্ষণ পরে সে বুঝিতে

পারিল যে মহাজন যখন মাথায় আসিয়া চাপে, আর নিজের হাতে টাকা থাকে ও মহাজন জানে যে এর হাতে টাকা আছে, তখন আর চাষী কি করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে।

মাথা নীচু করিয়া হরি নিজের ভাগ্য ভাবিয়া দুঃখ করিতেছিল, ধনিয়ার মুচকি হাসি তাহার চোখে পড়িল না। বলিল—মজুরি তো মিলবে। মজুরি করে খাব।

ধনিয়া প্রশ্ন করিল—কোথায় এ গাঁয়ে মজুরি! আর কোন মুখে মজুরি করবে? লোকে মোড়ল বলে না!

হরি ছিলিমে কয়েকবার জোর টান দিয়া বলিল—মজুরি করায় কোনও পাপ নাই। মজুরের অবস্থা ভাল হয়ে যায় তো কৃষাণই হয়, কিষাণের অবস্থা খারাপ হলে মজুর হয়ে যায়। মজুরি করা অদৃষ্টে না থাকলে এ সব বিপদ আসত কোথা থেকে? গোরু মরত কেন? ছেলে উপযুক্ত না হয়েও কেন চলে যেত?

ধনিয়া পুত্রবধূ ও মেয়ের দিকে তাকাইয়া বলিল—তোমরা সকলে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও, নিজের নিজের কাজ কর গিয়ে। যারা হাট-বাজার থেকে আসে, আসবার সময় ছেলেপিলেদের জন্য দু-চার পয়সার কোনও জিনিস নিয়ে আসে, তারা হল অন্য ধরণের লোক। এখানে তো লোভ লেগে আছে, টাকা ভাঙ্গাবে কি করে? কমে যাবে না! এই জন্য এদের রোজগার হয় না! যারা খরচ করে, তারাই পায়। যারা খেতে পারে না, পরতে পারে না, তাদের কাছে টাকা আসবে কেন? মাটিতে পুঁতে রাখবার জন্য?

হরি খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল—কোথায় আছে, সেই যে পুঁতে রাখা টাকাটা?

যেখানে রেখেছিলে, সেখানেই থাকবে। এটাই তো দুঃখের কথা যে জেনেও পয়সার জন্য মর। চার পয়সার কোনও জিনিস নিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের হাতে দিতে, তাহলে আর জলে পড়ত না। ঝিংগুরীকে বলতে যে আমায় একটা টাকা দিয়ে দাও, নইলে এক পয়সাও দেব না, এসে আদালতে নিয়ে যেও, তাহলে ও নিশ্চয় দিয়ে দিত।

হরি লজ্জা পাইল। ও যদি চট করিয়া পঁচিশ টাকা নোখেরামকে না দিত, তাহা হইলে নোখে লইত কি করিয়া! বড় জোর, বকেয়ার উপর দুই চার আনা সুদ নিয়া নিত; এখন তো সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

ঝুনিয়া ভিতরে গিয়া সোনাকে বলিল—আমার তো বাবাকে দেখে ভারি দয়া হয়। বেচারা সারাদিন খেটে-খুটে ঘরে এল, তো মা রাগ করতে লাগল। মহাজন টুঁটি চেপে ধরেছে, বাবা কি করবে ?

বলদ আসবে কি করে তবে ?

মহাজন চায় তার টাকা। তোমাদের দুঃখের কথায় তার কি আসে যায় ?

মা ওখানে থাকলে মহাজনকে মজা দেখিয়ে দিতেন। হতভাগা পালিয়ে বাঁচত।

ঝুনিয়া ঠাট্টা করিল—তা এখানে টাকার অভাব কি ? তুমি মহাজনদের একটু হেসে কথা বল, দেখ সমস্ত টাকা ছেড়ে দেয় কি না। সত্যি বলছি, বাবার সমস্ত দুঃখ দারিদ্র দূর হয়ে যায়।

সোনা দুই হাতে তাহার মুখ চাপিয়া বলিল—ব্যস, চুপ কর, নইলে বলে দেব। এখ্খুনি গিয়ে মাকে মাতাদীনের সমস্ত কথা খুলে বলি তো কাঁদতে শুরু করবে।

ঝুনিয়া প্রশ্ন করিল—কি বলে দিবি মাকে ? বলবার মত কথা হোক। যখন কোনও বায়নায় ও ঘরে এসে যায়, তখন কি বলব, বেরিয়ে যাও ? আমার কাছ থেকে কিছু নিয়ে তো যায় না, নিজেরই কিছু দিয়ে যায়, মিষ্টি মিষ্টি কথা ছাড়া ও ঝুনিয়ার কাছ থেকে কিছু পেতে পারে না। আর নিজের মিষ্টি কথাকে বেশি দামে বিক্রী করাও আমার আসে। আমি এত বোকা নই যে কারো ফাঁদে পড়ে যাব। হাঁ, যখন জানতে পারব যে তোমার দাদা ওখানে কাউকে রেখে নিয়েছে, তখন অন্য কথা, তখন আমার ওপর কারো কোন বন্ধন থাকবে না। এখন তো আমার বিশ্বাস যে ও আমারই আছে, আর আমারই জন্য ওকে পথে পথে ঘা খেতে হচ্ছে। হেসে কথা বলা আলাদা জিনিস ; কিন্তু আমি ওর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব না। যে এক হতে দুজনের হয়, সে কারুরই থাকে না।

শোভা আসিয়া হরিকে ডাকিল, আর পটেশ্বরীর টাকা তাহার হাতে দিয়া কহিল—দাদা, তুমি গিয়ে এই টাকাটা লালাকে দিয়ে দাও। আমার তখন কে জানে কেমন ধারা হয়ে গিয়েছিল।

হরি টাকাটা লইয়া উঠিতেই শঙ্খধ্বনি কানে আসিল। গাঁয়ের ওই মাথায় ধ্যানসিংহ নামে এক ঠাকুর থাকিত। পলটনে কাজ করিত, আর কিছুদিন হইল, দশ বৎসর পরে, ছুটি লইয়া ফিরিয়াছে। বোগদাদ, এডেন, সিংগাপুর,

বর্মা—চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এখন বিয়ে করার নেশায় আছে, তাই পূজাপাঠ করিয়া ব্রাহ্মণদের প্রসন্ন রাখিতে চাহিতেছে।

হরি বলিল—বুঝলাম, সাত অধ্যায় শেষ হয়েছে, আরতি হচ্ছে।

শোভা বলিল—হাঁ, জানা তো যাচ্ছে, চলো প্রসাদ নিয়ে আসি।

হরি চিন্তিতভাবে বলিল—তুমি যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

যেদিন ধ্যানসিংহ আসিয়াছিল, সকলেরই বাড়ি বাড়ি এক এক সের মিঠাই পাঠাইয়াছিল। রাস্তায় হরির সঙ্গে দেখা হইলে কুশল প্রশ্ন করে। তাহার বাড়িতে কথকতায় গিয়া আরতিতে কিছু না দেওয়া অপমানের ব্যাপার।

আরতির থালা তাহারই হাতে হয়তো। তাহার সামনে হরি কি করিয়া খালি হাতে প্রসাদ লইবে? তার চেয়ে কথকতায় না যাওয়াই তো ভাল। এত লোকের মধ্যে কি আর উহার মনে থাকিবে যে হরি আসে নাই? কেহ তো আর রেজিস্টারি লইয়া বসিয়া নাই যে কে আসিল, আর না আসিল তাহা টুকিয়া রাখিবে? সে গিয়া খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল।

কিন্তু ওর প্রাণটা উস্‌-খুস্‌ করিতে লাগিল। হাতে একটা পয়সাও নাই! তামার একটা পয়সা! আরতির পুণ্য ও মাহাত্ম্যের কথা ওর মনে একেবারেই ছিল না। কথকতা তো শুধু সামাজিক ব্যাপার; ঠাকুরজীর প্রসাদ তো সে শুধু শ্রদ্ধার উপহার দিয়া লইতে পারিত, কিন্তু কি করিয়া মান-সম্ভ্রম খোয়ায়, সকলের চোখে ছোট হয় কি করিয়া!

হঠাৎ সে উঠিয়া বসিল। কেন মান-সম্ভ্রমের গোলামি করিব? মান-সম্ভ্রমের জন্য প্রসাদের পুণ্য ছাড়িবে কেন? লোকে হাসিবে; হাসুক। তাহাতে পরোয়া নাই। ভগবান তাহাকে কুকর্ম হইতে বাঁচাইয়া রাখুন। সে আর কিছু চায় না।

ঠাকুরজীর বাড়ির দিকে সে চলিতে আরম্ভ করিল।

১৮

খান্না আর গোবিন্দীর বনে না। কিন্তু কেন যে বনে না, তাহা বলা কঠিন। জ্যোতিষ মতে উহাদের গ্রহের কিছু অমিল আছে, অথচ বাপ-মা বিবাহের সময় গ্রহনক্ষত্র খুব মিলাইয়া লইয়াছিল। কামশাস্ত্রের মতে হয়তো এই অবনিবনার

কোনও কারণ আছে, আবার মনোবিজ্ঞানেও হয়তো ইহার কারণ নির্দেশের চেষ্টা হইবে। আমি শুধু এই জানি যে উহাদের বনিবনাও হইল না। খান্না ধনী, সুরসিক, সামাজিক, রূপবান, পণ্ডিত, আর শহরে পাঁচজনের একজন। গোবিন্দী দেখিতে অপ্সরা না হইলেও সুন্দরী, গায়ের রং পাকা ধানের মত, চক্ষু দুটি লজ্জানম্র, লোকের সম্মুখে একবার চোখ উঁচু করিয়াই আবার নামাইয়া লয়। গাল দুইটি লাল না হইলেও মসৃণ, চিক্কণ, গাঁয়ের চামড়া কোমল, অঙ্গের গড়নটি সুডৌল, বাহু দুটি গোল, পুষ্ট ; মুখের ভাবে একটু গর্বমিশ্রিত বিরক্তির প্রকাশ, মনে হয় যেন সংসারের কার্যকলাপে উহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। খান্নার গৃহে বিলাসের উপকরণের অভাব নাই, পয়লা নম্বরের বাড়ি, পয়লা নম্বরের আসবাব-পত্র, পয়লা নম্বরের মোটরকার, আর আছে অপার ধন ; কিন্তু গোবিন্দীর চোখে এসবের যেন কোনই মূল্য নাই। এই লবণ সমুদ্রে ও থাকে পিপাসী। ছেলেপুলের দেখাশোনা আর ঘরের ছোটখাটো কাজ, ইহাই ওর কাছে সর্বস্ব। ও এই সব কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে ভোগের দিকে ওর খেয়ালই হয় না। আকর্ষণ কি জিনিস, আর কেমন করিয়া অনুরাগ জন্মানো যায়, এসব নিয়া সে কখনও মাথা ঘামায় না। ও পুরুষের খেলনা নয়, ভোগের বস্তুও নয়, কাজেই আকর্ষণ করিবার চেষ্টাই বা ও কেন করিবে ; যদি উহার আসল সৌন্দর্য দেখিবার চক্ষু পুরুষের না থাকে, পুরুষ যদি সুন্দরী মেয়ের পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে তাহা পুরুষেরই দুর্ভাগ্য। ও এমন নিখুঁত প্রেম আর নিষ্ঠার সঙ্গে পতিসেবা করে যেন হিংসা, দ্বেষ, মোহ, এসব ভাবনাকে ও জয় করিয়া লইয়াছে। এই অতুল ঐশ্বর্য তো ওর মনকে, ওর আত্মাকে পীড়াই দেয়। এই আড়ম্বর, এই ভণ্ডামি হইতে মুক্ত হইবার জন্য ওর মন সর্বদা ব্যাকুল। নিজের সরল স্বাভাবিক জীবনে ও কত সুখী হইতে পারিত—ইহাই এখন উহার নিত্যকার স্বপ্ন। তবে কেন মালতী উহার পথে আসিয়া বাধা দেয়, কেন বাড়িতে বাইজীদের মুজরা হয়, কেন এই সন্দেহ, অনৈক্য আর অশান্তি উহার জীবনপথে কাঁটার মত আসিয়া দাঁড়ায়! যখন ও বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িত, তখন উহাকে কবিতা লেখার রোগে ধরিয়াছিল। ও লিখিত, দুঃখ আর বেদনাই জীবনের তত্ত্ব ; সম্পত্তি, বিলাস আর ঐশ্বর্য তো জীবনকে কেবল দগ্ধ করে, আর মানুষকে অসত্য ও অশান্তির দিকে লইয়া যায়। ও এখনও মাঝে মাঝে কবিতা লেখে, কিন্তু শোনাইবার লোক কই? ওর কবিতা কেবল মনের ভাবতরঙ্গ নয়, যাহা

উঠে আর পড়ে ; ওর কবিতার প্রতি কথায় আছে মর্মের ব্যথা আর চোখের জল ; ওর সাধ যায় এমন কোন দেশে গিয়া বাস করিতে, যেখানে এই ভোগবাসনা আর কৃত্রিমতা থাকিবে না, যেখানে শান্তিপূর্ণ কুটীরে ওরা আনন্দে জীবন কাটাইবে। খান্নার হাতে ওর কবিতা পড়িলে কখনও কখনও ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিত, কখনো বা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিত। আর ঐশ্বর্যের এই দেওয়াল দিন দিন স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে লাগিল। খান্না নিজের মক্কেলদের কাছে যেমনই নম্র আর সৌজন্যপরায়ণ, ঘরে ঠিক তেমনই কটুভাষী আর দুর্দান্ত। সে হরদম রাগ করিয়া গোবিন্দীকে যা তা বলিয়া ফেলে, ওর শিষ্টতা দুনিয়াকে প্রতারণা করিবার একটা উপায় মাত্র, মনের সংস্কার নয়। ঐ সব সময়ে গোবিন্দী নিজের কোণের ঘরটিতে গিয়া বসিত, আর রাতের পর রাত কাঁদিয়া কাটাইত ; খান্না হয় ক্লাবে গিয়া মদ খাইত, নয়তো নাট্যশালায় গিয়া নাচ গানে বিভোর হইয়া থাকিত। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও খান্নাই ছিল গোবিন্দীর সর্বস্ব ; দলিত, অপমানিত হইয়াও ও খান্নার চরণের দাসী হইয়া থাকিত ; উহার সঙ্গে ঝগড়া করিবে, কান্নাকাটি করিবে, উহার ব্যবহারে মর্মজ্বালায় জ্বলিবে, তবু স্বামীর কাছ হইতে দূরে থাকিবার কথা ও কল্পনাও করিতে পারে না।

আজ না জানি কাহার অশুভ মুখ দেখিয়া খান্না ঘুম থেকে উঠিয়াছে। ভোরবেলা কাগজ খুলিয়াই দেখে উহার কত গুলি শেয়ারের দাম নামিয়া গিয়াছে, তাহার দরুণ বেশ কয়েক হাজার টাকা লোকসান হইল। [illegible] পাওয়া গেল, চিনির কলে মজুররা হরতাল করিয়াছে, আবার দাঙ্গাহাঙ্গামা কর[illegible]ন্যও প্রস্তুত। লাভের আশায় রূপা কিনিয়াছিল, কিন্তু আজ দেখিল উহার দর আরো নামিয়া গিয়াছে। রায়সাহেবের সঙ্গে যে ব্যবসায়ে বেশ একটু লাভের আশা ছিল, আজ কয়েক দিন যাবৎ তাহারও একটু টলমল অবস্থা। তা ছাড়া রাত্রি বেলা পানের মাত্রা একটু অতিরিক্ত হওয়ায় আজ মাথা ভার ভার, শরীর যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে। ওদিকে ড্রাইভার বলিতেছে, গাড়ীর ইঞ্জিন কিছুটা বিগড়াইয়াছে। তাহার উপর খবর আসিয়াছে, উহার লাহোর ব্যাঙ্কের উপর এক দেওয়ানী মামলা রুজু হইয়াছে। খান্না বসিয়া বসিয়া এসব কথা ভাবিতেছিল, এমন সময় গোবিন্দী আসিয়া বলিল, ভীষ্মের জ্বর তো আজও ছাড়ল না, ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।

ভীষ্ম উহার কনিষ্ঠ পুত্র, জন্মাবধি দুর্বল বলিয়া উহার রোজই একটা না একটা রোগ লাগিয়া আছে। আজ কাসি, কাল জ্বর, কখনও হলুদ বা সবুজ রঙের দাস্ত,

কখনও বা আর কিছু। দশ মাসের হইয়াছে, কিন্তু দেখায় যেন পাঁচ ছয় মাসের। খান্নার ধারণা হইয়াছিল, এ ছেলে বাঁচিবে না, সেজন্য ইহার বিষয়ে সে উদাসীন; গোবিন্দীর কিন্তু এই জন্যই সকলের চেয়ে ইহার উপরে বেশি টান।

পিতার যে রকম স্নেহ থাকা উচিত তেমন স্নেহের ভাব দেখাইয়া খান্না বলিল, ছেলেদের অত ওষুধ খাওয়ানোর অভ্যাস ভাল নয়, আর তুমি রাতদিন ওকে ওষুধ খাওয়াতে চাও। একটু কিছু হোল, কি, অমনি ডাক্তার ডাক। আজ তো মোটে তিন দিন, আর একটা দিন দেখ, সম্ভব আজ জ্বরটা আপনা আপনি ছেড়ে যাবে।

গোবিন্দী আগ্রহের স্বরে বলিল, তিন দিন হয়ে গেল, ঘরোয়া ওষুধ দিয়ে হার মেনে গেলাম।

খান্না বলিল, বেশ, ডাকাই ডাক্তারকে, কিন্তু কাকে ডাকবে ?

ডাক্তার নাগকে ডাকতে পাঠাও।

আচ্ছা, তাই হবে, ওঁকেই ডাকছি, কিন্তু মনে রেখো, নাম থাকলেই ভাল ডাক্তার হয় না। নাগ যতই ফি নিক না কেন, ওর ওষুধে আজ পর্যন্ত কাউকে ভালো হোতে তো দেখলাম না। ও তো রুগীকে স্বর্গলাভ করাতে ওস্তাদ।

তা, তোমার যাকে খুসি ডাক। ডাঃ নাগ কবার এসে ওকে দেখেছেন, তাই আমি তাঁর কথা বললাম।

আচ্ছা, মিস মালতীকে কেন ডাকাই না ? ওর ফি কম, তা ছাড়া ছোট ছেলেদের ক[illegible] লেডী ডাক্তার যেমন বুঝবে, পুরুষ ডাক্তারে তেমন পারবে না।

গোবিন্দী জ্বলিয়া উঠিল, মিস মালতী আবার ডাক্তার নাকি ?

খান্নাও রাগত চোখে চাহিয়া বলিল, তবে ও বুঝি ইংলণ্ডে গিয়েছিল শুধু ঘাস খেতে ? আর এই যে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাচ্ছে, এসব কি ?

তা হবে, তবে আমার ওর ওপর ভরসা নেই। ও খালি পুরুষের মন কাড়তে পারে, আর কোন রোগের ওষুধ ওর জানা নেই।

ব্যস, লাগিয়া গেল। খান্নার তর্জন গর্জন শুরু হইল। গোবিন্দীর চোখে বান ডাকিল। উহাদের দুজনের মাঝে মালতীর নাম ওঠা মানেই যে লড়াইয়ের পূর্বাভাস।

সমস্ত কাগজপত্র মাটিতে ফেলিয়া দিয়া খান্না বলিল, তোমার সঙ্গে থেকে জীবনটা মাটি হয়ে গেল, এবার সব সম্পর্ক শেষ।

গোবিন্দী বলিল, তবে মালতীকে বিয়ে কর না কেন? ঐ যদি মতলব হয়, তবে এখনই বা বাধা কি?

তুমি আমাকে কি মনে কর বল তো!

বলবো? আমি জানি, মালতী চায় তোমাকে গোলাম করে রাখতে, বিয়ে করতে নয়।

তোমার চোখে আমি তবে এতই নীচ!

বলিয়াই ও আরম্ভ করিল যত বিরুদ্ধ প্রমাণ দিতে। মালতী ওকে যেমন টানে, আর পাঁচজনকেও তেমনই টানে। রায়সাহেব ও রাজাসাহেবের তো এমন কিছু পরোয়া করে না, তবু একদিন দেখা না হইলে ব্যস্ত হয়।

এত সব প্রমাণও কিন্তু গোবিন্দী এক ফুঁয়ে উড়াইয়া দিল—এই জন্যেই বোধ হয় যে, ও তোমাকে সব চেয়ে বেশি অন্ধ মনে করে, আর কাউকে এত সহজে বোকা বানাতে পারে না।

খান্না খোঁচা দিল, গোবিন্দী যদি চায় ও আজই মালতীকে বিয়ে করিতে পারে, আজই, এখনই…

কিন্তু গোবিন্দীর মোটেই বিশ্বাস হইল না—তুমি সাতজন্ম নাক ঘসলেও ও তোমাকে বিয়ে কোরবে না। তুমি ওর টাট্টু হয়েছ, ও তোমাকে ঘাস খাওয়াবে, কখনো কখনো তোমার মুখে হাত বুলোবে, কখনো লেজে; সবই করবে, তোমার ওপর চড়ে বেড়াবে বলে। তোমার মত হাজারটি বোকা ওর পকেটে আছে।

গোবিন্দী আজ বড়ই বাড়াইয়া তুলিয়াছে। মনে হয়, আজ ও স্বামীর সঙ্গে লড়াই করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে, ডাক্তার ডাকিবার কথাটা অছিলা মাত্র। নিজের পৌরুষ আর শক্তির উপর এমন ধারা কটাক্ষ খান্না কেমন করিয়া সহ্য করে?

সে বলিল, তোমার মতে আমি যতই বোকা হই, কিন্তু সেই আমারই দোরে এই হাজার হাজার লোক নাক রগড়ায়। এমন কটা রাজা জমিদার আছে যে আমার কাছে মাথা নোয়ায় না? কতজনকেই না উল্লুক বানিয়ে ছাড়ছি আমি।

এই তো মালতীর বিশেষত্ব, লোকে যদি সোজা পথে চলে; ও চলে উলটো পথে।

তুমি মালতীকে যতই খারাপ বল, তুমি ওর পায়ের ধূলোও নও।

আমার চোখে ও বেশ্যাদেরও ছাড়িয়ে গেছে। কারণ ও পর্দার আড়ালে থেকে শিকার খেলিয়ে বেড়ায়।

দুই জনেই নিজের নিজের অগ্নিবাণ ছাড়িয়া দিল। খান্না গোবিন্দীকে অন্য কথা যতই কঠোর করিয়া বলুক, ওর এতটা খারাপ লাগিত না; কিন্তু ঘৃণিত মালতীর সঙ্গে নিজের এই তুলনা ওর সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। গোবিন্দীও খান্নাকে আর যাহা কিছু বলুক, সে এত গরম হইয়া উঠিত না, কিন্তু মালতীর এই অপমান তাহার সহ্য হইল না।

উভয়ে উভয়ের দুর্বলতার কথা জানিত। দুই জনেরই লক্ষ্য ঠিক জায়গায় গিয়া লাগিয়াছে, তাই দুই জনেই জ্বলিয়া উঠিল। খান্নার চোখ লাল হইয়া গেল, গোবিন্দীর মুখ হইল রক্তবর্ণ। সংযম হারাইয়া খান্না গোবিন্দীর দুই কান ধরিয়া জোরে টানিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটি চড়ও বসাইয়া দিল। গোবিন্দী কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার নাগ আসিলেন, আর আসিলেন সিভিল সার্জন মিঃ টাড্ ও ভিষগাচার্য নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী। কিন্তু গোবিন্দী শিশুকে লইয়া ঘরেই বসিয়া রহিল, কে কি বলিয়াছে, কি ক্ষতি হইল, তাহা যেন কিছুই উহার বোধগম্য হইতেছে না। যে বিপদের আশঙ্কা সে করিত, তাহাই আজ শিয়রে আসিয়া উপস্থিত। খান্না আজ যেন তাহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, যেন উহাকে ঘর হইতে খেদাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যে রূপের বাজার মিলাইয়া বসিয়া থাকে, যাহা ছুঁইয়া ও মাড়াইতে চায় না, সে-ই কিনা পরোক্ষে উহাকে শাসন করিতে বসিয়াছে! এ হইতে পারে না। খান্না ওর স্বামী, সে ওকে বুঝাইতে পড়াইতে পারে; উহার মারও গোবিন্দী মাথা পাতিয়া লইবে, কিন্তু মালতীর শাসন! অসম্ভব। কিন্তু ছেলেটার জ্বর যতদিন না ছাড়ে, ও নড়িতে পারিবে না। কর্তব্যের কাছে আত্মাভিমানকে মাথা নত করিতেই হইবে।

পরের দিন শিশুর জ্বর ছাড়িয়া গেল। গোবিন্দী একটি টাঙ্গা আনাইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। যেখানে উহার এত অনাদর, সেখানে ও কেমন করিয়া থাকিবে? আঘাত এতই বাজিয়াছিল যে সন্তানের মায়াও সে কাটাইয়া উঠিল। উহাদের প্রতি ওর যা কর্তব্য তা ও করিয়াছে, এখন যাহা বাকি তাহা খান্নার কাজ। হাঁ, কোলের ছেলেটিকে ছাড়িতে ওর শক্তিতে

ফুলাইল না, ওর যে মায়ের প্রাণ। এই ঘর হইতে ও কিছুই লইবে না। কিছুই তো ওর নয়। স্বামী ভাবে উহাকে পালন করিতেছে, ও দেখাইয়া দিবে উহার আশ্রয় হইতে চলিয়া গেলেও ও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। শিশু তিনটি ঐ সময়টা খেলিতে গিয়াছিল। গোবিন্দীর মনে হইল, একবার ডাকাইয়া আনিয়া উহাদের একটু আদর করে ; আবার ভাবিল, সে তো কোথাও পলাইয়া যাইতেছে না। ছেলেরা যদি ওকে ভালবাসে তবে ওর কাছে গিয়া খেলাধূলা করিবে ; পরে যদি দরকার মনে করে, ও নিজেও আসিয়া ছেলেদের দেখিয়া যাইবে ; কেবল খান্নার আশ্রয়ে ও আর থাকিবে না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। পার্কে জলসা ছিল। সবুজ ঘাসের উপর বসিয়া লোকে আমোদ করিতেছিল। গোবিন্দী হজরতগঞ্জ হইয়া চিড়িয়াখানার দিকে ঘুরিয়াছে। এমন সময় সম্মুখে দেখিল গাড়ীতে করিয়া আসিতেছে খান্না আর মালতী। উহার মনে হইল, খান্না উহার দিকে ইশারা করিয়া কি বলিল, আর মালতী হাসিয়া উঠিল। না, উহার ভুলও হইতে পারে। খান্না মালতীর কাছে উহার নিন্দা করিবে না, কিন্তু কি নির্লজ্জ! শোনা যায় ডাক্তারিতে ওর যথেষ্ট পশার, ঘরের অবস্থাও বেশ ভালো, তবু নিজেকে এ ভাবে বেচিয়া বেড়ায়! বিবাহই বা করে না কেন? অবশ্য কেই বা ওকে বিবাহ করিবে? না, তাহা ঠিক নয়। পুরুষের মধ্যে এমন অনেক গাধা আছে যাহারা উহাকে বিবাহ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিবে। কিন্তু মালতীর নিজেরও নিশ্চয় তাহাকেও পছন্দ হয় না। অবশ্য, বিয়েতে সুখই বা কি? যে বিয়ে না করে সে ভালই করে। এখন সবাই ওর গোলাম, বিয়ে করিলে ও-ই হইবে কেনা দাসী। বেশ আছে। এখন তো এই মহাশয়টিও ওর পায়ের তলা চাটিতেছেন। তাহাকেই যদি বিবাহ করে, তখন শাসন করা শুরু হইবে। কিন্তু একে মালতী কেন বিবাহ করিবে! সমাজে দুই চার জন এমন মেয়ে থাকা মন্দ নয়, অন্তত পুরুষদের কান তো মলিয়া দিতে পারে। আজ গোবিন্দীর মনে মালতীর উপরে বেশ সহানুভূতি জন্মিল। মালতীকে মন্দ বলিয়া ও অন্যায়ই করিয়াছে। তাহার দশা দেখিয়া উহার কি চোখ খুলিবে না? বিবাহিত জীবনের দুর্গতি চোখে দেখিয়া এ ফাঁস যদি ও গলায় না পরে, তবে ওকে কি দোষ দেওয়া যায়?

চিড়িয়াখানার চারিদিকে বেশ সুন্দর ছায়া নামিয়াছে। গোবিন্দী টাঙ্গা

থামাইয়া যেখানে সবুজ দূর্বাঘাসের উপর শিশুরা বসিয়া খেলা করিতেছিল, সেই দিকে চলিল, কিন্তু দুই তিন পা না যাইতেই ঘাসের নীচেকার জলে ওর পায়ের চপ্পল ভিজিয়া গেল। অল্পক্ষণ আগেই লনের জল সেঁচিয়া ফেলা হইয়াছিল। তবু ঘাসের নীচে জল থাকিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় পিছন না ফিরিয়া ও যেই আর এক পা বাড়াইয়াছে অমনি কাদায় ওর পা আটকাইয়া গেল। পায়ের দিকে চাহিয়া ও ভাবিল, এখানে পা ধোওয়ার জল কোথায় পাই? উহার মনের ব্যথা তখন লোপ পাইয়াছে। পা ধুইবার চিন্তাই এখন প্রধান। যত ক্ষণ পা ধোওয়া না হয়, ও আর কিছু চিন্তা করিতে পারিবে না।

হঠাৎ চোখে পড়িল, ঘাসের মধ্যে একটা জলের পাইপ লুকানো আছে। পাইপের জলে ও পা, চপ্পল, হাত, মুখ সব ধুইল, একটু জল আঁজলা করিয়া নিয়া খাইল, তাহার পর পাইপের ওধারে শুকনো মাটির উপর গিয়া বসিল। উদাসী মনে বৈরাগ্য আর মৃত্যুচিন্তা শীঘ্রই আসে। ও যদি এখানে বসিয়া মরিয়াই যায়, তবে কি হয়? টাঙ্গাওয়ালা নিশ্চয় তাড়াতাড়ি গিয়া খান্নাকে খবর দেয়। শুনিয়াই খান্না নিশ্চয় খুসি হইয়া উঠিবে, তবু লোককে দেখাইবার জন্য চোখে রুমাল দিবে। আর ছেলেরা? উহাদের কাছে খেলার জিনিস মায়ের চেয়ে বেশি আদরের। এই গোবিন্দীর জীবন, যাহার জন্য দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিবারও কেহ নাই! তখন উহার মনে পড়িল শাশুড়ীর কথা। তিনি যখন বাঁচিয়াছিলেন, আর খান্না এমন বিরূপ ছিল না, তখন কথায় কথায় শাশুড়ীর রাগিয়া [illegible] উহার কি খারাপই না লাগিত! আজ কিন্তু উহার মনে পড়িল, শাশুড়ীর কথায়ও কত রুষ্ট হইত, আর তিনি উহাকে কত আদর করিয়া সাধ্যসাধনা করিতেন। আজ একমাস ও রাগ করিয়া রহিয়াছে, কে পরোয়া করে? ক্রমে ক্রমে উড়িতে উড়িতে ওর মন মায়ের চরণে গিয়া পৌছিল। হায়, আজ মা বাঁচিয়া থাকিলে কি ওর এই দুর্দশা হয়! মার আর কিছু না থাক, স্নেহভরা কোল তো ছিল, প্রেমে ভরা আঁচল তো ছিল, যেখানে মুখ লুকাইয়া ও কাঁদিতে পারিত। কিন্তু না, ও কাঁদিবে না। মাকে সে স্বর্গে বসিয়া দুঃখ পাইতে দিবে না। তাহার জন্য তিনি যাহা করিতে পারিতেন, সবই করিয়া গিয়াছেন। তাহার কর্মের সঙ্গী হওয়া তো তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর সে কাঁদিবেই বা কেন? সে এখন কাহারো অধীন নয়। নিজের দিন চলার মত রোজগার করিতে পারে, কালই গান্ধী আশ্রম হইতে

জিনিসপত্র লইয়া বিক্রী করিতে শুরু করিয়া দিবে। কিসের লজ্জা? এই তো হইবে, লোকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিবে, ঐ যে খান্নার বিবিসাহেবা যাইতেছে? কিন্তু সে এই শহরে থাকিবে কেন? অন্য কোন শহরে কেন চলিয়া যাইবে না, যেখানে তাহাকে কেহ চেনেই না? দশ বিশ টাকা রোজগার করা এমন কি শক্ত? নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহা রোজগার করিবে, তাহাই খাইবে। কেহ তো তাহার উপর দাবি দাওয়া করিবে না। ইনি তাহার ভরণপোষণ করেন বলিয়াই না এত খানি মেজাজ। সে এখন নিজেই নিজের খরচপত্র চালাইবে।

হঠাৎ গোবিন্দী দেখিল, মেহতা তাহার দিকে আসিতেছে। দেখিয়া উহার বিরক্ত বোধ হইল। এই সময়ে উহার ইচ্ছা হইতেছিল, সম্পূর্ণ একা থাকে, কাহারও সঙ্গে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখানেও একজন আসিয়া পড়িল। তাহার উপর কোলের শিশুও কাঁদিতে লাগিল।

মেহতা কাছে আসিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এ সময়ে এখানে কি করে?

গোবিন্দী ছেলেকে চুপ করাইতে করাইতে বলিল, আপনি যেমন করে এলেন, তেমনি করে।

মেহতা মুচকি হাসিয়া বলিল, ধোপার কুকুর, না ঘরের, না ঘাটের। দিন, আমি বাচ্চাকে ঠাণ্ডা করি।

আপনি এ বিদ্যে কবে শিখলেন?

অভ্যাস কোরতে চাইছি, পরীক্ষা দিতে হবে যে।

আচ্ছা! পরীক্ষার দিন এসে পড়েছে বুঝি!

দিন তো আমি যেমন ঠিক করবো, তেমনই হবে। যখন ঠিক হয়ে যাবে, বসে পড়বো। ছোট ছোট ডিগ্রীর জন্য আমরা পড়ে পড়ে চোখ নষ্ট করেছি, আর এতো জীবনব্যাপী পরীক্ষা।

ভাল কথা, আমিও দেখবো আপনি কোন বিভাগে পাশ হন?

এই বলিতে বলিতে গোবিন্দী বাচ্চাকে মেহতার কোলে দিল। মেহতা শিশুকে কয়েকবার নাচাইলে শিশু চুপ করিয়া গেল। ছোট ছেলের মত লাফাইয়া উঠিয়া মেহতা বলিল, দেখুন আপনি, কেমন মন্ত্রের বলে ওকে ঠাণ্ডা করেছি। এখন আমিও কোনও জায়গা থেকে একটা বাচ্চা নিয়ে আসবো।

গোবিন্দী ঠাট্টা করিল, বাচ্চাই আনবেন, না তার মাকেও আনবেন ?

মেহ্‌তা কৌতুকমিশ্রিত নৈরাশ্যের ভাবে বলিল, এমন স্ত্রী তো কোথাও পাওয়াই যায় না।

কেন, মিস মালতী নাই ? সুন্দরী, শিক্ষিতা, গুণবতী, মনোহারিণী। আপনি আর কি চান ?

মিস মালতীর মধ্যে সেই জিনিসটিই নাই যা আমি নিজের স্ত্রীর মধ্যে দেখতে চাই।

গোবিন্দী এই নিন্দায় আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে বলিল, ওর মধ্যে মন্দটা কি শুনি। ভ্রমরে তো সর্বদা ওকে ঘিরে আছে। শুনেছি, আজকাল পুরুষেরা এমন স্ত্রীই পছন্দ করে।

মেহ্‌তা শিশুর হাত হইতে নিজের গোঁফ জোড়া বাঁচাইয়া বলিল, আমার স্ত্রী হবে অন্য ঢঙের, সে হবে এমন যাকে আমি পূজো করতে পারি।

গোবিন্দী হাসি চাপিতে পারিল না, বলিল, তবে আপনি স্ত্রী চান না, চান প্রতিমা। এমন স্ত্রী কোথাও পাবেন কিনা সন্দেহ।

আজ্ঞে না, এমনই এক দেবী তো এই শহরেই আছেন।

সত্যি ! আমিও তাঁকে একবার দর্শন কোরতাম, তাঁর মতো হওয়ার চেষ্টা কোরতাম।

আপনি তাঁকে খুব ভালো কোরেই জানেন, তিনি হোলেন এক লক্ষপতির পত্নী, যিনি স্বামীকে তুচ্ছ মনে করেন। উপেক্ষা আর অনাদর সহ্য করেও যিনি নিজের কর্তব্য থেকে বিচলিত হন না। মাতৃত্বের বেদীর সামনে যিনি নিজেকে বলি দিয়েছেন, ত্যাগই যাঁর মতে সব চেয়ে বড়ো অধিকার, আর যিনি প্রতিমা বানিয়ে পূজো করার মতো।

গোবিন্দীর হৃদয় আনন্দে নাচিতে লাগিল। বুঝিয়াও না বোঝার ভান করিয়া সে বলিল, এমন স্ত্রীর আপনি প্রশংসা করেন ? আমার মতে তো সে কৃপার পাত্র।

মেহ্‌তা আশ্চর্য হইয়া বলিল, কৃপার পাত্র ! আপনি তার অপমান কোরেছেন। সে আদর্শ মেয়ে, আর যে আদর্শ মেয়ে সেই তো আদর্শ স্ত্রী হোতে পারে।

কিন্তু ও আদর্শ এ যুগের জন্য নয়।

না, ও আদর্শ সনাতন আর অমর। মানুষই এই আদর্শকে বিকৃত করে নিজের সর্বনাশ কোরেছে।

গোবিন্দীর অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিল। এমন ধারা আনন্দ উহার কখনও হয় নাই। উহার পরিচিত পুরুষদের মধ্যে মেহতার স্থান সকলের উঁচুতে। তাহারই মুখে এই সুখ্যাতি শুনিয়া উহার অন্তর যেন মত্ত হইয়া

বলিল, তবে চলুন, আমায় ওঁকে দর্শন করিয়ে আনবেন।

মেহতা শিশুটির গালে মুখ লুকাইয়া বলিল, সে তো এখানেই বসে রয়েছে।

কোথায়, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।

আমি তো সেই দেবীর সঙ্গেই কথা কইছি।

গোবিন্দী জোরে হাসিয়া উঠিল, আপনি আজ আমায় এত বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করছেন কেন?

শ্রদ্ধায় নত হইয়া মেহতা বলিল, আপনি আমার প্রতি অন্যায় করছেন, আর তার চেয়েও বেশি অন্যায় করছেন নিজের ওপর। সংসারে এমন খুব অল্প লোকই আছে যাদের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে। যে কজনা আছে, তাদের মধ্যে আপনি একজন। আপনার ধৈর্য, ত্যাগ, ব্যবহার আর আপনার প্রেম অতুলনীয়। আমি নিজের জীবনে সব চেয়ে বড় সুখ যা কল্পনা করি, তা হোল আপনার মতো কোনও দেবীর চরণসেবা। আমার যে নারীর আদর্শ, আপনি তার সজীব প্রতিমা।

গোবিন্দীর চোখে আনন্দের অশ্রু দেখা দিল; এই শ্রদ্ধাকবচ ধারণ করিয়া ও কোন বিপদের সম্মুখে যাইতে ভয় পায়? উহার রোমে রোমে যেন মৃদু সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

নিজের নারীত্বের এই উল্লাস চাপিয়া রাখিয়া ও বলিল, আপনি কেন দার্শনিক হতে গেলেন, মিঃ মেহতা? আপনার তো কবি হওয়া উচিত ছিল।

সরল হাসি হাসিয়া মেহতা বলিল, আপনি কি মনে করেন দার্শনিক না হোলে কেউ কবি হোতে পারে? দর্শন তো কেবল মাঝখানের কক্ষ।

তা এখনো আপনি কবিত্বের রাস্তায়ই রয়েছেন, কিন্তু আপনি এটাও তো জানেন যে কবিরা সংসারে সুখ পায় না?

যাকে সংসারের লোকে দুঃখ বলে, তাতেই কবিদের সুখ। ধন ঐশ্বর্য, রূপ

গুণ, বিদ্যা বুদ্ধি, এই সব বিভূতি সংসারের লোককে যতই মোহিত করুক, কবির কাছে এদের একটুও আকর্ষণ নেই ; কবির আনন্দ আর আকর্ষণের বস্তু তো বিফল আশা, লুপ্ত স্মৃতি, ভাঙ্গা হৃদয়ের অশ্রুজল, এই সব। যেদিন এসবের প্রতি প্রেমের অভাব ঘটবে সেদিন কবি আর কবি থাকবে না। জীবনের এই সব রহস্যের মধ্যে দর্শন আনন্দ পায়, আর কবি এদের মাঝে লীন হয়ে যান। আমি আপনার দুচারটে কবিতা পড়েছি, তাই আমি জানি সে সব কবিতায় কি পুলক, কি কম্পন, কত মধুর ব্যথা, কত প্রাণ-কাঁদানো আবেগ আপনি অনুভব করেছেন। প্রকৃতির বড়ই অন্যায় যে আপনার মতো দুজন মেয়ে সৃষ্টি করেনি।

গোবিন্দী হাসিমাখা স্বরে বলিল, না মেহতাজী, এটা আপনার ভুল। আমার মতো মেয়ে তো অলিতে গলিতে মেলে, আর তাদের সকলের তুলনায় আমি সামান্য। যে স্ত্রী না পারে স্বামীকে প্রসন্ন রাখতে, না পারে নিজেকে স্বামীর মনোমত করে গড়ে তুলতে, সে আবার কি স্ত্রী? আমি তো এক এক বার মনে ভাবি, মালতীর কাছে এ বিদ্যেটা শিখে নেব ; যেখানে আমি বিফল হয়েছি সেখানে ও সফল হয়েছে। আমি নিজের জনকেই আপন করে নিতে পারি না, আর ও পরকেও আপনার করে নেয়। এটা কি ওর কম গুণের কথা?

মেহতা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, মদ মানুষকে পাগল করে দেয়, তাই বলে কি জলের থেকে মদ ভালো—জল, যা নাকি মানুষের পিপাসা দূর করে, মানুষকে স্নিগ্ধ করে, তার প্রাণ বাঁচায়?

গোবিন্দী ঠাট্টার আড়ালে থাকিয়া বলিল, তা যাই হোক, আমি তো দেখতে পাই লোকে জল বয়ে বেড়ায়, আর মদের জন্যে ঘর দোর বিকিয়ে যায় ; আর মদ যত কড়া হয় আর নেশা এনে দেয়, ততই ভালো। আমি তো শুনেছি, আপনিও নাকি মদের উপাসক।

গোবিন্দী নৈরাশ্যের এমন স্তরে পৌছিয়াছে যেখানে আসিলে লোকে সত্য, ধর্ম, এ সকলের প্রতি আস্থা হারায় ; কিন্তু মেহতার চিন্তা ঐদিক দিয়া গেল না। গোবিন্দীর কথার শেষ অংশের প্রতি মন আকৃষ্ট হইল। নিজের মদ খাওয়ার জন্য আজ উহার যেমন লজ্জা আর ক্ষোভ হইল, বড় বড় উপদেশ শুনিয়াও তেমন হয় নাই। তর্কের জবাব উহার ছিল, মুখের জোরও ছিল ;

কিন্তু এই মৃদু তিরস্কারের কোন জবাব উহার মাথায় চট্ করিয়া আসিল না। মালতীর সঙ্গে মদের তুলনা মেহতাই উঠাইয়াছিল, তাই এখন পসতাইতে লাগিল, কি কথায় কি আসিয়া পড়িল, নিজের মার অবশেষে নিজের মাথায় পড়িল।

লজ্জিত হইয়া বলিল, হঁা, আমি স্বীকার করছি, এ আসক্তি আমার আছে। আমি নিজের সাফাইয়ের জন্য ওর গুণের ব্যাখ্যা করে পাপ আর বাড়াব না— তাতে আরো পাপ হবে। আজ আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, মদের একটি ফোঁটাও আমার গলা দিয়ে গলবে না।

গোবিন্দী কাছে আসিয়া বলিল, এ আপনি কি করলেন মেহতাজী! ঈশ্বর জানেন, আমার মোটেই এরকম মতলব ছিল না। আমার বড়ই খারাপ লাগছে।

না, না, তা কেন? আপনার বরং খুসি হওয়া উচিত যে একজনকে উদ্ধার কোরলেন।

আমি আপনাকে উদ্ধার করলাম! বরং আমার নিজের উদ্ধারের জন্যেই আপনার সাহায্য চাই।

আমার সাহায্য চান! সে তো আমার সৌভাগ্য।

গোবিন্দী করুণ সুরে বলিল, আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দেখছি না যাকে আমার দুঃখের কথা শোনাতে পারি। দেখুন, একথা শুধু আপনার আর আমার মধ্যেই রাখবেন, তা ছাড়া আপনার এবিষয়ে মন দেওয়ার দরকার নেই। তবে, আমার জীবন আজকাল দুর্বহ হয়ে পড়েছে। তপস্যা যত দূর করা যায় আমি আজ পর্যন্ত তা করেছি; কিন্তু আর সইতে পারছি না। মালতী আমার সর্বনাশ করতে বসেছে। আমার সব রকম অস্ত্র দিয়েও ওর সঙ্গে পেরে উঠছি না। আপনার তো ওর ওপর খুব প্রভাব। ও আপনাকে যত খাতির করে এমন বোধ হয় আর কাউকে করে না। আপনি যদি কোন রকমে ওর খপ্পর থেকে আমার স্বামীকে মুক্ত করে দিতে পারেন, তো আমি জন্ম জন্ম আপনার কাছে ঋণী থাকবো। ও আমার সৌভাগ্য লুটে নিচ্ছে। আপনি যদি পারেন, আমায় বাঁচান। আমি আজ ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম এই মনে করে যে আর ফিরবো না। আমি খুব বড়াই করেছিলাম, এই মরণপাশ জোর করে ছিঁড়ে ফেলবো। কিন্তু মেহতাজী, মেয়েদের মন

বড়ই দুর্বল। মোহ তাদের প্রাণ, জীবন থাকতে মোহ কাটানো তাদের পক্ষে অসম্ভব। এত কাল আমার ব্যথা আমি নিজের মনেই চেপে রেখেছি, কিন্তু আজ গলায় আঁচল দিয়ে আপনার কাছে মিনতি করছি, মালতীর হাত থেকে আমায় বাঁচান। এই মায়াবিনীর হাতে আমার প্রাণ গেল……

চোখের জলে গোবিন্দীর গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল, সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মেহতার বুক গর্বে ফুলিয়া উঠিল; যেদিন ফরাসী একাডেমি ওর রচনা এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া ওকে মানপত্র দিয়াছিল সেদিনও বুঝি ওর নিজেকে এত বড় মনে হয় নাই। যাহাকে ও প্রতিমা মনে করিয়া এতদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে, যে ওর ইষ্টদেবী, জীবনের বহু জটিল ব্যাপারে যাহার কাছে ও আদর্শ খুঁজিয়া পাইবে আশা করে, সে আজ ওর দ্বারে প্রার্থী! ও নিজের মধ্যে এমন শক্তির সন্ধান পাইল, মনে হইল বুঝি পর্বত লঙ্ঘন করিতে পারে, সমুদ্র সাঁতার দিয়া পার হইতে পারে। উহার যেন নেশা লাগিয়া গেল। কাঠের ঘোড়ায় চাপিয়া বালক যেমন মনে করে হাওয়ায় ভর করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, ওর মনের অবস্থা তেমনই হইল। কাজটা যে কতখানি অসাধ্যসাধন, তাহা ওর খেয়ালই হইল না। নিজের বিচার বিবেচনা কতখানি খাটো করিতে হইবে, তাহাও ওর মাথায় আসিল না। ও গোবিন্দীকে আশ্বাস দিয়া বলিল, মালতীর দিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ও আপনার পথ থেকে সরে যাবে। আমি জানতাম না, ওর জন্যে আপনি এত দুঃখ পাচ্ছেন। আমার বুদ্ধির দোষ, চোখের দোষ, আর কল্পনার দোষ। আর কি বোলবো, শুধু শুধু আপনাকে এত কষ্ট সইতে হোল।

গোবিন্দীর ভয় হইল, বলিল, কিন্তু মনে রাখবেন, সিংহীর কাছ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেওয়া সহজ নয়।

মেহতা দৃঢ়স্বরে বলিল, নারীহৃদয় ধরিত্রীর মত, সেখানে মিঠেও মেলে, আবার কড়াও মেলে। যে বীজ পড়বে তার শক্তি অনুযায়ী ফল হবে।

আপনি নিশ্চয় পসতাচ্ছেন, আজ কোত্থেকে এর সঙ্গে দেখা।

আর যদি বলি, আজকেই জীবনে প্রকৃত আনন্দ পেলাম, তাহলে বোধ হয় আপনার বিশ্বাস হবে না।

আমি আপনার মাথায় মস্ত ভার চাপিয়ে দিলাম।

শ্রদ্ধামধুর স্বরে মেহতা বলিল, আপনি আমায় লজ্জা দিচ্ছেন। আমি তো বলেছি, আমি আপনার সেবক। আপনার ভালো কোরতে গিয়ে যদি আমার প্রাণও যায় তাও আমি সৌভাগ্য মনে করবো। আপনি এটা কবিত্ব মনে করবেন না, এটা আমার জীবনের সত্য। আমার জীবনের আদর্শ কি, তা আপনাকে বলার লোভ সামলাতে পারছি না। আমি প্রকৃতির পূজারী, আর আমার সাধ যায় মানুষকেও তার প্রাকৃতিক রূপেই দেখি। সে-ই প্রকৃত মানুষ যে নাকি খুসি হোলে হাসে, দুঃখ পেলে কাঁদে, রাগ হোলে মার ধর করে। যে সুখ দুঃখ দুইই দমন করে রাখে, কান্নাকে যে ভাবে দুর্বলতা আর হাসিকে হালকাপনা, তার সঙ্গে আমার মেলে না। আমার কাছে জীবন আনন্দের লীলা—সরল, স্বচ্ছন্দ, এখানে নিন্দা কুৎসা, হিংসা, মনের রিষ এসবের স্থান নেই। আমি না করি অতীতের চিন্তা, না করি ভবিষ্যতের পরোয়া। আমার কাছে বর্তমানই সব। ভবিষ্যতের চিন্তা আমাদের কাপুরুষ করে দেয়, আর অতীতের ভার আমাদের কোমর ভেঙ্গে দেয়। আমাদের জীবনী শক্তি এমনিতেই ক্ষীণ, তাতে যদি ভূত ভবিষ্যতের ভাবনা এসে জোটে তবে আমরা আরো দুর্বল হয়ে যাই। ব্যর্থতার ভার নিজেদের ওপর চাপিয়ে, সংস্কার, ঐতিহ্য আর ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের নীচে পড়ে আমরা পিষে যাচ্ছি, ওঠার নামও করি না। ওঠার শক্তিও নেই। মানবধর্ম পালন করতে হলে যে শক্তি, যে ফুর্তির দরকার ছিল, ভাইবেরাদরির সঙ্গে থেকে, পুরোনো রীতি বদলাতে ও বাপদাদার ঋণ শোধ করতে গিয়ে তা শেষ হয়ে গেছে। আর এই যে ঈশ্বর আর মোক্ষলাভের চক্র এ দেখলে আমার হাসিই পায়। এ সব আমার মতে অহঙ্কারের পরাকাষ্ঠা, ঐ অহঙ্কার আমাদের মানবতাকে নষ্ট করে ফেলছে। আমার মতে যেখানে প্রাণ আছে, আনন্দের খেলা আছে, যেখানে প্রেম আছে, প্রীতি আছে, সেখানেই ঈশ্বর আছেন। জীবনকে সুন্দর আর সুখী করাই ঈশ্বরের উপাসনা আর তাতেই মোক্ষ। জ্ঞানী লোকেরা বলে, ঠোঁটের কোণে হাসি থাকবে না, চোখে জল আসবে না; আর আমি বলি, যদি তুমি হাসতে কাঁদতে না পার তবে তুমি মানুষই নও, তুমি পাথর। যে জ্ঞান মনুষ্যত্বকে পিষে মারে তা জ্ঞান নয়, তা তো কল।—কিন্তু, ক্ষমা কোরবেন, আমি যে এক লম্বা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম! আর দেরিও হোয়ে যাচ্ছে, চলুন আপনাকে পৌছে দি। বাচ্চাটাও আমার কোলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

গোবিন্দী বলিল, আমি তো টাঙ্গা নিয়ে এসেছি।

তা, টাঙ্গা আমি এখান থেকে বিদায় করে দিচ্ছি।

মেহতা টাঙ্গার ভাড়া চুকাইয়া ফিরিয়া আসিলে গোবিন্দী বলিল, কিন্তু আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন ?

মেহতা চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, কেন, আপনার বাড়িতেই পৌছে দেব।

মেহতাজী, ও বাড়ি আমার নয়।

তবে কি মিঃ খান্নার ?

এও কি জিজ্ঞাসা করার কথা ? ও ঘর আর আমার নেই। যেখানে শুধু অপমান আর ধিক্কারই জোটে, তাকে কি নিজের ঘর মনে করা চলে ?

দরদ ভরে, এক একটি কথা যেন অন্তর হইতে বাহির হইতেছে এমন ভাবে মেহতা বলিল, না দেবী, ও ঘর আপনার, আর চিরদিন আপনারই থাকবে। ঐ ঘর আপনিই সৃষ্টি করেছেন, ঐ ঘরের লোকেরা আপনার সৃষ্টি করা, আর প্রাণ যেমন দেহকে চালনা করে, ঐ ঘরের লোকদের আপনি তেমন ভাবে চালনা করেছেন। সেই প্রাণ যদি বেরিয়ে যায় তবে দেহের গতি কি হবে ? দেখুন, মাতৃত্ব মহা গৌরবের জিনিস। আর গৌরবের পদে অপমান, ধিক্কার, তিরস্কার, লাঞ্ছনা কোথাই বা না মিলেছে ? মায়ের কাজ জীবন দান করা। যার হাতে এই অতুল ক্ষমতা—কে কি বললো, কে রাগ করলো, কে বিরূপ হোল—এসবে তার কি আসে যায় ? প্রাণ বিনে দেহের যেমন চলে না, তেমনই প্রাণেরও সব চাইতে উপযুক্ত স্থান দেহের আশ্রয়। ধর্ম আর ত্যাগের উপদেশ আমি আপনাকে কি শোনাব ? আপনি তো ঐ দুটি জিনিসের জীবন্ত প্রতিমা। আমি বলি……

অধীর হইয়া উঠিয়া গোবিন্দী বলিল, কিন্তু আমি তো কেবল মা নই, আমি নারীও তো !

মেহতা এক মিনিট চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, হাঁ, তা ঠিক। তবে আমার মতে নারী সব আগে মা, আর যা কিছু সব মাতৃত্বের উপক্রম মাত্র। মাতৃত্ব জগতে সব চেয়ে বড় সাধনা, সব চেয়ে বড় তপস্যা, সবার সেরা ত্যাগ, আর সকলের শ্রেষ্ঠ জয়; এক কথায় বলা যায়, লয়—জীবনের, ব্যক্তিত্বের আর নারীত্বেরও। আপনি মিঃ খান্নার বিষয় এইটুকু মনে রাখবেন যে, ওর হুঁস নেই, ও যা কিছু বলে বা করে—সবই উন্মাদ অবস্থায়। কিন্তু ঐ উন্মত্ততা

কাটতে বেশি দিন লাগবে না। দেখবেন, শীগগিরই এমন দিন আসবে যখন ও আপনাকে ইষ্টদেবী মনে করবে।

গোবিন্দী এই কথার জবাব দিল না। ধীরে ধীরে গাড়ীর দিকে চলিল। মেহতা আগাইয়া গিয়া মোটরের দরজা খুলিয়া দিল, গোবিন্দী ভিতরে গিয়া বসিল। গাড়ি ছুটিয়া চলিল—কিন্তু দুই জনেই নীরব।

নিজের বাড়ির দ্বারে পৌছিয়া গোবিন্দী যখন গাড়ী হইতে নামিল, বিদ্যুতের আলোয় মেহতা দেখিল উহার চক্ষু দুটি সজল।

ছেলেমেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া মা, মা, করিয়া উহাকে জড়াইয়া ধরিল। গোবিন্দীর মুখে মাতৃত্বের উজ্জ্বল, গৌরবময় জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

মেহতাকে বলিল, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, এজন্য ধন্যবাদ; বলিয়াই মাথা নত করিল। এক ফোঁটা চোখের জল ওর গালের উপর গড়াইয়া পড়িল।

মেহতার চোখও জলে ভরিয়া গেল, এত ঐশ্বর্য আর বিলাস বিভবের মধ্যে থাকিয়াও ওর নারী-হৃদয়ে কি গভীর দুঃখ!

## ১৯

মির্জা খুরশেদের বাড়ির হাতা ক্লাবও বটে, কাচারীও বটে, আখড়াও বটে। সারাদিন ভিড় লাগিয়াই আছে। মহল্লায় আখড়ার জন্য জায়গা পাওয়া যাইতেছিল না। মির্জা এক চালা তুলিয়া আখড়া তৈয়ার করাইয়া দিল। সেখানে নিত্য অনেক কুস্তিগীর আসিয়া জুটিত। মির্জাজীও তাঁহাদের সঙ্গে জোর পরীক্ষা করে। মহল্লার পঞ্চায়েৎও ঐখানে বসে। মিয়া-বিবি, শাশুড়ী-বৌ আর ভাইয়ে-ভাইয়ে যে সব ঝগড়া-গোলমাল, সব ঐখানেই মিটাইয়া ফেলা হয়। মহল্লার সামাজিক জীবনের উহাই কেন্দ্র, আর রাজনৈতিক আন্দোলনেরও তাই। আগেকার কালে এখানে সভা হইত। এখানেই স্বেচ্ছাসেবকেরা থাকে, এখানেই তাহাদের প্রোগ্রাম তৈয়ারি হয়; এখান হইতে শহরের রাজনৈতিক আন্দোলন চলে। গত বৈঠকে মালতীকে নগর কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী নির্বাচন করা হইয়াছিল; সেই হইতে এই জায়গাটার নাম আরও ছড়াইয়া গেল।

এখানে গোবর পুরা এক বৎসর আছে। এখন সে আর সাদাসিধা গ্রাম্য যুবক নাই। দুনিয়ার অনেক কিছু সে দেখিয়াছে আর সংসারের রং-ঢংও কিছু কিছু

বুঝিতে পারিতেছে। মূলে ও আজও দেহাতেরই, পয়সা কামড়াইয়া ধরে, স্বার্থকে কখনও ছাড়ে না, পরিশ্রমে কখনও ফাঁকি দেয় না, সাহসে কখনও হার মানে না; কিন্তু তাহার গায়ে শহরের হাওয়া লাগিয়াছে। প্রথম মাসটা ও তো কেবল মজুর খাটিয়াছিল আর আধপেটা খাইয়া অল্প স্বল্প টাকা বাঁচাইয়া নিয়াছিল। পরে সে 'কচালু,' মটর আর দৈ-বড়া খুচরা বিক্রী করিতে লাগিল; এদিকে বেশি লাভ দেখিয়া, অমনি চাকরি ছাড়িয়া দিল। গ্রীষ্মকালে শরবৎ আর বরফের দোকানও খুলিয়া দিল। লেন-দেনের ব্যাপারে খাঁটি ছিল; এজন্য তাহার ব্যবসা জমিল ভাল। শীত আসিল, শরবতের দোকান উঠাইয়া দিয়া সে গরম চা খাওয়াইতে শুরু করিল। এখন তাহার রোজকার আমদানী আড়াই শ তিন শ টাকার কম নয়। সে নিজে ইংরেজি ঢঙে চুল কাটায় শরু ধুতি আর পম্পশু পরে, লালরঙে এক পশমি চাদর কিনিয়াছে, পান-সিগারেটের অনুরাগী হইয়াছে। সভা-সমিতিতে আসা-যাওয়ার জন্য কিছু কিছু রাজনৈতিক জ্ঞানও তাহার হইয়াছে। রাষ্ট্র ও শ্রেণীর অর্থ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে; সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর লোকনিন্দার ভয় তাহার এখন খুব কমই আছে। ভবিষ্যতে পঞ্চায়েৎ কি করিবে, সে ভাবনা তাহার নাই। যে কথার জন্য সে ঘর হইতে এখানে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া আছে, উহা হইতেও নিন্দার কথা এখানে নিত্য হইতেছে, কেহ সেজন্য কোথায়ও পালায় না। ও কেন এত কাণ্ড করিল, মুখ লুকাইল!

এত দিনের মধ্যে ও এক পয়সাও বাড়ি পাঠায় নাই। টাকা পয়সার ব্যাপারে বাপ-মাকে ও বেশি চালাক চতুর মনে করে না। তাহারা তো টাকা পাইলেই আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিবে, বাবার তাড়াতাড়ি গয়া করিবার ও মায়ের গহনা গড়াইবার ধূম উঠিবে। এই রকম বাজে কাজের জন্য ওর কাছে টাকা নাই। ও নিজে এখন ছোটখাট মহাজন। পাড়ার এক্কাওয়ালা, গাড়োয়ান, ধোবা, সুদে ইহাদের টাকা ধার দেয়। এই দশ এগার মাসেই সে মেহনত, মিতব্যয় ও পুরুষার্থের জোরে নিজের জায়গা করিয়া লইয়াছে, আর ঝুনিয়াকে এখানে আনিয়া রাখিবার কথা ভাবিতেছে।

তিন প্রহর বেলা। রাস্তার কলে নাহিয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার জন্য আলু ছাড়াইতেছে, এমন সময়ে মির্জা খুরশেদ আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন। গোবর এখন আর তাঁহার চাকর নয়, তবে এখনও আগের মতই ব্যবহার করে, তাঁহার

জন্যে জান দিতে সে প্রস্তুত। দরজায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হুকুম আছে সরকার?

মির্জা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তোমার কাছে কিছু টাকা থাকে তো দিয়ে যেও। আজ তিন দিন থেকে বোতল খালি পড়ে আছে, প্রাণ বড় অস্থির হচ্ছে।

পূর্বেও দুই তিন বার গোবর মির্জাজীকে টাকা দিয়াছে; কিন্তু আজ পর্যন্ত উশুল করিতে পারে নাই। তাগাদা করিতে ভয় পাইত, মির্জাজীও টাকা লইয়া দিতে জানিত না। তাহার হাতে টাকা জমিতই না। এদিকে আসিল, ওদিকে অন্তর্ধান। সে একথা তো বলিতে পারে না. আমি টাকা দিব না, কি আমার কাছে টাকা নাই, তাই অগত্যা মদের নিন্দা করিতে লাগিল—আপনি ছেড়ে দিন না কেন হুজুর, ও খেয়ে কি কোনও লাভ হয়?

মির্জাজী কুঠরির ভিতরে খাটিয়ার উপর বসিতে বসিতে বলিল—তুমি বুঝতে পারছ, আমি ছাড়তে চাই না, সখ করে খাই। এ ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে পারি না। তুমি নিজের টাকার জন্য ভয় পেও না, আমি কড়ায়-গণ্ডায় দিয়ে দেব।

গোবর অবিচলিত রহিল—আমি সত্যি বলছি হুজুর! আমার কাছে এ সময়ে টাকা থাকলে আপনাকে দিতে অস্বীকার করি?

দু টাকাও দিতে পারবে না?

এখন তো নাই।

আমার আংটিটা বন্ধক রাখ।

গোবরের মনে লোভ হইল; কিন্তু কথার বদল কি করিয়া করে!

বলিল—আপনি এ কী বলছেন হুজুর, টাকা থাকলে তো আপনাকে দিয়ে দিতাম, আংটির কথা কি?

মির্জা অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে বলিল—আমি আর তোমার কাছে কখনো চাইব না গোবর। আমি দাঁড়াতে পারছি না। আমি এই মদের জন্য লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি নষ্ট করে ভিখারি হয়ে গেছি। এখন আমারও জিদ চড়ে গেছে, ভিক্ষা চাইতেও যদি হয় তবু একে ছাড়ব না।

গোবর তখনও রাজি হইল না দেখিয়া মির্জা সাহেব নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল। শহরে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে তাহার মেলামেশা ছিল।

কত জন তাহারই সাহায্যে মানুষ হইয়া গিয়াছিল। কত জনের দুঃসময়ে সে সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে দেখা করাও সে পছন্দ করিত না। এমন হাজার হাজার ফিকির তাহার জানা ছিল, যাহাতে সে সময় সময় প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত; কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে পয়সার কোনও কদর ছিল না। কোন না কোন বাহানায় টাকা উড়াইয়াই তাহার মন শান্ত হইত।

গোবর আলুর খোসা ছাড়াইতে লাগিল। এক বৎসরের মধ্যেই সে এতখানি চালাক ও পয়সার হিসাবে এত পটু হইয়া গিয়াছিল যে দেখিলে আশ্চর্য লাগিত। যে কুঠরীতে সে থাকিত, তাহা মির্জা সাহেবের দেওয়া। এই কুঠরী ও বারান্দার ভাড়া অতি সহজেই পাঁচ টাকা পাওয়া যাইত, গোবর প্রায় এক বৎসর হইল এখানে থাকে; কিন্তু মির্জাও কখনও ভাড়া চাহে নাই, সেও দেয় নাই। মির্জার হয়তো খেয়ালও ছিল না যে এই কুঠরীর জন্য কিছু ভাড়াও পাওয়া যাইতে পারে।

অল্পক্ষণ পরে একজন এক্কাওয়ালা টাকা চাহিতে আসিল। তাহার নাম আলাদীন। মাথা কামানো, কাঁচাপাকা দাড়ি, আর কানা। তাহার মেয়ে বিদায় হইতেছিল। তাহার পাঁচটা টাকার ভারি দরকার পড়িয়াছিল। গোবর এক আনা সুদে টাকাটা দিয়া দিল।

আলাদীন ধন্যবাদ দিতে দিতে কহিল—ভাই, এখন ছেলেপুলেদের নিয়ে এস। কত দিন আর হাতা বেড়ি ঠক্ ঠক্ করবে?

গোবর শহরের খরচের কথা বলিয়া মায়া কান্না কাঁদিল—এত অল্প আয়ে গেরস্তি চলবে কি করে?

আলাদীন বিড়ি ধরাইতে ধরাইতে বলিল—খরচ তো আল্লা দেবেন ভাই! ভেবে দেখ, কতখানি আরাম পাবে। আমি তো বলি, তুমি একলা যা খরচ করছ তাতেই গেরস্তি চলে যাবে। মেয়েদের হাতে খুব সুবিধা হয়। খোদার কসম, যখন আমি এখানে একলা থাকি তখন যতই কামাই, খাওয়া-দাওয়ার খরচে সব শেষ হয়ে যায়। বিড়ি তামাকেরও পয়সা থাকে না। তার ওপর হায়রানি। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে এলে তো ঘোড়াকে খাওয়াও আর বেড়িয়ে আন। আবার ছোটো নানাবাইয়ের দোকানে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। ঘরের লোক এসে গেলে ঐ রোজগারেই ওর রুটিও কুলিয়ে যায় আরামও হয়; মূলে তো লোকে আরামের জন্যই রোজগার করে। যখন প্রাণ দিয়েও আরাম পাওয়া যায় না,

তখন জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। আমি তো বলছি, তোমার রোজগার বেড়ে যাবে ভাই! যতক্ষণ আলু আর মটর সিদ্ধ করছ, ততক্ষণ দু চার পেয়ালা চা তৈরি করে বিক্রী করবে—এখন তো বারো মাসই চা চলে। রাতে ফিরবে, তো ঘরের লোক পদসেবা করবে। সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

এ কথা গোবরের মনে বসিয়া গেল। প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়া গেল। এখন তো সে ঝুনিয়াকে আনিয়াই রাখিবে। চুলার উপর আলু চড়ানো রহিল, আর সে তৈয়ারী হইয়া লইল বাড়ি যাইবার জন্য; কিন্তু মনে পড়িল, হোলি আসিতেছে, এইজন্য হোলির জিনিসপত্রও লইয়া যাইবে। উৎসবে মন খুলিয়া খরচ করিবার যে প্রবৃত্তি কিষাণদের হইয়া থাকে, তাহা গোবরের মধ্যেও জাগিয়া উঠিল। আখেরে এই দিনের জন্য তো পাই-পাই হিসাব করিতেছিল। মা, বোনেরা, ঝুনিয়া—সকলের জন্য এক এক জোড়া শাড়ী লইয়া যাইবে। হরির জন্য লইবে এক ধুতি আর এক চাদর। সোনার জন্য আর ঝুনিয়ার জন্য একটা পেটরা, তাহাতে থাকিবে তেল, সিন্দূর আর আয়না; বাচ্চাটার জন্য টুপি, আর বাজারে তৈরী যে ফ্রক পাওয়া যায় সেই রকম একটা ফ্রক। টাকা বাহির করিয়া সে বাজারে চলিল। দুই প্রহর নাগাত সমস্ত জিনিস আসিয়া গেল। বিছানাও বাঁধাছাঁদা হইল; মহল্লার লোকেরা খবর পাইল যে গোবর ঘরে যাইতেছে। কয়েকজন স্ত্রীপুরুষ তাহাকে বিদায় দিতে আসিল। গোবর তাহাদের উপর নিজের ঘরবাড়ির ভার সঁপিয়া দিতে দিতে বলিল—তোমাদের ভরসায় ঘর ছেড়ে যাচ্ছি। ভগবান যদি মুখ তুলে চান তো হোলির পরের দিন ফিরব।

একজন যুবতী ঠাট্টা করিয়া বলিল—বউকে না নিয়ে এসো না, তাহলে ঘরে ঢুকতে পাবে না।

একজন প্রৌঢ়া শিখাইয়া দিল—হাঁ, আর কি, অনেকদিন পর্যন্ত চুলোয় ফুঁ দিয়েছ; ঠিক মত রুটি তো পাবে।

রাম-রাম বলিয়া গোবর সকলকে অভিবাদন করিল। হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল। সকলের মধ্যে বন্ধুভাব, একে অন্যের সুখ দুঃখের সাথী। রোজা রাখার দল রোজা রাখিত, একাদশী করিবার যাহারা তাহারা একাদশী করিত। ফুর্তি করিয়া কখনও কখনও একে অন্যের উপর এক হাত লইত। আলাদীনের নামাজকে গোবর বলিত উঠ-বস করা, অশ্বত্থ গাছের তলে স্থাপিত

শত শত শিবলিঙ্গের নাম আলাদীন রাখিয়াছিল—বাটখারা ; কিন্তু ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের নামও ছিল না ; গোবর বাড়ি যাইতেছে ; সকলে হাসিমুখে বিদায় দিতে আসিয়াছিল।

এতক্ষণে ভূরে এক্কা লইয়া আসিল, সারাদিনকার দৌড়-ধাপ সারিয়া এই ফিরিতেছিল। খবর পাইল, গোবর বাড়ি যাইতেছে। অমনি এক্কা এদিকে ফিরাইল। ঘোড়া আপত্তি করিল, তাহাকে কয়েক ঘা চাবুক কসাইয়া দিল। গোবর এক্কার উপর জিনিসপত্র রাখিয়া দিলে এক্কা আগাইল, যাহারা বিদায় দিতে আসিতেছিল তাহারা গলির মোড় পর্যন্ত আসিল, তখন গোবর সকলকে 'রাম রাম' অভিবাদন করিয়া এক্কার উপর চড়িয়া বসিল।

রাস্তার উপর দিয়া এক্কা ছুটিয়া চলিতেছিল। গোবর বাড়ি যাওয়ার খুসিতে পাগল ; ভূরে তাহাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার খুসিতে পাগল ; আর ঘোড়া ছিল তেজী, যেন উড়িয়া চলিতেছিল। কথা বলিতে না বলিতে স্টেশনে আসিয়া গেল।

গোবর খুসি হইয়া কোমর হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ভূরের দিকে আগাইয়া ধরিল. বলিল—নেও, ঘরের লোকের জন্য মিঠাই নিয়ে যেও।

ভূরে কৃতজ্ঞতা ও তিরস্কার মেশানো দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল—তুমি আমায় ভুল বুঝছ ভাই! একদিন এক্কায় একটুখানি চড়লে, অমনি আমি তোমার কাছ থেকে ইনাম নেব! তোমার ঘাম যেখানে পড়বে সেখানে আমি রক্ত দিতে পারি। 'অতখানি ছোট মন পাও নি। আর যদি টাকাটা নিয়েই নি, তাহলে ঘরের লোক কি আমায় আস্ত রাখবে!

গোবর আর কিছু বলিল না। লজ্জিত হইয়া নিজের জিনিসপত্র নামাইয়া লইল, তাহার পর টিকিট কিনিতে অগ্রসর হইল।

ফাল্গুন তাহার ঝুলিতে নবজীবনের বিভূতি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল। আম গাছ দুই হাতে মুকুলের সুগন্ধ বিতরণ করিতে লাগিল, আর আমের ডালে লুকাইয়া কোকিল গোপনে সঙ্গীতসুধা দান করিতে থাকিল।

গাঁয়ে আখ বসানো আরম্ভ হইয়াছে। এখনও রোদ উঠে নাই ; হরি কিন্তু

ক্ষেতে পৌঁছিয়া গিয়াছে। ধনিয়া, সোনা, রূপা তিনজনেই ছোট পুকুর হইতে আখের ভিজা ডগ বাহির করিয়া ক্ষেতে আনিতেছে, আর হরি কাটারি দিয়া ডগ টুকরা টুকরা করিতেছে। এখন সে দাতাদীনের মজুরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিষাণ নয়, মজুর; দাতাদীনের সঙ্গে এখন তাহার পুরোহিত-যজমানের সম্বন্ধ নয়, মালিক-মজুরের সম্বন্ধ।

দাতাদীন আসিয়া ধমক দিল—হাত আরো ফুর্তি করে চালাও হরি! এভাবে তো তুমি সমস্ত দিনেও কাটতে পারবে না।

হরি আহত অভিমানের সঙ্গে বলিল—চালাচ্ছি তো মহারাজ, বসে তো নাই।

দাতাদীন মজুরদের পিষিয়া কাজ আদায় করিত: এই জন্য তাহার কাছে কোনও মজুর টিকিত না। হরি তাহার স্বভাব জানিত, কিন্তু যাইবে কোথায়!

পণ্ডিত তাহার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—চালানো আর চালানোয় তফাৎ আছে। এক চালানো সেই রকম যে একঘণ্টার মধ্যে সমস্ত কর্ম শেষ, আর এক রকমের চালানো আছে যাতে সমস্ত দিনে এক বোঝা আখও কাটা হয় না।

হরি অপমান সহ্য করিয়া আরও জোরে হাত চালাইতে শুরু করিল। এদিকে কয়েক মাস ধরিয়া সে পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। প্রায়ই তো এক বেলা মুড়ি চিবাইয়া কাটিত, অন্য বেলা কখনও আধপেটা মিলিত, কখনও উপবাস। কত বার ইচ্ছা করিত, হাত আরো তাড়াতাড়ি চলুক; কিন্তু হাত জবাব দিয়াছিল। তাহার উপর দাতাদীন মাথায় চড়িয়া: একটুক্ষণ দম লইতে পারিলে সে আবার তাজা হইত, কিন্তু দম নেয় কি করিয়া? ধমক খাওয়ার ভয় যে!

ধনিয়া ও মেয়ে তিনটি আখের ডগ লইয়া ভিজা শাড়ীতে লতপত, কাদায় মাখা হইয়া আসিল; ডগাগুলি রাখিয়া সবে দম নিতে আরম্ভ করিয়াছে, অমনই দাতাদীন ধমক দিল—এখানে কী তামাশা দেখছিস ধনিয়া! যা, নিজের কাজ কর। পয়সা অমনি আসে না। এক প্রহরে তুই এক খেপ এনেছিস! এই হিসাবে তো সমস্ত দিনেও আখ বওয়া শেষ হবে না।

ধনিয়ার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, সে বলিল—একটু দম নিতেও দেবে না মহারাজ! আমিও তো মানুষ। তোমার মজুরি করছি বলেই তো আর বলদ হয়ে যাই নি। একটু মাথায় করে এক বোঝা নিয়ে এস, তবে বুঝতে পারবে ব্যাপারখানা কি।

দাতাদীন চটিয়া বলিল—পয়সা দিচ্ছি কাজের জন্য, দম নেওয়ার জন্য নয় দম নিতে হয় তো ঘরে গিয়ে দম নেও।

ধনিয়া কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে হরি ধমক দিল—তুই যাস না কেন ধনিয়া! কেন হাঙ্গামা করছিস?

ধনিয়া বোঝা উঠাইতে উঠাইতে বলিল—যাচ্ছি তো; যে বলদ চলেছে তাকে চাবুক মারা ঠিক নয়।

চোখ লাল করিয়া দাতাদীন বলিল—বোঝা যাচ্ছে, মেজাজ এখনো ঠাণ্ডা হয় নাই। যদিও পলে পলে মরণ হচ্ছে।

ধনিয়াই বা কেন চুপ করিয়া থাকে—তোমার দরজায় ভিক্ষা মাগতে যাই না তো!

দাতাদীন জোর গলায় উত্তর দিল—এই যদি হাল হয় তবে ভিক্ষাও মাগবে

ধনিয়ার কাছে জবাব তৈরি ছিল, কিন্তু সোনা তাহাকে টানিয়া পুকুরের দিকে লইয়া গেল, নইলে কথা বাড়িয়া যাইত; কিন্তু শ্রুতিপথের বাহিরে গিয়া সে মনের জ্বালা বাহির করিয়া দিল—তুমি ভিক্ষা কর, ভিক্ষা চাইবার জাত যে। আমি তো মজুর রয়েছি, যেখানে কাজ করব সেখানেই চার পয়সা পাব।

সোনা তাহাকে তিরস্কার করিল—মা, যেতে দাও। তুমি তো সময় অসময় বোঝ না, কথায় কথায় ঝগড়া করতে এস।

হরি পাগলের মত মাথার উপর পর্যন্ত কাটারি উঠাইয়া আখ টুকরা টুকরা করিয়া জমা করিতে লাগিল। তাহার শরীরের মধ্যে যেন আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে অমানুষিক শক্তি আসিয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে পূর্বপুরুষদের যে শক্তি ছিল, তাহা এখন যেন জল হইতে ভাপ হইয়া তাহাকে যন্ত্রের মত অন্ধশক্তি প্রদান করিতেছিল। তাহার চোখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। মাথায় যেন ঘূর্ণি; তাহার উপর আবার তাহার হাত যন্ত্রের গতিতে বিনা শ্রান্তিতে বিনা বিরামে চলিতেছিল। তাহার দেহ হইতে ধারা বহিয়া ঘাম বাহির হইতেছিল। মুখ হইতে ফেনা উঠিতেছিল। আর মাথার ভিতরে 'গুম গুম' শব্দ হইতেছিল। কিন্তু উহার ঘাড়ে যেন ভূত চাপিয়াছিল।

হঠাৎ তাহার দুই চোখে ঘন অন্ধকার আসিয়া ছাইয়া গেল। মনে হইল, কে যেন উহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছে। সামলাইবার চেষ্টায় সে শূন্যে হাত

মেলিল, আর জ্ঞান হারাইল। কাটারিটা হাত হইতে ছুটিয়া গেল, মুখ থুবড়াইয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল।

ঠিক তখনই ধনিয়া এক বোঝা আখের ডগ লইয়া আসিল; দেখিল, কয়েকজন লোক হরিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। একজন চাষী দাতাদীনকে বলিতেছিল, মালিক, তোমার এমন কথা বলা ঠিক নয় ফলে যা লোকের লেগে যায়। দানাপানি ফুরোলে লোকে তো মরবেই।

ধনিয়া আখের বোঝা ফেলিয়া দিয়া পাগলের মত দৌড়াইতে দৌড়াইতে হরির কাছে গেল, আর নিজের কোলে তাহার মাথা রাখিয়া বিলাপ করিতে লাগিল—তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় যাও। ওরে সোনা, দৌড়ে জল নিয়ে আয়, আর গিয়ে শোভাকে বল্ যে বাবা বেহুঁস হয়ে পড়েছে। হায় ভগবান, এখন আমি যাই কোথায়? এখন কার আশ্রয়ে থাকব, কে আমাকে ধনিয়া বলে ডাকবে……

লালা পটেশ্বরী ছুটিয়া আসিল আর স্নেহপূর্ণ কঠোরতার সঙ্গে বলিল—কি করছিস ধনিয়া, স্থির হ। হরির কিছু হয় নাই। গরমে ও বেহুঁস হয়েছে। এখ্খুনি জ্ঞান হবে। মনটা এতখানি নরম করবি তো কাজ চলবে কি করে?

ধনিয়া পটেশ্বরীর পা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, কি করি লালা, মন মানে না। ভগবান সব কিছু নিয়েছেন। আমি চুপ করেই ছিলাম। এখন চুপ করে থাকা যায় না। হায়রে আমার হীরা!

সোনা জল লইয়া আসিল। পটেশ্বরী হরির মুখে জলের ছাঁট দিল। কয়েকজন নিজের নিজের গামছা খুলিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। হরির গা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। পটেশ্বরীরও চিন্তা হইল; সে কিন্তু ধনিয়াকে সমানে সাহস দিয়া চলিল।

ধনিয়া অধীর হইয়া বলিল, এমনটা কখনো হয় নি লালা, কখ্খনো হয়নি!

পটেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিল—রাত্রে কিছু খেয়েছিল?

ধনিয়া বলিল—হাঁ, রুটি তৈরি করেছিলাম; কিন্তু আজকাল আমাদের ওপর দিয়ে যা যাচ্ছে, তোমার কাছে লুকাই কি করে? এ কয় মাস ভরপেট রুটি কপালে ছিল না। কত বলি, প্রাণ বাঁচিয়ে কাজ কর; কিন্তু আরাম তো আমার ভাগ্যে লেখাই নাই।

সহসা হরি চক্ষু মেলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাইল।

ধনিয়া যেন বাঁচিয়া উঠিল। বিহ্বল হইয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিল—এখন তোমার কেমন লাগছে? আমার তো প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছিল।

হরি কাতর স্বরে বলিল—ভাল আছি। কি জানি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম।

ধনিয়া তিরস্কারের সহিত কহিল—শরীরে তো দম নাই, প্রাণ দিয়ে কাজ করছ। ছেলেদের ভাগ্য ছিল, নইলে তুমি তো শেষ করেই দিয়েছিলে!

পটেশ্বরী হাসিয়া কহিল—ধনিয়া তো কান্নাকাটি করছিল।

হরি কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—সত্যি, তুই কাঁদছিলি ধনিয়া?

ধনিয়া পটেশ্বরীকে ধাক্কা দিয়া বলিল—একে বকতে দাও না! জিজ্ঞাসা কর, ও কেন কাগজ পত্র ফেলে ঘর থেকে দৌড়ে এল!

পটেশ্বরী চটিয়া বলিল—তুমি হীরা হীরা বলে কাঁদছিলে! এখন লজ্জায় পড়ে অস্বীকার করছ। বুক চাপড়াচ্ছিলে।

হরি সজল নেত্রে ধনিয়ার দিকে চাহিল—পাগল না কি! জানি না এখন কোন সুখ দেখবার জন্য আমায় বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

দুইজন লোক হরিকে উঠাইয়া ঘরে আনিয়া খাটিয়ার উপর তাহাকে শোয়াইয়া দিল। দাতাদীন তো লাফাইতেছিল যে আখ বসাইতে দেরি হইয়া যাইতেছে; কিন্তু মাতাদীন এতটা নিষ্ঠুর ছিল না। সে দৌড়াইয়া ঘর হইতে গরম দুধ আনিল; এক শিশি গোলাপজলও লইয়া আসিল। দুধ খাইয়া হরির দেহে যেন প্রাণ আসিল।

এমন সময় দেখা গেল, গোবর একজন মজুরের মাথায় নিজের জিনিস-পত্র বোঝাই করিয়া আসিতেছে।

গাঁয়ের কুকুরগুলো প্রথমে তো ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে তাহার দিকে ছুটিল; তাহার পরে লেজ নাড়িতে লাগিল। রূপা বলিল—দাদা এসেছে, আর হাত তালি দিতে দিতে ছুটিল। সোনাও দুই তিন পা আগাইয়া আসিল, কিন্তু নিজের উৎসাহ ভিতরেই চাপিয়া রাখিল। এক বৎসরের মধ্যে তাহার যৌবন তাহাকে আরও লজ্জানম্র করিয়া দিয়াছিল। ঝুনিয়াও ঘোমটা খুলিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

গোবর বাপ-মার পায়ে আসিয়া প্রণাম করিল, রূপাকে কোলে বসাইয়া আদর করিল। ধনিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিল, তাহার মাথা বুকে

জড়াইয়া যেন মাতৃত্বের পুরস্কার পাইয়া গেল, গর্বে তাহার হৃদয় যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আজ তো সে রানী। এই দুরবস্থাতেও রানী। কেহ ওর চোখ দেখুক, ওর মুখ দেখুক, ওর হৃদয় দেখুক, ওর চাল-চলন দেখুক ; রাজরানীও লজ্জা পাইয়া যাইবে। গোবর কত বড় হইয়া গিয়াছে, আর কাপড় চোপড় পরিয়া তাহাকে কত ভদ্রলোকের মত লাগিতেছে। ধনিয়ার মনে কখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা হয় নাই। তাহার মন বলিতেছিল, গোবর কুশলে আছে, আনন্দে আছে। আজ তাহাকে চোখে দেখিয়া তাহার জীবনের ধূলা-কাদায় লুকানো রত্ন যেন সে ফিরিয়া পাইল। কিন্তু হরি মুখ ফিরাইয়া লইল।

গোবর জিজ্ঞাসা করিল—বাবার কি হয়েছে, মা ?

ঘরের অবস্থার কথা বলিয়া তাহাকে দুঃখিত করিতে ধনিয়ার মন চাহিল না। বলিল—কিছু নয়, বাবা, একটু মাথা ধরেছে। চল, কাপড় ছাড়, হাতমুখ ধোও। এতদিন ছিলে কোথায় ? এমন করে কি কেউ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ? কখনও একখানা চিঠি পর্যন্ত পাঠাও নাই। আজ এক বচ্ছর পরে মনে পড়েছে। তোমার পথ চেয়ে চেয়ে চোখ গিয়েছে। এই আশা বাঁচিয়ে রেখেছে যে কবে এমন দিন আসবে, কবে তোমাকে দেখব। কেউ বলত, 'মিরচ' চলে গেছ, কেউ বলত, 'ডমরা' দ্বীপে গেছ। শুনে শুনে প্রাণ শুকিয়ে উঠত। কোথায় ছিলে এত দিন ?

গোবর লজ্জা পাইয়া বলিল—বেশি দূরে যাই নাই মা, এখানে লখনৌতে তো ছিলাম।

এত কাছে থেকেও কখনও একখানা চিঠি লেখ নাই !

ওদিকে সোনা ও রূপা ভিতরকোঠায় গোবরের জিনিসপত্র খুলিয়া ভাগা-ভাগি করিতে ব্যস্ত ; ঝুনিয়া কিন্তু দূরে দাঁড়াইয়া। তাহার মুখের উপর আজ মানের প্রগল্‌ভতা রং-এর ঝলকে দেখা দিয়াছে। গোবর তাহার সঙ্গে যে ব্যবহার করিয়াছে, আজ সে তাহার শোধ লইবে। কৃষককে দেখিয়া তাহার নিকট হইতে মহাজন সেই টাকা উশুল করিতেও ব্যস্ত হইয়াছে, যাহা সে অনাদায়ীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। বাচ্চা ঐ সব জিনিস লাফাইয়া ধরিতে যাইতেছিল, ইচ্ছা যে, সবগুলি সে এক সঙ্গে মুখে পুরিয়া দিবে ; কিন্তু ঝুনিয়া তাহাকে কোল হইতে নামিতে দেয় নাই।

সোনা বলিল—দাদা তোমার জন্য আয়না-চিরুণী নিয়ে এসেছে, বৌদিদি !

ঝুনিয়া উপেক্ষার ভাবে বলিল—আমার আয়না-চিরুণী চাই না। নিজের কাছেই থাক।

রূপা শিশুর জন্য চমৎকার এক টুপি বাহির করিল—ওহো. এ তো চুন্নুর টুপি! আর সে শিশুর মাথার উপরে তাহা রাখিল।

ঝুনিয়া টুপি খুলিয়া ফেলিয়া দিল, আর হঠাৎ গোবরকে ভিতরে আসিতে দেখিয়া সে শিশুকে লইয়া নিজের কুঠুরিতে চলিয়া গেল। গোবর দেখিল, জিনিসপত্র সব খোলা পড়িয়া রহিয়াছে। ওর প্রাণ তো চাহিতেছিল, প্রথমে ঝুনিয়ার সঙ্গে দেখা করিয়া নিজের অপরাধ ক্ষমা করাইয়া লয়; কিন্তু ভিতরে যাইবার সাহস হইতেছিল না। সে ঐখানেই বসিয়া গেল, আর জিনিসপত্র বাহির করিয়া এক এক জনকে দিতে লাগিল, কিন্তু রূপার অভিমান হইল যে তাহার জন্য চপ্পল আসিল না কেন, আর সোনা তাহাকে ধমক দিতে লাগিল যে তুই চপ্পল নিয়ে কি করবি, নিজের পুতুল নিয়ে খেল; আমি তো তোর পুতুল দেখে কাঁদি না, তুই কেন আমার চপ্পল দেখে কাঁদবি! মিঠাই ভাগ করার ভার ধনিয়া নিজের উপর রাখিয়াছিল। এত দিন পরে ছেলে কুশলমত বাড়ি আসিয়াছে। সারা গাঁয়ে সে সব বিতরণ করিবে। একটা গোলাপজাম রূপার কাছে ছিল, উটের মুখে জিরার মত! সে চাহিতেছিল, হাঁড়ি তাহার সামনে রাখা হউক, সে লাফাইয়া লাফাইয়া খাইবে।

বাক্সটা খুলিয়া তাহা হইতে শাড়ী বাহির করা হইতে লাগিল। সবগুলি ছিল পাড়ওয়ালা, যেমন পটেশ্বরী লালার ঘরে পরিত; কিন্তু বড় পাতলা। এত মিহি শাড়ী বাপু আর কত দিন টিকিবে? বড় লোক যারা, তারা যত ইচ্ছা পাতলা শাড়ী পরুক। তাদের মেয়েদের তো আর শোয়া বসা ছাড়া কাজ নাই। এখানে তো খেত-খামার সব আছে। আরে! হরির জন্য ধুতি ছাড়া একখানা দোপাট্টাও আছে।

ধনিয়া খুসি হইয়া বলিল—এ তুমি বেশ করেছ বাবা। ওর দোপাট্টাখানা রয়ে রয়ে খসে গিয়েছিল একেবারে।

এতক্ষণে গোবর বাড়ির অবস্থাটা অনুমান করিতে পারিল। ধনিয়ার শাড়ীতে কয়েকটা তালি; সোনার শাড়ীর মাথার দিকটা ছেঁড়া, তাহার চুল দেখা যাইতেছিল; রূপার ধুতিতে চার দিক হইতে ঝালরের মত ঝুলিতেছিল। সকলের চেহারা রুক্ষ, কারুর দেহে চিকনাই নাই। যেদিকেই দেখ, দুর্দশার অন্ত নাই।

মেয়েরা তো শাড়ী লইয়া ডুবিয়া ছিল, ছেলের আহারের জন্য ধনিয়ার চিন্তা হইল। ঘরে অল্প স্বল্প যবের আটা সন্ধ্যার জন্য জমানো ছিল। যবের আটা খাওয়াও তার চলিবে। বিদেশে কি কি খাওয়া দাওয়া চলিত, কে জানে? দুলারীর দোকান হইতে গমের আটা, চাল, ঘি ধার করিয়া আনিতে সে চলিল। এদিকে কয়েক মাস সাহুনী এক পয়সার জিনিসও ধারে দিত না; আজ কিন্তু সে একবারও জিজ্ঞাসা করিল না, পয়সা কবে দিবে।

সে জিজ্ঞাসা করিল—গোবর তো খুব টাকা কামিয়ে এসেছে, না?

ধনিয়া বলিল—এখনও তো কিছু খোলে নাই, দিদি। এখনও আমি কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত মনে করি নাই। হাঁ, সকলের জন্য পাড়ওয়ালা শাড়ী নিয়ে এসেছে! তোমাদের আশীর্বাদে কুশলমত ফিরতে পেরেছে, এই আমার খুব।

দুলারী আশীর্বাদ করিল—ভগবান করুন, যেখানেই থাক ভালয় ভালয় থাকে। বাপ-মার আর চাই কি। ছেলের বুদ্ধি শুদ্ধি আছে; অন্য ছেলেদের মত উড়নচণ্ডী নয়। আমার টাকা এখন না মেলে, ব্যাজ তো দিয়ে দাও। দিন দিন বোঝা যে বেড়েই চলেছে।

এদিকে সোনা চুন্নুকে তাহার ফ্রক, টুপি আর জুতা পরাইয়া রাজা সাজাইতেছিল। শিশু এসব পরার চেয়ে হাতে লইয়া খেলাটাই বেশি পছন্দ করিল। বাড়ির ভিতরে গোবর আর ঝুনিয়ার মধ্যে মান-অভিমানের অভিনয় হইতেছিল।

ঝুনিয়া তিরস্কারপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া কহিল—আমাকে এনে এখানে রেখে দিলে। নিজে বিদেশের রাস্তা ধরলে। মরে আছি কি বেঁচে আছি, তার কোনও খোঁজখবর নাই। একটা বছরের পর তবে তোমার গিয়ে ঘুম ভাঙ্গল!, কত বড় কপটী তুমি। আমি তো ভাবছি আমার পিছনে পিছনে আসছ, আর তুমি গেলে উড়ে, এক বছরের পরে ফিরছ। মরদকে বিশ্বাস কি, আবার কোথায় তাগ করেছ। ভেবেছ, একটাকে তো ঘরের জন্য এনেইছি, বাইরের জন্যও একজন হোক।

গোবর সাফাই দিল—ঝুনিয়া, ভগবানকে সাক্ষী মেনে বলছি, আমি কখনও কারুর দিকে তাকাই নাই। ভয়ে আর লজ্জায় সত্যি বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম; কিন্তু তোর কথা মন থেকে এক দণ্ডের জন্যও সরে যায় নি।

এখন তো আমি ঠিক করে এসেছি, তোকে শুদ্ধু নিয়ে যাব। এই জন্যই এসেছি। তোর বাড়ির লোকেরাও তো খুব রাগ করে থাকবে ?

বাবা তো আমার প্রাণ নিতেই এসেছিল।

সত্যি !

তিনজনই এখানে চড়াও হয়েছিল। মা এমনি ধমক দিলেন যে বেঁচে গেলাম। হাঁ, আমাদের দুটো বলদই খুলে নিয়ে গেছে।

এতখানি জবরদস্তি ! আর বাবা কিছু বলল না ?

বাবা একা কয়জনের সঙ্গে লড়বেন ? গাঁয়ের লোকেরা তো নিয়ে যেতে দিতে চায় নি ; তা বাবা করলেন ভালমানষি, তারা কি করে !

আজকাল তবে ক্ষেতি-টেতি কি করে হয় ?

ক্ষেতি-টেতি সব উঠে গেছে ; পণ্ডিত মহারাজের সঙ্গে ভাগে সামান্য কিছু হয়। আখ বসাতেই পারা যায় নাই।

গোবরের কোমরে এ সময়ে দুই শ টাকা ছিল। তাহার গরমও বড় কম নয়। এ দশা শুনিয়া তাহার দেহে আগুনের জ্বালা ধরিল।

বলিল—আমি তো আগে ওদেরই গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আসব। ওদের এত বড় আস্পর্ধা যে আমাদের দরজা থেকে বলদ খুলে নিয়ে যায় ! এ তো ডাকাতি, খোলাখুলি ডাকাতি ! তিন জনকে খাটতে হবে তিন তিন বৎসর ! এরা গোরু না দেয়, আদালতের থেকে নেব। সমস্ত অহঙ্কার ভেঙ্গে দেব।

সে এমনই ভাবে চলিল যে ঝুনিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল—তা যেও, এখন অত তাড়াতাড়ি কিসের ? একটু আরাম করে নাও, কিছু খাওয়া দাওয়া কর। সারা দিন তো পড়েই আছে। এখানে বড় বড় পঞ্চায়েৎ হল ; পঞ্চায়েৎ আশি টাকা দণ্ড লাগাল। ত্রিশ মণ ধানও তার ওপর। ঐতেই তো আরো সর্বনাশ হল।

শিশুকে কাপড়-জুতা পরাইয়া সোনা লইয়া আসিল। কাপড় চোপড় পরিয়া ও যেন সত্যই রাজা হইয়া গিয়াছিল। গোবর তাহাকে কোলে লইল ; কিন্তু শিশুকে আদর করিয়া সে এখন আনন্দ পাইল না। তাহার রক্তে আগুন ধরিয়াছিল, কোমরের টাকা সে আগুনের আঁচ বাড়াইয়া দিয়াছিল। সে এক এক জনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবে। তাহার উপর দণ্ড লাগাইবার অধিকার কি

আছে পঞ্চের? তাহাদের মধ্যে বলিবার মত আছে কে? সে একটা মেয়ে রাখিয়াছে, তাহাতে পঞ্চের বাপের কি, এ কথায় যদি সে ফৌজদারী করে তো লোকের হাতে যে হাতকড়ি পড়িবে, সমস্ত সংসার তছনছ হইবে। এরা তাহাকে কি মনে করিয়াছে!

শিশু তাহার কোলে একটু হাসিল, তাহার পর জোরে চিৎকার করিয়া উঠিল যেন কোন কিছু দেখিয়া ভয় পাইয়াছে।

ঝুনিয়া তাহার কোল হইতে শিশুকে লইয়া বলিল—এখন গিয়ে স্নান-টান কর। কি ভাবনার মধ্যে পড়েছ? এদের সঙ্গে যদি লড়তে শুরু কর তবে এখানে এক-দিনও কাটবে না। যাদের কাছে পয়সা, তারাই বড়লোক, তারাই ভাল লোক। পয়সা যার নাই তারই ওপর সকলের চাপ।

আমার বেকুবি, বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। নইলে দেখে নিতাম, এক আধলাও কেমন করে কে দণ্ড নেয়!

শহরের হাওয়া খেয়ে এসেছ, তাই এসব কথা বুঝতে আরম্ভ করেছ। না হলে ঘর ছেড়ে পালাতেই বা কেন!

প্রাণ চায়, লাঠি উঠিয়ে পটেশ্বরী, দাতাদীন, ঝিংগুরী সব শালাকে পিটোই, তাদের পেটের থেকে টাকাটা বের করি।

টাকার খুব গরম হয়েছে, ভাল সময় পড়েছে কি না। নেও, বের কর, দেখি এত দিনে কি কামিয়ে এনেছ।

গোবরের কোমরে সে হাত দিল। গোবর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—এখন আর কি কামিয়েছি, হাঁ, যখন তুমি যাবে, তখন তো কামাব। এক বছর ধরে শুধু শহরের আদব-কায়দা বুঝতেই চলে গেল।

মা যেতে দেবে, তবে তো?

মা কেন যেতে দেবে না? মার কথা কেন?

বাঃ, মাকে রাজী না করিয়ে আমি কোথাও যাব না। তুমি তো ছেড়ে যেতে তৈরি। আর আমার এখানে কে ছিল! মা যদি ঘরে ঢুকতে না দিত তো কোথায় যেতাম। যতদিন বাঁচব, মার নাম করব; তুমিই কি বিদেশ আঁকড়ে পড়ে থাকবে?

আর এখানে বসে করব কি? টাকা কামাও আর—মর, এ ছাড়া এখানে আর কি আছে। অল্প সল্প বুদ্ধি থাকে আর লোকে কাজ করতে ভয় না পায়,

তাহলে ওখানে খিদেয় মরতে কেউ পারবে না। এখানে তো বুদ্ধি কিছুই করতে পারে না। বাবা আমাকে দেখে গাল ফোলাচ্ছে কেন?

গাল ফুলিয়ে যে ছেড়ে দিচ্ছে সে তোমার ভাগ্য। তুমি তো এতখানি উপদ্রব বাড়িয়েছ, যে রাগের সময় সামনে পেলে মেরে লাল করে দিত।

তুমিও তবে নিশ্চয় আমায় খুব গাল দিয়েছ?

কখনও না, ভুলেও না। মা তো প্রথমে চটেই ছিল, কিন্তু বাবা তো কখনও কিছু বলেন নাই, যখন ডাকতেন খুব আদর করে ডাকতেন। আমার যদি মাথা ধরত তো অজ্ঞান হয়ে যেতেন। নিজের বাপকে দেখে আমার মনে হত ইনি দেবতা। মাকে বোঝাতেন, বৌকে কিছু বোলো না। তোমার ওপর একশ বার রাগ করতেন, একে ঘরে দিয়ে নিজে না জানি কোথায় চলে গেল। আজকাল পাই পয়সার টানাটানি; আখের টাকা বাইরে বাইরে উড়ে গেল। এখন তো মজুরি করতে হচ্ছে। আজ বেচারা ক্ষেতে বেহুঁস হয়ে গিয়েছিলেন। কান্না-কাটি লেগে গিয়েছিল। তখন থেকে পড়ে আছেন।

মুখ হাত ধুইয়া ও চুল খুব ভাল করিয়া আঁচড়াইয়া গোবর গ্রামে দিগ্বিজয়ে বাহির হইল। দুই কাকার বাড়ি গিয়া 'রাম রাম' করিয়া আসিল। তাহার পর গেল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করিতে। গ্রামের বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নাই। হাঁ, পটেশ্বরীর নূতন বসিবার ঘর হইয়াছে, আর ঝিংগুরী সিং দরজার কাছে নূতন কূয়া খোঁড়াইয়াছে। গোবরের আরও মনে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিল। যাহার সঙ্গে দেখা হইল সে তাহাকেই আদর করিল, ছেলের দল তো তাহাকে নিজেদের 'হিরো' বানাইয়া লইল, তাহার সঙ্গে লখনৌ যাইতে তৈয়ার হইল। এক বৎসরের মধ্যে সে কি হইতে কি হইল।

ঝিংগুরী সিংহ নিজের কুয়ার কাছে স্নান করিতেছিল। হঠাৎ গোবর আসিয়া পড়িল। কিন্তু না করিল সেলাম, না বলিল কথা। ও ঠাকুরকে দেখাইতে চাহিয়াছিল, আমি তোমাকে গ্রাহ্যই করি না।

ঝিংগুরী সিংহ নিজেই জিজ্ঞাসা করিল—কখন এলে গোবর, মজায় তো ছিলে। কোথায় চাকরি করছিলে, লখনৌতে?

গোবর দর্পের সহিত বলিল—লখনৌ গোলামি কোরতে যাই নাই। চাকরি তো গোলামি। আমি ব্যবসা করছিলাম।

ঠাকুর কুতূহলভরা চোখে তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত দেখিয়া লইল।—রোজ কত লাভ হচ্ছিল ?

গোবর তাহার উপর ছুরিটা ভাল করিয়া চালাইল—এই আড়াই-তিন টাকা আর কি। সুবিধা হলে কখনও চার টাকাও পেয়েছি। তার বেশি নয়।

ঝিংগুরী খুব আঁচড়াইয়া কামড়াইয়াও পঁচিশ-ত্রিশ টাকার বেশি কামাইতে পারে না; আর এই গেঁয়ো ছোকরাটা এক শ টাকা কামাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার মাথা নীচু হইয়া গেল। এখন সে কিসের জোরে তাহার উপর ধমকাধমকি করিতে পারিবে? বর্ণে সে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বর্ণ দেখে কে? তাহার সহিত দ্বন্দ্বের এ সময় নয়, এখনও তো তাহাকে মিনতি করিয়া কিছু কাজ আদায় করা সম্ভব; বলিল—এ রোজগারও কম নয়রে বাছা, যদি খরচ কুলিয়ে যায়। গাঁয়ে তো তিন আনাও পাওয়া যায় না। ভবানীকেও (বড় ছেলের নাম) কোনও জায়গায় একটা কাজ পাইয়ে দাও, তাহলে ওকেও পাঠিয়ে দিই। পড়াশোনা করে না, একটা না একটা উপদ্রব লেগেই আছে। কোথাও কেরাণীগিরি খালি হলে বোলো। নইলে সঙ্গে করেই নিয়ে যাও। তোমার তো বন্ধু। মাইনে কম হয়, কিছু দুঃখ নাই, যদি চার পয়সা উপরি থাকে।

গোবর অভিমানভরা হাসির সঙ্গে বলিল—এই উপরি পাওনার লোভ মানুষকে খারাপ করে দেয়, ঠাকুর; কিন্তু আমাদের অভ্যেস এমনি বদলে গেছে যে বেইমানি না করলে পেটই ভরে না। লখনৌতে কেরাণীগিরি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক মহাজন ইমানদার, চোকস লোক চায়। আমি না হয় ভবানীকে কারো গলায় বেঁধে দিলাম; কিন্তু পরে যদি সে কোথাও কোন দুষ্কর্ম করে তবে সে আমারি তো ঘাড় ধরবে। সংসারে ইলেমের কদর নেই, কদর আছে ইমানের।

এই থাপ্পড় মারিয়া গোবর আগে চলিয়া গেল। ঝিংগুরী মনে মনে বেঁকিয়া রহিল। ছোকরা কত অহংকারের সঙ্গে কথা বলে, যেন ধর্মের অবতারই হইবে।

এই ভাবে গোবর দাতাদীনকেও এক চোট লইল। দাতাদীন খাইতে যাইতেছিল; গোবরকে দেখিয়া খুসি হইয়া বলিল—ফুর্তিতে আছিস তো গোবর? শুনলাম ওখানে কোন একটা ভাল জায়গা পেয়ে গেছিস।

মাতাদীনকেও কোনও স্থবিধায় লাগিয়ে দে না! ভাং খেয়ে পড়ে থাকা ছাড়া এখানে আর ওর কাজ কি ?

গোবর বলিতে আরম্ভ করিল—তোমাদের বাড়িতে কিসের অভাব আছে মহারাজ? যে যজমানের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, কিছু না কিছু আদায় করে আনবেই। মানুষের জন্মের সময় নাও, মৃত্যুর সময় নাও, বিয়েতে নাও, দুঃখশোকে নাও; ক্ষেতি করছ, লেন-দেন করছ, দালালি কর, কারো ভুলচুক হলে দণ্ড লাগিয়ে তার ঘর লুটে নাও; এত রোজগার করেও পেট ভরে না? অনেক টাকা জমিয়ে করবে কি? সঙ্গে নিয়ে যাবার কোন যুক্তি ঠাউরেছ না কি ?

দাতাদীন দেখিল, গোবর কত জিদের সঙ্গে কথা কহিতেছে; আদব-কায়দা আর খেয়াল যেন ভুলিয়াই গিয়াছে। এখনও জানেনা হয়তো যে বাপ আমারই গোলামি করিতেছে। সত্য কথা, ছোট নদীর দুই ধার ভাসাইতে দেরি হয় না, কিন্তু শরীরে ময়লা লাগিতে দেয় নাই। বয়স্ক লোক যেমন ছেলে গোঁফ ধরিয়া টানিলেও হাসে, সেও তেমনি ভঙ্গীতে হাসিল, গায়ে কিছু মাখিল না, আর ফুর্তির ভাবে বলিল—লখনৌয়ের হাওয়া খেয়ে তুই বড় কৃপণ হয়ে গেছিস, গোবর! নে, কি কামিয়ে এনেছিস, বের কর কিছু। সত্যি বলছি গোবর, তোমার কথা খুব মনে হোত; এখন তো থাকবে কিছুদিন ?

হাঁ, এখন তো থাকবো কিছুদিন। ঐ পঞ্চায়েতের ওপর চাপ দিতে হবে, যারা দণ্ডের ভাগ করে আমার দেড় শ টাকা হজম করেছে। দেখব, কে আমার হুঁকো-জল বন্ধ করে, আর কোন বেরাদরি আমায় জাতের বের করে দেয়।

এই ধমক দিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার হাঁকডাকে যুবক ভক্তেরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

একজন বলিল—দে নালিশ করে, গোবর ভাই! বুড়ো হল কালসাপ—কাটলে আর মন্তর নেই। ঠিক দণ্ডের কথা বলেছ। পাটোয়ারীর কানও একটু গরম করে দাও। বড় চালাক রে বাবা! বাপে-বেটায় আগুন লাগিয়ে দেয়, ভাইয়ে-ভাইয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। গোমস্তাদের সঙ্গে মিশে প্রজাদের গলা কাটে। নিজের ক্ষেতে পরে লাঙ্গল জুতো, আগে ওর ক্ষেতে লাঙ্গল দাও। নিজের সেঁচ পরে কোরো, আগে ওঁর খেতে সেঁচ দাও।

গোবর গোঁফে তা দিতে দিতে বলিল—আমায় কি বলছ ভাই, এক

বচ্ছরে খুব কমই ভুলেছি। এখানে আমার থাকাই হবে না, নইলে এক এক করে নাচিয়ে ছাড়তাম। এখন ধুমধাম করে হোলি লাগাও, আর হোলির সং বানিয়ে এদের সকলকে খুব এক চোট নাও।

হোলির প্রোগ্রাম তৈরি হইতে লাগিল। খুব ভাং ঘোঁটা হইল, দুধিয়া ঘোঁটা হইল, নুন দেওয়া হইল। রং-এর সঙ্গে কালিও তৈরি হইল, আর প্রবীণদের মুখের উপর কালিই তো মাখানো হইবে। হোলির সময় কে আর কাহাকে কি বলিতে পারে! সং বাহির করা হইবে, পঞ্চায়েৎকে ঠাট্টা করা হইবে। টাকা পয়সার জন্য কোনও চিন্তা নাই। গোবরভাই টাকা রোজগার করিয়া আসিয়াছে।

আহারের পর গোবর ভোলার সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। যতক্ষণ নিজের বলদ জোড়া আনিয়া দরজার সামনে বাঁধিয়া না দেয়, ততক্ষণ ওর শান্তি নাই। ও লড়িতে মরিতে তৈয়ার।

হরি কাতর স্বরে বলিল—ঝগড়া বাড়িও না বাবা। ভোলা গোরু নিয়ে গেছে, ভগবান ওর ভাল করুন; কিন্তু ওর টাকা তো আসছেই।

গোবর উত্তেজিত হইয়া বলিল—বাবা, তুমি মাঝখানে কথা বোলো না। ওর গোরুর দাম ছিল পঞ্চাশ টাকা। আমার গোরু এসেছিল দেড় শ টাকায়। তিন বচ্ছর আমি জুতেছিলাম। তখনও এক শ টাকার ছিল। ও নিজের টাকার জন্য চাপ দিত, ডিক্রি করাত, যা ইচ্ছা করত, আমার দরজা থেকে বলদ জোড়া খুলে নিয়ে গেল কেন? আর তোমাকে বলব কি! এদিকে গোরু খুইয়ে বসলে, ওদিকে দেড় শ টাকা দণ্ড ভরলে। এ হোল এমনি করে থাকার ফল। আমার সামনে বলদজোড়া খুলে নিয়ে যেত তো দেখতাম। তিনজনকে এইখানে জমিনের ওপর শুইয়ে দিতাম। আর পঞ্চের সঙ্গে তো কথাই বলতাম না। দেখতাম, কে করে আমাকে বেরাদরি থেকে আলাদা; কিন্তু তুমি তো চুপ করে বসে দেখে যাচ্ছ।

হরি অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিল, কিন্তু ধনিয়া এই অন্যায় কথা শুনিতে পারে না; সে বলিল—বাবা, তুমিও তো গোলমেলে কথা বলছ। হুঁকো-জল বন্ধ হলেও গাঁয়ে চলে যায়। সোমত্ত মেয়ে বসে আছে, ওরও তো একটা গতি করতে হবে, কি, না! বাঁচি আর মরি লোকে আত্মীয় স্বজন……

গোবর কথা থামাইয়া বলিল—হুঁকো-জল তো সবই ছিল, বেরাদরির মধ্যে

আদরও ছিল, কিন্তু আমার বিয়ে হোল না কেন? বল। এইজন্যেই তো যে, ঘরে রুটি ছিল না? টাকা থাকলে হুঁকো-জলেই বা কি কাজ. জাত-বেরাদরিই বা করবে কি? দুনিয়াটা হল টাকার বশ, হুঁকো-জলের কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে না।

ধনিয়া তো ছেলের কান্না শুনিয়া ভিতরে চলিয়া গেল, আর গোবরও ঘর হইতে বাহিরে আসিল। হরি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, ছেলেটার বুদ্ধি যেন খুলিয়া গিয়াছে। কেমন ধারা এদিক ওদিক কথা বলে। লজ্জার মাথা খাইয়া এমন সব কথা বলে কি করিয়া? হরির ধর্ম ও নীতি গোবরের বক্র বুদ্ধির কাছে হার মানিল।

হঠাৎ হরি তাহাকে প্রশ্ন করিল—আমিও যাব তোমার সঙ্গে?

আমি লড়াই করতে যাচ্ছি না, বাবা, ভয় পেও না। আমার দিকে তো আইন আছে, আমি কেন লড়াই করতে শুরু করব?

আমিও যদি যাই তো ক্ষতি হবে কিছু?

হাঁ, খুব ক্ষতি হবে। তুমি তৈরি কথা উল্‌টে দেবে।

হরি চুপ করিয়া রহিল আর গোবর চলিয়া গেল।

পাঁচ মিনিটও হয় নাই ধনিয়া শিশুকে লইয়া বাহিরে আসিল, বলিল—কী, গোবর চলে গেছে, একলা? আমি বলি, তোমাকে কি ভগবান কখনও বুদ্ধি দেবেন না? ভোলা কি সহজে গোরু দেবে? তিনজন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, বাজের মত। ভগবান কুশল করুন। কাকে এখন বলি, দৌড়ে গোবরকে ধরে ফেল? তোমার কাছে তো হার মানলাম।

হরি কোণ হইতে ডাণ্ডা লইয়া গোবরের পিছনে ছুটিল। গ্রামের বাহিরে আসিয়া সে চারি দিকে নজর করিল। এক ক্ষীণ রেখার মত কিছু যেন দিগ্‌বলয়ে মিশাইয়া যাইতে দেখা গেল। এইটুকু সময়ের মধ্যে গোবর এতদূর কি করিয়া চলিয়া গেল! হরির আত্মা তাহাকে ছি ছি করিতে লাগিল। ও কেন গোবরকে আটকাইল না? যদি ও ধমক দিয়া বলিয়া দিত, ভোলার বাড়ি যেও না, তাহা হইলে গোবর কখনও যাইত না। আর এখন তো সে দৌড়াইতেও পারে না। হার মানিয়া সে ঐখানেই বসিয়া পড়িল, আর বলিল—মহাবীর স্বামী, ওকে রক্ষা কর।

গোবর ঐ গ্রামে পৌঁছাইয়া দেখিল, কয়েকজন লোক বটগাছের নীচে বসিয়া

জুয়া খেলিতেছে। উহাকে দেখিয়া লোকে মনে করিল, পুলিসের সিপাহী বা হইবে! কড়িগুলা সংগ্রহ করিয়া পলাইবে, এমন সময় জংগী হঠাৎ তাহাকে চিনিয়া বলিল—ওরে! এ যে গোবর্ধন।

গোবর দেখিল, জংগী গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতেছে; বলিল—ভয় কোরো না জংগী ভাই, এ যে আমি। রাম রাম! আজই এসেছি। ভাবলাম, যাই, সকলের সঙ্গে দেখা করে আসি, আবার কবে আসা হবে জানি না। আমি তো ভাই তোমার আশীর্বাদে বড় ফুর্তিতে বাইরে গেছি। যে রাজার চাকরি করছি তিনি আমায় বললেন, আরও দুই একজন পাও তো সঙ্গে নিয়ে এসো। চৌকিদারির জন্য চাই। আমি বললাম, হুজুর, এমন লোক দেব যে প্রাণ যায় তাও স্বীকার, কাজ থেকে হটবার পাত্র নয়; ইচ্ছা হয় তো আমার সঙ্গে চলো। ভালো জায়গা।

জংগী তাহার ঠাট দেখিয়া দমিয়া গেল। সে কখনও চামড়ার জুতা পরিবার সুযোগ পায় নাই, আর গোবর খুব নতুন এক জোড়া বুট পরিয়া মসমস করিয়া যাইতেছে। সাফ-সুৎরা, ডোরাকাটা ছিটের কামিজ, পাটকরা চুল, পুরা বাবু-সাহেব বনিয়া গিয়াছে। ছেঁড়া-কপাল গোবর, আর এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গোবর, দুইজনে প্রভেদ বিস্তর। হিংসার ভাব কিছুটা এই সময়ের গুণে শান্ত হইয়া গিয়াছিল, আর কথাবার্তাও শান্ত। জংগী নিজে জুয়াড়ী তো ছিলই, তাহার উপর গাঁজার বদ্ অভ্যাস। আর বাড়ি থেকে অনেক কষ্টে পয়সা পাইত। জিভে জল আসিয়া গেল। বলিল—যাব না কেন, এখানে তো বসে বসে মাছি-ই মারছি। ক টাকা পাওয়া যাবে?

গোবর খুব নিশ্চিন্তভাবে বলিল—তার জন্য কিছু ভেব না। সব কিছু হাতের মুঠোয় আছে। যা চাইবে, তা-ই হবে। আমি ভাবলাম, বাড়িতেই যখন লোক আছে, তখন বাইরে যাই কেন?

জংগী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি কাজ করতে হবে?

কাজ? চাই চৌকিদারি কর, না হয় তাগাদায় যাও। তাগাদার কাজ সব চেয়ে ভাল। প্রজাদের সঙ্গে জমে গেলে; এসে মালিককে বলে দিলে, ঘরে পাওয়া গেল না, চাও তো টাকাটা আধুলিটা রোজ আসতে পারে।

থাকার জায়গাও পাওয়া যায়?

জায়গার অভাব কি? গোটা মহল পড়ে আছে। জলের কল, বিজলি, কোন জিনিসের অভাব নাই।—কামতা আছে, না কোথাও গেছে?

দুধ নিয়ে গেছে। আমায় কেউ বাজার যেতে দেয় না। বলে, তুমি তো গাঁজা খেয়ে ফেল। আমি এখন খুব কম খাই ভাই, কিন্তু রোজ তো দুই পয়সার চাই-ই। তুমি কামতাকে কিছু বোল না। আমি যাব তোমার সঙ্গে।

হাঁ, হাঁ, নির্ভয়ে চল। হোলির পরে।

তবে পাকা কথা রইল।

দুইজনে কথা বলিতে বলিতে ভোলার দরজা পর্যন্ত আসিয়া পৌছিল। ভোলা বসিয়া বসিয়া সুতলি কাটিতেছিল। গোবর তড়াক করিয়া তাহার পা ছুঁইল, এসময় তাহার গলা সত্য সত্যই ধরিয়া আসিল। বলিল—কাকা, আমার যা ভুলচুক হয়েছে, মাপ কর।

ভোলা সুতলি কাটা বন্ধ করিয়া দিল আর কঠোর স্বরে বলিল—কাজ তো তুমি এমন করেছ গোবর, যে তোমার মাথা কাটলেও পাপ হয় না; কিন্তু নিজের বাড়ির ওপর এসেছ, এখন কি বলি। যাও, আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছ, ভগবান তার সাজা দেবেন। কবে এসেছ?

গোবর খুব রসাল করিয়া নিজের উন্নতির কথা বলিল, আর জংগীকে নিজের সঙ্গে লইয়া যাইবার অনুমতি চাহিল। ভোলার যেন 'না চাইতেই বরলাভ'! জংগী বাড়িতে একটা না একটা হাঙ্গামা করিত। বাহিরে গেলে চার পয়সা রোজগার করিবে তো! কাহাকেও কিছু না দিলে নিজের বোঝা তো উঠাইয়া লইবে!

গোবর বলিল—না কাকা, ভগবান যদি মুখ তুলে চান আর ও যদি টিকে যায়, তো দুই এক বৎসরে মানুষ হয়ে যাবে।

হাঁ, যদি ও টিকে যেতে পারে।

মাথার উপরে বোঝা এলে লোকে নিজেই নিজেকে সামলে নেয়।

তা হলে কবে লাগাৎ যাবে ভাবছ?

হোলির পরে চলে যাব। এখানকার চাষবাড়ির বন্দোবস্তটা আবার করে দিলে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।

হরিকে বল, এখন বসে রাম নাম করুক।

বলছি তো; কিন্তু ওঁকে বসাতে পারলে তবে তো হয়।

ওখানে কোনও বৈদ্যের সঙ্গে তোমার জানা শোনা নিশ্চয় আছে। কাসিটা বড্ড কষ্ট দিচ্ছে। যদি পার তো কোনও ওষুধ পাঠিও।

খুব বড় নামডাকের একজন তো আমার পাড়ায়ই থাকেন। তাঁকে অবস্থাটা বলে ওষুধ তৈরি করে পাঠিয়ে দেব। কাসিটা রাত্রে কষ্ট দেয় বেশি, না দিনে?

না বাবা, রাতেই জোর করে। চোখ বন্ধ করতে পারি না। নইলে ওখানে যদি কোনও ব্যবস্থা হয় তো আমিও গিয়ে থাকি। এখানে তো কিছু পড়তা নাই।

রোজগারের যা মজা সেখানে, এখানে কি হবে। এখানে টাকায় দশ সের দুধও কেউ পোছে না। হালুয়াইদের গলায় ঝুলিয়ে দিতে হয়। ওখানে পাঁচ ছয় সের দরে দিতে চাও তো এক ঘণ্টায় দুধ বিক্রি করে ফেলতে পার।

জংগী গোবরের জন্য 'দুধিয়া' শরবত বানাইতে চলিয়া গেল। আর কেহ নাই দেখিয়া ভোলা বলিল—আরে ভাই, এখন এ জংগল দেখে প্রাণ উবে যায়। জংগীর অবস্থা তো দেখছই। কামতা দুধ নিয়ে যায়। গোরুর সানিজল, গোরুকে খোলা-বাঁধা, সব করতে হয় আমাকে। এখন তো প্রাণ চায় যে সুখে কোথাও একখানা রুটি খাই আর পড়ে থাকি। কত দিন হৈ চৈ করব! রোজ লড়াই ঝগড়া। কার পায়ে ধরব। কাসি আসে, রাত্রে উঠতে পারি না। কেউ এক ঘটি জল দিয়েও পোছে না। গোরুর দড়ি ছিঁড়ে গেছে, কিন্তু সেদিকে কারো লক্ষ্য নাই। যখন আমি করব, তখন হবে।

গোবর আত্মীয়তার ভাব দেখাইয়া বলিল—তুমি লখনৌ চল কাকা। পাঁচ সের করে দুধ বেচো, নগদ। কত সব বড় বড় আমীরদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। এক মণ দুধ জোগানের ভার তো আমিই নিচ্ছি। আমার চায়ের দোকানও আছে। দশ সের দুধ তো আমিই রোজ নিয়ে থাকি। তোমার কোনও রকম কষ্ট হবে না।

জংগী দুধিয়ার শরবৎ লইয়া আসিল। গোবর এক গেলাস শরবৎ খাইয়া বলিল—তুমি তো শুধু সাঁঝে সকালে চায়ের দোকানে বসে থেক কাকা, একটা টাকা কেউ মারবে না।

ভোলা এক মিনিট পরে সংকোচের সঙ্গে বলিল—রাগের বশে, বাবা, লোকে অন্ধ হয়। আমি তোমার গোরু খুলে এনেছিলাম। তুমি নিয়ে যাও। এখানে কি আর ক্ষেতি হচ্ছে!

আমি তো একটা নতুন গরু ঠিক করে এনেছি কাকা।

না-না, নতুন গোরু নিয়ে কি করবে, এটাই নিয়ে যাও।

তাহলে আমি তোমাকে টাকা পাঠিয়ে দেব।

টাকা আর বাইরে কোথায়, বাবা, ঘরেই তো আছে। জ্ঞাতিদের ফিকির, নইলে তোমাদের আর আমাদের মধ্যে ভেদ কোথায়? সত্যি কথা বলতে বল তো বলি, ঝুনিয়া ভাল ঘরে আছে, আরামে আছে, আমার তো খুসি হওয়ার কথা। আর আমি চেয়েছিলাম ওর রক্ত দর্শন করতে!

সন্ধ্যার সময় গোবর চলিয়া গেল, গোরু তাহার সঙ্গে গেল, আর পিছনে পিছনে জংগী চলিল, দুই দুই হাঁড়ি দৈ লইয়া।

## ২১

গ্রামে বৎসরের ছয় মাস কোন না কোন উৎসবে ঢাক ঢোল বাজিতেই থাকে। হোলির এক মাস পূর্ব হইতে এক মাস পরে পর্যন্ত ফাগ উড়িতে থাকে; আষাঢ় আসিতে না আসিতে আল্‌হা শুরু হইয়া যায়, আর শ্রাবণ-ভাদ্রে কাজরির গান। কাজরির পরে রামায়ণ গান। সেমরীও বাদ পড়ে না। মহাজনের ধমক, গোমস্তার ভুলচুক এই সমারোহে বাধা দিতে পারে না। ঘরে ধান নাই, দেহে কাপড় নাই, গাঁঠে পয়সা নাই। তাতে কি? জীবনের আনন্দবৃত্তি তো চাপিয়া রাখা যায় না, না হাসিয়া বাঁচা যায় না।

এই হোলিতে গানবাজনার প্রধান স্থান ছিল নোখেরামের বৈঠকখানা। সেইখানেই ভাং তৈরি হইত, সেখানেই রং উড়িত, সেখানেই নাচ হইত। উৎসবে গোমস্তা সাহেবের দশ-পাঁচ টাকা খরচ হইয়া যাইত। আর কাহার এত ক্ষমতা আছে যে নিজের বাড়িতে জলসা করায়?

কিন্তু এবার গোবর গ্রামের সমস্ত তরুণদের নিজের বাড়িতে টানিয়া লইয়াছে, নোখেরামের ঘর আছে খালি পড়িয়া। গোবরের দরজায় ভাং ঘোঁটা হইতেছে, পানের খিলি সাজানো আছে, রং গুলিতেছে, ফরাস বিছানো আছে, গান হইতেছে, আর নোখেরামের বাড়িতে অন্ধকার জমাট! ভাং তো আছে, পিষিবে কে? ঢোল-মঞ্জীর সব মজুদ, গাহিবে কে? যাহাকেই দেখ, গোবরের দরজার

দিকে ছুটিতেছে। সেখানে ভাঙে গোলাপজল, কেশর আর বাদামের বাহার। হাঁ, হাঁ, এক সের বাদাম গোবর নিজে কিনিয়া আনিয়াছে। খাইতেই শরীর তর্ হইয়া যায়, চোখ খুলিয়া যায়। খাম্বীরা তামাক আনিয়াছে, খাস বিসোয়ার। রঙেও কেওড়া দিয়াছে। টাকা আনিতেও জানে, খরচ করিতেও জানে; টাকা পুঁতিয়া রাখিলে আর কে বা দেখে! খরচ করাই হইল ধনের শোভা। আর শুধু ভাং নয়। যাহারা গান করে, সকলেরই নিমন্ত্রণ হইয়াছে। গাঁয়ে নাচিবার, গাহিবার, অভিনয় করিবার লোকের অভাব নাই। শোভাই ল্যাংড়ার এমন নকল করে যে সকলে হার মানে; বুলির নকল করিতে উহার দোসর নাই; যাহার বুলি বল, তাহারই বুলি—মানুষেরও, জানোয়ারেরও। নকল করিতে গিরিধরেরও জুড়ি নাই। উকিলের নকল সে করিবে, পাটোয়ারির নকল করে; থানাদারের, চাপরাসির, শেঠের, সকলেরই নকল করিতে পারে। হাঁ, বেচারার কাছে সাজসরঞ্জাম নাই, কিন্তু এখন গোবর তাহার জন্য সমস্ত জিনিস জোগাড় করিয়া দিয়াছে, আর তাহার নকল দেখিবার মত হইবে।

এ আলোচনা এতদূর গড়াইল যে সন্ধ্যা হইতেই তামাশা দেখিবার লোক জমা হইতে লাগিল। আশপাশের গ্রাম হইতে দর্শকদের ভিড় হইতে লাগিল। দশটা বাজিতে বাজিতে তিন চার হাজার লোক জমা হইয়া গেল। আর যখন গিরিধর ঝিংগুরী সিংহের রূপ ধরিয়া সপরিবারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন লোকে দাঁড়াইবার জায়গাও পাইল না। সেই টাকভরা মাথা, সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোঁফ, আর সেই ভুঁড়ি! ভোজনে বসিয়াছে আর এক নম্বরের গিন্নী বসিয়া পাখা নাড়িতেছেন।

ঠাকুর ঠাকুরাণীর দিকে রসিক দৃষ্টিতে দেখিয়া বলিতেছে—এখনও তোমার মধ্যে এতখানি প্রাণ আছে যে কোনও যুবক দেখলে উদ্‌ভ্রান্ত হয়। আর ঠাকুরাণী গাল ফুলাইয়া বলিতেছে, এখনই তো নতুন নতুন নিয়ে এসেছ।

ওকে তো এনেছি তোমারি সেবা করবার জন্য। ও তোমার সমান সমান হবে কি!

ছোট বিবি এই কথা শুনিয়া গাল ফুলাইয়া চলিয়া যান।

দ্বিতীয় দৃশ্যে ঠাকুর খাটের উপর শুইয়া, আর ছোট বউ মুখ ঘুরাইয়া মাটির উপর বসিয়া। ঠাকুর বার বার তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইবার বিফল চেষ্টা করিয়া কহিতেছে—আমার ওপর রুষ্ট কেন, দুলালী আমার!

তোমার দুলালী যেখানে আছে, সেখানে যাও। আমিতো চাকরাণী, অন্যের সেবা-শুশ্রূষা করতে এসেছি।

তুমি আমার রানী! তোমারি সেবা-শুশ্রূষা করবার জন্য ঐ বুড়ি।

এক নম্বরের ঠাকুরাণী শুনিয়া ফেলেন আর ঝাঁটা লইয়া ঘরে ঢোকেন, আর তাহার উপর কয়েক ঘা ঝাঁটা লাগাইয়া দেন। ঠাকুর সাহেব পলাইয়া প্রাণ বাঁচান।

আর একটি দৃশ্য অভিনয় হইল; ঠাকুর দশ টাকার দস্তাবেজ লিখাইয়া পাঁচ টাকা দিল, বাকিটা নজরানা, তহুরী, দস্তুরী ও ব্যাজের বাবদ কাটিয়া লইল।

কিষাণ আসিয়া ঠাকুরের পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক কষ্টে ঠাকুর টাকা দিতে রাজি হইল। কাগজ লেখা হইতেছে এমন সময় কিষাণের হাতে পাঁচ টাকা দেওয়া হইল; সে তখন আমতা আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

এ তো পাঁচটা টাকা, মালিক!

পাঁচ নয়, দশ। ঘরে গিয়ে গুনো।

না হুজুর, পাঁচটা।

এক টাকা নজরানার কি না?

হাঁ, হুজুর।

তহুরী এক টাকা?

হাঁ, হুজুর।

কাগজের এক টাকা?

হাঁ, হুজুর।

দস্তুরীর এক টাকা?

হাঁ, হুজুর।

সুদের এক টাকা?

হাঁ, হুজুর।

নগদ পাঁচ টাকা, মোট দশ হল কি না?

হাঁ, হুজুর! এখন এই পাঁচটাও আমার হয়ে রেখে দেন।

কি পাগল, নাকি!

হুজুর, এক টাকা ছোট ঠাকরুণের নজরানা, এক টাকা বড় ঠাকরুণের

নজরানা; এক টাকা ছোট ঠাকরুণের পান খাবার, এক টাকা বড় ঠাকরুণের পান খাবার। বাকি বাঁচল এক, তা থাকল আপনার ক্রিয়াকর্মের জন্য।

এমনি করিয়া নোখেরাম, পটেশ্বরী, দাতাদীন—একে একে সকলেরই কথা হইল। নক্‌সার মধ্যে কোনও নূতনত্ব না-ই থাক আর অভিনয় পুরানোই হোক; কিন্তু গিরিধরের ভঙ্গী এমনই হাস্যকর হইয়াছিল, ও দর্শকেরা এতই সরলহৃদয় ছিল যে সমস্ত কথাতেই তাহারা হাসিয়াছিল। সারা রাত ধরিয়া ভাঁড়ামি চলিল, আর অত্যাচারিত মন কাল্পনিক প্রতিশোধ পাইয়া প্রসন্ন হইয়া উঠিল। শেষে যখন অভিনয় শেষ হইল, তখন কাক ডাকিতেছিল।

সকাল হইতেই যাহাকে দেখ, তাহারই মুখে রাতের ঐ গান, ঐ অনুকরণ, ঐ চিন্তা। গ্রামের প্রধানেরা পরিহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যেদিকে যায় সেদিকেই দুই চারিজন ছেলে পিছনে পিছনে যায়, আর ঐ সব কথা আওড়াইতে থাকে। ঝিংগুরী সিংহ তো ফুতিবাজ লোক, এটাকে সে তামাশার মধ্যেই ধরিল। কিন্তু পটেশ্বরীর রাগ করিবার বদ্ অভ্যাস ছিল, আর পণ্ডিত দাতাদীন তো এমনি বদ্‌মেজাজী ছিল যে ঝগড়া করিবার জন্য সর্বদা তৈয়ার। পহেলা সম্মান যে তাহার প্রাপ্য। কারিন্দার আর কথা কি, রায়সাহেব পর্যন্ত তাহাকে দেখিয়া মাথা নাড়েন। তাহাকে নিয়া এত ঠাট্টা, তাও নিজেরই গাঁয়ে —এ ছিল তার পক্ষে অসহ্য। যদি তাহার ব্রহ্মতেজ থাকিত তবে এই সব দুষ্ট লোকদের ভস্ম করিয়া দিত, এমন শাপ দিত যে এক দিক হইতে সকলে ভস্ম হইয়া যাইত; কিন্তু এই কলিকালে শাপ ফলে না। এইজন্য সে কলিযুগের হাতিয়ার বাহির করিল। হরির দরজার গোড়ায় আসিয়া চোখ লাল করিয়া বলিল—কী, আজও তুমি কাজ করতে যাবে না হরি? এখন তো তুমি ভাল হয়ে গেছ। আমার কতটা ক্ষতি হল, তা তুমি ভাবছ না।

গোবর দেরিতে শুইয়াছিল। সবে ঘুম হইতে উঠিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বাহিরে আসিতেছিল, এমন সময়ে দাতাদীনের আওয়াজ কানে পৌঁছিল। প্রণাম করা তো দূরে থাক, উল্‌টিয়া আরও রাগ দেখাইয়া বলিল— এখন ও তোমার মজুরি করবে না। আমাদের নিজের আখও তো বুনতে হবে।

দাতাদীন খৈনী মুখে দিতে দিতে বলিল—কাজ কি করে করবে না। বছরের মাঝখানটায় কাজ ছেড়ে দিতে পারবে না। জষ্ঠি মাসে ছাড়তে হয় ছাড়ুক, করতে হয় করুক। তার আগে ছাড়তে পারে না।

গোবর হাই তুলিয়া বলিল—ও তোমায় দাসখত লিখে দেয় নাই। যতদিন ইচ্ছা ছিল, কাজ করেছে। এখন ইচ্ছা নাই, কাজ করবে না। এর মধ্যে কোনও জবরদস্তি করতে পার না।

হরি তবে কাজ করবে না ?

না।

তবে সুদ শুদ্ধ আমার টাকা দিয়ে দাও। তিন বছরের সুদ হয় এক শ টাকা। আসল নিয়ে দুই শ হয়। আমি ভেবেছিলাম, মাসে তিন টাকা সুদে কাটা যাবে ; কিন্তু তোমার ইচ্ছা না হলে কাজ করো না। আমার টাকাটা দিয়ে দাও। বড়লোক হয়েছ তো বড়লোকের মত কাজ কর।

হরি দাতাদীনকে বলিল—তোমার চাকরি করতে আমি কবে অস্বীকার করেছি মহারাজ ? কিন্তু আমার আখও তো পড়ে আছে, বসাতে হবে।

গোবর বাপকে ধমক দিল—কি চাকরি, আর কার চাকরি ? এখানে কেউ কারো চাকর নয়। সব সমান। আচ্ছা মজা দেখছি ! একজন এক শ টাকা ধার দিয়ে দিল, আর তার সুদে সারা জীবন কাজ নিতে থাকবে ! আসল যেমনকে তেমন ! এ মহাজনি নয়, এ গিয়ে রক্তচোষা।

তবে টাকাটা দিয়ে দাও ভাই, ঝগড়ায় কাজ কি। আমি টাকায় আনা হিসাবে ব্যাজ নিয়ে থাকি। তোমায় গাঁয়ের লোক হিসাবে টাকায় আধ আনা করে দিয়েছিলাম।

আমি ত এক শ টাকায় এক টাকা দেব। এক কড়ি বেশি নয়। তোমার নিতে হয় তো নাও, নইলে আদালত থেকে নিও।

টাকার গরম হয়েছে দেখছি।

গরম তাদেরই হয়, যারা এক টাকার জায়গায় দশ টাকা নেয়। আমি তো মজুর। আমার গরম ঘাম দিয়ে বের হয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তুমি বলদের জন্য ত্রিশ টাকা দিয়েছিলে ! তা হল এক শ। আর এখন এক শর জায়গায় দুই শ হল। এই ভাবে তোমরা কিষাণদের লুটে-পুটে মজুর করেছ, আর নিজেরা তাদের জমির মালিক হয়ে গেছ। ত্রিশের জায়গায় দুই শ ! সবেরই একটা সীমা আছে।—কতদিন হয়েছে বাবা ?

হরি কাতর কণ্ঠে বলিল—এই আট নয় বৎসর হয়েছে।

গোবর বুকে হাত রাখিয়া বলিল—নয় বছরে ত্রিশ টাকায় হয়েছে দু শ! এক টাকার হিসাবে কত হয়?

সে মাটিতে এক ইটের টুকরা দিয়া হিসাব করিয়া কহিল—দশ বছরে ছত্রিশ টাকা হয়। আসল নিয়ে ছেষট্টি। তার জায়গায় সত্তর টাকা নাও। এর বেশি এক কড়িও দেব না।

দাতাদীন হরিকে মাঝখানে টানিয়া বলিল—শুনছ হরি, গোবরের ফয়সালা? আমি নিজের দু শ ছেড়ে সত্তর টাকা নিয়ে নিই, নইলে আদালত করি! এ রকম ব্যবহার হলে সংসার কয় দিন চলবে। আর তুমি বসে বসে শুনছ! কিন্তু বুঝে নিও যে আমি ব্রাহ্মণ, আমার টাকা হজম করে সুখ হবে না। আমি এ সত্তর টাকাও ছাড়লাম, আদালতেও যাব না, যাও। যদি আমি ব্রাহ্মণ হই, তো নিজের পূরো দু শ টাকা নিয়ে দেখিয়ে দেব। আর তুমি আমার দরজায় এসে জোড় হাত করে সে টাকা দেবে।

দাতাদীন রাগ করিয়া ফিরিয়া গেল। গোবর নিজের জায়গায় বসিয়া রহিল। কিন্তু হরির পেটে ধর্মের সংস্কার জমা। যদি ঠাকুর বা বেনিয়ার টাকা হইত, তাহা হইলে তাহার বেশি চিন্তা হইত না; কিন্তু ব্রাহ্মণের টাকা! তাহার এক পাই কমিয়া গেলেও হাড় ভাঙ্গিয়া বাহির করিবে। ভগবান করুন, ব্রাহ্মণের কোপ আর কারো উপর পড়ুক। বংশে কেহ এক ঝিনুক জল দিবার, ঘরে বাতি জালিবার থাকিবে না। ধর্মভীরু মন তাহার, ভয় পাইয়া গেল। সে দৌড়িয়া পণ্ডিতজীর পা ধরিল, আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল—মহারাজ, যতদিন বেঁচে থাকব, তোমার পাই পয়সা চুকিয়ে দেব। ছেলের কথায় চলে যেও না। ব্যাপারটা তো তোমার আমার মধ্যে, ও কে?

দাতাদীন একটু নরম হইল। ওর জবরদস্তি দেখ না, বললে যে দু শ টাকার জায়গায় সত্তর টাকা নাও, নইলে আদালতে যাও! এখনও তবু আদালতের হাওয়া খায় নাই। একবার কারো পাল্লায় পড়ে যায়, তো আর এই গরম থাকবে না। চার দিন শহরে থেকে কি নবাব হয়ে গেল!

আমি তো বলছি মহারাজ, আমি তোমার পাই পয়সা পর্যন্ত চুকিয়ে দেব। তবে কাল থেকে আমার এখানে কাজ করতে আসতে হবে। নিজের আখ বসাতে হবে ঠাকুর, নইলে তোমারই কাজ করতাম।

দাতাদীন চলিয়া গেলে গোবর তিরস্কারভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—

গিয়েছিলে দেবতাকে খুসি করতে! তোমরাই তো এদের মেজাজ বিগড়ে দিয়েছ। ত্রিশ টাকা দিয়ে এখন দু শ টাকা নেবে, আর ওপর থেকে দণ্ড লাগাবে, তোমাকে দিয়ে মজুরি করাবে, আর খাটাতে খাটাতে মেরে ফেলবে!

হরি নিজের বিচারবুদ্ধিমত সত্যের পক্ষ লইয়া বলিল—ধর্মের পথ ছেড়ো না বাবা, নিজের কর্ম চলে নিজের সঙ্গে। আমরা যে ব্যাজে টাকাটা নিয়েছি সে-টা তো দিতেই হবে। তাতে আবার বামুন। এদের পয়সা আমরা হজম করব? এসব তো ওদেরই হজম হয়।

গোবর ভ্রূকুটি করিল। ধর্মের পথ ছাড়তে বলছে কে? আর কে বা বলছে যে বামুনের পয়সা মেরে দাও! আমি তো এই কথাই বলছি যে এতখানি সুদ আমি দেব না। ব্যাঙ্কওয়ালারা বারো আনা করে সুদ নেয়। তুমি এক টাকা নিয়ে নাও। আর কি মানুষকে লুটে নেবে?

ওর বোনার যে অসুবিধা হবে?

হোক। ওর অসুবিধা হবে এ ভয়ে আমি গর্ত খুঁড়ব কেন?

বাবা, যতদিন আমি বেঁচে আছি, আমায় নিজের রাস্তা ধরে চলতে দাও। যখন আমি মরে যাব, তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই কোরো।

তা হলে তোমাকেই শোধ দিতে হবে। আমি নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মারব না। আমার বোকামি যে তোমাদের মাঝখানে কথা কয়েছি—তুমি খেয়েছ, তুমি দাও। আমি কেন নিজের জান দেব?

এই কথা বলিতে বলিতে গোবর ভিতরে চলিয়া গেল। ঝুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আজ সকাল হতেই বাবার সঙ্গে কেন লাগলে?

গোবর সমস্ত ব্যাপার শুনাইয়া শেষে বলিল—বাবার ওপর ঋণের বোঝা এই ভাবে বাড়তেই থাকবে। আমি কত দূর মরব। উনি তো টাকা কামিয়ে অন্যের ঘর ভরছেন। উনি যে গর্ত খুঁড়েছেন তাতে আমি কেন পড়ি। আমাকে জিজ্ঞাসা করে তো ধার নেওয়া হয় নাই, আমার জন্যও নেওয়া হয় নাই। আমি ওঁর দেনদার নই।

ওদিকে প্রধানেরা গোবরকে খাটো করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে ব্যস্ত। এ ছোকরাকে প্যাঁচে ফেলিয়া কসিতে না পারিলে গাঁয়ে সব ভণ্ডুল করিয়া দিবে। পেয়াদা থেকে রাজা হইয়াছে, বাঁকাই চলিবে। জানি না, কোথা থেকে এত আইন শিখিয়া আসিল। বলিতেছে, 'শতকরা এক টাকার বেশি

সুদ দেব না। নেবে তো নাও, না হলে আদালতে যাও।' রাত্রে সমস্ত গাঁয়ের ছোকরাদের একত্র করিয়া কত অনর্থ করিল! কিন্তু প্রধানদের মধ্যেও ঈর্ষার অভাব ছিল না। সকলে নিজের সমকক্ষদের প্রতি পরিহাসে খুসিই ছিল। পটেশ্বরী আর নোখেরামের মধ্যে কথা হইতেছিল। পটেশ্বরী বলিল—কিন্তু সকলেরই ঘরের হালচাল খুঁটিনাটি সব জানা আছে। সকলে এমন করে ঝিংগুরী সিং-এর পেছনে লেগেছে যে আর বোলো না। দুই ঠাকরুণের কথা শুনে শুনে লোকে হাসির চোটে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

নোখেরাম ঠাট্টা করিয়া বলিল—কিন্তু নকল ছিল খাঁটি। আমি কত বার ওঁর ছোটবিবিকে দরজায় দাঁড়িয়ে ছোকরাদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে দেখেছি।

আর বড়রানী কাজল সিঁদুর গালা দিয়ে ছুঁড়ি সাজছেন।

দুইজনে রাতদিন লেগেই আছে। ঝিংগুরী পাকা বেহায়া। আর কেউ হলে পাগল হয়ে যেত।

শুনেছি, তোমাকে খুব খারাপ দেখিয়ে নকল করেছে। চামারনীর ঘরে বন্ধ করে মার খাইয়েছিল।

আমি তো বাছাধনকে বাকি খাজনার দাবিতে ঠিক করে দেব। ও বুঝবে যে কার পাল্লায় পড়েছিল!

খাজনা তো ও চুকিয়ে দিয়েছে, না?

কিন্তু রসিদ তো আমি দিই নাই। প্রমাণ কি যে খাজনা চুকিয়ে দিয়েছে? আর এখানে হিসাব-কিতাব দেখে কে? আজই পেয়াদা পাঠিয়ে ডাকিয়ে আনছি।

হরি আর গোবর দুইজনে আখ বসাইবার জন্য ক্ষেতে সিঁচ দিতেছিল। এ পর্যন্ত আখের ক্ষেত চাষ হওয়ার আশা তো ছিল না, এজন্য ক্ষেত পতিত হইয়াই ছিল। এখন বলদ আসিয়া গিয়াছে, তো আখ কেন বসানো হইবে না?

কিন্তু দুইজনে যেন ছত্রিশ ভাগ হইয়া গিয়াছিল। না বলিতেছিল পরস্পরে কথা, না চাহিতেছিল পরস্পরের প্রতি। হরি বলদদের ডাকিতেছিল, গোবর বোঝা বহিয়া যাইতেছিল। সোনারূপা দুইজনে ক্ষেতে জল দিতেছিল; দুইজনে ঝগড়া লাগিল। বিবাদের বিষয় এই ছিল যে ঝিংগুরী সিং-এর ছোট ঠাকুরাণী প্রথমে নিজে খাইয়া তবে স্বামীকে খাওয়াইত, না স্বামীকে খাওয়াইয়া

তবে নিজে খাইত। সোনা বলিতেছিল, প্রথমে সে নিজেই খাইত। রূপার মত ছিল তার উল্‌টা।

রূপা জেরা করিল—যদি ও প্রথমে খেত, তবে মোটা হল কেন? ঠাকুর মোটা কেন? যদি ঠাকুর ওর ওপর পড়ে যায় তবে তো ঠাকরুণ পিষে যাবে।

সোনা প্রতিবাদ করিল—তুই মনে করিস, ভাল খেলেই লোক মোটা হয়। ভাল খেলে লোকের গায়ে জোর হয়, মোটা হয় না। মোটা হয় ঘাস-পাতা খেলে।

তা হলে ঠাকুরের চেয়ে ঠাকরুণের গায়ে জোর বেশি?

তা ছাড়া আর কি। এখন সেদিন দুইজনে যুদ্ধ হল, ঠাকরুণ ঠাকুরকে এমন এক ধাক্কা দিল যে তার হাঁটু গেল ভেঙ্গে।

তাহলে তুইও আগে নিজে খেয়ে পরে তোর বরকে খাওয়াবি?

তা নয় তো কি।

মা তো আগে বাবাকে খাওয়ায়।

তবু তো দেখ, বাবাই মাকে ধমকে দেয়। আমার গায়ে জোর হবে বেশি, আমি আমার মরদকে কাবু করে রাখব। তোর মরদ তোকে ধরে পিটবে। তোর হাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেবে।

রূপা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—কেন পিটবে? আমি মার খাওয়ার কাজই করবো না।

সে সব কিছু শুনবে না। তুই একটু মুখ খুললেই ও মার চালাবে। মারতে মারতে তোর চামড়া উপড়ে নেবে।

রূপা চটিয়া গিয়া সোনার শাড়ী দাঁত দিয়া ছিঁড়িতে চেষ্টা করিল। আর না পারিয়া চিমটি কাটিতে লাগিল।

সোনা তাহাকে আরও রাগাইল—ও তোর নাকও কাটবে।

ইহার পরে রূপা দিদিকে দাঁত দিয়া কামড়াইল। সোনার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। সে রূপাকে জোরে দিল এক ধাক্কা। রূপা পড়িয়া গেল আর উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। সোনাও দাঁতের দাগ দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দুই জনের চিৎকার শুনিয়া গোবর রাগে ফুলিয়া চলিয়া আসিল, আর দুই জনকেই দুই ঘা বসাইয়া দিল। দুই জনই কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষেত হইতে

চলিয়া আসিয়া ঘরে গেল। সেঁচের কাজ বন্ধ হইল। তাহার পর পিতাপুত্রে এক হাত হইয়া গেল।

হরি জিজ্ঞাসা করিল—জল দেবে কে? দৌড়ে দৌড়ে গেলি, দুজনকে দিলি তাড়িয়ে। এখন গিয়ে তুষিয়ে বুষিয়ে ফিরিয়ে আন না কেন?

তুমিই এদের সব বেয়াড়া করে রেখেছ।

এমনি ধারা ঠেঙালে আরও নির্লজ্জ হয়ে যাবে।

দুবেলা খাওয়া বন্ধ কর, অমনি ঠিক হয়ে যাবে।

আমি ওদের বাপ, কসাই নই।

পায়ে একবার কোন কারণে ঠোকর লাগিয়া গেলে বার বার ঠোকর লাগে, কখনও কখনও আঙ্গুল পাকিয়া যায়, আর মাসের পর মাস কষ্ট দিতে থাকে। পিতাপুত্রের ভালবাসায় আজ সেই ধরণের চোট লাগিয়াছিল, আর তাহার উপর এই তিন বার চোট পড়িল।

গোবর ঘরে আসিয়া ক্ষেতে জল দিবার জন্য ঝুনিয়াকে সঙ্গে করিয়া লইল। ঝুনিয়া শিশুকে লইয়া ক্ষেতে গেল। ধনিয়া আর তাহার মেয়ে দুইটি তাকাইয়া রহিল। মায়ের কাছেও গোবরের এই উদ্দামতা খারাপ লাগিল। রূপাকে মারিত, তাহা খারাপ লাগিত না; কিন্তু বড়সড় মেয়েকে মারা, এ ছিল তাহার পক্ষে অসহ্য।

আজই রাত্রে গোবর লখনৌ ফিরিয়া যাইবে স্থির করিল। এখানে আর সে থাকিতে পারে না। যখন ঘরে তাহার কেহ জিজ্ঞাসা করিবার নাই, তখন সে থাকিবে কেন? লেন-দেনের ব্যাপারে ও কিছু বলিতে পারে না। মেয়েদের একটু মার লাগাইয়াছে তো বাড়ির সকলে এমন ব্যবহার করিতেছে যেন সে বাহিরের লোক; তবে এই সরাইয়ে ও থাকিবে না।

হরি ও গোবর খাইয়া দাইয়া বাহিরে আসিয়াছে এমন সময় নোখেরামের পেয়াদা আসিয়া বলিল—চল, কারিন্দা সাহেব ডেকেছে।

হরি তেজ দেখাইয়া বলিল—রাতে ডেকেছে কেন, আমি তো পাওনা চুকিয়ে দিয়েছি।

পেয়াদা বলিল—তোমাকে ডেকে আনবার হুকুম হয়েছে। যা কিছু আর্জি আছে, ওখানে গিয়ে কোরো।

হরির ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাইতে হইল। গোবর বিরক্তভাবে বসিয়া

রহিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে হরি ফিরিল, আর ছিলিম ভরিয়া টানিতে লাগিল। গোবর আর থাকিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল—কোন মতলবে ডেকে পাঠিয়েছিল ?

হরি ধরা গলায় কহিল—আমি পাই পর্যন্ত খাজনা চুকিয়ে দিয়েছিলাম। ও বলছে, তোমার নামে দুই বচ্ছরের বাকি। এইতো সেদিন আমি আখ বেচেছি, পঁচিশ টাকা তো সেখানেই ওকে দিয়ে দিয়েছি, আর আজ ও বার করছে দুই বছরের বাকি ! আমি বলে দিয়েছি, এক আধলাও দেব না।

গোবর জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কাছে রসিদ আছে তো ?

রসিদ দেয় কই ?

তা তুমি বিনা রসিদে টাকা দাওই বা কেন ?

আমি কি জানতাম যে এরা বেইমানি করবে ? এসব তোমার কর্মের ফল। তুমি রাত্রে ওদের ঠাট্টা করেছ, এ হল তারই দণ্ড। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা চলে না। সুদ হিসাব করে সত্তর টাকা বাকি আছে বলে দিল। এ টাকা আসবে কার ঘর থেকে ?

গোবর নিজের সাফাই গাহিতে গাহিতে বলিল—তুমি যদি রসিদ নিয়ে থাকতে, তা হলে আমি লাখো ঠাট্টা করি, তোমার চুলও বাঁকাতে পারত না। আমি বুঝতেই পারি না, তুমি লেন-দেনের ব্যাপারে সাবধান হয়ে কেন কাজ কর না। এরা যদি রসিদ না দেয়, তবে টাকা ডাকে পাঠিয়ে দাও। এই তো হবে, এক আধ টাকা মাশুল খরচ পড়ে যাবে ! এই ধরণের ঝগড়া তো আর হবে না।

তুমি এই আগুন না লাগালে কিছুই হত না। এখন তো প্রধানেরা সব বিগড়ে আছে। বেদখল করবে বলে ধমক দিচ্ছে। কি করে বিপদ পার হব, দেবতা জানেন।

আমি গিয়ে ওদের জিজ্ঞাসা করে আসি।

তুমি গিয়ে আরো আগুন লাগিয়ে দেবে।

যদি আগুন লাগাতেই হয় তবে আগুনই লাগাব। ওরা বেদখল করবে, করুক। আমি ওদের হাতে গঙ্গাজল দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেব আদালতে—দিব্যি করুক। তুমি চুপ চাপ বসে থাক। আমি এর জন্য প্রাণপাত করব। আমি কারো এক পয়সা মারতে চাই না, নিজেরও এক পয়সা খোয়াতে চাই না।

তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া পড়িল, চলিল নোখেরামের বৈঠকখানায়। দেখিল সব প্রধান প্রধান ব্যক্তির কেবিনেট বসিয়াছে। গোবরকে দেখিয়া সকলে সতর্ক হইয়া গেল। আবহাওয়া ষড়যন্ত্রের মত কুণ্ঠায় ভরিয়া গিয়াছে।

উত্তেজিত স্বরে গোবর জিজ্ঞাসা করিল—এ কী কথা কারিন্দা সাহেব, বাবা তো এ পর্যন্ত আপনাকে সমস্ত খাজনা চুকিয়ে দিয়েছে, তবু আপনি দুবৎসরের বাকি হিসাব বের করেছেন! এ কেমন গোলমাল?

নোখেরাম মসনদে শুইয়া পড়িয়া মুরুব্বির চালে বলিল—যতক্ষণ হরি আছে, ততক্ষণ আমি তোমার সঙ্গে লেনদেনের কোনও কথাবার্তা করতে চাই না।

আহত স্বরে গোবর কহিল—আমি তবে ঘরে কেউই নই?

তুমি নিজের ঘরে সব কিছু হতে পার। এখানে তুমি কিছুই নও।

ভাল কথা, আপনি বেদখলি দায়ের করুন। আমি আদালতে তোমার হাতে গঙ্গাজল দিইয়ে তবে টাকা দেব; এই গাঁ হতে এক শ সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করে দেব যে তুমি রসিদ দাও না। সাদা সিধা চাষী, কিছু বলে না, তাই তুমি ভেবেছ যে সব কাঠের পুতুল! আমি যেখানে, রায়সাহেবও সেখানে। গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে দত্যিদানব মনে করতে পারে, আমি মনে করি না। সব অবস্থা খুঁটিয়ে বলব, আর দেখব কেমন করে তুমি আমার কাছ থেকে ডবল টাকা উশুল করে নাও।

তাহার বাণীর মধ্যে ছিল সত্যের বল। ভীরু প্রাণীর মধ্যে সত্যও বোবা হইয়া যায়। ইটের উপর বসিয়া যে সিমেণ্ট পাথর হইয়া উঠে, মাটির উপর বসিলে তাহাও মাটি হইয়া যায়। গোবরের নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা সেই দুর্নীতির বর্মকে বিদ্ধ করিল, যাহাতে সাজিয়া নোখেরামের দুর্বল আত্মা আপনাকে শক্তিমান মনে করিয়াছিল।

নোখেরাম যেন কিছু মনে করিবার চেষ্টা করিতে করিতে কহিল—তুমি এত গরম হচ্ছ কেন হে, এর মধ্যে গরম হওয়ার কথাটা কি। হরি যদি টাকাটা দিয়ে থাকে, সে টাকা তো কোথাও না কোথাও থাকবে। আমি কাল কাগজ বার করে দেখব। এখন আমার কিছু কিছু মনে পড়ছে বটে যে হরি হয়তো টাকাটা দিয়েছিল। তুমি তো আর সামান্য টাকার জন্য মিথ্যা বলবে না, আমিও এই টাকা নিয়ে বড়লোক হব না।

নোখেরামের বাড়ি হইতে আসিয়া গোবর হরিকে এমন তিরস্কার করিল যে

স্বার্থভীরু বুড়া বেচারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া গেল—তুমি তো ছোট ছেলেরও অধম, যে বিড়ালের মেও শুনে চিৎকার করে ওঠে! আমি কত দিক বাঁচিয়ে চলব! আমি তোমাকে সত্তর টাকা দিয়ে যাচ্ছি। দাতাদীন নেয় তো দেখে শুনে পাই পয়সা পর্যন্ত লিখিয়ে নিও। এর ওপর তুমি যদি এক পয়সাও দাও, তো আর আমার কাছ থেকে এক পয়সাও পাবে না। আমি এ জন্য বিদেশে পড়ে নেই যে তুমি নিজে সর্বস্ব বিলিয়ে দেবে আর আমি রোজগার করে ভরতে থাক্‌ব। আমি কাল চলে যাব; কিন্তু এই কথা বলে দিচ্ছি যে এক পয়সাও কারু কাছ থেকে ধার করবে না, আর কাউকে কিছু দেবে না। মংরু, দুলারী, দাতাদীন, সক্কলকে শতকরা এক টাকা হিসাবে সুদ দিতে হবে।

ধনিয়াও খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাহিরে আসিয়াছিল। বলিল—এখন কেন যাস বাবা, আরও দু-চার দিন থেকে আখ বসিয়ে নে, আর লেন-দেনেরও হিসাব খানিকটা ঠিক করে দে, তার পর যাস।

গোবর মুরুব্বির চালে বলিল—আমার রোজ দু তিন টাকা লোকসান হচ্ছে, এও তো বুঝতে পার! এখানে আমি বড় জোর চার আনার মজুরি করি। আর এবার আমি ঝুনিয়াকেও নিয়ে যাব। ওখানে আমার খাওয়া-দাওয়ার বড় তকলিফ হয়।

ধনিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল—তোমার যেমন ইচ্ছা; কিন্তু সেখানে ও একা কি করে ঘর সামলাবে, কি করে খোকাকে দেখবে শুনবে?

এখন ছেলেকে দেখব, কি নিজের সুবিধা দেখব? আমাকে দিয়ে উননে ফুঁ দেওয়া হবে না।

নিয়ে যেতে চাও, আমি আটকাব না; কিন্তু বিদেশে ছেলে পিলে নিয়ে থাকা, আগে পিছে কেউ নাই, ভাব কতখানি ঝঞ্ঝাট।

বিদেশেও সঙ্গী সাথী এসে যায়, মা। আর এতো স্বার্থের সংসার। যার কাছে পাওনার থেকে দু পয়সা কম নাও সে-ই নিজের। খালি হাতে তো বাপ-মাও পোছে না।

ধনিয়া কটাক্ষ বুঝিতে পারিল। তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত জ্বলিয়া গেল। বলিল—মা বাপের সঙ্গেও তুমি ঐ পয়সার সম্বন্ধই মনে করেছ?

চোখে তো দেখছি।

দেখ নাই; মা বাপের মন এতটা নিষ্ঠুর হয় না; হাঁ, ছেলে আলবৎ যেমনই

তু পয়সা কামাতে শুরু করে, অমনি মা-বাপের থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। এই গাঁয়ে তুই-একজন নয়, দশ-বিশজন প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি। বাপ-মা কর্জ করে, কেন? ছেলে-মেয়ের জন্য, না নিজের ভোগবিলাসের জন্য?

কে জানে তোমরা কিসের জন্য কর্জ নিয়েছিলে। আমি তো তার কিছুই জানি না।

মানুষ না করলে নিজে নিজেই এতটা বড় হয়ে গেছ?

মানুষ করতে তোমার আর লেগেছে কি? যতদিন শিশু ছিলাম, তুধ খাইয়েছ। তার পর বেওয়ারিশের মত ছেড়ে দিয়েছ। সকলে যা খেয়েছে, আমিও তাই খেয়েছি। আমার জন্য তুধ আসে নাই, মাখন তোলা হয়.নাই। আর এখন তুমি চাও, আর বাবা চায় যে, আমি সমস্ত কর্জ শোধ দিই, খাজনা দিই, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিই। আমার জীবনটা যেন তোমাদের দেনা শোধ দেবার জন্যই। আমারও তো ছেলেপুলে আছে?

ধনিয়া অন্ধকারে পড়িয়া গেল। এক মুহূর্তে তাহার জীবনের মধুর স্বপ্ন যেন টুটিয়া গেল। এ পর্যন্ত তাহার মন খুসি হইয়া ছিল যে এখন তাহার তুঃখ দারিদ্র সব দূর হইয়া গিয়াছে। গোবর বাড়ি ফিরিবার পর হইতে তাহার মুখের উপর হাসির এক ছটা খেলিতেছিল। তাহার কথায় মৃতুতা, ব্যবহারে উদারতা আসিয়া গিয়াছিল। ভগবান তাহার প্রতি দয়া করিয়াছেন যখন, তখন তাহাকে মাথা নীচু করিয়া চলিতে হইবে। ভিতরের শান্তি বাহিরের সৌজন্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। ছেলের কথা তপ্ত বালুর মত তাহার হৃদয়ে পড়িল, আর সমস্ত পুড়িয়া ঝুরিয়া গেল। তাহার সমস্ত অভিমান গুঁড়া হইয়া গেল। এসব শুনিবার পর এখন জীবনের কি সুখ রহিল! যে নৌকায় বসিয়া সে জীবন-সাগর পার হইতে চাহিতেছিল, তাহা যদি ভাঙ্গিয়াই গেল, তবে কোন সুখে সে বাঁচিয়া থাকিবে!

কিন্তু না। তাহার গোবর এতটা স্বার্থপর নয়। সে কখনও মার কথার উপর কথা বলে নাই, কখনও কোনও বিষয়ে জিদ করে নাই। শুকনো শাকনা যাহা কিছু পাইয়াছে, তাহাই খাইয়া নিয়াছে। সেই আলাভোলা স্বভাবের স্নেহের পুতুল আজ কেন এমন মনভাঙ্গানো কথা বলিতেছে? তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো কেহ কিছু বলে নাই! বাপ-মা তুজনেই তাহার মুখের পানে তাকাইয়া আছে। সে নিজেই লেন-দেনের কথা চালাইল, না হইলে ওকে কে বলিয়াছে যে তুই বাপ-মায়ের দেনা চুকাইয়া দে? বাপ-মার পক্ষে কি এ কম

সুখের কথা যে সে ইজ্জত-আবরু রক্ষা করিয়া ভালমানুষের মত রোজগার করিয়া খায় ? ও যদি কিছু পারে বাপ-মার সাহায্য করুক, না পারে তো বাপ-মা ওর গলা টিপিয়া ধরিবে না। ঝুনিয়াকে লইয়া যাইতে চায়, খুসির কথা। ধনিয়া তো শুধু তাহার ভাল হইবে ভাবিয়া বলিয়াছিল যে ঝুনিয়াকে সেখানে লইয়া গেলে যতটা সুখ হইবে তার থেকে বেশি ঝঞ্ঝাট বাড়িবে। ইহার মধ্যে এমন কি আঘাতের কথা আছে যে ও এতখানি চটিয়া উঠিল ! হোক না হোক, এই আগুন ঝুনিয়া লাগাইয়াছে। সে-ই বসিয়া বসিয়া উহাকে এ মন্ত্র পড়াইয়াছে। এখানে শখ কি বেশভূষা কিছু করিতে পায় না, ঘরেরও কিছু না কিছু কাজ কর্ম করিতেই হয়। ওখানে টাকা-পয়সা হাতে আসিবে, মজা করিয়া মিহি খাইবে, মিহি পরিবে, ঢং করিয়া শুইয়া থাকিবে। দুই জনের রুটি তৈয়ার করিতে আর কি লাগে, ওখানে তো পয়সা দিলে শুনিয়াছি, বাজারে রুটিও কিনিতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত হাঙ্গাম ও-ই জমাইয়াছে। শহরে কিছুদিন থাকিয়া আসিয়াছে, সেখানকার দানাপানি আছে মুখে লাগিয়া। এখানে তো কেহ পোছে না। ছেলেটাকে বোকা পাইয়াছে, অমনি ফাঁদে ধরিয়াছে। যখন এখানে পাঁচ মাসের শিশু পেটে লইয়া আসিল, তখন কেমন মেও-মেও করিত। তখন এখানে আশ্রয় না পাইলে আজ কোথাও ভিক্ষা করিতে হইত। ওই এই নেকাকে বদল করিয়া দিয়াছে। ওই ডাইনীর পিছনে দণ্ড দিতে হইল, ভাইবেরাদরির মধ্যে বদনাম হইল, ক্ষেত গেল, সমস্ত দুরবস্থা ওরি জন্য। আর আজ ঐ ডাইনী, যে পাথরে খায় তাহাই ছেঁদা করিয়া দিতেছে। পয়সা দেখিয়াছে, আর চোখ খুলিয়াছে। কেমন টান-টান হইয়া চলে, মন পাওয়া যায় না। আজ ছেলে দু পয়সা কামাইতেছে, তাই ! এতদিন ছেলে বৌকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই, বৌ তেল লইয়া দৌড়াইত শাশুড়ীর পা টিপিতে। ডাইনী তাহার জীবনের নিধিকে হাত হইতে ছিনাইয়া লইতে চায়।

দুঃখের স্বরে বলিল—এ মন্তর তোমায় কে দিল বাবা, তুমি তো এমন ছিলে না। বাপ-মা তোমারই, তোমারই বোন, তোমারই ঘর। এখানে বাইরের কে আছে, আর আমরা কি বেশি দিন বসে থাকব ! ঘরের মান মর্যাদা বাড়াবে, সে তোমারই সুখ হবে। মানুষ ঘরের লোকজনের জন্যই টাকা রোজগার করে, না আর কারো জন্য ? নিজের পেট তো শুয়োরেও ভরায়। আমি জানতাম না যে ঝুনিয়া নাগিনী হয়ে আমাকে কামড়াবে।

গোবর চটিয়া বলিল—মা, আমি বেকুব নই যে ঝুনিয়া আমাকে মন্তর পড়াবে। তুমি নাহক ওর ওপর রাগ করছ। তোমার গেরস্তির সব বোঝা আমি নিতে পারব না। আমাকে দিয়ে যা কিছু হতে পারে, তোমার সাহায্য করব; কিন্তু নিজের পায়ে বেড়ি লাগাতে পারি না।

ঝুনিয়াও কুঠরী হইতে বাহির হইয়া বলিল—মা, একজনের ওপর রাগ অন্যের ওপর এনো না। কেউ ছেলেমানুষ নয় যে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। আপনার বুঝ সকলেই বোঝে। মানুষের এজন্য জন্ম হয় নাই যে সারা জীবন সে কষ্ট করবে, আর একদিন খালি হাতে মরে যাবে। সকলেই চায় জীবনে কিছু সুখ ভোগ করতে, সকলেরই লালসা হয় হাতে দু পয়সা হোক।

ধনিয়া দাঁতে দাঁত ঘসিয়া বলিল—থাক ঝুনিয়া, বেশি জ্ঞানের কথা বলিস না। এখন তুইও নিজের ভালমন্দ বিচার করতে পারিস! যখন এখানে এসে আমার পায়ে মাথা রেখে কেঁদেছিলি, তখন নিজের ভালমন্দ দেখিস নাই? তখন আমিও যদি আমার ভালমন্দ দেখতাম, তাহলে আজ আর তোর কোথাও পাত্তা পাওয়া যেত না।

ইহার পর সংগ্রাম বাধিয়া গেল। টানাটানি, গালি-গালাজ, হাঙ্গাম-ফৈজত, কোনও কিছুই বাদ গেল না। গোবরও মাঝে মাঝে কামড় মারিতে থাকিল। হরি দেউড়িতে বসিয়া সব কিছু শুনিতে লাগিল। সোনা ও রূপা আঙ্গিনায় মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া; দুলারী, পুনিয়া আর কয়েকজন মেয়ে ঝগড়া মিটাইবার জন্য আসিয়া পৌঁছিল। গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে কখনও কখনও বিন্দুবিন্দু বর্ষণও হইতেছিল। দুই জনেই নিজ নিজ ভাগ্যের কথা বলিয়া কাঁদিতেছিল। দুইজনেই ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল, আর দুইজনেই প্রমাণ করিতেছিল যে তাহারা নির্দোষ! ঝুনিয়া পুরানো কাসুন্দি অনেক কিছু বাহির করিতেছিল। আজ হীরা ও শোভার তাহার প্রতি খুব সহানুভূতি, ধনিয়ার প্রতি কাহারও নাই। ধনিয়ার আজ পর্যন্ত কাহারও সঙ্গে পটিল না; তা হইলে ঝুনিয়ার সঙ্গে আর কি করিয়া পটিতে পারে! ধনিয়া নিজের সাফাই গাহিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু না জানি কেন, জনমত ঝুনিয়ার দিকে। হয়তো তাহার কারণ এই যে ঝুনিয়া ঝগড়াতেও সংযম হারায় নাই, আর ধনিয়ার কথাবার্তায় স্বভাবতই গালিগালাজের আগল ছিল না; হয়তো বা এইজন্য যে, ঝুনিয়া এখন রোজগেরে লোকের স্ত্রী, আর তাহাকে খুসি রাখাই শ্রেষ্ঠ নীতি।

হরি তখন আঙ্গিনায় আসিয়া বলিল—তোর পায়ে পড়ি ধনিয়া, চুপ কর। আমার মুখে চুনকালি লাগাস না। হাঁ, এখনও যদি মন না ভরে থাকে তবে আরো শোন।

ধনিয়া সোঁ করিয়া তাহার দিকে দৌড়িয়া গেল—তুমিও মোটা ডাল ধরতে চললে! আমিই দোষী! ও তো আমার ওপর ফুল ঝরাচ্ছে, না?

সংগ্রামের ক্ষেত্রের বদল হইল।

ছোটর মুখে মুখে যে জবাব দেয়, সে-ই ছোট।

ধনিয়া কোন বিচারে ঝুনিয়াকে ছোট মনে করিতে পারে?

হরি ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—আচ্ছা, ও ছোট নয়, বড়ই মানলাম। যে থাকতে চায় না তাকে কি বেঁধে রাখবে? বাপ-মার ধর্ম, ছেলেকে মানুষ করে বড় করে দেওয়া। তা আমি করেছি। ওর হাত-পা হয়েছে। এখন তুই চাস কি, যে ও ভাত-জল এনে খাওয়াবে? বাপ-মার ষোল আনা ধরম, ছেলের ভাল করা। বাপ-মাকে দেখা ছেলের কথা নয়। যে যায়, তাকে আশিষ দিয়ে বিদায় করে দে। ভগবান আমার মালিক। যা কিছু ভোগ মাপা আছে তা ভুগতে হবে। সাতচল্লিশ বছর এই ভাবে কেঁদে-ককিয়ে কেটে গেল। আর পাঁচ দশ বছর, তাও এমনি করে কেটে যাবে।

ওদিকে গোবর বাড়ি ছাড়িয়া যাইবার জন্য তৈয়ারী হইতেছিল। এ বাড়ির জল তাহার পক্ষে 'হারাম'। মা হইয়া যখন এমনধারা কথা বলে, তখন সে মায়ের মুখও সে আর দেখিবে না।

দেখিতে দেখিতে তাহার বিছানা বাঁধা হইয়া গেল। ঝুনিয়াও রঙ্গিন শাড়ী পরিয়া লইল। মুন্নুও টুপি ও ফ্রক পরিয়া রাজা সাজিল।

হরি আর্দ্র কণ্ঠে কহিল—বাবা, তোমাকে কিছু বলবার মুখ তো নাই; কিন্তু প্রাণ মানে না। একটু গিয়ে যদি নিজের অভাগিনী মায় পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আস, তাহলে কিছু খারাপ হবে কি? যে মায়ের পেটে হয়েছ আর যার রক্ত খেয়ে বড় হয়েছ, তার কাছে এটুকুও করতে পার না?

গোবর মুখ ফিরাইয়া বলিল—আমি ওকে নিজের মা বলেই মনে করি না।

হরি জলভরা চোখে বলিল—তোমার যা ইচ্ছা; যেখানে থাক, সুখে থাক।

ঝুনিয়া শাশুড়ীর কাছে গিয়া আঁচল দিয়া তার পা ছুঁইল। ধনিয়ার মুখ থেকে আশীর্বাদের একটা কথাও বাহির হইল না। সে চোখ মেলিয়া দেখিলও

না। গোবর ছেলেকে কোলে লইয়া আগে আগে যাইতেছিল। ঝুনিয়া পিছনে পিছনে, বিছানা বগলে। এক চামারের ছেলে বাক্স লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গাঁয়ের কয়েকজন স্ত্রীপুরুষ গোবরকে আগাইয়া দিতে গাঁয়ের বাহির পর্যন্ত আসিল।

আর ধনিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, যেন কেহ তাহার হৃদয়কে করাত দিয়া চিরিতেছিল। তাহার মাতৃত্ব হইয়া গেল সেই ঘরের মত, যেখানে আগুন লাগিয়া সব ভস্ম হইয়া গিয়াছে, বসিয়া কাঁদিবার জায়গাও বাঁচে নাই।

## ২২

এদিকে কিছুদিন যাবৎ রায়সাহেবের মেয়ের বিয়ের কথা চলিতেছিল। আর তাহারই সঙ্গে সঙ্গে ইলেকশনের সময়ও আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহার চেয়েও বড় হইয়া দাঁড়াইল আর এক ব্যাপার; আদালতে একটা মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে, তাহার জন্য শুধু কোর্ট ফিই লাগিবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। উপরি খরচ তো আলাদা। রায়সাহেবের শালা, যে নাকি নিজের এস্টেটের একমাত্র অধিকারী ছিল, সে মোটর দুর্ঘটনায় অকালে মারা যায়; নিজের নাবালক পুত্র যাহাতে মামার সম্পত্তির ভাগ পায় সেই জন্য রায়সাহেব আইনের শরণ নিতে চান। ইতিমধ্যে তাঁহার খুড়তুতো শালারা সম্পত্তি দখল করিয়া বসিয়াছে, রায়সাহেবের ছেলেকে অংশমাত্র দিতেও রাজি নয়। রায়সাহেব খুবই চান যে আপোষে বোঝাপড়া হয়, আর খুড়তুতো শালারা তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য নিয়া সরিয়া পড়ে; এমন কি, সম্পত্তির আয়ের অর্ধেক ছাড়িতেও তিনি রাজি—কিন্তু খুড়তুতো শালারা কোন বোঝাপড়ার মধ্যে আসিতে প্রস্তুত নয়, কেবল লাঠির জোরে তাহারা আদায় উশুল শুরু করিয়া দিয়াছে। এক্ষেত্রে আদালতের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত রায়সাহেবের অন্য পন্থা নাই। মামলা করিতে লাখ খানেক খরচ, কিন্তু এস্টেটের মূল্যও বিশ লাখের কম নয়। উকিলদের নিশ্চিত অভিমত, রায়সাহেবের পক্ষে ডিক্রী হইবে। এ রকম সুযোগ কে ছাড়িতে পারে? তবে মুস্কিল এই যে, এই তিন প্রস্থ কাজই এক সঙ্গে আসিয়া ঘাড়ে পড়িয়াছে—অথচ একটাতেও ঢিলা দেওয়া চলে না। মেয়ের বয়স আঠারো পার হইয়াছে, হাতে টাকা ছিল না বলিয়াই এতদিন তাহার

বিবাহ হয় নাই। বিবাহের খরচ অনুমান এক লাখ টাকা হইবে। যাহার কাছে যান, সে-ই লম্বা চওড়া কথা বলে; তবে সম্প্রতি একটা বড় সুযোগ মিলিয়াছে। কুমার দিগ্বিজয় সিংহের পত্নী যক্ষ্মা রোগে মারা গিয়াছে, আর আপনার শূন্য ঘর পূর্ণ করিবার জন্য কুমারসাহেবের তর সহিতেছে না। বিবাহের বাজারও সুবিধামত হইয়া গিয়াছে, এখন শিকার কোনমতে হাতছাড়া না হইয়া যায়, এজন্য বিবাহ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সারা আবশ্যক। কুমারসাহেব ছিল বহু দোষের আকর। মদ, গাঁজা, আফিং, ভাং, চরস এমন কোন নেশা নাই যাহা সে করে না। তা, বিলাস ব্যসন তো বড় লোকের শোভা! যে বিলাসিতা না করিল, সে আবার কেমন জমিদার? এই সকল উপসর্গ না থাকিলে ঐশ্বর্যের ভোগ হয় কিসে? কিন্তু এ সব দোষ সত্ত্বেও উহার এমন প্রতিভা যে বড় বড় পণ্ডিতেরাও উহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। গানবাজনা, নাট্যকলা, জ্যোতিষ, হাতের রেখা বিচার, যোগ, লাঠি খেলা, কুস্তি করা, লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্যায় তাহার জুড়ি পাওয়া শক্ত। ইহার সঙ্গে যেমন সাহস তেমনই বাহাদুরি। রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে মন খুলিয়া যোগ দেয়, তবে কিনা, গুপ্ত ভাবে। কর্তারা জানেন সবই, কিন্তু উহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা, বৎসরে একবার দুইবার গভর্নরের বাড়িতে উহার নিমন্ত্রণ থাকিবেই, বয়স এখনো ত্রিশ বত্রিশের বেশি হয় নাই, আর স্বাস্থ্য এমন চমৎকার যে একলা একটা পাঁঠা খাইয়া হজম করিতে পারে। রায়সাহেব মনে করিলেন, বিড়ালের ভাগ্যে এবার শিকা ছিঁড়িয়াছে। কুমারসাহেবের স্ত্রীর যোড়শ শেষ না হইতেই রায়সাহেব কথাবার্তা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কুমারসাহেবের কাছে বিবাহ তো কেবল নিজের শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি করার উপায়। রায়সাহেব কাউনসিলের মেম্বার, যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে, রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিয়া লোকের শ্রদ্ধাও অর্জন করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং বিবাহ স্থির হইবার বাধা কোথায়? তাই কথা পাকাপাকি হইয়া গেল।

এখন বাকি ইলেকশন। ইলেকশন হইল সোনার হাঁস, গেলাও যায় না, ফেলাও যায় না। ইতিপূর্বে রায়সাহেব দুইবার নির্বাচিত হইয়াছেন, দুইবারই লাখ টাকার ধাক্কা সামলাইতে হইয়াছে; কিন্তু এবার এক রাজাসাহেব ঐ এলাকা হইতে দাঁড়াইয়াছে, সে বলিতেছে, প্রত্যেক ভোটারকে যদি এক হাজার করিয়াও দিতে হয় এবং পঞ্চাশ লাখের এস্টেটও যদি মাটিতে মিশাইয়া যায়, তাও

স্বীকার, তবু রায়সাহেব অমরপাল সিংহকে কাউনসিলে ঢুকিতে দিবে না। আর কর্তৃপক্ষও নাকি উহাকে সাহায্য করিবে, এমন আশ্বাস দিয়াছে। রায়সাহেব চতুর, বুদ্ধি বিবেচনা যথেষ্ট আছে, নিজের লাভ লোকসান বোঝেন। কিন্তু জাতিতে রাজপুত, আর তিনপুরুষে জমিদার; মনোনয়নের পর কিরূপে তিনি রণক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন? ঐ রাজা সূর্যপ্রতাপ যদি আসিয়া বলিত, 'ভাইসাহেব, তুমি দুই দুইবার কাউনসিলে গিয়াছ, এবার আমাকে যাইতে দাও,' তাহা হইলে হয় তো রায়সাহেব সাগ্রহে এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেন। কাউনসিলের মোহ উঁহার আর নাই; কিন্তু এই নির্বাচনের সামনে আসিয়া এখন তাল ঠোকা ভিন্ন অন্য পথ নাই। আর একটা কথা আছে। মিঃ তন্‌খা উঁহার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল যে এখন দাঁড়াইয়া পরে রাজাসাহেবের কাছ হইতে লাখ টাকার থলি হাতে করিয়া বসিয়া পড়িলেই চলিবে। ও তো এতদিন যাবৎ বলিয়া আসিতেছে যে রাজাসাহেব মহা খুসিতে লাখ টাকা দিয়া দিবে, উহার সঙ্গে সেই রকম কথাও হইয়াছে; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, রায়সাহেবকে হারাইয়া দিবার গৌরবটা ছাড়িতে রাজাসাহেব প্রস্তুত নয়, আর তাহার প্রধান কারণই হইল কুমারসাহেবের সঙ্গে রায়সাহেবের মেয়ের বিবাহ। এই দুই পরিবারের সংযোগকে রাজাসাহেব নিজের প্রতিষ্ঠার পক্ষে ক্ষতিকর মনে করে। ওদিকে রায়সাহেবের আবার শ্বশুরবাড়ির জায়গীর পাইবারও আশা রহিয়াছে। রাজাসাহেবের মনে এই ব্যাপারটা কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। এই জায়গীর যদি রায়সাহেব পাইয়া যায়—আইন তো উহারই পক্ষে—তবে তো সে রাজাসাহেবের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবে। তাই উহার কাজ হইল, রায়সাহেবকে চূর্ণ করিয়া তাহার সম্ভ্রম প্রতিপত্তি ধূলিসাৎ করা।

বেচারা রায়সাহেব মহা সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তাঁহার খুবই সন্দেহ হইল যে, তন্‌খা নিশ্চয় নিজের কোন মতলবে উঁহাকে এই ধোঁকা দিয়াছে। আরও শোনা যাইতেছে যে, তন্‌খা এখন রাজাসাহেবের দলে ভিড়িয়াছে। রায়সাহেবের কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা পড়িল। বার কয়েক তন্‌খাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু হয় তন্‌খাকে ঘরে পাওয়া যায় না, নয় তো আসিবে কথা দিয়া সে আসিতে ভুলিয়া যায়। অবশেষে তিনি নিজেই উঁহার কাছে যাইবেন ঠিক করিয়া রায়সাহেব তন্‌খার কাছে গিয়া হাজির হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তন্‌খাকে বাড়িতে পাওয়া গেল, কিন্তু দেখা পাওয়ার জন্য পুরা একটি ঘণ্টা

রায়সাহেবকে অপেক্ষা করিতে হইল। এই সেই তন্‌খা, যে দিনে একবার রোজ রায়সাহেবের বাড়ি আসিয়া হাজিরা দিত। আজ তাহার মেজাজ এত ভারি! রায়সাহেবের শরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিল। মিঃ তন্‌খা যাই সাজগোজ করিয়া, সিগার মুখে দিয়া ঘরে ঢুকিয়া রায়সাহেবের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল, রায়সাহেব অমনই যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন—এক ঘণ্টার ওপর আমি বসে রয়েছি, আর আপনি বেরুতে বেরুতে এত ক্ষণে এলেন! রীতিমত অপমানিত বোধ করছি আমি।

মিঃ তন্‌খা একটা সোফায় বসিয়া নিশ্চিন্ত মনে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, আমি ভারি দুঃখিত, আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখতে হোল। কিন্তু বড়ই জরুরি একটা কাজে আটক পড়েছিলাম। আপনার উচিত ছিল আমার কাছে ফোন করে সময় ঠিক করে নেওয়া।

আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। কিন্তু রায়সাহেব রাগ চাপিয়া রাখিলেন—কেন না তিনি আজ ঝগড়া করিতে আসেন নাই। তাই এই অপমান হজম করিয়া লইয়া বলিলেন, হাঁ, বড় ভুল হয়ে গেছে, আপনার আজকাল বড়ই সময়ের অভাব হয়েছে দেখছি।

যা বলেছেন, বড়ই কম ফুরসৎ পাই, নইলে আমি অবিশ্যি যেতাম।

আমি সেই কথাটা নিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। কিন্তু বোঝাপড়ার কোন আশাই দেখছি না। ওদিকে তো লড়াইয়ের জন্য খুব তোড়জোড় চলেছে।

আপনি তো রাজাসাহেবকে জানেনই, ভারি ঝঞ্চটে লোক, একদম খেয়ালী। একটা না একটা খেয়াল ওর ওপরে ভর করেই থাকে। আজকাল ঝোঁক হয়েছে, রায়সাহেবকে হারাতেই হবে। আর ওর যখন যে খেয়াল চাপে তা করবেই, কারু কথাই শুনবে না। তাতে যতই লোকসান হোক না কেন। এখন চল্লিশ লাখের বোঝা ঘাড়ে চেপে আছে, তবু বেহুঁসের মত বেহিসাবি খরচ করে চলেছে। পয়সা যেন খোলামকুচি। এদিকে পাঁচ মাস ছয় মাস এক একজন চাকরের মাইনে বাকি পড়ে আছে, ওদিকে হীরামহল তৈরি হচ্ছে—শ্বেত পাথরের মেজে; এমন সুন্দর পংখের কাজ, দেখলে চোখ ঝলসে যায়। অফিসারদের জন্য রোজ ডালি পাঠান হোচ্ছে। শোনা যাচ্ছে নাকি, ইংরেজ ম্যানেজার রাখবে।

তবে আপনি কেন বলেছিলেন যে ওর সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে নেবেন ?

আমার যতদূর সাধ্য আমি করেছি। এর বেশি আর কি করতে পারি বলুন। কেউ যদি দুচার লাখ টাকা ফুঁ দিয়ে ওড়াতে চায় তো আমি কি করতে পারি ?

রায়সাহেব এবার রাগ আর সামলাইতে না পারিয়া বলিলেন, ঐ দুচার লাখের দশ বিশ হাজার বোধ করি আপনারই হাতে আসবে।

মিঃ তন্‌খাই বা চুপ করিবে কেন ? বলিল, রায়সাহেব, অমন সাধু সাজবেন না। এই ব্যাপারে না আপনি সন্ন্যাসী, না আমি। আপনি আমি দুজনেই কিছু না কিছু রোজগারের জন্য উন্মুখ। বোকা ধনীর খোঁজ করার ইচ্ছা আপনারও যেমন, আমারও তেমনই। আমি আপনাকে দাঁড়াতে বলেছিলাম, আপনিও এক লাখের লোভে দাঁড়াতে রাজী হয়ে গেলেন। যদি ঢিল ঠিক জায়গায় লাগতো, তবে আজ আপনি লাখ টাকার মালিক হয়ে যেতেন। এক পয়সা ধার না করে কুমারসাহেবের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করে ফেলতেন, এদিকে মামলাও দায়ের করা চলতো। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য যে ও চালটা খাটলো না। আপনিই যখন চালের ওপর রয়ে গেলেন, তখন আমার আর কি কিছু মিলতো ? শেষটা আমি অগত্যা ওর লেজে ধরে ঝুলে পড়লাম। কাউকে না কাউকে ধরে তো এই বৈতরণী পার হতে হবে ?

রায়সাহেব রাগে এমন ধারা অভিভূত হইলেন যে, মনে হইল এই দুষ্টটাকে গুলি করিয়া মারেন। এই বদমায়েস লোভ দেখাইয়া উঁহাকে দাঁড় করাইয়াছে, এখন বেশ নিজের সাফাই গাহিতেছে, নিজের গায়ে একটু ধূলাও লাগিতে দিবে না ; কিন্তু ঘটনাচক্র উঁহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিল।

তাহলে আপনার আর কিছুই করবার নেই ?

সেই রকমই মনে করুন।

আমি পঞ্চাশ হাজারেও বোঝাপড়া কোরতে রাজী।

রাজাসাহেব কোন মতে তা মানবে না।

পঁচিশ হাজারে তো মানবে ?

কোন আশা নেই। সে পরিষ্কার বলে দিয়েছে।

সে বলে দিয়েছে, না, আপনি বলছেন ?

আপনি আমাকে মিথ্যেবাদী মনে করেন ?

রায় সাহেব বিনম্র স্বরে বলিলেন, আমি আপনাকে মিথ্যেবাদী বলছি না; তবে এটা আমি ঠিক বুঝছি যে আপনি চাইলেই বোঝাপড়া হয়ে যায়।

তবে কি আপনি ভাবছেন যে আমি ও বন্দোবস্ত করতে দিই নি?

না, আমি তা বলছি না, আমি বলতে চাই যে আপনি মনে করলে কাজটা হয়ে যেত, আর আমি এত ঝামেলায় পড়তাম না।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া মিঃ তন্‌খা বলিল, তবে শুনুন রায়সাহেব, আপনি যদি সোজা কথা শুনতে চান, শুনুন, আপনি যদি দশ হাজার টাকার চেক আমার হাতে ফেলে দিতেন তবে আজ নিশ্চয় এক লাখ টাকার মালিক হোয়ে যেতেন। আপনি হয় তো ভেবেছিলেন, রাজাসাহেবের কাছ থেকে টাকা পেয়ে গেলে আমাকে হাজার দু হাজার দিয়ে বিদায় কোরতেন। আমি অমন কাঁচা চাল চালি না। আপনি যদি রাজাসাহেবের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ট্রেজারীতে রাখতেন আর আমায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতেন, তাতেই বা আমি কি করতে পারতাম? এ নিয়ে তো আর নালিশ ফরিয়াদ চলে না!

আহত নয়নে চাহিয়া রায়সাহেব বলিলেন, আপনি আমায় এমন বেইমান মনে করেন?

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে তন্‌খা বলিল, এর মধ্যে বেইমানি কোথায় দেখছেন? আজ কাল এই তো বুদ্ধির লক্ষণ। কি করে অন্যকে উল্লুক বানানো যায়, সেটাই হোল সার্থক নীতি। আর আপনিই হলেন তার গুরু।

মুষ্টি দৃঢ় করিয়া রায়সাহেব বলিলেন, আমি?

আজ্ঞে হাঁ, আপনি। প্রথম ইলেকশনের সময় আমি মন প্রাণ দিয়ে আপনার সাহায্য করেছিলাম। আর আপনি কিনা গাঁই গুঁই করে বহু কষ্টে পাঁচ শ টাকা দিলেন; দ্বিতীয় নির্বাচনের সময় আপনি একটা ভাঙ্গাচোরা লজ্‌ঝড় গাড়ি দিয়ে কোনরকমে কাজ সারলেন। আপনার হাত দিয়ে তো জলও গলে না। দুধের চাঁছিটুকুও ফাঁকি দিয়ে খেয়ে নিয়েছেন।

এই বলিয়া সে ঘরের বাহিরে গিয়া গাড়ি বাহির করিতে হুকুম দিল।

রায়সাহেবের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। অশিষ্টতারও একটা সীমা আছে। একে তো ঘণ্টাভর অপেক্ষা করাইয়া রাখিল, আবার এখন এমনধারা অভদ্রের মত ঘর হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে। তন্‌খাকে পাড়িয়া ফেলিতে পারেন, এ বিশ্বাস থাকিলে তিনি থামিতেন না, কিন্তু তন্‌খা যে ওজনে আয়তনে

তাঁহার দেড় গুণ হইবে। মিঃ তন্‌খার হর্ন শুনিয়া রায়সাহেবও নিজের মোটরে বসিয়া সোজা খান্নার কাছে আসিয়া হাজির হইলেন।

নয়টা বাজিতেছিল। কিন্তু খান্না সাহেব এখন মিঠে ঘুমের আনন্দে বিভোর। দুইটা রাত্রির আগে তো সে কোন দিন শুইতে যায় না, কাজেই বেলা নয়টা পর্যন্ত ঘুমানো তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এখানেও তাই রায়সাহেবকে আধঘণ্টা বসিতে হইল; সাড়ে নয়টা আন্দাজ মিঃ খান্না যখন হাসিতে হাসিতে ঘরে প্রবেশ করিল, তখন রায়সাহেব ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, সাবাস, সাড়ে নয়টা বাজে, এতক্ষণে হুজুরের ঘুম ভাঙ্গলো! টাকার আণ্ডিল ঘরে, কাজেই এমন নিশ্চিন্ত। আমার মতো তালুকদার হোলে আপনাকেও এতক্ষণ লোকের দোরে হাজিরা দিতে হোত। বসে বসে মাথা ঘুরছে আমার।

সিগারেটের কেসটি আগাইয়া দিয়া হাসিমুখে খান্না বলিল, কাল রাত্তিরে শুতে শুতে বড় দেরি হয়ে গেল। তা, আপনি কোত্থেকে আসছেন এখন?

রায়সাহেব অল্প কথায় নিজের দুঃখের কথা সব বলিলেন। তিনি মনে মনে খান্নাকে গালি দিতে লাগিলেন, সহপাঠী হইয়াও সে তো সর্বদাই রায়সাহেবকে ঠকাইতে ব্যস্ত, অথচ মুখে কতই না খোসামুদি করে।

খান্না যেন কতই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে এমন ভাব দেখাইয়া বলিল, আমার তো পরামর্শ, আপনি ইলেকশন ছেড়ে দিন আর শালাদের নামে মামলা রুজু করে দিন, বাকি রইল মেয়ের বিয়ে, ও তো তিন দিনের মামলা। তার জন্য জেরবার হওয়া কাজের কথা নয়। কুমার সাহেব আমার বন্ধুলোক, দেনাপাওনার কোন প্রশ্নই উঠবে না।

রায়সাহেব ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমি ব্যাঙ্কার মিঃ খান্না নই, আমি তালুকদার। কুমারসাহেব পণ চান না, ওঁকে ভগবান সব দিয়েছেন, কিন্তু আপনি তো জানেন আমার এই একটি মোটে মেয়ে, তাতে ওর মা নেই। সে যদি আজ বেঁচে থাকতো তাহলে হয় তো সারা বাড়ি লুটে দিয়েও তার মন উঠতো না। আমিও হয় তো তার হাতে খরচের টাকা দিয়ে বলতাম যে, হাত টান করে খরচ কর; কিন্তু এখন আমি যে ওর বাপ মা সবই। বুকের রক্ত নিংড়ে দিতে হলেও আমি আনন্দে তা দিয়ে দেব। এই বিরহিবিধুর জীবনে অপত্যস্নেহ দিয়েই তো আমি আত্মার সব পিপাসা মিটিয়ে রেখেছি। দুইটি সন্তানের প্রেমের মধ্যেই আমি পত্নীর স্মৃতি রক্ষা করেছি। এই শুভ কাজে মনের

ইচ্ছা পূরণ কোরতে পারবো না, এ যেন আমার কাছে অসম্ভব কথা। নিজের মনকে তবু বোঝাতে পারি, কিন্তু যখন ভাবি আমার স্ত্রী এসব চাইতো, তখন আর মন মানে না। আর ইলেকশনে দাঁড়িয়ে এখন পিছিয়ে আসাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি জানি যে আমার হার হবে। রাজাসাহেবের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই, তবে আমি দেখাতে চাই যে অমরপাল সিং কম পাত্র নয়।

আর মামলা দায়ের করা তো নিশ্চয়ই দরকার?

ওটার ওপরেই তো সব নির্ভর করছে। তা আপনার কাছ এখন এলাম, বলুন তো আপনি আমাকে কতটা সাহায্য কোরতে পারেন?

আপনি তো জানেন, এ বিষয়ে আমাদের ডিরেকটারদের কি হুকুম। আর এও আপনি জানেন যে রাজাসাহেবও আমাদের একজন ডিরেকটার। বাকি বকেয়া উশুলের জন্য বার বার তাগিদ হোচ্ছে। কোন নতুন ব্যাপার হয় তো হতে পারে।

রায়সাহেব মুখ নীচু করিয়া বলিলেন, আপনি যে মিঃ খান্না আমার ডোঙ্গাখানা ডুবিয়ে দিচ্ছেন।

আমার নিজস্ব যা কিছু আছে সব আপনার, কিন্তু জানেন তো ব্যাঙ্কের ব্যাপারে আমাকেও মালিকদের হুকুম মেনেই চলতে হয়।

এই জায়গীরটা যদি হাতে এসে যায়—আর আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে এসে যাবে—তবে আমি সকলের দাবি পাই পর্যন্ত শোধ করে দেব।

এখন ঠিক কতখানি জলে দাঁড়িয়ে আছেন, তার একটা আন্দাজ দিতে পারেন?

রায়সাহেব একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, এই ধরুন, পাঁচ ছয় লাখ। সামান্য কিছু কমও হোতে পারে।

অবিশ্বাসের সুরে খান্না বলিল, হয় আপনার মনে নেই, নয় আপনি লুকোচ্ছেন।

রায়সাহেব দৃঢ়স্বরে বলিলেন, আজ্ঞে না, আমি ভুলিও নি, লুকোইও নি। আমার সম্পত্তি এখন কমসে কম পঞ্চাশ লাখ টাকার, আর শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তিও তার চেয়ে কম নয়। এতখানি সম্পত্তির কাছে পাঁচ দশ লাখ টাকার বোঝা এমন কিছু নয়।

কিন্তু শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তির ওপরেও দেনার দায় নেই, তাই বা কি কোরে বলতে পারেন ?

আমি যত দূর জানি, ও সম্পত্তি 'বে-দাগ'।

এদিকে আমি কিন্তু খবর পেয়েছি যে ঐ সম্পত্তির ওপর দশ লাখ টাকার কম দেনা নাই। ও সম্পত্তি থেকে কিছু পাওয়ার কথা থাক, আপনার সম্পত্তির দেনাও দশ লাখের কম হবে না। তা ছাড়া ঐ সম্পত্তি এখন পঞ্চাশ লাখ টাকার নয়, বড় জোর পঁচিশ লাখ। এ অবস্থায় কোন ব্যাঙ্ক আপনাকে কর্জ দিতে পারে না। আপনি মনে জানবেন যে জ্বালামুখীর মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। আস্তে একটা ধাক্কা খেলেও পাতালে গিয়ে পড়বেন। এ রকম অবস্থায় আপনাকে খুব বুঝে সুঝে সামলে চলতে হবে।

উহার হাতখানা ধরিয়া রায়সাহেব বলিলেন, এ সবই আমি খুব বুঝি, বন্ধু ; যে কাজ করতে প্রাণ চায় না, তাই করতে হয়, এ ছাড়া জীবনে ট্র্যাজেডি আর কি আছে ! এ অবস্থায় আপনাকে কিন্তু আমার জন্যে কম পক্ষে দুলাখ টাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

জোরে শ্বাস লইয়া খান্না বলিল, মাই গড্ ! দুই লাখ ! অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব।

আমি তোমার দরজায় মাথা ঠুকে মরবো, খান্না, এটা জানবে ! তোমার ভরসায়-ই আমি এই সমস্ত প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। এখন তুমি যদি নিরাশ কর, তবে বিষ খাওয়া ছাড়া আমার হয়তো গতি নেই। সূর্যপ্রতাপ সিংহের কাছে আমি হাঁটু গাড়তে পারি না। মেয়ের বিয়ে অবশ্য দু চার মাস ঠেকিয়ে রাখা যায় ; মোকদ্দমা রুজু করারও এখনো যথেষ্ট সময় আছে ; কিন্তু এই ইলেকশন যে ঘাড়ে এসে পড়েছে ! আর এটাই আমার সব চেয়ে বড় চিন্তা।

খান্না চকিত হইয়া বলিল, তাহলে আপনি ইলেকশনে দু লাখ টাকা খরচ কোরবেন ?

ইলেকশনের প্রশ্ন নয় ভাই, এ হোল ইজ্জতের কথা। আপনার মতে কি আমার ইজ্জতের দাম দু লাখও নয় ? আমার সমস্ত সম্পত্তি বিকিয়ে যায়, দুঃখ নাই ; কিন্তু সূর্যপ্রতাপ সিংহকে একদম বিনা আয়াসে জিততে দেব না।

মিনিট খানেক চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া খান্না বলিল, ব্যাঙ্কের যা অবস্থা তা আপনার সামনে ধরে দিচ্ছি। আমাদের ব্যাঙ্ক লেনদেন একরকম বন্ধই করেছে।

আমি চেষ্টা করবো যাতে আপনার জন্যে বিশেষ একটা ব্যবস্থা করা যায়, তবে জানেন তো Business is Business। আমার কমিশন কি থাকবে! আপনার জন্য আমাকে বেশ একটু কায়দা মাফিক সুপারিশ করতে হবে। অন্য ডিরেকটারদের ওপর রাজাসাহেবের কি রকম প্রভাব, তা তো আপনি জানেন। আমায় এর আটঘাট বাঁধতে হবে। আপনি জেনে রাখুন, এ ব্যবস্থা আমার নিজের দায়িত্বে কোরতে হবে।

রায়সাহেবের মুখ হেঁট হইয়া গেল। খান্না ছিল তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, এক সঙ্গে পড়িয়াছিল, এক সঙ্গে চলাফেরা করিত। আজ কি না সে-ই কমিশনের আকাঙ্ক্ষা রাখিতেছে! এমন নির্লজ্জ! আর তিনি যে এতদিন ধরিয়া খান্নার খোসামোদি করিতেছেন, সে কিসের জন্য? বাগানে ফল হইল, শাক সবজী হইল, সর্বপ্রথম খান্নার কাছেই তিনি ডালি পাঠাইয়াছেন। কোন উৎসব হইলে, কোন জলসা হইলে, সর্বাগ্রে খান্নাকেই তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাহার এই প্রতিদান! রায়সাহেব উদাস মনে বলিলেন, তা আপনার যেমন ইচ্ছা, আমি কিন্তু আপনাকে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করি।

কৃতজ্ঞতার ভাব দেখাইয়া খান্না বলিল, সে আপনার দয়া। আমিও সর্বদা আপনাকে নিজের বড় ভাইয়ের মত দেখে এসেছি, এখনও দেখি। আপনার কাছে আমি রাখঢাক কোনদিন করি নি, কিন্তু ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্র একটু আলাদা রকমের। এখানে কেউ কারও বন্ধু নয়, কেউ কারও ভাই নয়। আমি যেমন ভাই মনে করি বলে আপনার কাছে বেশি কমিশন চাইতে পারি না, তেমনি আপনারও আমাকে কমিশন কমাতে বলা উচিত নয়। তবে আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার কাছে যত কম করে নিতে পারা যায় তা আমি নেবো। কাল আপনি অফিসের সময় এসে লেখাপড়া করিয়ে নেবেন। ব্যস্, বিজনেস শেষ। আচ্ছা, আপনি কি শুনেছেন, মেহতা সাহেব নাকি আজকাল মালতীর দিকে বেজায় রকম ঝুঁকেছে? সমস্ত ফিলসফি চুকে গেছে! দিনে একবার দুবার তো হাজিরা দেয়ই, আর সন্ধ্যে বেলা হরদম এক সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া হয়। আমি তো জানতাম, ও মালতীর দোরে কখনও সেলাম ঠুকতে যায় না। এখন সম্ভবত ক্ষতিটা পুরিয়ে নিচ্ছে। এমন দিন গিয়েছে যখন মিঃ খান্নাই ছিল সব কিছু। কোন কাজ পড়লেই মালতী ছুটে আসত খান্নার কাছে। কখনও টাকার দরকার পড়লে খান্নার নামে চিঠি আসত। আর এখন, আমাকে

কোথাও দেখলে পরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি কত সাধ করে ওর জন্যেই খাস ফ্রান্স থেকে একটা ঘড়ি আনালাম, বড় সখ করে নিয়ে গেলাম, তা মালতী নিলই না। কাল মেওয়ার সাজি পাঠিয়েছিলাম, কাশ্মীর থেকে ওর জন্যেই আনানো; তা ফেরৎ পাঠিয়েছে। আমার আশ্চর্য লাগে, মানুষ এত শীগগির কি করে এমন ধারা বদলাতে পারে!

রায়সাহেব মনে মনে তো উহার দুরবস্থায় খুসিই হইলেন; কিন্তু বাহিরে সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, যদি ধরে নিই যে ও মেহতার প্রেমে পড়েছে, তাহলেও তো আপনার সঙ্গে সব সম্পর্ক ভেঙ্গে দেবার কোন কারণ নেই।

ব্যথিতস্বরে খান্না বলিল, এই তো দুঃখ, ভাইসাহেব। আমি গোড়ায়ই জানতাম, ও আমার হাতে আসবে না। আপনাকে সত্যি বলছি, মালতী আমাকে ভালবাসবে এ ধোঁকায় আমি কখনো পড়ি নাই। প্রেমের মত জিনিস ওর কাছ থেকে পাওয়া যাবে, এ আমি কখনো আশাই করি নাই। আমি তো কেবল ছিলুম ওর রূপের পূজারী। সাপের বিষ আছে জেনেও আমরা দুধ দিয়ে সাপ পুষি। তোতার মত নির্মম প্রাণী আর আছে কি? তবু তার রূপ আর মিষ্টি বুলির জন্যে লোকে ওকে পোষে, আর সোনার খাঁচায় রেখে দেয়। আমার পক্ষে মালতী ছিল ঐ তোতার মত। তবে দুঃখ হয় ভাইসাহেব, কেন আমি আগে থেকে সাবধান হই নাই! ওর পেছনে আমি কত হাজার টাকা যে ঢেলে দিলাম! ওর স্লিপ পাওয়া মাত্র আমি ওকে টাকা পাঠিয়েছি। আজ পর্যন্ত আমার গাড়ী ওর হেফাজতেই আছে। ভাইসাহেব, ওর জন্যে আমি নিজের ঘর সংসার ছারেখারে দিয়েছি। হৃদয়ে যত রস ছিল তা ওর জন্যে এত বেশি ঢেলে দিয়েছি যে অন্য দিকের বাগান একদম শুকিয়ে গেছে। কত বছর চলে গেছে, আমি গোবিন্দীর সঙ্গে মন খুলে কথাই বলি নাই। অজীর্ণ রোগীর যেমন মোহনভোগে অরুচি জন্মে, আমারও গোবিন্দীর সেবা, যত্ন, ত্যাগ, স্নেহে তেমনই অরুচি ধরে গিয়েছিল। যাদুকর যেমন বাঁদরকে নাচায়, মালতী আমাকে ঠিক তেমনই নাচিয়ে বেড়িয়েছে; আমিও খুসি হয়েই নেচেছি। ও আমাকে কত অপমান করতো, আমি খুসি হয়ে হাসতাম। ও আমায় শাসন কোরতো, আমি মাথা নীচু করে থাকতাম। অবশ্য আমি স্বীকার করছি, ও কখনও আমাকে আদরও করে নাই, উৎসাহও দেয় নাই, তাও আমি পতঙ্গের মতো ওর রূপের শিখায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি। আর সেই মালতী, আজ আমার সঙ্গে সাধারণ শিষ্টাচার

পর্যন্ত করে না! কিন্তু এও বলে দিচ্ছি, ভাইসাহেব, খান্না চুপ করে সইবার পাত্র নয়। ওর চিঠি আমার কাছে বেশ ভাল ভাবে রাখা আছে, আমি পাই পয়সাটি পর্যন্ত আদায় করে ছাড়ব। আর ডাঃ মেহতাকে লখনৌ থেকে তাড়িয়ে তবে হাঁফ ছাড়ব, তার এখানে থাকা আমি অসম্ভব করে তুলব।

ঠিক এমন সময় মোটরের হর্নের আওয়াজ হইল, আর মুহূর্তের মধ্যে ডাঃ মেহতা আসিয়া ঘরে দাঁড়াইল। সাদা ধবধবে রং, মুখে স্বাস্থ্যের লালিমা, পরনে লম্বা আচকান, চুড়িদার পাজামা, চোখে সোনালী চশমা। সৌম্যতার প্রতিমূর্তি।

খান্না উঠিয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া দিল। আসুন, আসুন, মিঃ মেহতা। আপনার কথাই হচ্ছিল।

মেহতা দুই জনের সঙ্গেই করমর্দন করিয়া বলিল, কি শুভক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়েছি যে, আপনাদের দুজনকে একই জায়গায় পেয়ে গেলাম! আপনারা কাগজে সম্ভবত দেখেছেন যে মেয়েদের জন্য একটা ব্যায়ামশালা খোলার আয়োজন হোচ্ছে। মিস মালতী ঐ কমিটির সভাপতি। অনুমান দুই লাখ টাকা লাগবে। সহরে এরকম একটা জিনিসের কত দরকার তা আপনারা আমার চেয়ে ভাল জানেন। আমার ইচ্ছা, যাঁরা দান করবেন তাঁদের মধ্যে আপনাদের দুজনের নাম সকলের ওপরে থাকে। মিস মালতী নিজেই আসছিলেন, কিন্তু আজ ওঁর বাবার শরীরটা একটু খারাপ হয়ে পড়ায় আসতে পারলেন না।

এই বলিয়া মেহতা চাঁদার তালিকাটা রায়সাহেবের হাতে দিল। প্রথম নাম রাজা সূর্যপ্রতাপ সিংহের—আর নামের পাশে লেখা রহিয়াছে পাঁচ হাজার টাকা। তাহার নীচে কুমার দিগ্বিজয় সিংহের নামে তিন হাজার টাকা। তাহার পরে আরও কয়েকটি নাম, তাহাদের নামে টাকার অঙ্ক প্রায় এই রকমই, বা কিছু কম। মালতী দিয়াছে পাঁচ শ, আর মেহতা হাজার।

রায়সাহেব অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, আপনারা তো দেখছি প্রায় চল্লিশ হাজার এরই মধ্যে তুলে ফেলেছেন।

গর্বভরে মেহতা বলিল, এ সব আপনাদেরই দয়া। আর এ তো কেবল তিন ঘণ্টার পরিশ্রম। রাজা সূর্যপ্রতাপ সিংহ সম্ভবত আগেও সার্বজনীন কাজে হাত দিয়েছেন; আজ তো উনি কিছু না শুনে না বলেই চেক কেটে দিলেন। দেশ জেগেছে। জনসাধারণ যে কোনও শুভ কাজে যোগ দিতে তৈরী।

কেবল ওদের বিশ্বাস হওয়া চাই যে দানের টাকাটা সৎ কাজে খরচ হবে। মিঃ খান্না, আপনার কাছে তো আমার খুব বেশি রকম আশা।

খান্না উপেক্ষার ভাবে বলিল, আমি ওসব দানধ্যানের ব্যাপারে নাই। জানি না আপনারা আর কতখানি পশ্চিমের গোলামি কোরবেন। এসব মেয়েদের দেখছি ঘরে অরুচি। ব্যায়ামের ভূত ঘাড়ে চাপলে তো আর ঘরে থাকবেই না। যে মেয়ে ঘরের কাজকর্ম করে তার ব্যায়ামের কোনই দরকার নাই। আর যারা ঘরের কাজকর্ম করে না, খালি ভোগবিলাস নিয়ে থাকে, তাদের ব্যায়ামের জন্য চাঁদা দেওয়া আমি তো অধর্ম মনে করি।

মেহতা কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া বলিল, এমন ক্ষেত্রে আপনার কাছে কিছু চাইবই না। যে কাজে আমাদের আস্থা নাই তাতে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করা সত্যই অধর্ম। আপনি তো মিঃ খান্নার সঙ্গে একমত নন, রায়সাহেব?

রায়সাহেব গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন। সূর্যপ্রতাপের পাঁচ হাজার উঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া দিতেছিল; চমকিয়া বলিলেন, আমাকে কিছু বললেন?

আমি বলছি, আপনি তো এ ব্যাপারে সহায়তা করাকে অধর্ম মনে করেন না?

যে কাজে আপনি হাত দিয়েছেন তা ধর্মই হোক আর অধর্মই হোক, আমি গ্রাহ্য করি না।

না, আমি চাই, আপনি নিজে বিচার করে দেখুন। বিচারে যদি এ কাজটা সমাজের মঙ্গলের জন্য দরকার মনে হয় তবেই যোগ দেবেন। মিস্টার খান্নার নীতি আমার ভালো লাগে।

খান্না বলিল, আমার পরিষ্কার কথা, আর তার জন্যে বদনামও হয়।

ক্ষীণ হাসি হাসিয়া রায়সাহেব বলিলেন, আমার তো বিচার করার শক্তিই নাই। সজ্জনের পিছনে পিছনে চলাই আমি ধর্ম মনে করি।

তবে একটা বড়ো রকম অঙ্ক লিখুন।

যা বলবেন, তাই লিখব।

আপনার যা ইচ্ছা।

না, আপনি যা বলবেন তাই লিখব।

তবে দু হাজারের কম কি করে লিখবেন?

রায়সাহেব আহতস্বরে বলিলেন, আপনার চোখে আমার এই দাম ?

তার পর কলম তুলিয়া লইয়া নিজের নাম লিখিয়া তাহার পাশে লিখিলেন, পাঁচ হাজার। মেহতা উঁহার হাত হইতে তালিকাটি নিল ; কিন্তু দেখিয়া উহার মনে এমন গ্লানি হইল যে, রায়সাহেবকে ধন্যবাদ দিতেও ভুলিয়া গেল। চাঁদার তালিকা রায়সাহেবকে দেখাইয়া সে মহা অনর্থ করিয়া বসিয়াছে, এই চিন্তা উহাকে শূলের মত বিঁধিতে লাগিল।

মিস্টার খান্না দয়া আর উপহাসের দৃষ্টিতে রায়সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন বলিতেছে, তুমি কি মস্ত গাধা।

হঠাৎ মেহতা রায়সাহেবের গলা জড়াইয়া ধরিল, আর মুক্তকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিল, থ্রি চিয়ার্স ফর রায়সাহেব, হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

খান্না খোঁচা দিয়া বলিল, এরা সব রাজা মহারাজা লোক ! ভালো কাজে এরা না দিলে কে দেবে ?

মেহতা বলিল, আপনাকে তো আমি রাজার রাজা ভাবতাম। আপনি ওদের শাসনকর্তা, ওদের কলকাঠি তো আপনারই হাতে।

রায়সাহেব প্রসন্ন হইয়া গেলেন, এ আপনি খুব বলেছেন মেহতাজী ! আমরা তো নামেই রাজা—আসল রাজা আমাদের ব্যাঙ্কারেরা।

মেহতা খান্নাকে খোসামোদি করিবার ভান করিয়া বলিল, আপনার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নাই খান্নাজী ! আপনি আজ এ কাজে যোগ দিতে চাচ্ছেন না, বেশ, কিন্তু একদিন আপনি নিশ্চয় এর মধ্যে আসবেন। আপনাদের মত ধনকুবেরদের দৌলতেই তো বড় বড় প্রতিষ্ঠান সব চলছে। দুই তিন বছর ধরে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এত ধুমধামে কারা চালাল ? এতগুলি ধর্মশালা বিদ্যালয় কারা তৈরি করাল ? আজ সংসারের শাসন দড়িটি আছে ব্যাঙ্কারের হাতে। সরকার ওদের হাতের পুতুল। আমি তো আপনার আশা ছাড়ি নাই। যে লোক দেশের জন্য জেলে যেতে পারে, তার পক্ষে দুচার হাজার খরচ করা এমন কি বড় কথা ? আমরা তো ঠিক করেছি, এ ব্যায়ামশালার ভিত্তি স্থাপন গোবিন্দী দেবী করবেন। আমরা দুজনে শীগগিরই গভর্নরের কাছে একবার দেখা করতে যাব, আমার বিশ্বাস আমরা গভর্নরের সাহায্য পেয়ে যাব। আপনি তো জানেন, মহিলা-আন্দোলনের ব্যাপারে লেডী উইলসনের কতখানি অনুরাগ। রাজাসাহেব আর অন্য অনেকের মত ছিল,

লেডী উইলসন ভিত্তি স্থাপন করেন; কিন্তু পরে ঠিক হোল, এমন শুভ কাজের সূচনা আমাদের বোনেদের কারো হাতে হওয়াই ঠিক। অন্তত সেদিনটা আপনি ওখানে আসবেন ?

খান্না ঠাট্টা করিয়া বলিল, হাঁ, হাঁ, লেডী উইলসন যখন যাবেন তখন আমাকে তো যেতেই হবে। এ ভাবে আপনি বহু রাজারাজড়াকে ফাঁসাতে পারবেন। আপনাদের চাল তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। আর আমাদের রাজা জমিদাররা এই রকমই। তাদের উল্লুক বানিয়ে যথেষ্ট ঠকান যায়।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা যখন হাতে আসে তখন তা নিজেই নিজের বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজতে থাকে। ও পথে যদি না যায়, তো জুয়াতে যাবে, ঘোড়দৌড়ে যাবে, নয় তো বাবুগিরিতে যাবে।

এগারটা বাজে। খান্না সাহেবের অফিসের সময় হইয়া আসিয়াছে। মেহতা চলিয়া গেল। রায়সাহেবও উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু খান্না উঁহার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল, না, না, আপনি একটু বসুন। দেখলেন তো, মেহতা আমাকে কি বিচ্ছিরি ভাবে ফাঁসিয়েছে, বেরোবার রাস্তাও রাখে নাই। গোবিন্দীকে দিয়ে ভিত্তি স্থাপন করাবে, সে ক্ষেত্রে আমার সরে থাকা মানেই তো হাস্যাস্পদ হওয়া, নয় কি ? গোবিন্দী কি করে রাজী হোল, তাই আমি বুঝতে পারছি না, আর মালতী কেমন করে ওকে সয়ে নিল সেটা বোঝা তো আরও কঠিন। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না, এর মধ্যে বেশ একটু রহস্য আছে ?

রায়সাহেব আত্মীয়তা জমাইয়া বলিলেন, সত্যি তো, এসব বিষয়ে মেয়েদের স্বামীর পরামর্শ নেওয়া উচিত।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে রায়সাহেবের দিকে চাহিয়া খান্না বলিল, এই সব নিয়েই গোবিন্দীর ওপর আমার রাগ ধরে যায়, আর তারি জন্যে লোকে মন্দ বলে। আপনিই বলুন—এসব হাঙ্গামায় আমার যাবার দরকার কি ? এসবে তারাই গিয়ে পড়ে যাদের ফালতু টাকা আছে, এন্তার সময় আছে, আর আছে নামের হাউস। যা হবে তা তো আমার জানা আছে। দু চার জন মহাত্মা সেক্রেটারী, সহ-সেক্রেটারী, সভাপতি, সহ-সভাপতি সেজে অফিসারদের খানাপিনার নিমন্ত্রণ করবেন, ওঁদের দয়ার পাত্র হবেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের একত্র করে মজা লুটবেন। ব্যায়াম তো একটা লোক দেখানো মাত্র। এ-সব প্রতিষ্ঠানে

হামেশা তো এই হোচ্ছে, হবেও, আর আমরা এবং আমাদের মত যারা নামে ধনী, তারাই বোকা বনবে। এ সবের মূলে গোবিন্দী।

সে একবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, ফের বসিয়া পড়িল। গোবিন্দীর উপর উহার রাগ ক্রমেই প্রচণ্ডতর হইতে লাগিল। দুই হাতে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমার কি করা উচিত তা বুঝতে পারছি না।

রায়সাহেব ভালমানষি করিয়া বলিলেন, কিছু না, আপনি গোবিন্দী দেবীকে বলুন অস্বীকার করে মেহতাকে চিঠি লিখে দিতে। ব্যস, ফুরিয়ে গেল। আমি তো বেকায়দায় ফেঁসে গেছি, আপনি আর কেন ফাঁসবেন ?

খান্না একটু চিন্তা করিয়া বলিল, কিন্তু ভেবে দেখুন, কি মুসকিলের কথা ! লেডী উইলসনের সঙ্গে কথা ঠিক হয়ে গেছে, সারা শহর খবর পেয়ে গেছে, সম্ভব আজকের কাগজেও উঠে গেছে। এসব মালতীর কারসাজি ; আমাকে জব্দ করবার জন্যে এই চালটি চেলেছে !

সত্যি, তাই তো মনে হোচ্ছে।

ও আমাকে অপমান করতে চায়।

তা, আপনি ভিত্তিস্থাপনের একদিন আগে বাইরে চলে যাবেন।

তাতেও মুসকিল আছে, রায়সাহেব ! কোথাও মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না। সেদিন যদি আমার কলেরাও হয়, তাও ওখানে যেতেই হবে।

কাল আবার আসিবেন বলিয়া রায়সাহেব যেই বাহির হইয়া গেলেন, খান্না অমনি ভিতরে গিয়া গোবিন্দীকে এক হাত নিল। কেন সে এই ব্যায়ামশালার ভিত্তি স্থাপন করিতে রাজী হইল ?

গোবিন্দী কি করিয়া বলে যে এই সম্মান পাইয়া তাহার মন কত খুসি হইয়া উঠিয়াছে, সেদিনের জন্য কি গভীর মনোযোগ দিয়া ও অভিভাষণ রচনা করিতেছে, কি ওজস্বিনী ভাষায় ও পদ্য লিখিয়াছে ! ওর মনে বুঝিয়াছিল এই প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইলে ও খান্নাকে প্রসন্ন করিতে পারিবে। উহার এই সম্মান তো উহার স্বামীরও। ইহাতে খান্নার অপমান হইতে পারে, একথা তাহার কল্পনায় আসে নাই। এদিকে কয়েক দিন ধরিয়া স্বামীর মন একটু নরম দেখিয়া উহার মনে আনন্দ আর আশা জাগিতেছিল। ও তাই স্বপ্ন দেখিতেছিল, কি করিয়া অভিভাষণ পাঠে, কবিতা আবৃত্তিতে লোককে মোহিত করিয়া দিবে।

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনিয়া আর খান্নার ভঙ্গী দেখিয়া ওর বুক কাঁপিয়া উঠিল; অপরাধী ভাবে বলিল, ডাক্তার মেহতার বারবার অনুরোধে আমি স্বীকার করলাম।

ডাঃ মেহতা তোমাকে কূয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়তে বললেও বোধ হয় এমনি খুশি হয়েই ঝাঁপিয়ে পড়বে!

গোবিন্দী নিরুত্তর।

ঈশ্বর তোমার ঘটে যখন বুদ্ধি দেন নাই, তখন আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করে নিলে না? তুমি এটা বুঝছো না—মেহতা আর মালতী দুজনে মিলে এই যে চালটা চাললো, এ কেবল আমার কাছ থেকে দুচার হাজার আদায়ের ফিকির। এদিকে আমি ঠিক করেছি, এক পাইও দেব না। তুমি আজই অস্বীকার করে মেহতাকে একটা চিঠি লেখ।

গোবিন্দী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, তা তুমিই লিখে দাও না।

আমি কেন লিখবো? তুমি কইলে কথা, আর লিখবো আমি?

ডাক্তার সাহেব কারণ জিজ্ঞাসা কোরলে কি বলবো?

বলবে তোমার মাথা, আর কি? এই ব্যভিচারশালার জন্য একটি আধলাও আমি দিচ্ছি না।

তা তোমাকে দিতে বলছে কে?

ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিয়া খান্না বলিল, কি অবুঝের মত কথা বলছো! তুমি ভিত্তি স্থাপন করবে অথচ আমি কিছু দেব না, তাহলে লোকে বলবে কি?

গোবিন্দী যেন সঙ্গীনের খোঁচার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, বেশ কথা, আমি লিখে দিচ্ছি।

আজই লিখতে হবে।

বললাম তো, লিখে দেব।

খান্না বাহিরে আসিয়া ডাক দেখিতে লাগিল। যেদিন অফিসে যাইতে উহার দেরি হইয়া যাইত, চাপরাশী ডাক বাড়িতেই দিয়া যাইত। চিনির দাম চড়িয়াছে। খান্নার মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আর একটা চিঠি খুলিল। আখের দর বাঁধিয়া দিবার জন্য যে কমিটি বসিয়াছিল তাহা ঠিক করিয়াছে যে দর নিয়ন্ত্রণ করা চলিবে না। ধুত্তোর! ও তো আগেই এ কথা বলিয়াছিল, কিন্তু ঐ অগ্নিহোত্রী যত গোলমাল করিয়া জবরদস্তি এক কমিটি বসাইল।

শেষ পর্যন্ত গালে থাপ্পড় খাইল তো! এ হইল চাষীদের আর মিলওয়ালাদের ব্যাপার। সরকার এর মধ্যে কথা বলিবার কে?

হঠাৎ গাড়ী হইতে মিস মালতী নামিল। পদ্মের মত উৎফুল্ল, দীপশিখার মত উজ্জ্বল, আনন্দ আর প্রাণের প্রতিমা—নিঃশঙ্ক, নির্দ্বন্দ্ব, যেন উহার মনের বিশ্বাস জগতে সর্বত্র উহার জন্য সুখ আর আদর যত্নের দ্বার খোলাই রহিয়াছে। খান্না বারান্দায় আসিয়া নমস্কার করিল।

মালতী প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, মিঃ মেহতা এখানে এসেছিলেন?

হাঁ, এসেছিলেন তো।

কোথায় যাচ্ছেন, কিছু বলেছেন কি?

না, তা তো কিছু বলেন নি।

কে জানে কোথায় ডুব মেরেছে; আমি তো চার দিকে খুঁজে এলাম। আচ্ছা, ব্যায়ামশালার জন্যে আপনি কত দিলেন?

অপরাধীর মত খান্না বলিল, আমি ও ব্যাপারটা এখনো কিছু বুঝতেই পারি নাই।

মালতী বড় বড় চোখ মেলিয়া উহার দিকে চাহিয়া রহিল, যেন ভাবিয়া পায় না, এমন লোকের উপর রাগ না অনুকম্পা, কি করা চলে।

তাহার পর সে বলিল, এতে বোঝার কি আছে? বোঝাবুঝি পরে হোত, এখন কিছু দিয়ে তো দিতেন। আমি মেহতাকে এখানে ঠেলে পাঠালাম। ও বেচারার ভয় ছিল, আপনি না জানি কি বলে বসেন। আপনার এ কিপটেমোর ফল কি হবে, জানেন? এখানকার ব্যবসাদার সমাজ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। আপনি নিশ্চয় আমাকে অপমান করবেন বলে ঠিক করেছেন। সবাই পরামর্শ দিয়েছিল, লেডী উইলসনকে দিয়ে ভিত্তি স্থাপন করাও। আমিই গোবিন্দীর পক্ষ নিয়ে সবার সঙ্গে লড়াই করে রাজী করিয়েছি; আর এখন আপনি বলছেন, এ জিনিসটা আপনি বুঝতেই পারছেন না! আপনি ব্যাঙ্কিং-এর ঘোরপ্যাচ সব বোঝেন, আর এই মোটা কথাটা বুঝতে পারলেন না! এর মানে আমাকে অপমান করা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। বেশ কথা, তাই সই।

মালতীর মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। খান্না ঘাবড়াইয়া গেল, তাহার দর্প ভাসিয়া যাইতেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল যে, ও যদি ফাঁসিয়াছে কাঁটার ঘায়ে, তবে মালতী মজিয়াছে কাদায় ডুবিয়া; ওর বিপত্তি যদি টাকার থলিতে, মালতীর মনে আশঙ্কা হয় প্রতিষ্ঠাহানির। আর প্রতিষ্ঠা যে টাকার অপেক্ষা অনেক বেশি মূল্যবান! তবু মালতীর দুরবস্থায় ওর মন খুসি হইয়া উঠিতেছে না কেন? ও তো মালতীকে খরচের খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে। আর যদি উহাকে রাগাইয়া তুলিবার সাহস খোয়াইয়া থাকে, তবু দুই চারিটি কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিবার সুযোগ পাইয়া ছাড়িতে চায় না। ইহাও সে দেখাইতে চায় যে সে নিতান্ত গাধা নয়। মালতীর পথ আগলাইয়া বলিল, আমার ওপর তুমি এত সদয় হয়ে গেছ মালতী, দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।

মালতী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, তার মানে তো আমি বুঝছি না।

কিছুদিন আগে তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ছিল, এখনো কি তা আছে?

আমি তো কোনই তফাৎ দেখছি না।

আমি তো আকাশ পাতাল তফাৎ দেখছি।

আচ্ছা, বেশ, তোমার অনুমানই যদি ঠিক হয়, তাতেই বা কি? আমি ভালো কাজে তোমার সাহায্য চাইতে এসেছি, নিজের আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে তো আসি নাই? আর যদি ভেবে থাক যে চাঁদা দিয়ে লোকের সুখ্যাতি ছাড়া অন্য কিছু পাবে, তবে ভুল করেছ।

খান্না পরাস্ত হইল। ও এমন সংকীর্ণ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে; যেখানে নড়াচড়া করিবারও জায়গা নাই। ও কি সাহস করিয়া বলিতে পারে, তোমার পিছনে আমি যে হাজার হাজার টাকা ঢালিয়াছি, তার কি এই পুরস্কার? লজ্জায় উহার মুখ এতটুকু হইয়া গেল, কোন মতে বলিল, আমি তা বলিনি মালতী, তুমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছ।

পরিহাসের সুরে মালতী বলিল, ঈশ্বর করুন, আমার যেন ভুলই হয়। কেন না আমি যদি সব সত্যি বলে জেনে নিই তবে তো তোমার ছায়াও মাড়াতে পারি না। আমার রূপ আছে। আমার বহু প্রার্থীর মধ্যে তুমি এক জন। তোমার ওপর একটু সদয় ছিলাম তাই যেখানে অন্যের উপহার ফেরৎ দিয়েছি, সেখানে তোমার সামান্য জিনিসও ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। আমার টাকার দরকার পড়লে তোমার কাছে চেয়েও নিয়েছি। টাকার

অহঙ্কারে আমার সেই ধন্যবাদের যদি তুমি অন্য কিছু অর্থ ধরে থাক তার জন্যে আমি তোমাকে ক্ষমা কোরতে প্রস্তুত আছি। পুরুষের স্বভাবই এই, তাতে নিন্দার কিছু নাই। তবে এটুকু জেনে রেখ, আজ পর্যন্ত টাকায় কেউ মেয়েদের হৃদয় জয় কোরতে পারে নাই, পারবেও না।

উহার এক একটি কথায় খান্না যেন এক এক গজ নীচে ধ্বসিয়া পড়িতে লাগিল। আর আঘাত সহিবার সাহস উহার নাই। লজ্জিত হইয়া সে বলিল, মালতী, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় আর অপমান করো না। আর বেশি কিছু না থাক, বন্ধুতাটুকু রাখতে দাও।

এই বলিয়া ও দেরাজ হইতে চেক বই বাহির করিয়া তাহাতে এক হাজার টাকা লিখিয়া দিয়া ভয়ে ভয়ে চেকটি মালতীর হাতে দিল।

চেক হাতে লইয়া নিষ্ঠুর ব্যঙ্গভরে মালতী বলিল, আমার আচরণের দাম, না, ব্যায়ামশালার চাঁদা ?

সজল চোখে খান্না বলিল, আমায় রেহাই দাও মালতী। কেন আমার মুখে আর কালি মাখাচ্ছ ?

মালতী জোরে হাসিয়া বলিল, দেখ, গালও দিলাম আবার হাজার টাকা আদায়ও করে নিলাম। তুমি আর কখনো এরকম অভদ্রতা কোরবে ?

কখনো নয়, প্রাণ থাকতে নয় !

কান মল।

তাই মলছি। তবে দয়া করে তুমি এখন যাও, আর আমাকে নির্জনে বসে একটু ভাবতে আর কাঁদতে দাও। আজ তুমি আমার জীবনের সব আনন্দ…

মালতী আরো জোরে হাসিয়া উঠিল—দেখ খান্না, তুমি আমায় ভারি অপমান করেছ। তুমি কি জান না, রূপ অপমান সইতে পারে না ? আমি তোমার সঙ্গে কত ভাল ব্যবহার করেছি, আর তুমি কিনা এমন খারাপ মনে করলে ?

চক্ষু দুইটিতে বিদ্রোহ ভরিয়া খান্না বলিল, তুমি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছ, না, উলটো ছুরিতে আমার গলা কেটেছ ?

কেন, আমি না তোমাকে লুটে পুটে নিজের ঘর ভরে তুলেছি ! সেই লুট থেকে তুমি তো বেঁচে গেছ।

কেন আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দাও মালতী ? আমিও তো মানুষ !

মালতী এমনভাবে উহার দিকে চাহিল যেন বুঝিয়া দেখিতে চায়, সত্যই খান্না মানুষ না আর কিছু।

আমি তো মানুষের কোন লক্ষণ দেখছি না।

আজ আমি নিশ্চিত বুঝছি তুমি এক নম্বরের।

হাঁ, তোমার কাছে তাই, আর তাই থাকবো।

এই কথা বলিয়াই পক্ষীর মত ফুরুত করিয়া উড়িয়া মালতী চলিয়া গেল, আর খান্না মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল, একি ওর লীলা, না, এ-ই ওর সত্যকারের রূপ !

## ২৩

গোবর ও ঝুনিয়া চলিয়া গেলে ঘর খাঁ খাঁ করিতে লাগিল। ধনিয়ার বারে বারে মুন্নুর কথা মনে পড়ে। শিশুর মা তো ছিল ঝুনিয়া; কিন্তু তাহাকে মানুষ করিত ধনিয়াই। সেই তাহার গায়ে তেলহলুদ মাখাইত, চোখে কাজল দিত, উহাকে ঘুম পাড়াইত আর কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে উহাকে আদর করিত। বাৎসল্যের এই নেশাই তাহাকে দুঃখের কথা ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। শিশুর ঢলঢলে মাখনের মত মুখ দেখিয়া সে আপনার সমস্ত চিন্তা ভুলিয়া যাইত। আর স্নেহময় গর্বে তাহার হৃদয় ফুলিয়া উঠিত। জীবনের সেই অবলম্বন এখন আর নাই। উহার শূন্য ছোট খাটলির দিকে চাহিলে তাহার কান্না পাইত। ওই ছিল কবচ, সমস্ত চিন্তা ও দুরাশা হইতে তাহাকে রক্ষা করিত, সে কবচ তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া গেল। বার বার মনের মধ্যে তোলপাড় করিত, ঝুনিয়ার সঙ্গে সে এমন কি দুর্ব্যবহার করিয়াছিল যাহার সে এই দণ্ড দিল! ডাইনী আসিয়া তাহার সোনার সংসার ছারখার করিয়া দিয়াছে। গোবর তো কখনো তাহার কথার জবাবও দেয় নাই। এই ছুঁড়ি তাহাকে গাঁথিয়াছে, আর সেখানে লইয়া গিয়া না জানি কত নাচাইবে। এখানেই বাচ্চাকে সে যত্ন করিত বিস্তর! সে তো নিজের পোষাক, চোখে কাজল পরা, চুল বাঁধা প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত থাকিত, সময় পাইত না। ছেলেকে দেখা-শুনা করিবে কি? বেচারা হয়তো একলা মাটির উপরে পড়িয়া কাঁদিতেছে। এখানে একদিনও সে সুখে থাকিতে পারে নাই—কখনও কাসি,

কখনও পেটের অসুখ, কখনও এটা, কখনও সেটা। এই সব ভাবিয়া ঝুনিয়ার উপর তাহার রাগ হইত। গোবরের প্রতি এখনও তাহার মনে আগের মত মমতা ছিল। এই ডাইনীই উহাকে কিছু খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া বশ করিয়াছে। এমন ধারা মায়াবিনী যদি না-ই হইবে, তা হইলে এমনধারা ব্যাপার ও করিবে কেমন করিয়া? কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত না, ভাজদের লাথি খাইত। এই বেকুবটাকে পাইয়াছে, অমনই আজ রানী হইয়া বসিয়াছে।

হরি চটিয়া বলিল—যখনই বল তখনই ঝুনিয়ার দোষ দাও। একথা বোঝ না যে নিজের সোনা খারাপ, তো স্যাকরার কি দোষ? গোবর যদি ওকে না নিয়ে যেত, তাহলে কি নিজে নিজে ও চলে যেত? শহরের ভাত পেটে গেলে ছোকরাদের চোখ যায় ঘুরে। এমনি ভাবে জিনিসটা দেখ না কেন?

ধনিয়া গর্জিয়া উঠিল—আচ্ছা, চুপ কর। তুমি তো বিধবা ছুঁড়িকে মাথায় চড়িয়েছিলে, নইলে আমি প্রথম দিনই ঝাঁটা মেরে বিদায় করে দিতাম।

খামারে কাজকর্ম জমা হইয়া ছিল। হরি বলদ দুটিকে লইয়া ধান মাড়িতে যাইতেছিল। পিছনে মুখ ফিরাইয়া বলিল—মানলাম, বৌ গোবরকে গেঁথে ফেলেছে, তা তুই এত রাগছিস কেন? সকলে যা করে গোবরও তাই করেছে। এখন ওর ছেলেপুলে হচ্ছে। আমার ছেলেপুলের জন্য কেন নিজের অসুবিধা করবে, কেন আমার মাথার বোঝা নিজের মাথায় রাখবে!

তুমিই সব গোলমালের মূল।

তবে আমাকেও বের করে দে। নিয়ে যা বলদগুলো, ধান মাড়াই কর। আমি বসে বসে হুঁকোয় টান দিই।

তুমি গিয়ে যাঁতা ঘুরাও, আমি ধান মাড়াই করি।

হাসি-ঠাট্টার মধ্যে দুঃখ উড়িয়া গেল। ইহাই তাহার ঔষধ। ধনিয়া খুসি মনে রূপার চুল বাঁধিতে বসিল, চুলগুলো একেবারে এলোমেলো হইয়া পড়িয়াছিল। আর হরি গেল খামারে। সরস বসন্ত, সুগন্ধ ও মনের ফুর্তি আর জীবনের ঐশ্বর্য লুটাইতেছিল, দুই হাতে, প্রাণ খুলিয়া। আমের ডালে লুকাইয়া কোকিল নিজের সরস প্রাণস্পর্শী মধুর কুহুধ্বনিতে আশা জাগাইয়া ফিরিতেছিল। মহুয়ার ডালে ডালে ময়নার যেন নিমন্ত্রণ সভা বসিয়াছিল। নিম, শিরিষ আর করঞ্জা নিজেদের গন্ধে যেন মাতাল করিয়া তুলিতেছিল। হরি

যখন আম বাগানে পৌছিল, তখন গাছের নীচে নীচে যেন তারা ফুটিয়া উঠিল, আর তাহার ব্যথিত নিরাশ মনও এই বিস্তীর্ণ শোভা আর স্ফূর্তির মধ্যে পড়িয়া গাহিতে লাগিল—

হিয়া জরত রহত দিন-রেন।

আমকী ডরিয়া কোয়ল বোলে তনিক ন আবত চৈন।

দিনরাত হিয়া ব্যথায় জীর্ণ হইতেছে। আমের ডালে কোকিল ডাকিয়া যাইতেছে, একটুও শান্তি আসে না।

সামনে দিয়া আসিতেছে দুলারী সাহুয়াইন, তাহার পরনে গোলাপী শাড়ী। পায়ে মোটা চাঁদির কড়, গলায় মোটা সোনার হাঁসুলি, চেহারা শুকনো কিন্তু প্রাণ তাজা। এমন সময় ছিল, যখন হরি খেত-খামারে তাহার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করিত। ও ছিল সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ, হরি হইত দেওর। এই সম্পর্ক লইয়া দুজনের মধ্যে ঠাট্টা চলিত। যেদিন সাহজী গেল মরিয়া, সেইদিন হইতে দুলারী ঘর হইতে বাহির হওয়া ছাড়িয়া দিল। সমস্ত দিন দোকানে বসিয়া থাকিত, আর বসিয়া বসিয়াই সমস্ত গাঁয়ের খোঁজ খবর লইত। কোথাও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হইলে মধ্যস্থতা করিতে সাহুয়াইন অবশ্য আসিয়া পৌছিত। টাকায় এক আনার কম সুদে সে টাকা ধার দিত না। আর যদিও সুদের লোভে মূলও হাতে আসিত না, টাকা যে লইত সে তাহা খাইয়া বসিয়া থাকিত—তবু ব্যাজের হার যেমনকার তেমনই থাকিত। বেচারা উশুল করে কি করিয়া? নালিশ-ফরিয়াদ নয়, থানা-পুলিশ নয়, কেবল জিভের বলে; কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জিভের তেজ যেমন যেমন বাড়িতেছিল, তাহার দংশন তেমনই কমিতেছিল। এখন তাহার গালি খাইয়া লোকে হাসিয়া ফেলে, ঠাট্টা করিয়া বলে—কি করবে টাকা নিয়ে কাকি, সঙ্গে তো এক কড়িও নিয়ে যেতে পারবে না। গরিবকে খাইয়ে-দাইয়ে যতটা আশীর্বাদ পেতে পার কুড়িয়ে নাও। পরলোকে ঐটাই আসবে কাজে।—দুলারী পরলোকের নামে জ্বলিতে থাকে।

হরি ঠাট্টা আরম্ভ করিল—আজ তো বৌঠান, সত্যি তোমাকে জোয়ান মনে হচ্ছে।

সাহুয়াইন আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিল—আজ শুভদিন, নজর দিও না। এইজন্যই কিছু পরি-টরি না। বাড়ি থেকে বেরুলেই সকলে চার ধারে ঘুরতে

থাকে, কেউ যেন মেয়ে দেখে নাই কোন দিন। পটেশ্বরী লালার পুরানো কথা এখনও ফুরায় নাই।

হরি দাঁড়াইয়া গেল, বড় রসাল প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। বলদ আগে আগে চলিয়া গেল।

ও তো আজকাল খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে। দেখছ না, প্রতি পূর্ণিমায় ও সত্যনারায়ণের কথা শোনে, আর দুবেলা মন্দিরে যায় দর্শন করতে।

এমনি ধারা লম্পট যারা, সকলেই বুড়ো বয়সে ভক্ত হয়ে পড়ে। কুকর্মের প্রাচিত্তির তো করতেই হয়। জিজ্ঞাসা কর, আমি এখন যে বুড়ী হয়েছি, আমাকে দেখে ও কি হাসে!

তুমি এর মধ্যে বুড়ী হয়ে গেলে কি করে বৌঠান? আমার তো এখনও···

আচ্ছা চুপ চুপ, নইলে এক ঝুড়ি গাল দেব। ছেলে বিদেশে রোজগার করছে, একদিন নেমন্তন্নও খাওয়ালে না, শুধু শুধু বৌঠান বলতে ওস্তাদ।

আমার দিব্যি বৌঠান, আমি ওর রোজগারের এক পয়সাও ছুঁই নাই। কি আনল, কি খরচ করল, কিছুই জানি না, আমি কোনও খবরই পাই না। ব্যস, একজোড়া ধুতি আর একটা পাগড়ি আমার হাতে এসে পৌছল।

ভাল রোজগার করছে তো, আজ না হয় কাল ঘর সামলাবে। ভগবান ওকে সুখে রাখুন। আমার টাকাও কিছু কিছু দিতে থাকো। সুদ তো বেড়েই যাচ্ছে।

তোমার পাই পয়সা পর্যন্ত দিয়ে দেব বৌঠান, হাতে পয়সা আসতে দাও। আর যদি খেয়েই ফেলি, তাহলে বাইরের লোক তো নই, তোমারই তো আপনার জন।

সাহুয়াইন এমনি ধারা আমুদে কথাবার্তায় নিরস্ত্র হইয়া যাইত। মুচকি হাসিয়া নিজের গন্তব্যপথে প্রস্থান করিল। হরি এক দৌড়ে বলদের কাছে আসিয়া পৌছিল, আর তাহাদের যথাস্থানে লইয়া ঘুরাইতে লাগিল। সমস্ত গাঁয়ে ঐ একটি খামার। কোথাও মাড়াই হইতেছে, কোথাও ধান ঝাড়া হইতেছে, কোথাও ধান ওজন করা হইতেছে। নাপিত, ছুতার, কামার, পুরোহিত, ভাট, ভিখারি সকলে নিজের নিজের ভাগ লইবার জন্য একত্র হইয়াছিল। এক গাছের তলায় ঝিংগুরী সিংহ খাটিয়ার উপর বসিয়া নিজের পাওনা বুঝিয়া লইতেছিল। কয়েকজন ব্যবসায়ী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ধানের

দর-দস্তুর করিতেছিল। সমস্ত খামারে বাজারের মত হৈ-চৈ হইতেছিল। একজন 'বড়ুই' ও ভুট্টা বিক্রি করিতেছিল, আর একজন ধামা করিয়া তেলে ভাজা মিঠাই ও জিলিপি লইয়া ফিরি করিতেছিল। পণ্ডিত দাতাদীনও হরির কাছ থেকে ধান ভাগ করিয়া লইবার জন্য আসিয়া পৌছিল ও ঝিংগুরী সিংহের সঙ্গে খাটিয়ার উপর বসিল।

দাতাদীন সুর্তি টিপিতে টিপিতে বলিল—বলি শুনেছ কিছু, সরকারও নাকি মহাজনদের বলছেন যে সুদের হার কমিয়ে দাও, নইলে ডিক্রী পাবে না।

ঝিংগুরী খৈনি লইয়া বলিল—পণ্ডিত, আমি তো একটা কথা বুঝি। তোমার গরজ থাকলে একশ বার আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিতে আসবে, আর আমি যে ব্যাজ চাইব তাই নেব। সরকার যদি প্রজাদের টাকা দেবার কোন বন্দোবস্ত না করেন, তাহলে এই আইনে আমাদের কিছু হবে না। আমরা দর কম লেখাব; কিন্তু এক শ টাকার মধ্যে পঁচিশ টাকা প্রথমেই কেটে নেব। সরকার তার আর কি করতে পারে?

এ কথা তো ঠিক; তবে সরকারও এ কথা খুব বোঝে। এরও কোন কাটান বেরোবে, দেখে নিও।

এ কেউ মারতেই পারে না।

আচ্ছা, যদি ওরা সর্ত করে দেয়, যতক্ষণ স্ট্যাম্পের ওপর গাঁয়ের প্রধান বা গোমস্তার দস্তখত না হয়, ততক্ষণ সেটা পাকা নয়; তখন কি করবে?

প্রজার একশ বার গরজ হবে, প্রধানের হাতে পায়ে ধরে দস্তখত করিয়ে নেবে। আমি তো সিকি ভাগ কেটেই নেব।

আর যদি ফেঁসে যাও! জাল হিসাব লিখে চোদ্দ বছরের জন্য গেলে।

ঝিংগুরী সিংহ জোরে হাসিয়া উঠিল—তুমি কী বলছ পণ্ডিত, সংসার কি তবে বদলে যাবে? যার কাছে পয়সা, তারই কাছে ন্যায়, তারই কাছে আইন। আইনে তো বলে যে মহাজন কোনও প্রজার সঙ্গে কড়াক্কড়ি না করে, জমিদার কোনও চাষীর সঙ্গে জবরদস্তি না করে, কিন্তু হচ্ছে কি? রোজই তো দেখছ। জমিদার পিছমোড়া করে বেঁধে পেটায়, আর মহাজন কথা কয় লাথি আর জুতো দিয়ে। যে চাষী শক্ত, তাকে না ডাকে জমিদার, না ডাকে মহাজন। এরকম লোকের সঙ্গে আমরা মিশি, আর তাদেরই সাহায্যে অন্য লোকদের ঘাড়ে চড়ি।

তোমাকে নিয়েই রায়সাহেবের পাঁচ শ টাকা আদায় হয়েছে; কিন্তু নোখেরামের এতখানি সাহস আছে কি যে তোমাকে কিছু বলে? সে যে জানে, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই তার ভাল। কোন প্রজার মধ্যে এতখানি বল আছে যে রোজ রোজ আদালতে ছোটে! সমস্ত সংসার যেমন চলছিল তেমনি চলবে। কাছারি-আদালত তারই পক্ষে, যার কাছে আছে পয়সা। আমাদের ঘাবড়ানোর কোন কথাই নাই।

এই বলিয়া সে খামারবাড়িতে এক চক্কর লাগাইয়া আসিল, ফিরিয়া আসিয়া খাটিয়ার উপর বসিতে বসিতে বলিল—হ্যাঁ, মতই-এর বিয়ের কি হল? আমার তো পরামর্শ, ওর বিয়ে দিয়ে দাও। এখন তো ভারি বদনাম হচ্ছে।

দাতাদীন যেন তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। এই কথার লক্ষ্য কি, তাহা সে খুবই জানিত। গরম হইয়া বলিল—আড়ালে লোকে যা বলে বলুক, আমার মুখের উপর কেউ কিছু বলুক তো, তার গোঁফ উপড়ে নেব। আমার মত নিয়মে কেউ থাকুক তো। কত লোককে জানি, কখনো সন্ধ্যাবন্দনা করে না, তাদের ধর্মেও মন নাই, কর্মও তারা চায় না; না চায় কথা শুনতে, না চায় পুরাণ পড়তে; তারাও নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়! আমাদের কথা নিয়ে কারা কি হাসবে? আমরা জীবনে একটা একাদশী বাদ দিই নাই, কখনো স্নান পূজা না করে মুখে জল দিই নাই। নিয়ম মেনে চলা কঠিন। কেউ বলুক দেখি যে আমি কখনও বাজারের কোনও জিনিস খেয়েছি, কি অন্য কারুর হাতে জল খেয়েছি, তাহলে তার পায়ের ধূলো হয়ে থাকব। সিলিয়া আমার চৌকাঠ পার হতে পারে না, চৌকাঠ; বাসন-টাসন ছোঁয়া তো পরের কথা। আমি বলি না যে মতই এ খুব ভাল কাজ করছে, কিন্তু একবার যখন একটা কথা হয়ে গেছে তখন মেয়েমানুষকে ছেড়ে দেওয়া পাজির কাজ। আমি তো খোলাখুলি বলে দিচ্ছি, এর মধ্যে লুকোবার কোনও কথা নাই। স্ত্রীজাতি পবিত্র।

দাতাদীন যৌবনে নিজে খুব রসিক পুরুষ ছিল, কিন্তু শুদ্ধাচার হইতে কখনও ভ্রষ্ট হয় নাই। মাতাদীনও সুযোগ্য পুত্রের মত তাহার পদচিহ্ন ধরিয়া চলিতেছিল। ধর্মের মূলতত্ত্ব হইল পূজা-পাঠ, ব্রত-কথা আর হাঁড়ি-কুঁড়ি। পিতাপুত্র দুইজনেই যখন মূল তত্ত্ব ধরিয়া আছে, তখন কাহার এত জোর যে তাহাদের পথভ্রষ্ট বলিতে পারে?

ঝিংগুরী সিংহ হার মানিয়া বলিল—আমি তো ভাই যা শুনেছি তাই তোমাকে বলে দিয়েছি।

দাতাদীন, মহাভারত ও পুরাণ হইতে ব্রাহ্মণের দ্বারা অন্য জাতির কন্যা গ্রহণ করার এক দীর্ঘ তালিকা পেশ করিল, আর প্রমাণ করিয়া দিল যে এরূপ বিবাহে উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিত, আজকালের ব্রাহ্মণেরা তাহাদের সন্তানের সন্তান। এই প্রথা আদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ইহাতে লজ্জার কোনও কারণ নাই।

ঝিংগুরী সিংহ তাহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া বলিল—তবে আজকাল লোকে বাজপেয়ী ও সুকুল হয়ে ফেরে কেন?

এক এক কালের এক এক প্রথা আর কি! এ কালে কারু অতটা তেজ থাকুক তো! বিষ খেয়ে হজম করা চাই। সে ছিল সত্যযুগের কথা, সত্যযুগের সঙ্গে চলে গেছে। এখন তো দিন চলে বেরাদরির সঙ্গে মিলেমিশে থেকে; কিন্তু করি কি, কোনও মেয়ের বাপ আসেই না। তোমাকেও বলেছি, অন্য লোকদেরও বলেছি, কেউ শোনে না, তো আমি কি মেয়ে তৈরি করব?

ঝিগুরী সিংহ ধমক দিল—মিছে বকো না পণ্ডিত, আমি তো দুজনকে ফুঁসলে এনেছিলাম; তা তুমি গাল ফুলিয়ে রইলে, তারা দুজন কান খাড়া করে শুনে পালিয়ে গেল। আর তুমি হাজার পাঁচ শ চাও কি অজুহাতে? দশ বিঘা ক্ষেত আর ভিক্ষা ছাড়া তোমার আছে কি?

দাতাদীনের অভিমানে ঘা লাগিল। দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—আমার কাছে কিছু নাই, সে কথা ঠিক, আমি ভিখ মেগেই বেড়াই; কিন্তু আমার নিজের মেয়েদের বিয়েতে পাঁচ পাঁচ শ দিয়েছি; তবে ছেলের জন্য পাঁচ শ টাকা চাইব না কেন? কেউ যদি বিনে পয়সায় আমার মেয়েদের ঘরে নিয়ে নিত, তাহলে আমিও অমনি ছেলের বিয়ে দিতাম। মর্যাদার কথা থাক। তুমি যজমানিকে মনে কর ভিক্ষা, আমি তো ওকে জমিদারি মনে করি, ব্যাঙ্ক মনে করি। জমিদারি ফুরিয়ে যায়, ব্যাঙ্ক ভেঙ্গে যায়, কিন্তু যজমানি টিঁকে থাকবে শেষ পর্যন্ত। যত দিন হিন্দু জাতি থাকবে, তত দিন ব্রাহ্মণও থাকবে, যজমানিও থাকবে। ক্রিয়াকর্মে বিনা শ্রমে ঘরে বসে এক শ দু শ টাকা আদায় করে নেয়; কখনো কপাল খুলে যায়, তো চার পাঁচ শ মেরে দেয়। কাপড়-চোপড়, বাসন-কোসন, খাওয়া-দাওয়া আলাদা। কোথাও না কোথাও রোজই

শুভ কর্ম কিছু লেগেই আছে। কিছু না পেলে অন্তত তুই একখানা থালা আর দু চার আনা দক্ষিণা পাওয়াই যায়। এতখানি আরাম না জমিদারিতে আছে, না মহাজনিতে। আমার আবার সিলিয়া থেকে যতখানি কাজ হয়, বামুনের মেয়ের থেকে ততখানি হবে কি করে? সে তো বৌ সেজে বসে থাকবে। বড় জোর রুটি গড়ে দেবে। সিলিয়া একা তিন জনের কাজ করে। আর আমি রুটি ছাড়া ওকে আর কি দিই! খুব বেশি হয় তো বছরে একখানা কাপড় দিই।

অন্য একটা গাছের তলায় দাতাদীনের নিজের ধান রাখা ছিল। চারটা বলদ দিয়া মাড়াই হইতেছিল। ধন্না চামার বলদদের চালাইতেছিল, সিলিয়া ধান বাহির করিয়া করিয়া ঝাড়িতেছিল, আর মাতাদীন অন্য দিকে বসিয়া লাঠিতে তেল মাখাইতেছিল।

সিলিয়া ছিল শ্যামবর্ণ, সুন্দরী, শ্রীমন্ত মেয়ে, রূপবতী না হইলেও মনে ধরিবার মত। তাহার হাসিতে, দৃষ্টিতে, অঙ্গের বিলাসে আনন্দের উন্মাদনা ছিল, সেই জন্য তাহার প্রতি অঙ্গ নাচিতেছিল। মাথা হইতে পা পর্যন্ত ভূষির গুঁড়া, ঘামে শরীর একেবারে ভিজা, মাথার চুল অর্ধেক খোলা, সে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া ধান মাড়িতেছিল, যেন সারা মনপ্রাণ দিয়া সে কোনও খেলা খেলিতেছে।

মাতাদীন বলিল—আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত যেন ধান বাকি না থাকে সিলিয়া। তুই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিস তো আমি আসব? সিলিয়া প্রসন্ন মুখে বলিল—তুমি আসবে কেন পণ্ডিত? আমি সন্ধ্যা নাগাদ সব শেষ করে রাখব।

আচ্ছা, আমি তা হলে ধান বয়ে নিয়ে রেখে আসি। তুই একলা নিবি কি করে?

তুমি ভয় পাও কেন, আমি একাই সব পারব। এক প্রহর রাতের মধ্যে এখানে একটা দানাও পড়ে থাকবে না।

দুলারী সাহুয়াইন আজ নিজের পাওনা উশুল করিয়া ফিরিতেছে। সিলিয়া তাহার দোকান হইতে হোলির দিন দুই পয়সার গোলাপী রং আনিয়াছিল। এখনও পয়সা দেয় নাই। সিলিয়ার কাছে আসিয়া সে বলিল—কি রে সিলিয়া, এক মাস হল রং এনেছিস, এখনও পয়সা দেবার নাম নেই। চাইছি, তো দৃষ্টি হেনে চলে যাচ্ছিস। আজ আমি পয়সা না নিয়ে যাব না।

মাতাদীন চুপ করিয়া এক দিকে সরিয়া গেল। সিলিয়ার শরীর ও মন দুই-ই

লইয়াও তাহার বদলে কিছু দিতে সে রাজি নয়। তাহার দৃষ্টিতে সিলিয়া এখন শুধু কাজ করিবার যন্ত্র, আর কিছু নয়। সিলিয়ার মমতার সুযোগ লইয়া সে কৌশলে তাহাকে নাচাইয়া বেড়াইত।

সিলিয়া চোখ উঠাইয়া দেখিল, মাতাদীন সেখানে নাই। বলিল—চিৎকার কোরো না সাহুয়াইন, এই নাও দুইয়ের জায়গায় চার পয়সার ধান। এখন কি জানে প্রাণে মারবে? অত সহজে মরে যাচ্ছি না।

সে আন্দাজ করিয়া প্রায় এক সের ধান স্তূপ হইতে লইয়া সাহুয়াইনের প্রসারিত অঞ্চলের উপর ফেলিয়া দিল। অমনি মাতাদীন গাছের আড়াল হইতে লাফাইয়া বাহির হইল, আর সাহুয়াইনের আঁচল ধরিয়া বলিল—ভাল চাও তো ধান রেখে যাও সাহুয়াইন, এ লুটের মাল নয়।

চোখ লাল করিয়া সে আবার সিলিয়ার দিকে তাকাইয়া দিল এক ধমক—তুই ধান দিলি কেন? কাকে জিজ্ঞাসা করে দিলি? আমার ধান দেওয়ার তুই কে?

সাহুয়াইন ধান স্তূপে ঢালিয়া দিল, আর সিলিয়া হকচকিয়া গিয়া মাতাদীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। মনে হইল, যে ডালের উপর নিশ্চিন্ত হইয়া সে বসিয়াছিল, তাহা গিয়াছে ভাঙ্গিয়া, আর এখন সে আশ্রয়হীন হইয়া নীচে পড়িয়া যাইতেছে। ক্রুদ্ধ মুখে জলভরা চোখে সে সাহুয়াইনকে বলিল—তোমার পয়সা পরে দেব সাহুয়াইন, আজ আমায় ছেড়ে দাও।

সাহুয়াইন দয়ার্দ্র চক্ষে তাহার দিকে তাকাইল, আর ধিক্কারভরা দৃষ্টিতে মাতাদীনের দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল।

তখন সিলিয়া ধান ঝাড়িতে ঝাড়িতে আহত গর্বে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার জিনিসে আমার কোনই একতিয়ার নাই?

মাতাদীন চোখ পাকাইয়া বলিল—না, তোর কোনই একতিয়ার নাই। কাজ করিস, খাস। তুই যে ভাবছিস, খাবি আর লুঠ করবি, তা সে এখানে হবে না। এতে তোর না পোষালে আর কোথাও গিয়ে কাজ কর। মজুরের অভাব নাই। অমনি অমনি কাজ নিই না, খেতে পরতে দিই।

সিলিয়া সেই পক্ষীর মত মাতাদীনের দিকে চাহিয়া দেখিল, মালিক যাহার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া পিঁজরা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে। সে দৃষ্টিতে বেদনা বেশি ছিল, না ভর্ৎসনা, বলা কঠিন। কিন্তু সেই পক্ষীর মত তাহার মন ধড়ফড়

করিতেছিল, আর উঁচা ডালের উপর, উন্মুক্ত বায়ুমণ্ডলে উড়িবার শক্তি না পাইয়া সেই পিঁজরায়ই বসিতে চাহিতেছিল ; তা সে দানাপানি বর্জিত অবস্থায় পিঁজরার শিকে মাথা ঠুকিয়া মরুক না কেন, তাহাও স্বীকার। সিলিয়া ভাবিতেছিল, এখন তাহার আর জায়গা কোথায় ? বিবাহিত না হইয়াও সংস্কারে, ব্যবহারে ও মনোভাবে সে বিবাহিতই ছিল। মাতাদীন চাই এখন উহাকে মারুক আর কাটুক, তাহার দ্বিতীয় আশ্রয় নাই, দ্বিতীয় অবলম্বন নাই। আজ তাহার মনে পড়িল—এখনও তো দুই বৎসর হয় নাই যে মাতাদীন তাহার খোসামোদ করিত, পৈতা হাতে বলিত—সিলিয়া, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে তোকে বিয়ে-করা স্ত্রীর মতই রাখব ; প্রেমাতুর হইয়া গোচর জমিতে, বাগানে, নদীর ধারে, তাহার পিছনে পিছনে পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইত। আর আজ তাহার এই নিষ্ঠুর ব্যবহার ! এক মুঠা ধানের জন্যে তাহার অপমান করিল !

সে কোন জবাব দিল না। গলায় এক ডেলা নুনের মত কি যেন আটকাইয়া আছে মনে করিতে করিতে আহত হৃদয়ে শিথিল হস্তে সে আবার কাজ করিতে শুরু করিল।

তখনই তাহার মা, বাপ, দুই ভাই আর অন্য চামারেরা না জানি কোথা হইতে আসিয়া মাতাদীনকে ঘিরিয়া ফেলিল। সিলিয়ার মা আসিয়াই তাহার হাত হইতে ধানের টুকরি কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিল, আর গালি দিয়া বলিল—রাঁড়, যদি তোর মজুরি-ই করতে হবে তবে ঘরের মজুরি ছেড়ে এখানে কেন মরতে এলি ? যদি বামুনের সঙ্গে আছিস, তবে বামুনের মতই থাক। সমস্ত কুটুমের নাক কাটিয়ে চামারনী হয়েই যদি থাকতে হয়, তবে এখানে কি ঘিয়ের মিঠাই নিতে এসেছিলি ? জলে ডুবে মরলি না কেন ?

ঝিংগুরী সিংহ আর দাতাদীন দুইজনে দৌড়াইয়া আসিল, চামারদের এই পরিবর্তিত ভ্রুকুটি দেখিয়া তাহাদের শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সিলিয়ার বাপকে ঝিংগুরী সিংহ জিজ্ঞাসা করিল—কি ব্যাপার হে চৌধুরী, ঝগড়া কিসের ?

সিলিয়ার বাপ হরখু ষাট বৎসরের বুড়া, কালো, রোগা, শুকনা মরিচের মত কুঁচকাইয়া গিয়েছে ; কিন্তু তেমনি ঝাল !—বলিল, ঝগড়া কিছু নয় ঠাকুর, আমরা আজ হয় মাতাদীনকে চামার বানিয়ে ছাড়ব, নয় তো তার আর আমাদের রক্ত এক করে দেব। সিলিয়া মেয়ের জাত, কারো না কারো ঘরে তো যাবেই।

সে কথায় আমাদের কিছু বলবার নাই ; কিন্তু ওকে যেই রাখুক, আপনার করে রাখুক। তোমরা আমাদের বামুন করতে পার না, সোজা আমরা তোমাদের চামার করতে পারি। আমাদের বামুন বানিয়ে দাও, আমাদের সমস্ত জ্ঞাতি কুটুম বামুন হতে রাজি আছে। সে ক্ষমতা যদি না থাকে তবে তোমরাও চামার হও, আমাদের সঙ্গে খাও দাও, আমাদের সঙ্গে ওঠ বস। আমাদের ইজ্জৎ নিচ্ছ তো নিজের ধর্ম আমাদের দাও।

দাতাদীন লাঠি নাড়িয়া বলিল—মুখ সামলে কথা বল্ হরখু! তোর বেটি কাজ দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে ও যেতে চায় নিয়ে যা। আমরা ওকে বেঁধে রাখি নি। কাজ করে, মজুরি নেয়। এখানে মজুরির কিছু কমি নেই।

সিলিয়ার মা আঙ্গুল মটকাইয়া বলিল—বাঃ বাঃ পণ্ডিত, খুব ধর্মের কথা বলছ। তোমার মা কোনও চামারের সঙ্গে বেরিয়ে যেত আর তুমি এমনি কথা বলতে তো দেখতাম। আমি চামার, তাই বুঝি আমার কোন ইজ্জৎই নাই! আমি সিলিয়াকে একলা নিয়ে যাব না। তার সঙ্গে মাতাদীনকেও নিয়ে যাব, যে তার ইজ্জৎ নষ্ট করেছে। তুমি না বড় নিয়মে থাক? ওর সঙ্গে শোবে, কিন্তু ওর হাতের জল খাবে না! ও ডাইন বলেই এত সব সহ্য করে। আমি তো এরকম লোককে বিষ খাইয়ে মারতাম।

হরখু তাহার সঙ্গীদের হাঁক দিল—এদের কথা শুনছ তো? এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে তাকাচ্ছ কি?

এই কথা শুনিয়াই দুই জন চামার লাফাইয়া মাতাদীনের হাত ধরিয়া ফেলিল, আর এক জন ঝাঁ করিয়া তার পৈতা ছিঁড়িল, আর দাতাদীন ও ঝিংগুরী সিংহ তাহাদের লাঠি সামলাইতে না সামলাইতে দুই জন চামার মাতাদীনের মুখে একটা বড় মত হাড়ের টুকরা ফেলিয়া দিল। মাতাদীন দাঁতে দাঁত লাগাইয়া রহিল, তবু তো ঐ ঘৃণিত বস্তু তাহার ঠোঁটে লাগিয়া গেল। সে পাগলের মত হইয়া গেল, মুখ নিজ হইতে খুলিয়া গেল, আর হাড্‌ডি গলা পর্যন্ত পৌঁছিল। ততক্ষণে খামারের সকলে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই ধর্মলুণ্ঠনকারীদের কেহ বাধা দিল না। মাতাদীনের ব্যবহার সকলেরই অপছন্দ ছিল। গাঁয়ের বৌঝিদের পিছনে পিছনে সে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাই তাহার দুর্গতি দেখিয়া সকলেই মনে মনে খুসি হইল; তবে হাঁ, বাহিরে সকলে চামারদের উপর রাগ দেখাইতে লাগিল।

হরি বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা, অনেক হয়েছে হরখু! ভাল চাও তো এখান থেকেই চলে যাও।

হরখু নির্ভয়ে উত্তর দিল—তোমার ঘরেও মেয়ে আছে হরি মাহাতো, একথা বুঝে দেখ। এই ভাবে গাঁয়ের মান মর্যাদা যদি নষ্ট হতে থাকে, তবে কারু আবরু বাঁচবে না।

এক মুহূর্তে শত্রুর উপর পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়া আক্রমণকারীরা সেখান হইতে চলিয়া যাওয়াই উচিত মনে করিল। জনমত বদলাইতে দেরি লাগে না। তাহা বাঁচাইয়া চলাই ভাল।

মাতাদীন বমি করিতেছিল। দাতাদীন তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—এক এক জনকে পাঁচ পাঁচ বৎসর যদি জেলে না পাঠাই, তবে আমায় বলো। পাঁচ পাঁচ বচ্ছর যাঁতা ঘুরিয়ে আনব।

হরখু জোর গলায় জবাব দিল—তার জন্য কোন দুঃখ নাই। তোমাদের মত বসে বসে তো খাই না! যেখানে গতর খাটিয়ে কাজ করব, সেখানেই আধপেটা দানা পাওয়া যাবে।

মাতাদীন বমি করিবার পর নির্জীবের মত মাটির উপর শুইয়া পড়িল, যেন কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেন ডুবিয়া মরিবার জন্য গণ্ডুষ পরিমাণ জল খুঁজিতেছে। যে মর্যাদার জোরে তাহার রসিকতা, দম্ভ ও পুরুষার্থ লোকের উপর চড়াও হইয়া ফিরিত, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। ঐ হাড্ডির টুকরা শুধু তাহার মুখকে নয়, তাহার আত্মাকেও অপবিত্র করিয়া দিয়াছিল। এই খাওয়া-দাওয়া ছোঁওয়া-ছুঁয়ি বিচারের উপরই তো তাহার ধর্ম টিকিয়া ছিল। আজ সে ধর্মের মূল কাটিয়া গিয়াছে। এখন সে লক্ষ বার প্রায়শ্চিত্ত করুক, লক্ষ বার গোবর আর গঙ্গাজল খাক, লক্ষ বার দান-ধ্যান আর তীর্থ-ব্রত করুক, তাহার নষ্ট ধর্মকে আর জিয়াইতে পারা যাইবে না। একলার কথা হইলে লুকানো যাইত, এখানে তো সকলের সামনে তাহার ধর্ম লুঠ করা হইয়াছে। তাহার মাথা চিরকালের মত হেঁট হইয়া গিয়াছে। আজ হইতে নিজেরই ঘরে তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করা হইবে। তাহার স্নেহময়ী মাতাও তাহাকে ঘৃণা করিবে। আর সংসার হইতে ধর্ম এতখানি লোপ পাইয়াছে যে এতগুলি লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু তামাশা দেখিল, কেহ 'টুঁ' শব্দটি উচ্চারণ করিল না। এক মুহূর্ত পূর্বে যাহারা উহাকে দেখিকামাত্র সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিত, এখন উহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া

লইবে। সে কোন মন্দিরেও যাইতে পারিবে না, কাহারও বাসন-কোসনও ছুঁইতে পারিবে না ; আর এ সমস্তই হইল এই হতভাগী সিলিয়ার জন্য।

যেখানে ধান মাড়াই হইতেছিল সিলিয়া সেখানে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, যেন এ উহারই দুর্গতি। সহসা তাহার মা আসিয়া ধমক দিল—দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, চল, সোজা ঘরে যাই, নইলে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব। বাপদাদার নাম তো খুব উজ্জ্বল করে দিয়েছিস, এখন কি করবি ?

সিলিয়া অচল মূর্তিবৎ দাঁড়াইয়া থাকিল। মাতা পিতা ও ভাইদের উপর তাহার রাগ হইতেছিল। উহারা কেন তাহার কথায় কথা বলে ? ওর যেমন ইচ্ছা তেমনই থাকিবে, অন্যদের সে কথায় কাজ কি ? বলিতেছে, এখানে তোর অপমান হচ্ছে, তাই বলিয়া কি কোনও ব্রাহ্মণ তাহার রান্না খাইবে ? তাহার হাতের জল খাইবে ? এখনই একটু আগে তাহার মন মাতাদীনের নিষ্ঠুর ব্যবহারে খিন্ন হইতেছিল ; কিন্তু নিজের ঘরের লোক ও বেরাদরির এই অত্যাচার ঐ বিরাগকে দিল প্রচণ্ড অনুরাগের রূপ।

বিদ্রোহ-ভরা মনে সে বলিল—আমি কোথাও যাব না। তুই কি এখানেও আমায় বেঁচে থাকতে দিবি না ?

বুড়ি কর্কশ স্বরে বলিল—তুই যাবি না ?

না।

চল সোজা।

যাব না।

তাড়াতাড়ি দুই ভাই তাহার দুই হাত ধরিয়া ফেলিল আর তাহাকে ঘসড়াইতে ঘসড়াইতে নিয়া চলিল। সিলিয়া মাটির উপর বসিয়া পড়িল। তবু ভাইয়েরা ছাড়িল না; ঘসড়াইতেই থাকিল। তাহার শাড়ী ছিঁড়িয়া গেল, পিঠ ও কোমরের ছাল ছড়িয়া গেল, কিন্তু সে যাইতে রাজি হইল না।

হরখু তখন ছেলেদের বলিল—আচ্ছা, একে ছেড়ে দে এখন। মনে করবো, মরে গেছে, কিন্তু এর পর যদি কখনো আমার দরজার গোড়ায় আসে, তবে রক্ত দর্শন করে ছাড়বো।

সিলিয়া প্রাণের ভয় তুচ্ছ করিয়া বলিল—হাঁ, যখন তোমার দরজার গোড়ায় যাব তখন রক্ত দেখো।

ক্রোধের উন্মাদনায় বুড়ি সিলিয়াকে কয়েকটা লাথি লাগাইল, হরখু তাহাকে টানিয়া লইয়া না গেলে হয়তো মারিয়াই ফেলিত।

বুড়ি আবার লাফাইয়া আসিল, তখন হরখু তাহাকে ধাক্কা দিয়া পিছু হটাইতে হটাইতে বলিল—তুই বড় খুনে রে কলিয়া—ওকে কি খুন করেই ফেলবি?

সিলিয়া বাপের পায়ে লুটাইয়া বলিল—মেরে ফেল বাবা, সকলে মিলে মেরে ফেল। হায় রে মা, তুমি এত নির্দয়! এই জন্য দুধ খাইয়ে মানুষ করেছিলে? আঁতুর ঘরে গলা টিপে মেরে ফেলতে পার নাই? হায় হায়! আমার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতকেও তোমরা ভ্রষ্ট করে দিলে! তার ধর্ম নিয়ে তোমাদের লাভ হল কি? এখন তো ও-ও আমায় পুছবে না; পুছুক চাই নাই পুছুক, ওর সঙ্গেই তো থাকব। ও আমায় চাই না খাইয়েই রাখুক, চাই মারুক আর ধরুক, ওর সঙ্গ ছাড়ব না। ওকে এতটা কঠিন দণ্ড দিইয়ে ছেড়ে দেব? মরে যাব তাও স্বীকার, কিন্তু দ্বিচারিণী হব না। এক বার যার হাত ধরেছি তারই থাকব।

কলিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া বলিল—যেতে দাও রাঁড়টাকে। মনে করছে, ওর ভার নেবে এই মাতাদীন, আজই যদি মেরে না তাড়ায় তো আমি এ মুখ দেখাব না।

ভাইদেরও দয়া হইল। সিলিয়াকে ওখানেই রাখিয়া সকলে চলিয়া গেল। তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কঁকাইতে কঁকাইতে খামারে আসিল আর আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দাতাদীন একজনের উপর রাগ অন্যের উপর ঝাড়িল—ওদের সঙ্গে চলে গেলি না কেনরে সিলিয়া! আর কি করবার জন্য রয়ে গেলি? আমার ধর্ম নষ্ট করেও তোর পেট ভরল না!

সিলিয়া সজল নয়নে উপরের দিকে তাকাইল। তাহাতে আগুনের হলকা।

ওদের সঙ্গে যাব কেন? যে হাত ধরেছে, তার সঙ্গে থাকব।

পণ্ডিতজী ধমক দিল—আমার ঘরে পা দিয়েছ কি লাথি মেরে তবে কথা।

সিলিয়াও উদ্দণ্ড ভাবে উত্তর দিল—ও আমাকে যেখানে রাখবে সেখানেই থাকব—গাছতলায় রাখুক, আর মহলেই রাখুক।

মাতাদীন জ্ঞানহারার মত বসিয়াছিল। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে তাহার শরীরের উপর রৌদ্র পড়িতেছিল। মাথা হইতে টস টস করিয়া ঘাম পড়িতেছিল। কিন্তু সে ছিল নিস্পন্দ, মৌন।

যেন হঠাৎ তাহার জ্ঞান হইল, বলিল—আমার এখন তবে কি হবে, বাবা?

দাতাদীন তাহার মাথায় হাত রাখিয়া ভরসা দিতে দিতে বলিল—তোমার কথা আমি এখন কি বলি, বাবা! চল, স্নান কর, খাও। পণ্ডিতেরা পরে যেমন ব্যবস্থা দেবেন তেমনি হবে। হাঁ, একটা কথা; সিলিয়াকে ত্যাগ করতে হবে।

মাতাদীন সিলিয়ার দিকে রক্তচক্ষে চাহিয়া বলিল—আমি আর কখনো ওর মুখ দেখব না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেলে তো আর কোনও দোষ থাকবে না?

প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেলে আর কোনও দোষ পাপ থাকে না।

তবে আজই পণ্ডিতদের কাছে যাও।

আজই যাব, বাবা।

কিন্তু পণ্ডিতেরা যদি বলেন যে এর প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না, তখন?

তাঁদের যা ইচ্ছা।

তা হলে তুমি আমাকে ঘর থেকে বের করে দেবে?

দাতাদীন পুত্রস্নেহে বিহ্বল হইয়া কহিল—তা কি করে হয়, বাবা! ধন যাক, ধরম যাক, লোকমর্যাদা যাক, তাই বলে তোমাকে ছাড়তে পারি না।

মাতাদীন লাঠি উঠাইয়া বাপের পিছনে পিছনে ঘরে চলিল। সিলিয়াও উঠিল, আর ল্যাংড়াইতে ল্যাংড়াইতে তাহার পিছু লইল।

মাতাদীন পিছন ফিরিয়া নির্মম স্বরে বলিল—আমার সঙ্গে আসিস না। আমি তোকে গ্রাহ্যই করি না। এতখানি লাঞ্ছনা করিয়েও তোর পেট ভরে নাই!

সিলিয়া স্পর্ধার সঙ্গে তাহার হাত ধরিয়া বলিল—গ্রাহ্য করবে না কেন? এই গাঁয়ে তোমার চেয়ে ধনী, তোমার চেয়ে সুন্দর, তোমার চেয়ে মানী লোক আছে। আমি তাদের হাত ধরি নাই কেন? তোমার এই দুর্দশাই বা আজ হল কেন? যে রসি তোমার গলায় পড়ে গেছে, লাখো বার চেষ্টা কর তবু তা ছিঁড়তে পারবে না। আর আমি তোমাকে ছেড়ে যাব কোথায়? মজুরি করব, ভিখ মাগব, তবু তোমাকে ছাড়ব না।

এই কথা বলিতে বলিতে সে মাতাদীনের হাত ছাড়িয়া দিল, আবার

খামারে গিয়া ধান ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। হরি এখনও সেখানে ধান মাড়াই করিতেছিল। ধনিয়া তাহাকে খাইবার জন্য ডাকিতে গিয়াছিল। হরি বলদ-গুলা বাহিরে আনিয়া এক গাছে বাঁধিয়া দিল, আর সিলিয়াকে বলিল—তুইও যা সিলিয়া, খেয়ে দেয়ে আয়। ধনিয়া এখানে বসে আছে। তোর পিঠের কাপড় তো রক্তে রাঙ্গা হয়ে গিয়েছে রে। ঘা আবার পেকে না যায়। তোর ঘরের লোকেরা তো ভারি নির্দয়।

সিলিয়া তাহার দিকে করুণ নেত্রে চাহিয়া দেখিল—সংসারে নির্দয় কে নয়, বাবা! আমি তো কাউকে দয়ালু দেখতে পেলাম না।

কি বলল পণ্ডিত?

বলে যে তোমার যা হোক, আমার কিছু আসে যায় না। তোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

বটে! এমন বলছে?

হয়তো মনে করে যে, এমনি করে নিজের মুখ রক্ষা হবে; কিন্তু দুনিয়া যে কথা জানে, সে কথা কি করে গোপন করা যায়! আমার ভাত দিতে এতই কষ্ট, নাই দিলে। আমার কি? মজুরি এখনও করি, তখনও করব। শোবার জন্য এক হাত জায়গা তোমার কাছে চাইলে কি আর তুমি দেবে না?

ধনিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বলে—জায়গার অভাব কি, মেয়ে! তুই চল, আমার ঘরে থাকবি।

হরি কাতর স্বরে বলিল—ডাকছিস তো, কিন্তু পণ্ডিতকে চিনিস না?

ধনিয়া নির্ভীক ভাবে বলিল—রাগ করে তো একখানা রুটি বেশি করে খাবে, আর কি করবে! কে ওর ভয় করে? ইজ্জত নিলে, বেরাদরি থেকে বের করে দিলে, এখন বলছে কি, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক নাই! মানুষ, না কসাই! সেই কর্মের আজ ফল মিলল। প্রথমটায় ভাবে নাই; তখন তো বিহার! এখন বলছে, আমার কি!

হরির মতে ধনিয়া ভুল করিতেছে। সিলিয়ার বাড়ির লোকেরা মাতাদীনকে একেবারে ধর্মভ্রষ্ট করিয়া দিল, এ কাজ ভাল করে নাই। সিলিয়াকে মার ধর করিয়াই নিয়া যাক, আর আহ্লাদ করিয়াই নিয়া যাক, সে তো ওদের মেয়ে। মাতাদীনের ধর্মে হাত দিল কেন?

ধনিয়া নিল এক চোট—আচ্ছা, থাকতে দাও, বড় ধর্ম ধর্ম করছ যে।

মরদে মরদে সকলে এক ; মতই একে ধর্মভ্রষ্ট করল, তাতে করে কারো খারাপ লাগল না ; অমনি যেই মতই ধর্মভ্রষ্ট হল, এখন কেন খারাপ লাগে ? সিলিয়ার ধরম কি তবে ধরমই নয় ? রেখেছে তো এক চামারনী, আবার সেজেছে আচারী ব্রাহ্মণ। বেশ করেছে হরখু চৌধুরী। এরকম গুণ্ডার এই হল সাজা। তুই চল সিলিয়া আমার বাড়ি। জানি না কেমন বাপ মা, একটু দরদ নেই, বেচারির সারা পিঠটা রক্তে লাল করে দিয়েছে। তুমি গিয়ে সোনাকে পাঠিয়ে দাও, আমি একে নিয়ে আসছি।

হরি ঘরে চলিল, আর সিলিয়া ধনিয়ার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

## ২৪

সোনা সতেরো বৎসরে পা দিয়াছে, আর এবৎসর তাহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। হরি তো দুই বছর এই খোঁজেই ছিল, হাত খালি বলিয়া কোনও কৌশলই খাটিতেছিল না। কিন্তু এই বৎসর যেমন করিয়াই হউক, বিবাহ দেওয়াই চাই, কর্জ করিয়াই হউক আর ক্ষেত বাঁধা দিয়াই হউক। শুধু হরির কথা অনুসারে কাজ হইলে দুই বৎসর পূর্বেই বিবাহ হইয়া যাইত। সে কাজ করিতে চাহিত অল্পসল্পের মধ্যে। কিন্তু ধনিয়া বলিত, যতই বাঁধাবাঁধি করে খরচ কর, দু শ আড়াই শ টাকা লাগিবেই। ঝুনিয়া আসায় বেরাদরির মধ্যে ইহাদের স্থান কিছু নিচে হইয়া গিয়াছিল, আর এক শ দুই শ না দিলে, কোনও ভাল ঘরের ছেলে পাওয়া যাইবে না। গত বৎসর চৈতি ফসল পাওয়া গেল না ; ছিলই তো পণ্ডিত দাতাদীনের সঙ্গে ভাগচাষ, কিন্তু পণ্ডিতজী বীজ ও মজুরির এমন হিসাব দেখাইল যে হরির হাতে সিকি ভাগের চেয়ে বেশি ধান আসিল না। খাজনা কিন্তু দিতে হইল পূরাপূরি। আখ আর শনের ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শনটা গেল বর্ষা বেশি হওয়ার জন্য, আর আখে উই ধরিয়া গেল। হাঁ, এ বৎসর চৈতি ফসল ভাল হইয়াছিল, আর আখচাষও খুব ভাল হইয়াছিল। বিবাহের জন্য ধান তো মজুদ ছিলই ; দু শ টাকাও যদি হাতে আসিয়া যায়, তবে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হয়। গোবর যদি এক শ টাকা দিয়াও সাহায্য করে, তা হইলে বাকি এক শ হরি সহজে জোগাড় করিতে পারিবে। ঝিংগুরী সিংহ ও মংরু সা দুইজনেরই সুর এখন কিছু নরম পড়িয়াছিল। গোবর

যখন বিদেশে টাকা রোজগার করিতেছে, তখন আর তাহাদের টাকা মারা পড়িতে পারে না।

একদিন হরি দুই তিন দিনের জন্য গোবরের কাছে যাইবে বলিয়া কথা পাড়িল।

কিন্তু এ পর্যন্ত ধনিয়া গোবরের সেই কঠোর ব্যবহার ভোলে নাই। সেই গোবরের কাছ থেকে এক পয়সাও নেওয়া হইবে না, কোনও মতেই না!

হরি বিরক্ত হইয়া বলিল—কিন্তু কাজ চলবে কি করে, বুঝিয়ে দে?

ধনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—মনে কর গোবর বিদেশে যায় নাই, তা হলে তুমি করতে কি? এখনও তাই কর।

হরির কথা বন্ধ হইয়া গেল। মুহূর্ত পরে বলিল—আমি তো তোমাকেই সে কথা জিজ্ঞাসা করছি।

ধনিয়া নিজেকে বাঁচাইল—এ কথা তো পুরুষের ভাববার।

হরির কাছে জবাব তৈরি—মনে কর আমি নাই, তুই একা, তখন কি করতিস? তাই কর।

ধনিয়া তিরস্কাপূর্ণ নেত্রে চাহিল—তখন আমি শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে দিলেও কেউ হাসত না।

শাঁখা-সিঁদুর হরিও দিতে পারিত। তাহাতে তাহার মঙ্গলও হইত। কিন্তু কুলমর্যাদা ছাড়িবে কি করিয়া? তাহার বোনদের বিবাহে তিন তিন শ বরযাত্রী দরজায় আসিয়াছিল। দানও ভালই দেওয়া হইয়াছিল। নাচ-তামাসা, বাদ্য-ভাণ্ড, হাতি-ঘোড়া, সবই ছিল। আজও বেরাদরির মধ্যে তাহার নাম আছে। দশটা গাঁয়ের লোকের সঙ্গে তার মেলামেশা আছে। শাঁখা-সিঁদুর দিলে ও মুখ দেখাইবে কাহাকে? তাহা হইতে মরিয়া যাওয়াও ভাল। আর সে রকম কেন [illegible]? গাছ-পালা আছে, জমি আছে, অল্পসল্প ফসলও আছে। যদি সে এক বিঘাও বেচিয়া দেয়, তবে দুই শ টাকা পাইয়া যায়; কিন্তু কিষাণের কাছে জমি প্রাণের চেয়েও প্রিয়, কুলমর্যাদার চেয়েও প্রিয়; আর তাহার কাছে আছে তো মোট তিন বিঘাই; যদি এক বিঘাও বিক্রী করিয়া দেয় তবে ক্ষেতি করিবে কি করিয়া?

কয়েকদিন এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া কাটিল। হরি কিছু ফয়সালা করিতে পারিল না।

দশহরার ছুটির দিন। ঝিংগুরী, পটেশ্বরী আর নোখেরাম, গ্রামে মান্য তিন জনেরই ছেলে ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিল। তিন জনই ইংরেজি পড়িত, আর যদিও তিন জনেরই বয়স কুড়ি বৎসর পার হইয়াছিল, তবু এ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার কেহ নাম করে নাই। এক এক ক্লাসে দুই তিন বৎসর ধরিয়া পড়িতেছে। তিনজনের বিবাহও হইয়া গিয়াছিল। পটেশ্বরীর সুপুত্র বিন্দেশ্বরী তো এক ছেলের বাপও হইয়া গিয়াছে। তিন জনে সারাদিন তাস খেলে, ভাং খায়, আর সাজিয়া গুজিয়া বেড়ায়। দিনে কতবার তাহারা হরির দরজার দিকে তাকাইতে তাকাইতে যায়, আর এমনই যোগাযোগ যে তাহারা যে সময় বাহির হয়, সোনাও তখন কোন না কোন কর্মে দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়ায়। এ কয়দিন সোনা, গোবর তাহার জন্য যে শাড়ী আনিয়াছিল, তাহা পরিয়া আসিত। এ সব রঙ্গ দেখিয়া দেখিয়া হরির রক্ত শুকাইয়া আসিত, যেন তাহার ক্ষেতি নষ্ট করিবার জন্য আকাশে শিলাবৃষ্টির হলদে মেঘ সাজিয়া আসিতেছে।

একদিন তিন জনেই সেই কুয়ার কাছে স্নান করিতে আসিল, হরি যেখানে আখ সেঁচিবার জন্য মাটি কাটিতেছিল। সোনা মোট লইয়া আসিতেছিল। হরির রক্ত আজ চন্ করিয়া উঠিল।

সেইদিনই সন্ধ্যায় সে দুলারীর কাছে গেল। ভাবিল, মেয়েদের দয়ামায়া আছে, হয় তো ইহার মন গলিবে, কম সুদে টাকাটা দিয়া দিবে। কিন্তু দুলারী নিজেই তাহার কান্না লইয়া বসিয়া ছিল। গাঁয়ে এমন ঘর নাই যেখানে তাহার কিছু টাকা না পাওনা আছে; এমন কি, ঝিংগুরী সিংহের কাছ থেকেও ওর কুড়ি টাকা পাওনা। কিন্তু দেওয়ার নাম কেউ করে না। বেচারা টাকা আনে কোথা হইতে?

হরি কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল—বৌঠান, বড় পুণ্য হবে। তোমার টাকা দেওয়া হবে না, আমার গলার ফাঁসি খুলে নেওয়া হবে। ঝিংগুরী আর পটেশ্বরী আমার ক্ষেত কামড়ে পড়ে আছে। আমি ভাবছি, বাপ-দাদার তো এই চিহ্ন, এটা চলে গেলে যাব কোথায়? সে-ই সুপুত্র, যে কিনা ঘরের সম্পত্তি বাড়ায়, আমি এমনি কুপুত্র হব যে বাপ-দাদার রোজগারের ওপর ঝাড়ু মারব!

দুলারী দিব্য করিল—হরি, আমি ঠাকুরের পা ছুঁয়ে বলছি, এখন আমার কাছে কিছু নাই। যে নেয় সে দেয় না, তার আমি কি করি! তুমি তো আর কিছু বাইরের লোক নও, সোনাও আমারই মেয়ে; কিন্তু তুমি বল, আমি করি

কি! হীরা তোমারি ভাই; বলদের জন্য পঞ্চাশ টাকা নিল; তার কই পাত্তা নাই, ঘরের লোকদের কাছে চাও তো তারা মারতে আসে। শোভাও দেখতে খুব সাদা-সিধে, কিন্তু পয়সা দিতে জানে না। আর আসল কথা তো এই যে, কারো কাছে নাই-ই, দেবে কোথা থেকে। সকলের দশা দেখে চুপ করে যাই। লোকে কোন রকমে পেট ভরায়, আর কি। ক্ষেতি-বাড়ি বিক্রী করতে আমি পরামর্শ দেব না। কিছু না থাকে, মর্যাদা তো আছে।

আস্তে আস্তে কানে কানে বলিল—পটেশ্বরী লালার ছেলে তোমার বাড়ির চারদিকে খুব ঘোরাফেরা করে। তিন জনের একই হাল। এদের থেকে সাবধান। এরা শহুরে হয়ে গেছে, গাঁয়ের ভাই-ভাই সম্বন্ধ এরা বুঝবে কি? গাঁয়েও ছেলে আছে; কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু সম্ভ্রম আছে, লজ্জা আছে, ভয় আছে। এরা তো সব উদোম ষাঁড়; আমার কৌশল্যা শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছিল, আমি সকলের ঢং দেখে তার শ্বশুরকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। কে কতক্ষণ পাহারা দেবে!

হরিকে মুচকি হাসিতে দেখিয়া তাহাকে সে মিষ্ট ভৎর্সনার ভাবে কহিল—হাসছ হরি, তাহলে আমিও কিছু বলে দেব। তোমার কি কারু চেয়ে কম নটখট ছিল? দিনে সাতাশ বার একটা না একটা বায়নায় আমার দোকানে আসতে যেতে; কিন্তু আমি কখনো তাকাই নি পর্যন্ত।

হরি মিষ্ট প্রতিবাদের ভাবে বলিল—এ তো তুমি মিথ্যা বলছ বৌঠান! আমি রস কিছু না পেলে আসতামই না। পাখি একবার দেখে যায়, তবে পরের বার আঙ্গিনায় আসে।

দূর মিথ্যাবাদী!

চোখ দিয়ে তাকাও নাই বটে; কিন্তু তোমার মন তো তাকিয়ে ছিল; [illegible]ণ, মনে মনে ডাকতে।

আচ্ছা থাক থাক, খুব অন্তর্যামী হয়ে এসেছেন! তোমাকে বারবার ঘুরতে ফিরতে দেখে দয়া হোত, নইলে তুমি এমন কিছু চালাক জোয়ান ছিলে না।

হুসেনী এক পয়সার নুন নিতে আসিল, আর এই ঠাট্টা পরিহাস থামিয়া গেল। হুসেনী নুন লইয়া চলিয়া গেল, দুলারী আবার বলিল—গোবরের কাছে চলে যাও না কেন? ওদের দেখেও আসবে, কিছু পেয়েও যেতে পার।

হরি নিরাশ মনে বলিল—ও কিছু দেবে না। ছেলে দু পয়সা রোজগার

করতে শুরু করেছে, অমনি তার চোখ খুলে গেছে। আমি তো বেহায়াপনা করতে রাজি ছিলাম, কিন্তু ধনিয়া মানে না। তার মরজি না হলে যদি চলে যাই তো ঘরে থাকা অসম্ভব করে তুলবে। তার স্বভাব তো জান।

দুলারী কটাক্ষ করিয়া কহিল—তুমি তো স্ত্রীর গোলামের মত হয়ে গেছ।

তুমি ডেকে জিজ্ঞাসাই কর না তো করি কি?

আমার গোলামি করবে বললে লিখিয়ে নিতাম। সত্যি!

তা এখন অভাব কিসের, লিখিয়ে নাও না। দু শ টাকায় লিখে দিচ্ছি। এ দামে বেশি আক্রা নই।

তাহলে ধনিয়াকে বলবে না তো?

নাঃ, বল তো দিব্যি করি।

আর যদি বল?

তবে আমার জিভ কেটে নিও।

আচ্ছা তবে যাও, বর ঠিক-ঠাক কর, আমি টাকা দিয়ে দেব।

হরি সজল নেত্রে দুলারীর পা ধরিতে গেল। ভাবাবেগে তাহার মুখে কথা সরিল না।

দুলারী পা টানিয়া বলিল—এখন এ খোসামোদ আমার ভাল লাগে না। এক বছরের ভিতর নিজের টাকা সুদসমেত কান মলে আদায় করে নেব। তুমি বাবু টাকা পয়সার ব্যাপারে এমন কিছু সাচ্চা নও; কিন্তু ধনিয়ার ওপর আমার বিশ্বাস আছে। শুনেছি, পণ্ডিত তোমার ওপর খুব চটেছে। বলছে, একে গাঁ হতে বার করে না ছাড়ি তো বামুন নই। তুমি সিলিয়াকে বাড়ি থেকে বার করে দাও না কেন? সেধে ঝগড়া বাধিয়েছ!

ধনিয়া ওকে জায়গা দিয়েছে, আমি কি করব।

শুনেছি, পণ্ডিত কাশী গিয়েছিল। সেখানে এক খুব নামকরা পণ্ডিত আছে। সে পাঁচ শ টাকা চায়, তবে প্রায়শ্চিত্ত করাবে। ভাল, বল তো এমনি অন্ধ কোথাও আছে! ধরম যখন নষ্ট হয়েছে, তখন এক কেন, হাজার প্রায়শ্চিত্ত কর, তাতে হবে কি? তোমার হাতের ছোঁয়া জল কেউ খাবে না, তা যতই কেন প্রায়শ্চিত্ত কর না।

হরি এখান থেকে বাড়ি ফিরিল, আনন্দে তাহার মন উচ্ছ্বসিত। জীবনে এমন সুখের অনুভূতি তাহার কখনও হয় নাই। পথে শোভার বাড়ি গেল,

আর বিবাহের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। দুই জনে তার পর গেল দাতাদীনের বাড়ি, বিবাহের দিনক্ষণ জানিবার জন্য। সেখান থেকে আসিয়া বিবাহের জন্য কি কি তৈরি করিতে হইবে তাহার পরামর্শ করিতে লাগিল।

ধনিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—এক পহর রাত হয়ে গেল, এখনও খাওয়ার সময় হয় নাই? খেয়ে এসে বসো। গল্প গাছা করবার জন্য তো সারা রাতই পড়ে আছে।

হরি তাহাকেও পরামর্শে যোগ দিতে অনুরোধ করিয়া বলিল—এরই মধ্যে বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। বল, কি কি জিনিস আনতে হবে। আমার তো কিছু জানা নাই।

যখন কিছু জানই না, তখন সলা-পরামর্শ করতে বসেছ কেন? টাকা পয়সার বন্দোবস্ত কিছু হয়েছে, না মনে মনেই লাড্ডু খাচ্ছ?

হরি সগর্বে কহিল—তা দিয়ে তুই করবি কি? তুই এইটুকু বলে দে যে, কোন কোন জিনিস আনতে হবে?

আমি এমন বাজে ভাবনা ভাবি না।

তুই এইটুকু বল যে আমাদের বোনেদের বিয়েতে কোন কোন জিনিস এসেছিল?

আগে বল, টাকা পাওয়া গেছে?

হাঁ, পাওয়া গেছে, নইলে কি ভাং খেয়েছি।

তবে আগে এসে খেয়ে নাও। পরে সলা-পরামর্শ কোরো।

কিন্তু সে যখন শুনিল যে দুলারীর সঙ্গে কথাবার্তা হইয়াছে তখন নাক সিঁটকাইয়া বলিল—ওর কাছ থেকে টাকা ধার করে আজ পর্যন্ত কেউ শোধ দিয়েছে! ডাইনি কত কসে সুদ নেয়!

কিন্তু কি করা যাবে? আর কে দেয়?

বল না কেন, খানিকটা গালগল্প করতে গিয়েছিলে? বুড়ো হলে, তবু সে অভ্যাস গেল না!

তুই তো ধনিয়া কখনো কখনো ছোট ছেলেদের মত কথা বলিস। আমার মত লক্ষ্মী ছাড়ার সঙ্গে কি ও হাসবে খেলবে? সোজা মুখে কথা তো বলেই না।

তোমার মতন লোক ছাড়া আর যাবেই বা কে ওর কাছে ?

ওর দরজায় ভাল ভাল লোক সব নাক ঘসে, তুই তার জানিস কি! ওর কাছেই লক্ষ্মী বাঁধা।

ও একটু আধটু রাজি হয়ে গেল, আর তুমি খোসখবর নিয়ে চারদিকে ছুটলে!

একটু আধটু রাজি নয়, পাকা কথা দিয়েছে যে!

হরি রুটি খাইতে গেল, শোভা ফিরিল নিজের ঘরে; সোনা সিলিয়ার সঙ্গে বাহিরে আসিল। দরজায় দাঁড়াইয়া সে সমস্ত কথা শুনিয়াছে। তাহার বিবাহের জন্য দুই শ টাকা দুলারীর কাছ থেকে ধার লওয়া হইতেছে, একথা ওর পেটে এমন খলবল করিতে লাগিল তাজা চুনা মাছ জলে পড়িয়া গেলে যেমন হয়। দরজায় একটা কুপি জ্বলিতেছিল, তাহার জন্য তাকের উপরের দেওয়াল কালি বর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বলদ দুইটি নাদে ছানি খাইতেছিল, আর একটা কুকুর খাবারের আশায় মাটির উপর বসিয়াছিল। মেয়ে দুইটি বলদদের নাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সোনা বলিল—তুই কিছু শুনিস নাই ? বাবা আমার বিয়ের জন্য সাহুয়াইনের কাছ থেকে দু শ টাকা ধার নিচ্ছে।

সিলিয়া বাড়ির আগাগোড়া সব অবস্থা জানিত। বলিল—ঘরে পয়সা নাই তো করবে কি ?

সোনা সম্মুখের কালো গাছের দিকে তাকাইতে তাকাইতে বলিল—আমি এমন করতে চাই না যাতে বাপ-মাকে কর্জ করতে হয়। বল তো, বেচারিরা কোথা থেকে দেবে। আগের থেকেই কর্জের বোঝা চেপে আছে। আরও দু শ নিলে বোঝা আরো ভারি হবে, নয় কি ?

দান-টান নইলে বড়লোকদের কোথাও কি বিয়ে হয় রে পাগলি ? যৌতুক নইলে বুড়ো টুড়োই পাওয়া যায়। যাবি বুড়োর সঙ্গে ?

বুড়োর সঙ্গে যাব কেন ? দাদা কি বুড়ো ছিল যে ঝুনিয়াকে নিয়ে এল ? ওরা কাকে ক পয়সা যৌতুক দিয়েছে ?

ওতে যে বাপ-দাদার নাম ডোবে।

আমি তো সোনারীওয়ালাদের বলে দেব, যদি তোমরা এক পয়সাও যৌতুক নাও তো আমি তোমাদের বাড়ি বিয়ে করব না।

সোনার বিবাহ সোনারীর এক ধনী কিষাণের ছেলের সঙ্গে ঠিক হইয়াছিল।

আর যদি সে বলে দেয়, আমি কি করব, তোমার বাবা দিচ্ছে, আমার বাবা নিচ্ছে, এতে আমার কি একতিয়ার আছে ?

সোনা যে অস্ত্রকে রামবাণ মনে করিয়াছিল এখন দেখিল যে তাহা বাঁশের কঞ্চি। হতাশ হইয়া বলিল—আমি ওকে একবার বলে দেখতে চাই; যদি ও বলে আমার কোন একতিয়ার নাই, তাহলে গোমতী এখান থেকে কি আর বেশি দূরে! ডুবেই মরব। বাপ মা মরতে মরতে মানুষ করেছে। তার প্রতিদান কি এই যে তাদের বাড়ি থেকে যাব, তাদের ঘাড়ে কর্জের বোঝা আরও চাপিয়ে ? বাপ-মাকে ভগবান দিয়েছেন, তো খুসি হয়ে যত চাই দিন, আমি মানা করব না। কিন্তু যখন পয়সার টানাটানি, আজ মহাজন নালিশ করে নিলাম করে নেবে, কাল মজুরি করতে হবে, তখন মেয়ের ডুবে মরাই ধরম। ঘরের জমি-জিরেত তো বেঁচে যাবে, রুটির জোগাড় তো থাকবে। বাপ-মা দু দিন আমার জন্য কেঁদে কেঁদে ঠাণ্ডা হবে। এমন তো আর হবে না যে আমাকে বিয়ে দিয়ে তাদের জনমভোর কাঁদতে হবে! তিন চার বচ্ছরে দু শ দুনো হয়ে যাবে; বাবা কোথা থেকে শোধ করবে!

সিলিয়ার মনে হইল, তাহার চোখে যেন নূতন জ্যোতি আসিয়াছে। আবেশে সোনাকে বুকে জড়াইয়া বলিল—তুই এত আক্কেল কোথা থেকে শিখলি সোনা ? এমনি দেখতে তো তুই বড় ভাল মানুষ।

এতে আক্কেলের কি কথা রে ডাইনি ? আমার কি চোখ নাই, না আমি পাগল ? আমার বিয়েতে দুই শ নিল; তিন-চার বছরে তা হয়ে গেল দুনো। রুপিয়ার বিয়েতে আরো দু শ; যা কিছু ক্ষেত-খামার আছে, সব নিলাম-টিলাম হয়ে যাক, আর দরজায় দরজায় ভিখ মেগে ফিরুক। এই তো ? এর থেকে তো আমার আত্মহত্যা করাই ভাল ? একটু অন্ধকার থাকতে সোনারী চলে যাও আর ওকে ডেকে আন; কিন্তু না, ডেকে কাজ নাই। আমার ওকে বলতে লজ্জা করবে। তুই-ই আমার হয়ে এই কথা বলে দিস। দেখ কি জবাব দেয়। কতটা আর দূর ? নদীর ওপারেই তো! কখনও কখনও গোরু মহিষ নিয়ে এদিকে চলে আসে। একবার ওর মহিষ আমার ক্ষেতে এসে পড়েছিল, তো আমি ওকে খুব গালাগাল দিয়েছিলাম। জোড়হাত করতে লাগল।—হাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, মতই-এর সঙ্গে তোর দেখা হয় নাই ? শুনেছি, বামুনেরা ওকে সমাজে নেয় নাই।

সিলিয়া ঝাঁজের সঙ্গে বলিল—সমাজে আর নেবে না কেন, তবে হাঁ, বুড়ো টাকা খরচ করতে চায় না। পয়সা পেলে বেরাদরি জাতে তুলতে পারে। ছেলে আজকাল বাইরে দাঁড়িয়ে ঘুঁটে লাগায়।

তুই ওকে ছেড়ে দিস না কেন? নিজের সমাজে কারুর সঙ্গে রয়ে যা, আর মজাসে থাক? সে তো আর তোর অপমান করবে না?

হাঁ রে, কেন ছাড়ব, আমার জন্য ও বেচারীর এতটা দুর্দশা হল, এখন আমি ওকে ছেড়ে দেব! ও চাই পণ্ডিত হোক চাই দেবতা হোক, আমার তো ও সেই মতই-ই রইল, যে কিনা আমার পায়ে মাথা ঘসত; আর যদি বামুনও হয়ে যায়, আর বামনীকে বিয়েও যদি করে, তবু আমি ওর যতটা সেবা করেছি, কোনও বামনী কি ততটা করবে? ও ইচ্ছা করলে এখন মান-মর্যাদার মোহে আমায় ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু দেখে নিস, আবার ছুটে আসবে।

আর এসেছে! তোকে পেলে কাঁচাই খেয়ে নেয়।

তা ওকে ডাকতেই বা কে যায়। নিজের নিজের ধরম নিজের নিজের সঙ্গে যায়। ও নিজের ধরম ভাঙ্গল, তাই বলে আমি কেন আমার ধরম ভাঙ্গব?

সকালে সিলিয়া সোনারীর দিকে চলিল; কিন্তু হরি আটকাইল। ধনিয়ার মাথায় বড় ব্যথা; তার জায়গায় সিলিয়াকে জমির বেড়া দিতে হইবে। সিলিয়া 'না' বলিতে পারিল না। সেখান থেকে দুপুরে ছুটি মিলিলে তবে চলিল সোনারীর দিকে।

এদিকে হরি তিন প্রহর বেলায় আবার কুয়ার দিকে গেল; সিলিয়ার কোনও পাত্তা নাই; রাগ করিয়া বলিল—সিলিয়া কোথায় উড়ে গেল? থাকে থাকে জানি না কেন কোন দিকে চলে যায়, যেন কোন কাজে প্রাণ নাই। তুই জানিস রে সোনা, কোথায় গেছে?

সোনা না জানার ভাণ করিল। আমার তো কিছু জানা নাই। বলছিল, ধোবার বাড়ি যাবে কাপড় আনতে। হয় তো সেখানেই গেছে।

ধনিয়া খাটিয়া হইতে উঠিয়া বলিল—চল, আমি জমির বেড়া দিই গে। কেউ কি ওর মজুরি দেয় যে ওর উপর রাগ কর্ব?

আমার বাড়িতে থাকে না? ওর জন্য সারা গাঁয়ে বদনাম হচ্ছে না?

আচ্ছা থাকতে দাও, এক কোণে তো পড়ে আছে, তবু ওর কাছ থেকে ভাড়া নেবে?

এক কোণে তো পড়ে নাই, একটা গোটা কুঠরি নিয়েছে।

তাহলে ওই কুঠরির ভাড়া হবে মাসে ন শ পঞ্চাশ টাকা?

ওর ভাড়া এক পয়সাই সই। আমার বাড়িতে থাকে, যেখানেই যাক জিজ্ঞাসা করে যাক। আজ এলে জিজ্ঞাসা কোরব।

কাজ চলিতে লাগিল। হরি ধনিয়াকে আসিতে দিল না। রূপা মাটিতে খেলিতে থাকিল, সোনা মোট বহিতেছিল। রূপা ভিজা মাটি দিয়া উনন ও বাসন কোসন বানাইতেছিল, সোনার সংশয়িত দৃষ্টি ছিল সোনারীর দিকে নিবদ্ধ। ভয়ও ছিল, আশাও ছিল, ভয় বেশি, আশা কম। সে ভাবিতেছিল, ওরা টাকা পেলে ছাড়বে কেন? যার পয়সা আছে সে তো পয়সার জন্য জান দেবে আরও বেশি; আর গৌরী মাহাতো তো এক নম্বরের লোভী। মথুরার মধ্যে দয়া আছে, ধর্ম আছে, তবে বাপের ইচ্ছা যা হবে ওকে সেইটাই মানতে হবে; কিন্তু সোনাও বাছাধনকে এমন মজা দেখাবে যে মনে থাকবে। সে সাফ বলে দেবে, কোনও বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে কর গিয়ে, তোমার মত পুরুষের সঙ্গে আমার বনবে না। গৌরী মাহাতো যদি রাজি হয় তাহলে ও তার পা ধুয়ে ধুয়ে জল খাবে, তার এমন সেবা করবে যেমন সেবা সে বাপেরও করে নাই, আর সিলিয়াকে ভরপেট মিঠাই খাওয়াবে। গোবর তাকে যে টাকা দিয়াছিল, সে টাকা এখনো তার জমা আছে। এই মধুর কল্পনায় তাহার চাহনিতে চমক লাগিল, গালে ঈষৎ রক্তিমা খেলিয়া গেল।

কিন্তু সিলিয়া এখনও আসিল না কেন? কি এমন বেশি দূর। ওরা আসিতে দেয় নাই। আহা! ঐ যে আসছে; কিন্তু বড় ধীরে ধীরে আসছে। সোনার মন অবসন্ন হইল। হতভাগা হয় তো রাজি হয় নাই, না হলে সিলিয়া দৌড়াইয়া আসিত। তা হলে আর সোনার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে! থাকো মুখ ধুয়ে বসে।

সিলিয়া আসিতেছে নিশ্চয়। কিন্তু কুয়ার কাছে না আসিয়া ক্ষেতে আল বাঁধিতে লাগিয়া গেল। ভয় করিতেছিল, হরি যদি জিজ্ঞাসা করে, এতক্ষণ কোথায় ছিল, তবে কি জবাব দিবে। এই দু ঘণ্টা সময় সোনার বড় মুসকিলে কাটিল। কাজ শেষ হইলেই ও ছুটিল, সিলিয়ার কাছে গেল।

ওখানে গিয়ে তুই মরে গিয়েছিলি না কি? তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ গেল।

সিলিয়ার খারাপ লাগিল—তা আমি কি ওখানে শুয়ে ছিলাম? ঐ সব কথাবার্তা পথ চলতে চলতে হয় না, অবসর দেখতে হয়। মথুরা গিয়েছিল।

নদীর ধারে, গোরু চরাতে। খুঁজে খুঁজে তার কাছে গেলাম আর বললাম তোর কথা। এত খুসি হল যে কি আর বলব। আমার পায়ের কাছে পড়ে বলল— সিল্‌লো, আমি তো যখন থেকে শুনেছি যে সোনা আমার ঘরে আসছে তখন থেকে চোখের ঘুম পালিয়েছে। ওর সে সব গালাগালি ফলেছে, কিন্তু বাবাকে কি করি? ও কারো কথা শোনে না।

সোনা মন্তব্য করিল—তা না শুনুক। সোনাও জেদী মেয়ে। যা বলেছে করে দেখাবে। তখন হাত কচলাতে থাকবে।

ব্যস, তখনই ওখানে গোরু ছেড়ে দিয়ে আমায় নিয়ে গৌরী মাহাতোর কাছে চলল। মাহাতোর চাষ খুব চলছে; কুয়োও নিজের। দশ বিঘা আখ। মাহাতোকে দেখে আমার হাসি পেল। যেন একজন ঘেসেড়া। হাঁ, কপাল জোর বটে। বাপ-বেটায় কথা চলল। গৌরী মাহাতো বলছিল, আমি কিছু নিই আর না নিই, তোর তাতে কি? তুই বলবার কে? মথুরা বলছিল, তোমার টাকা পয়সা নিতে হয় তো আমার বিয়ে দিও না, আমি নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করব। কথায় কথা বাড়ল, আর গৌরী মাহাতো জুতো খুলে মথুরাকে খুব পিটল। আর কোন ছেলে এতটা মার খেয়ে সহ্য করত না। মথুরা একটা ঘুষি লাগিয়ে দিলেও মাহাতো আর উঠত না; কিন্তু বেচারা পঞ্চাশ জুতো খেয়েও কিছু বলে নাই। চোখ জলে ভরে গেল, গরিবের মত আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে গেল। তখন মাহাতো আমার ওপর রাগ করতে লাগল। অনেক গাল দিল; কিন্তু আমি কেন শুনব? ওকে আমার ভয় কি? আমি সাফ বলে দিলাম—মাহাতো, দু তিন শ টাকা এমন কিছু বেশি কথা নয়, এতে হরি মাহাতো বিক্রী হয়ে যাবে না; তুমিও বড়লোক হয়ে যাবে না। এ সব টাকা-কড়ি নাচ-তামাসাতেই উড়ে যাবে। হাঁ, তবে এমন বৌ পাবে না।

সোনা সজল চক্ষে বলিল—মাহাতো এই কথা শুনে ওকে মারতে লাগল?

সিলিয়া ঐ কথা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এমন অপমানের কথা সোনার কানে দিতে চাহে নাই; কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া সংযম রাখিতে পারিল না। বলিল—ওই গোবর ভাইয়ার কথা; মাহাতো বললে—লোকে এঁটো খায়, যদি তার সেটা মিষ্টি লাগে। কলঙ্ক চাঁদিতে ধুয়ে যায়। এর পরে মথুরা বলল—বাবা, কোন ঘর কলঙ্ক থেকে বেঁচেছে, হাঁ, কারু জানা গেছে, কারু গোপনে আছে। গৌরী

মাহাতোও প্রথমে এক চামারনী রেখেছিল ; তার দুই ছেলেও হয়ে ছিল। মথুরার মুখ থেকে একথা বেরুতেই ড্যাকরার ঘাড়ে যেন ভূত চাপল। যত লোভ, তত রাগও বটে লোকটার। না নিয়ে মানবে না।

দুই জনে বাড়ি ফিরিল। সোনার মাথায় দড়ি দড়ার এক ভারি বোঝা ছিল; কিন্তু এখন তাহার সে বোঝা ফুলের মত হালকা লাগিতেছিল। তাহার অন্তস্তলে যেন আনন্দ ও স্ফূর্তির ফোয়ারা খুলিয়া গেল। মথুরার সেই বীর মূর্তি সামনে দাঁড়াইয়া, আর ও যেন তাহাকে হৃদয়ে বসাইয়া অশ্রুতে পা ধোয়াইয়া দিতেছে। আকাশের দেবতারা যেন তাহাকে কোলে বসাইয়া আকাশে ছড়ানো দীপ্তির দিকে চলিয়া যাইতেছে।

সে রাত্রে সোনার খুব জ্বর আসিল।

তৃতীয় দিনে গৌরী মাহাতো নাপিতের হাতে এই পত্র পাঠাইল—

—স্বস্তি শ্রীসর্বোপমাযোগ্য শ্রীহরি মাহাতোকে গৌরী রাম রাম জানাইতেছে। আগে যে আমাদের মধ্যে দেনা পাওনার কথাবার্তা হইয়াছিল, সে বিষয়ে আমি শান্ত মনে বিচার করিলাম, বুঝিতে পারিলাম যে লেন-দেনে বর ও কন্যা দুইজনের বাড়ির লোকেই জেরবার হয়। আমার ও তোমার মধ্যে একটা সম্পর্ক যখন হইয়া গেল, তখন আমাদের এমন ব্যবহারই করা উচিত যাহাতে কাহারও কষ্ট না হয়। তুমি দান যৌতুকের কোনও ব্যবস্থা করিও না, আমি তোমাকে গন্ধদ্রব্য পাঠাইতেছি। ভাল মন্দ যা কিছু হয়, বরযাত্রীদের খাওয়াইয়া দিলে হইবে। আমি তাহাও চাই না। রসদের ব্যবস্থা আমি করিয়াছি। হাঁ, তুমি নিজের খুসিতে আমাদের যে খাতির করিবে তাহা মাথা নোয়াইয়া স্বীকার করিব।

হরি পত্র পড়িয়া দৌড়াইয়া ভিতরে গেল, ধনিয়াকে শুনাইতে। আনন্দের চোটে সে যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল ; কিন্তু ধনিয়া যেন কোনও ভাবনায় ডুবিয়াছিল। খানিক ক্ষণের পর বলিল—এ হল গৌরী মাহাতোর ভালমানষি ; কিন্তু আমারও নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। লোকে বলবে কি! টাকা হল হাতের ময়লা। তার জন্য বংশমর্যাদা ছাড়া হবে না। আমার যা কিছু জুটবে তাই দেব, গৌরী মাহাতোকে তাই নিতে হবে। তুমি এই জবাব লিখে দাও। বাপ-মার রোজগারে মেয়ের কি কোন দাবি-দাওয়া নাই? না, লেখবার কি আছে, চল, আমি নাপিতের হাতে বলে পাঠাই।

হরি হতবুদ্ধির মত আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া রহিল, আর ধনিয়া, গৌরী মাহাতোর সৌজন্য যে উদারতার প্রতিক্রিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছিল তাহার আবেশে বক্তব্য বলিয়া চলিল। তাহার পর নাপিতকে সরবত খাওয়াইয়া ও বকশিস দিয়া বিদায় করিল।

সে চলিয়া যাইতে হরি বলিল—এ তুই কি করলি ধনিয়া? তোর মেজাজ আমি আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না। তুই আগেও যাস, পেছনেও যাস। প্রথমে তো এই কথা নিয়ে মারামারি করলি যে কারো কাছ থেকে এক পয়সাও কর্জ কোরো না। কিছু দেওয়া-থোওয়ায় কাজ নেই। আর যখন ভগবান গৌরীকে দিয়ে এই পত্র লেখালেন তখন তোর বংশমর্যাদার জ্ঞান জেগে উঠল। তোর মর্ম বোঝেন ভগবান!

ধনিয়া বলিল—অবস্থা দেখে সেই মত করতে হয়, বুঝলে কিনা। তখন গৌরী নিজের লোভ দেখিয়েছিল, এখন দেখাচ্ছে ভালমানষি। ইটের জবাব পাথর হতে পারে; কিন্তু সেলামের জবাব তো গাল নয়।

হরি নাক সিঁটকাইয়া বলিল—তবে দেখা তোর ভালমানষি। দেখি কোথা থেকে টাকা আনিস।

ধনিয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল—টাকা আনা আমার কাজ নয়, ও তোমার কাজ। আমি তো দুলারীর কাছ থেকেই নেব।

নাও ওর কাছেই। সুদ তো সবাই নেবে। ডুবতেই যখন হবে, তখন পুকুরই বা কি, আর গঙ্গাই বা কি!

হরি বাহিরে গিয়া তামাক টানিতে লাগিল। কত সহজে প্রাণ বাঁচিয়া যাইত; কিন্তু ধনিয়া এখন প্রাণে ছাড়িয়া দেয়, তবে তো। যখনই দেখ, ও চলে উলটা; ভূত যেন উহার ঘাড়ে চাপে। ঘরের দশা দেখিয়াও ওর চোখ খোলে না।

## ২৫

এদিকে ভোলা আবার বিবাহ করিয়াছে। ঘরে বৌ না থাকিলে জীবন ওর নীরস লাগে। তবু যত দিন ঝুনিয়া ছিল, ওকে তামাকটা সাজিয়া দিত, সময়মত খাইতে ডাকিত। আজকাল ওর অবস্থা অনাথ বালকের মত। ছেলের বৌয়েরা ঘরের কাজকর্ম করিয়াই কুল পায় না, তা ওর সেবা যত্ন কি

করিবে। সেজন্য ওর আবার বিবাহ করা পরম প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। যোগাযোগও হইয়া গেল, একটি বিধবা মেয়ে পাওয়া গেল, যার স্বামী মারা গিয়াছে মাত্র তিন মাস আগে। একটি ছেলেও আছে। ভোলার জিভে জল আসিল। তাড়াতাড়ি শিকার হাত করিয়া ফেলিল।

এতদিন ভোলার বাড়িতে যাহা কিছু ছিল সব ছিল বৌদের। তাহারা যাহা চাহিত তাহাই করিত; যেমন করিয়া খুসি তেমনই থাকিত। জঙ্গী যেদিন হইতে বৌ নিয়া লখনৌ চলিয়া গিয়াছে, সেদিন হইতে কামতার বৌই বাড়ির কর্ত্রী হইয়া বসিয়াছে। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই উহার হাতে ত্রিশ চল্লিশ টাকা জমিয়াছে। এক আধ সের দুধ দই সে অনায়াসে চুরি করিয়া বেচিত। এখন ঘরের কর্ত্রী হইল ওর সৎ শাশুড়ী। তাহার বিলি ব্যবস্থা বধূর পছন্দ হইত না, আর দুই দিন না যাইতেই শাশুড়ী বৌয়ে খিটিমিটি লাগিল। শেষে এতদূর গড়াইল যে মেয়েদের ঝগড়া লইয়া ভোলা আর কামতার মধ্যেও কথা কাটাকাটি চলিল। ঝগড়াঝাঁটি শেষে এমন দাঁড়াইল যে পৃথক হওয়া অনিবার্য। আর পৃথক হওয়ার সময় মারামারি হইবে, এই প্রথা তো সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। কামতা জোয়ান পুরুষ, তবু ভোলাকে ও যতটুকু মান্য করিত সে শুধু সম্পর্কে বাপ বলিয়াই। কিন্তু এখন নূতন স্ত্রী ঘরে আনায় ছেলের কাছে সেই মান্য পাইবার আর দাবি রহিল না, এমন কি এই বৌকে কামতা স্বীকারই করিত না। ও ভোলাকে এক ধাক্কা মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া কয়েকটা লাথি মারিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল, ঘরের একটা জিনিস ছুঁইতে দিল না। গাঁয়ের লোক একজনও ভোলার পক্ষ নিল না। এই নতুন বিবাহে ওর বড়ই দুর্নাম হইয়াছে। রাতটা তো কোন মতে এক গাছের তলায় কাটাইয়া দিল, তারপর ভোর না হইতে ও নোখেরামের কাছে গিয়া নিজের নালিশ রুজু করিল। ভোলার গাঁখানা ওরই এলাকায়, আর এলাকার মালিক, মুখিয়া, যাহা কিছু সবই ঐ নোখেরাম। নোখেরামের ভোলার ওপর আর কি দয়া হইবে, তবে যেই দেখিল ভোলার সঙ্গে একটি সুন্দরী, চটপটে, হাসিখুসি মেয়ে, অমনি চটপট সে ভোলাকে আশ্রয় দিতে রাজী হইয়া গেল। যেখানে ওর গোরু বাঁধা হইত, সেখানে একটা ছোট ঘর ছিল, তাহাই ওদের জন্য ছাড়িয়া দিল। গোরু বাছুর দেখাশোনা করিবার জন্য, তাদের ভুষি, বিচালি দিবার জন্য ও, হঠাৎ লোকের দরকার হইয়া পড়িল;

ভোলাকে তিন টাকা মাহিনা আর দৈনিক একসের চাল ডাল বরাদ্দে চাকর নিযুক্ত করিল।

নোখেরাম লোকটি বেঁটে, মোটা, মাথায় টাক, লম্বা একটা নাক, আর ছোট ছোট দুইটি চোখ, গায়ের রং শ্যামবর্ণ। মাথায় মস্ত পাগড়ি বাঁধে, কুর্তা গায়ে দেয়, আর শীতের দিনে গায়ে লেপ চড়াইয়া চলাফেরা করে। গায়ে তেল মাথায় ওর মহা আনন্দ, তাই ওর কাপড়চোপড় চিরদিন ময়লা, তেলচিটা। ওর পরিবারটি বৃহৎ। সাতটি ভাই, তাহাদের কাচ্চা বাচ্চা, সবাই ওর আশ্রিত। তাহার উপর ওর ছেলে নতুন আমলের ফ্যাসানে ইংরেজী পড়ে, কাজেই তাহার বাবুয়ানি ঠাট বজায় রাখা বড় সহজ ব্যাপার নয়। রায়সাহেবের কাছে ও তো মাত্র বারো টাকা মাহিনা পায়, কিন্তু খরচ একশ'র এক পাই কম নয়। এজন্য চাষী একবার ওর খপ্পরে পড়িলে, মোটা ঘুস না দিয়া নিষ্কৃতি পায় না। আগে ছয় টাকা বেতন পাইত, তখন চাষাদের এত টানা হেঁচড়া করিত না। যখন বারো টাকা মাহিনা হইল, তখন হইতে উহার তৃষ্ণা যেন আরো বাড়িয়া গেল। এই জন্য রায়সাহেবও আর উহার বেতন বৃদ্ধি করিলেন না।

গাঁয়ের সকলেই কোন না কোন ভাবে উহাকে মানিয়া চলিত, এমন কি দাতাদীন আর ঝিংগুরী সিংহও উহার খোসামোদি করিত, কেবল পটেশ্বরী সর্বদা ব্যস্ত থাকিত—কি করিয়া উহাকে টেক্কা দেওয়া যায়। নোখেরামের বড়াই, সে ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের আঙ্গুল নাড়িয়া নাচাইয়া লয়, আর পটেশ্বরীরও গর্ব, সে কায়স্থ, কলম পেশার বাদশা, এই বাজারে উহাকে ঠকাইয়া কেহ বাজী জিতিতে পারে না। তা ছাড়া, সে জমীদারের চাকর নয়, সরকারের চাকর, যে সরকারের রাজ্যে সূর্য কখনও অস্ত যায় না। নোখেরাম যদি একাদশীর ব্রত পালন করিয়া পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে খাওয়ায়, তবে পটেশ্বরী প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের কথা শোনে, দশ জন ব্রাহ্মণকে খাওয়ায়। যে দিন হইতে পটেশ্বরীর বড় ছেলে খাজনা আদায়ের কাজ পাইয়াছে, নোখেরামও তাকে তাকে আছে, উহার ছেলেটি কোনমতে দশম শ্রেণীর পরীক্ষাটা পাশ করিলেই কোন জায়গায় নকলনবিশীতে ভর্তি করিয়া দিবে। আর ইহারই জন্য যখনকার যে ফলটি পাকুড়টি হাকিমকে ডালি ভরিয়া উপহার দিতেছে। আর একটা বিষয়ে পটেশ্বরী উহার উপরে ছিল। লোকে বলে, কাহারদের যে বিধবা মেয়েটি বাড়িতে জল দিত, সে পটেশ্বরীর

রক্ষিতা। আজ নোখেরামের মনে হইল, তাহার এই ত্রুটিটা পূরণ করিবার অবকাশ মিলিল।

ভোলাকে সাহস দিয়া সে বলিল, তুমি এখানে স্বচ্ছন্দে থাক ভোলা, কোনো ভয় নাই। যা কিছু দরকার, আমায় এসে বলো। আর তোমার বৌ রয়েছে, তারও কিছু কাজ জুটে যাবে। গোলায় ফসল তোলা, ধান ঝাড়া, শুকোতে দেওয়া, ঝাড়া বাছা, কাজ কি কম?

ভোলা অনুনয় করিয়া বলিল, হুজুর, একবার কামতাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, বাপের সঙ্গে কি এমন ধারা ব্যবহার করা সাজে? ঘর আমিই উঠিয়েছি, গোরু মোষ আমিই কিনেছি। আর ও কিনা সব কিছু হাতে করে আমাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল! এ যদি অন্যায় না হয় তবে কি! আপনি আমাদের মালিক, আপনার দরবারে এর একটা মীমাংসা হওয়া তো চাই।

নোখেরাম বুঝাইল, ওর সঙ্গে লড়াই করে তুমি ফল পাবে না। ওর বিচার ভগবানই কোরবেন। বেইমানি করে আজ পর্যন্ত কেউ কি সুফল পেয়েছে? সংসারে যদি অন্যায়ই না থাকবে, তবে আর একে নরক বলে কেন? এখানে ধর্ম আর ন্যায়ের কথা কে বলে? ভগবান সব দেখছেন। সংসারের খুঁটিনাটি খোঁজও তিনি রাখেন। তোমার মনটায় এখন কি রকম হোচ্ছে, তা কি তাঁর কাছে লুকোনো আছে? এ জন্যেই বলে, তিনি অন্তর্যামী। তাঁকে ঠকিয়ে কে পার পাবে? তুমি চুপ করে থাক, ঈশ্বরের ইচ্ছে হোলে এখানেও তুমি বাড়ির চেয়ে খারাপ থাকবে না।

এই খান হইতে ভোলা হরির কাছে গিয়া আপনার দুঃখের কাহিনী বলিয়া কান্নাকাটি করিল। হরিও নিজের অতীত কাহিনী শুনাইল। আর বল কেন, আজকালকার ছেলেদের কথা বলো না। প্রাণপাত করে তাদের পালন কর, আর যেই জোয়ান হবে অমনি তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। এই আমার গোবরকেই দেখ। মায়ের সঙ্গে সেই যে ঝগড়া করে চলে গেল, আজ এক বচ্ছর হয়ে গেল, না চিঠি, না পত্তর। ওর কাছে তো মা বাপ মরেই গেছে। মেয়ের বিয়ে ঘাড়ে এসে পড়েছে, তা ওর একটুও খেয়াল নেই। ক্ষেতি বাঁধা দিয়ে দুশ টাকা ধার করেছি, মান ইজ্জত তো বজায় রাখতে হবে।

কামতা রাগের মাথায় বাপকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছে, বাপ কতখানি কাজের লোক ছিল। ভোরে উঠিয়া ধোওয়া পাখলা করা, দুধ

দোয়ান, তাহার পর দুধ লইয়া বাজারে যাওয়া, ফিরিয়া আসিয়া গোরু বাছুরের খাবার দেওয়া, আবার দুধ দোয়ান; কত কাজ! এক পক্ষের মধ্যেই উহার মাথা বিগড়াইয়া গেল। স্বামী স্ত্রীতে বিরোধ বাধিল। স্ত্রী বলে, প্রাণে মরার জন্য আমি তোমার সংসারে আসি নাই। আমাকে খেতে দিতে না পার, বেশ, আমি বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি। কামতার ভয় হইল, এ যদি কোথাও চলিয়া যায়, তবে রুটি বানাইবারও কেহ থাকিবে না, নিজের হাতে তাহাও করিতে হইবে। তখন একটা লোক রাখিল, কিন্তু তাহাকে দিয়া কাজ চলে না। চাকর থলিভরা ভূষি চুরি করিয়া বেচিতে লাগিল; উহাকে উঠাইয়া দিল। তখন স্ত্রীপুরুষে আবার লড়াই শুরু হইল। স্ত্রী এবার রাগ করিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গেল। কামতার হাত পা আর চলে না। হার মানিয়া ভোলার কাছে আসিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, বাবা, আমার যা কিছু ভুল হয়েছে, ক্ষমা কর। আর চল, এবার ফিরে তোমার ঘর সামলাও। আমাকে যেমন রাখবে, তেমন থাকব।

এখানে মজুরগিরি ভোলার পোষাইতেছিল না। প্রথম দুই তিন মাস যে খাতির পাইয়াছিল তাহা এখন নাই। নোখেরাম আজকাল কখনও কখনও উহাকে তামাক সাজিয়া দিতে, চারপাই বাহির করিয়া দিতেও বলে। বেচারা ভোলা তাহাও মুখ বুজিয়া সহ্য করে। নিজের ঘরে লড়াই দাঙ্গা যাহাই হউক, কাহারও তাঁবেদারি করিতে তো হইত না।

উহার স্ত্রী নোহরী কিন্তু এই প্রস্তাব শুনিয়া খেঁকাইয়া উঠিল, যেখান থেকে লাথি খেয়ে চলে এসেছ, সেখানেই ফের যাবে? তোমার লজ্জা নেই? ভোলা বলিল, তা এখানেই বা কোন্ সিংহাসনে বসে আছি! নোহরী বাঁকা হাসিয়া বলিল তা তোমার যেতে হয় তুমি যাও, আমি কিন্তু যাচ্ছি না।

ভোলা জানিত, নোহরী বিরোধিতা করিবে। তাহার কারণ কিছু কিছু আন্দাজ করে, কিছু চোখেও দেখিয়াছে। উহার এখান হইতে পলাইতে চাহিবার তাহাও এক কারণ। এখানে ওকে কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, কিন্তু নোহরীর ভারি খাতির। পেয়াদা পাইকেরা পর্যন্ত ওর শাসন মানে। স্ত্রীর কথায় ভোলার রাগ হইল, কিন্তু করে কি? নোহরীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার সাহস যদি ওর থাকিত, তবে নোহরীও আস্তে আস্তে ওর পিছু ধরিত। ভোলার অবর্তমানে একলা নোহরীকে রাখিবার সাহস নোখেরামের

নাই, পর্দার আড়াল থেকে শিকার খেলানই উহার স্বভাব, এদিকে নোহরী কিন্তু ভোলাকে চিনিয়া লইয়াছে। ভোলা মিনতি করিয়া বলিল, দেখ্ নোহরী, বিরক্ত করিস না। এখন তো বৌরাও কেউ ওখানে নেই, তোর হাতেই সব কিছু থাকবে। এখানে মজুরগিরি করলে সমাজে কতখানি বদনাম হবে, তা একবার ভেবে দেখ।

নোহরী মুখ ঝামটা দিয়া বলিল, তোমার যেতে হয়, যাও। আমি তো তোমাকে আটকাতে পারবো না। ছেলের লাথি তোমার মিষ্টি লাগতে পারে, আমার লাগবে না। আমি নিজের মজুরগিরিতে বেশ আছি।

ভোলাকে থাকিতেই হইল, আর কামতা খোসামোদি করিয়া সাধ্যসাধনা করিয়া নিজের বৌকে নিয়া আসিল। এদিকে নোহরীর বিষয়ে কানাঘুসা চলিতে লাগিল, 'নোহরী আজ কী সুন্দর একটা গোলাপী শাড়ী পরিয়াছে। আর বল কি, রোজ একটা নতুন শাড়ী পরে। কোতোয়াল যার বন্ধু তার কাকে ভয়? ভোলার কি চোখ নাই নাকি?'

শোভা ভারি ফুর্তিবাজ লোক। সারা গাঁয়ের বিদূষক, নারদও বলা যায়। প্রত্যেক কথায় গোয়েন্দাগিরি করা তার স্বভাব।' একদিন নোহরীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত। একটু হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া ফেলিয়াছিল। নোহরী নোখেরামকে বলিয়া দেয়, ফলে তাহার কাছে শোভার তলব হইল। আর এমন কিছু লাঞ্ছনা লাভ হইল, যাহা শীঘ্র ভুলিবে না।

একদিন লালা পটেশ্বরী প্রসাদের ঘাড়ে শনি চাপিল। গ্রীষ্মকাল। লালাজী বাগানে বসিয়া আম পাড়াইতেছিলেন। হঠাৎ নোহরী সাজগোজ করিয়া কোথা হইতে আসিয়া পড়িল। লালা ডাকিয়া বলিল, নোহরা রানী, এদিকে এসো, কয়েকটা আম তো নিয়ে যাও, ভারি মিষ্টি আম।

নোহরীর ধারণা হইল, লালাজী উহাকে উপহাস করিতেছে। আজকাল উহার বেশ একটু অহঙ্কার হইয়াছে, ও চায়, লোকে ওকে জমিদারনী ভাবুক। আর সেই মত সম্মান করুক। অহঙ্কারী লোকে প্রায়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হয়। আর তুমি নিজের মনে যদি চোর হও, তোমার সন্দেহের ভাব আরো বেশি হইবে। ও আমার দিকে তাকাইয়া হাসিল কেন? সকলে আমাকে দেখিয়া জলিয়া ওঠে কেন? আমি তো কাহারও কাছে কিছু ভিক্ষা করিতে যাই না। কে কত সাধু, একবার আসুক আমার কাছে, সকলকে

দেখিয়া লইব। ইহারই মধ্যে গ্রামের যত গোপন রহস্য সব নোহরী জানিয়া ফেলিয়াছে। এই লালাই তো কাহারনীকে রাখিয়াছে, আবার আমাকে দেখিয়া হাসে? ইহাকে তো কেহ কিছু বলে না, এ যে বড়লোক। নোহরী গরিব, জাতে ছোট, তাই নোহরীকে সবাই উপহাস করে। যেমন বাপ, তেমনি বেটা। ইহার ছেলে রামেশ্বরীই সিলিয়ার পিছন পিছন পাগলের মত ঘোরে। চামার মেয়েদের দিকে তো শকুনির মত ছোটে, তার আবার বড়াই, আমরা কত উঁচু জাতের!

ওখানেই দাঁড়াইয়া নোহরী বলিল, তুমি আবার দাতা কবে থেকে হোলে লালাজী! তুমি তো পেলেই পরের রুটি কেড়ে খাও। আজ বড় মস্ত আমওয়ালা হয়েছো! আমার সঙ্গে লাগলে স্থবিধা হবে না, বলে দিচ্ছি!

ও হো! এই গোয়ালিনীর এত মেজাজ! নোখেরামকে ফাঁসাইয়া মনে করিতেছে, সারা দুনিয়া ওর সাম্রাজ্য! লালা বলিল, তুই এমন মেজাজ দেখাচ্ছিস, যেন এ গাঁয়ে আর কাউকে থাকতে দিবি না। একটু মুখ সামলে কথা বলিস এত শীগগির নিজের কথা ভুলে যেতে নাই।

কেন, আমি কি তোমার দুয়ারে মেগে খেতে গেছি নাকি?

নোখেরাম ঠাঁই না দিলে, মেগেই খেতে হোত। নোহরী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিল, দাড়িওয়ালা বুড়ো, লম্পট, মুখপোড়া, আরও কত কি। আর রাগে জ্বলিতে জ্বলিতে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নিজের বাসনকোসন বাহিরে টানিয়া ফেলিতে লাগিল।

শুনিয়া নোখেরাম ঘাবড়াইয়া গেল, তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল, আরে এ সব কি হোচ্ছে, নোহরী? কাপড়চোপড় বার করছো কেন? কেউ কিছু বলেছে বুঝি?

পুরুষদের নাচাইবার কলা নোহরীর জানা ছিল। সারা জীবনে ও এই বিদ্যাটাই শিখিয়াছিল। নোখেরাম লেখাপড়া জানা মানুষ। আইন জানে। ধর্মপুস্তকও অনেক পড়িয়াছে। বড় বড় উকিল ব্যারিস্টারকে সোজা করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই মূর্খ মেয়েটির হাতে ও পুতুল বনিয়া গিয়াছে। ভুরু কুঁচকাইয়া নোহরী বলিল, সময়ের ফেরে পড়ে এখানে আসতে হয়েছে, তাই বলে নিজের মান তো খোয়াতে পারি না।

ব্রাহ্মণ সতেজ হইয়া উঠিল। গোঁফ জোড়া সোজা করিয়া বলিল, যে তোর দিকে তাকিয়েছে তার চোখ উপড়ে ফেলব।

নোহরীর মুখে কালো মেঘের ছায়া নামিয়া আসিল, সে বলিল, ঐ পটেশ্বরী যখনই আমাকে দেখে, খারাপ খারাপ কথা বলে। কেউ আমায় পয়সা দেখালে আমার কোন লোকসান নেই; কিন্তু গাঁয়ে আরো তো মেয়ে আছে, কেউ তাদের সঙ্গে কোন কথা বলে না, আমাকেই সবাই উত্যক্ত করে।

নোখেরামের কাঁধে ভূত চাপিল। মোটা ডাণ্ডাটা তুলিয়া লইয়া অন্ধের মত ছুটিয়া চলিল বাগিচার দিকে, আর আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিল, চলে এস, যদি সাহস থাকে। গোঁফ উপড়ে নেব, মাটিতে পুঁতে ফেলব। চলে এস সামনে। আর কোনদিন যদি নোহরীকে জ্বালাতন করবি, তোর রক্ত চুষে খাব। পাটোয়ারীগিরি ঘুচিয়ে দেব। নিজে যেমন, পরকেও তেমন ভাব! কিসের এত গর্ব তোর?

লালা পটেশ্বরী মাথা নীচু করিয়া নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। যেই মুখ খুলিতে যায়, অমনি স্রোতের মত গালাগালি আসিয়া ওর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। এমন অপমান জীবনে ও কোন দিন হয় নাই। একবার রাত্রিবেলা লোকে পুকুরের ধারে উহাকে ধরিয়া খুব মারিয়াছিল, কিন্তু গাঁয়ের লোক জানিতে পারে নাই। আর আজ সারা গাঁয়ের চোখে উহার ইজ্জত নষ্ট হইয়া গেল। কাল যে মেয়েটি গাঁয়ে আসিয়াছিল আশ্রয় চাহিতে, আজ সারা গাঁ তাহার ভয়ে ভীত। আজ কাহার সাধ্য উহাকে কিছু বলে। পটেশ্বরীরই যদি সাহস নাই, তবে অন্যের আর কথা কি!

এখন নোহরী তো গাঁয়ের রানী। উহাকে আসিতে দেখিলে চাষীরা উহার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। আর নোহরীকে অল্পসল্প পূজা দিলেই যে নোখেরামকে দিয়া অনেকখানি কাজ পাওয়া যাইবে, সে রহস্য কাহারও অজানা নাই। কাহারও ভাগ বাটোয়ারা করাইতে হইবে, খাজনার জন্য কাহারও হাওলাত চাই, বাড়ি তৈয়ারির জন্য কাহারও জমি চাই, নোহরীকে তুষ্ট না করিলে কোন কাজ হইবার জো নাই। কত ভাল ভাল চাষীদের ও মুখঝামটা দেয়। চাষী দূরের কথা, কারকুন সাহেবের উপরও এখন হুমকি চালায় নোহরী।

নোখেরামের আশ্রিত হইয়া থাকিতে ভোলার প্রাণ আর চায় না। স্ত্রীর রোজগারে খাওয়ার অপেক্ষা খারাপ কাজ আর কি হইতে পারে? ও তো মাসে মোট তিনটি টাকা পায়, তাহাও হাতে আসিয়া পৌছায় না। নোহরী আগে-ভাগেই খরচ করিয়া বসিয়া থাকে। উহাকে তামাক খাইতে একটি আধলা দিবে না,

এদিকে নোহরীর দিনে তুই আনার পান আসিবে। যে কেহ আসিবে, উহাকে খাটাইয়া লইবে। পেয়াদা উহাকে দিয়া তামাক সাজায়, কাঠ কাটাইয়া লয়। বেচারা দিনভর খাটিয়া খুটিয়া আসিয়া দরজার কাছে গাছের নীচে খাটিয়ার উপর পড়িয়া থাকে, এক ঘড়া জল দিবারও কেহ নাই। দুপুরের বাসি রুটি রাত্রিতে খাইতে হয়, তাহাও হয় নুন দিয়া, না হয় নুন জল দিয়া।

অবশেষে আর না পারিয়া ও ঠিক করিল, বাড়ি ফিরিয়া কামতার সঙ্গেই থাকিবে। আর কিছু না হউক, এক টুকরা রুটি তো জুটিবে? নিজের ঘর তো।

নোহরী বলিল, আমি ওখানে কারু গোলামি কোরতে যাব না।

মন শক্ত করিয়া ভোলা বলিল, তোমাকে কে যেতে বলছে? আমি বলছি, আমার নিজের কথা।

তাহলে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবে? বলতে লজ্জা হোচ্ছে না?

লজ্জা তো ধুয়ে খেয়েছি।

কিন্তু আমি তো লজ্জার মাথা খাই নি। তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।

তুই যদি নিজের মনের মতই চলবি, তবে আমি কেন তোর গোলামি কোরবো?

মনে রেখো, পঞ্চায়েত ডেকে মুখে কালি লাগাবো।

কালি মাখাতে কি বাকি আছে—আমাকে এখনো তুই ফাঁকি দিতে চাস?

তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন রোজ আমায় কত খানা গয়না গড়িয়ে দিচ্ছ। নোহরী কারু তাঁবে থাকার পাত্র নয়।

ভোলা ঝাঁঝিয়া উঠিয়া উঠান হইতে চেলা কাঠ তুলিয়া লইল। তখনই নোহরী ছুটিয়া আসিয়া উহার হাত ধরিয়া ফেলিল। উহার বলিষ্ঠ বাহুপাশ হইতে মুক্ত হওয়া ভোলার পক্ষে অসম্ভব। চুপ করিয়া একদিকে বসিয়া পড়িল। একদিন যৌবন ছিল, যখন ও কত মেয়েকে আঙ্গুলে করিয়া নাচাইয়াছে। আর আজ ও এক মেয়ের করপাশে এমন ভাবে বাঁধা পড়িয়াছে যে বাহির হওয়ারই শক্তি নাই। হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া ও পর্দা ফাঁস করিতে চায় না; নিজের শক্তির সীমা যে ও বুঝিয়াছে। কিন্তু ও কেনই বা নির্ভয়ে বলিয়া দিবে না যে, তোকে দিয়া আমার আর প্রয়োজন নাই, আমি তোকে ত্যাগ

করিলাম? পঞ্চায়েতের ভয় দেখাইয়াছে; তা, পঞ্চায়েত কি কাহারও একলার হাতধরা? তোর যদি পঞ্চায়েতের ভয় না থাকে, আমি কেন পঞ্চায়েতকে ভয় করিব?

কিন্তু এই ভাব কথায় ব্যক্ত করিতে তাহার সাহস হইল না। নোহরী যেন উহার উপর বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছে।

## ২৬

লালা পটেশ্বরী পাটোয়ারীদের সদ্‌গুণের মূর্তিমান অবতার ছিল। কোনও প্রজা আর একজনের ইঞ্চি পরিমাণ জমিও চাপিয়া রাখিয়াছে, ইহা সে দেখিতে পারিত না। প্রজা কোনও মহাজনের টাকা মারিতেছে, এও সে সহ্য করিতে পারিত না। গাঁয়ের সমস্ত প্রাণীর স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল তাহার পরম ধর্ম। মিটমাট করানো বা গোলমাল মেটানোয় সে বিশ্বাস করিত না; ও তো নির্জীবতার লক্ষণ। সে নিজে ছিল সংঘর্ষের উপাসক, তাহাই যে জীবনের লক্ষণ; ভবিষ্যতে তাহাই বাড়াইবার প্রয়াস করিয়া এক একটা ফুলঝুরি ছাড়িয়া দিত। মংরু সার উপর তাহার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল; মংরু গাঁয়ে সব চেয়ে ধনী, কিন্তু স্থানীয় দলাদলিতে মাথা গলাইত না। প্রভাব বা অধিকারের লালসা তাহার ছিল না। তাহার বাড়িও ছিল গাঁয়ের বাহিরে, সেখানে সে একটি বাগান, একটা কুয়া ও ছোটখাট এক শিবমন্দির বানাইয়া লইয়াছিল। ছেলেপুলে ছিল না; এজন্য টাকা দেওয়া-নেওয়াও কম করিয়া দিয়াছিল, পূজাপাঠেই বেশির ভাগ লাগিয়া থাকিত। কত প্রজাই তাহার টাকা হজম করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু সে কাহারও নামে নালিশ-ফরিয়াদ করে নাই। হরির কাছেও তাহার সুদ-টুদ মিলাইয়া প্রায় দেড় শ টাকা পাওনা হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু না ছিল হরির ঋণশোধের চিন্তা, না ছিল তাহার সে টাকা আদায়ের ভাবনা। দুই চার বার সে তাগাদা করিয়াছিল, ধমক-টমকও দিয়াছিল, কিন্তু হরির অবস্থা দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এবারকার বরাতক্রমে হরির আখ সমস্ত গাঁয়ে সব চেয়ে বেশি হইয়াছিল; খুব কম পক্ষে তাহার মোটমাট দুই শ আড়াই শ ঘরে আসিবে, লোকে এরূপ অনুমান করিত। পটেশ্বরীপ্রসাদ মংরুকে বুঝাইল,

যদি এ সময় হরির উপর চাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত টাকাটা আদায় হইবে। মংরু ততটা দয়ালু নয়, যতটা আলসে, ঝঞ্ঝাটে পড়িতে চাহিত না। কিন্তু পটেশ্বরী যখন আশ্বাস দিয়াছে যে তাহাকে একদিনও কাছারি যাইতে হইবে না, তাহার আর কিছু কষ্ট হইবে না, ঘরে বসিয়া ডিক্রী পাইয়া যাইবে, তখন সে নালিশ করিবার সম্মতি দিয়া দিল, আর আদালতের খরচার জন্য টাকাও দিল। এদিকে তাহার জন্য যে কি খিচুড়ি রান্না হইতেছে, সে খবর হরি পায় নাই। কবে নালিশ দায়ের হইল, কখন যে ডিক্রী হইল, তাহার সন্ধান সে একেবারেই করে নাই। ক্রোকের আমিন তাহার আখ নিলাম করিতে আসিল, তবে তাহার হুঁশ হইল। গাঁ শুদ্ধ সমস্ত লোক ক্ষেতের ধারে আসিয়া ভিড় করিল। হরি মংরু সার কাছে দৌড়াইল, আর ধনিয়া পটেশ্বরীকে গালি দিতে লাগিল। উহার সহজবুদ্ধি বলিয়া দিল যে এ পটেশ্বরীরই কারসাজি; কিন্তু মংরু সা পূজায় বসিয়াছিল, দেখা করিতে পারিল না, আর ধনিয়া গালিবর্ষণ করিয়াও পটেশ্বরীর কিছু করিতে পারিল না। ওদিকে আখ দেড় শ টাকায় নিলাম হইয়া গেল, আর মংরু সার নামেই ডাক হইল। অন্য কেহ ডাকিতে পারিল না; ধনিয়ার গালি শুনিবার সাহস দাতাদীনেরও ছিল না।

ধনিয়া হরিকে উত্তেজিত করিয়া বলিল—বসে আছ কেন, গিয়ে পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা কর না কেন, গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে এই ব্যবহার? এই তোমার ধর্ম?

হরি দীনভাবে বলিল—জিজ্ঞাসা করার মুখই বা কি রেখেছিস! তোর গালাগাল কি আর ও শুনতে পায় নাই?

যে গালাগাল খাওয়ার কাজ করে, তার ভাগ্যে গালাগাল তো আছেই।

তুই গালাগালও দিবি, আবার ভাই সম্পর্কও পাতাবি?

দেখব, আমার ক্ষেতের ত্রিসীমানায় কে আসে।

মিলের লোকেরা এসে যদি কেটে নিয়ে যায়, তবে তুই-ই বা কি করবি, আর আমিই বা কি করব? ইচ্ছে করলে গালাগাল দিয়ে নিজের জিভের চুলকানি মিটিয়ে নিতে পার।

আমি বেঁচে থাকতে আর কেউ এসে আমার ক্ষেতের ফসল কেটে নিয়ে যাবে?

হাঁ, হাঁ, তুই আর আমি দুজনাই বেঁচে থাকতে থাকতে। সমস্ত গাঁয়ের লোক একত্র হয়েও তা বন্ধ করতে পারবে না। এখন আর ও জিনিস আমার নয়, মংরু সার।

মংরু সা কি মরে মরে জষ্ঠির দুপুরে সেঁচ করেছে, আখের গোড়া খুঁড়ে দিয়েছে ?

ও সব তুই করেছিলি ; কিন্তু এখন ও জিনিস মংরু সার হয়ে গেছে। ওর কাছে টাকা কর্জ করি নাই ?

আখ তো গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন সমস্যা আসিয়া উপস্থিত। এই আখ বাঁধা রাখিয়াই দুলারী টাকা ধার দিতে চাহিয়াছিল। এখন কি বাঁধা রাখিয়া টাকা দিবে? এখনও তাহার আগেকার দুই শ বাকি পড়িয়া আছে। ভাবিয়াছিল, আখ হইতে পুরানো টাকাটা পাওয়া যাইবে, তাহার পর নতুন হিসাব আরম্ভ হইবে। তাহার দৃষ্টিতে হরির ক্ষমতা ছিল দুই শ টাকা পর্যন্ত। তার বেশি ধার দেওয়া বিপদের কথা। বিবাহ একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল ; তিথি ঠিক হইয়া গিয়াছিল ; গৌরী মাহাতো হয়তো সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছে। এখন বিবাহের নড়চড় করা অসম্ভব। হরির এমন রাগ হইতেছিল যে দুলারীর গলা টিপিয়া ধরে। যত দূর অনুনয় বিনয় করা যাইতে পারে, সব করিয়াছে ; কিন্তু সে পাথরের দেবতা, একটুও ভিজে নাই। সে চলিতে চলিতে হাত জোড় করিয়া বলিয়াছে—দুলারী, আমি তোমার টাকা নিয়ে পালাব না, এত শীগ্‌গির মরেও যাব না। ক্ষেত আছে, গাছপালা আছে, বাড়ি আছে, জোয়ান ছেলে আছে। তোমার টাকা মারা যাবে না, আমার ইজ্জৎ নষ্ট হচ্ছে, তা রক্ষা কর। কিন্তু দুলারী দয়া ও ব্যবসা একত্র মিশাইতে স্বীকার করিল না ; যদি ব্যবসা না করিয়া দয়া করিতে পারিত, তবে তাহার কোনও আপত্তি হইত না। কিন্তু দয়ার ব্যবসা করিতে সে শিখে নাই।

হরি বাড়ি আসিয়া ধনিয়াকে বলিল—এখন ?

ধনিয়া তাহার উপর মনের ঝাল ঝাড়িয়া বলিল—তুমি তো এই চেয়েছিলে।

হরি মর্মাহত হইয়া বলিল—আমারই দোষ ?

যারই দোষ হোক। তোমার মনেই এভাব হয়েছিল।

তোর কি ইচ্ছা যে জমি রেহান রেখে টাকা নেব ?

জমি রেহান রাখবে, তো খাবে কি করে ?

মজুরি।

কিন্তু জমি দুজনারই সমান প্রিয় ছিল। তাহারই উপর তাহাদের ইজ্জৎ আর আবরু নির্ভর করিত। যাহার জমি নাই, সে গৃহস্থ নয়, সে মজুর।

হরি কোনও জবাব না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে কি বলিস?

ধনিয়া আহত স্বরে বলিল—বলব কি! গৌরী বরযাত্রী নিয়ে আসবে। এক বেলা কোনও রকমে খাইয়ে দিয়ে সকালে মেয়ে বিদায় করব। দুনিয়া হাসবে, হাসুক। ভগবানের যখন এই ইচ্ছে যে আমার নাক কাটা যায়, আমার মুখে কালি পড়ে, তখন আমি তার কি করব।

সহসা দেখা গেল নোহরী বুটিদার শাড়ী পরিয়া সামনে দিয়া যাইতেছে। হরিকে দেখিয়াই সে ঘোমটাটা একটু সরাইয়া দিল। তাহার সঙ্গে সম্পর্কটা স্বীকার করিত।

ধনিয়ার সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়াছিল। সে ডাকিল—আজ কোনদিকে চলেছ বেয়ান? এস, বস।

নোহরী দিগ্বিজয় করিয়া লইয়াছিল, আর এখন জনমতকে নিজের পক্ষে আনিতে প্রয়াস করিতেছিল; আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

ধনিয়া তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—আজ ভুল করে এদিকে এলে যে বড়?

নোহরী কুণ্ঠিত স্বরে বলিল—এম্নি তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে এলাম; মেয়ের বিয়ে হচ্ছে কবে?

ধনিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল—ভগবানের হাতে, যবে হয়ে যায়।

আমি তো শুনেছি, এই কাছাকাছিই হবে। দিন ঠিক হয়ে গেছে?

হাঁ, তিথি তো ঠিক হয়ে গেছে।

আমায়ও নেমন্তন্ন কোরবে তো?

তোমারই মেয়ে, নেমন্তন্ন কি!

যৌতুকের জিনিসপত্র এনেছ তো? আমিও একটু দেখে যাই।

ধনিয়া গোলমালে পড়িল, কি বলে! হরি তাহাকে সামলাইয়া দিল, বলিল —এখনও তো কোনও জিনিসপত্র আনি নাই, আর জিনিসপত্র কি আনব, শাঁখা-সিঁদূর তো দেব।

নোহরী একবার অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে তাকাইল—শাঁখা-সিঁদূর দিয়ে কেন দেবে মাহাতো, প্রথম মেয়ে, মন খোলসা করে কাজ কর।

হরি হাসিল, যেন বলিতেছে, তোমার চার দিক হয়তো সবুজ দেখাইতেছে, এখানে তো সমস্তই শুষ্ক।

টাকাপয়সার টানাটানি, কি মন খোলসা করে কাজ করব! তোমার কাছে ঢাকাঢাকি করে লাভ কি?

ছেলে কামাচ্ছে, তুমি কামাচ্ছ, তবু টাকা পয়সার টানাটানি! কি করে বিশ্বাস করি?

ছেলে যদি লায়েকই হবে, তবে আর কাঁদব কেন? টাকা পাঠাবে কি, চিঠিপত্রই দেয় না। এক বছর হয়ে গেছে, একখানা চিঠি নাই।

এমন সময় সোনা বলদগুলির খাবারের জন্য এক বোঝা ঘাস মাথায় লইয়া, যৌবনকে আঁচলে ঢাকিতে ঢাকিতে, বালিকার মত সরল ভাবে আসিল, আর সে বোঝা ঐখানে ফেলিয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

নোহরী বলিল—মেয়ে তো খুব বড় সড় হয়ে গেছে।

ধনিয়া বলিল—মেয়ের বাড়, বেড়ীর বাড়। হল এই কয় বছরের।

বর তো ঠিক হয়ে গেছে, না?

হাঁ, বর তো ঠিক আছে। টাকার বন্দোবস্ত হয়ে গেলে এই মাসে বিয়ে দিয়ে দেব।

নোহরীর মনে কিছু থাকিত না। এদিকে সে অল্প সল্প টাকা জমাইয়াছিল, তাহা পেটে আঁকুপাকু করিতেছিল। 'যদি সোনার বিয়েতে কিছু টাকা দিয়া দেয়, তাহলে কতখানি নামযশ হয়! সমস্ত গাঁয়ে তার নাম হয়ে যাবে। লোকে চমকে উঠে বলবে, নোহরী এত টাকা দিয়ে দিয়েছে! বড় দয়া তো! হরি আর ধনিয়া দুইজনে ঘরে ঘরে তার প্রশংসা করে বেড়াবে। গাঁয়ে ওর মান-সম্মান কতখানি বেড়ে যাবে! যারা ওকে দেখে আঙ্গুল দেখায়, তাদের মুখ সেলাই করে দেবে, ওকে দেখে টুঁ শব্দটি করে, কি হাসাহাসি করে, কার সাধ্য। এখন সমস্ত গাঁ হল ওর দুশমন, তখন সারা গাঁ হবে হবে ওর হিতৈষী।' এই কল্পনায় নোহরীর মনের বন্ধন খুলিয়া গেল।

অল্প সল্প দিয়ে কাজ চলে তো আমার কাছ থেকে নাও, হাতে টাকা এলে দিয়ে দিও।

হরি ও ধনিয়া দুই জনেই তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিল। নাঃ, নোহরী ঠাট্টা

করিতেছে না। দুইজনের চোখে বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা, সন্দেহ, লজ্জা। নোহরীকে লোকে যতটা খারাপ মনে করে তত খারাপ সে নয়।

নোহরী আবার বলিল—তোমার আর আমার ইজ্জৎ তো এক। তোমার নামে হাসাহাসি করলে কি আমার গায়ে লাগবে না? তা সে যেমন কথাই হোক; তার ওপর আবার তুমি তো এখন আমাদের কুটুম।

হরি সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—তোমার টাকা তো ঘরেই আছে, যখন দরকার পড়বে নিয়ে নেব। লোকে নিজের লোকের ভরসাই তো করে, কিন্তু বাইরের থেকে ব্যবস্থা হয়ে যায় যদি তবে ঘরের টাকায় কেন হাত দিই?

নোহরী আত্মীয়তা জানাইল—ঘরে যখন টাকা আছে, তখন বাইরের লোকের সামনে হাত পাতি কেন? সুদও দিতে হবে, স্ট্যাম্পও লাগবে, সাক্ষী আন, দস্তুরি দাও, খোসামোদ কর; হাঁ, আমার টাকা ছুঁলে যদি দোষ হয় তবে সে কথা আলাদা।

হরি সামলাইয়া বলিল—না, না, নোহরী, ঘরে যখন কাজ চলে যায় তখন বাইরে হাত পাতি কেন? কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথা। খামারবাড়ির ভরসা নাই। তোমার তাড়াতাড়ি কোনও দরকার হল, আমি টাকা জোটাতে পারলাম না, তাহলে তোমারও খারাপ লাগবে, আমারও প্রাণসঙ্কট। তাই বলছিলাম। নাঃ, মেয়ে তো তোমারই।

আমার টাকার এত তাড়াতাড়ি দরকার নাই।

তাহলে তোমার কাছ থেকেই নিয়ে নেব। কন্যাদানের ফল কেন বাইরে যায়?

কত টাকা চাই?

তুমি কত দিতে পারবে?

এক শ টাকায় কাজ চলে যাবে?

হরির লোভ হইল। ভগবান যদি ছাদ ফুঁড়িয়া টাকা দেন, তাহা হইলে যতটা লইতে পারে ততটা কেন লইবে না?

এক শ টাকাতেও চলে যাবে, পাঁচ শ টাকাতেও চলবে। যেমন ইচ্ছা।

আমার কাছে মোট দু শ টাকা আছে, তা আমি দিয়ে দেব।

ওতে হেসে খেলে কাজ চলে যাবে। ঘরে ধান আছে। কিন্তু ঠাকরুণ, আজ তোমায় বলছি, আমি তোমাকে এতখানি লক্ষ্মী মনে করতাম না। আজকালকার

দিনে কে কাকে সাহায্য করে, আর আছেই বা কার কত। আমি ডুবছিলাম, তুমি বাঁচিয়েছ।

সন্ধ্যাবাতির সময় হইল। ঠাণ্ডা পড়িতে শুরু হইয়াছে। জমি নীল চাদর পরিয়া লইয়াছে। ধনিয়া ভিতরে গিয়া আগুনের কড়াই নিয়া আসিল; সকলে হাত পা সেঁকিতে লাগিল। দেয়ালের আলোতে কান্তিমতী, সুরসিকা, কুলটা নোহরী তাহাদের সামনে বসিয়া আছে, যেন ভগবানের আশীর্বাদ। এই সময়ে তাহার চোখে কতখানি সহৃদয়তা ছিল, গালে কতখানি লজ্জা, ওষ্ঠে কতখানি সাধু প্রেরণা!

কিছুক্ষণ ধরিয়া এ কথা সে কথার পর নোহরী উঠিয়া দাঁড়াইল, আর এই বলিয়া সে বাড়ি চলিল—এখন দেরি হয়ে গেল; কাল তুমি এসে টাকা নিয়ে যেও মাহাতো।

চল, তোমায় পৌছে দিই।

না না, তুমি বস, আমি চলে যাই।

প্রাণ তো চায়, তোমায় কাঁধে করে পৌছে দিয়ে আসি।

নোখেরামের চৌবাড়ি গাঁয়ের অন্য মাথায়, আর বাহির দিয়া যাইবার রাস্তা পরিষ্কার ছিল। দুই জনে সেই রাস্তায় চলিল। এখন চারিদিকে অন্ধকার।

নোহরী বলিতেছিল—বাহাদুরকে একটু বুঝিয়ে দাও না। কেন সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে? যখন এদের মধ্যে থাকতে হবে, তখন এমন ভাবে থাকাই ভাল যে লোকে আপনার হয়ে যায়। আর ওর তো হল সকলের সঙ্গে লড়াই, সকলের সঙ্গে ঝগড়া। আমায় তুমি যতক্ষণ পরদার ভিতরে রাখতে না পার, আমায় অন্যের মজুরি করতেই হবে, তা এ কি করে হয় যে আমি কাউকে দেখে হাসব না, কারু সঙ্গে কথা বলব না, কেউ আমার দিকে তাকাবে না, হাসবে না। এ সব তো পরদার মধ্যে রাখলেই হতে পারে। জিজ্ঞাসা কর, কেউ আমার দিকে যদি তাকায় কি আমার আশে পাশে ঘোরে, তাহলে আমি কি করব। তাদের চোখ তো গেলে দিতে পারি না! তার ওপর মেলা কি পরবের সময় লোকের অসংখ্য কাজ জুটে যায়। যেমন সময় তেমনি বুঝে চল। তোমার বাড়িতে হাতির বাহার ছিল, এখন সে কথায় তোমার কি লাভ। এখন তো তুমি তিন টাকার মজুর। আমার বাড়িতে তো মহিষ বাঁধা থাকত, তবু এখন মজুরনী; কিন্তু ওর মাথায় কোনও কথা ঢোকে না। কখনও ছেলেদের সঙ্গে

থাকবে মনে করে, কখনও ভাবে লখনৌ গিয়ে থাকবে। আমাকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখেছে।

হরি মন জোগাইয়া বলিল—এ ভোলার একেবারে বেকুবি। বুড়ো হয়েছে, এখন তো ওর বোঝা উচিত। আমি বুঝিয়ে বলব।

তাহলে সকালে এস, টাকা দিয়ে দেব।

কিছু লেখাপড়া…

তুমি আমার টাকা হজম করবে না, এ আমি জানি।

তাহার বাড়ি আসিয়া গেল। সে অন্দরে চলিল। হরি ঘরে ফিরিল।

## ২৭

শহরে আসিবার পর গোবর দেখিতে পাইল যে, যে আড্ডায় সে নিজের ঝুড়ি লইয়া বসিত, সেখানে আর একজন ফিরিওয়ালা বসিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর খরিদদারেরা এখন গোবরকে ভুলিয়া গিয়াছে। ওই ঘরও এখন তাহার কাছে পিঁজরার মত লাগিতেছে। ঝুনিয়া সে ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া কাঁদে। ছেলের অভ্যাস ছিল, দিনভর আঙ্গিনায় কি দরজায় খেলা করে; এখানে তাহার খেলার কোনই জায়গা ছিল না। কোথা যায়? দরজার ওধারে দুহাত রাস্তা আছে কি না সন্দেহ। বাতাসে দুর্গন্ধ ভাসিয়া আসে: গরমে কোথাও বাহিরে শোওয়া-বসার জায়গা নাই। ছেলে মাকে এক মুহূর্তও ছাড়িয়া থাকে না। যখন খেলিবার কিছু পায় না, তখন দুধ কি আর কিছু খাওয়া ছাড়া সে আর কিই বা করে! বাড়িতে কখনও ধনিয়া খেলা দিত, কখনও রূপা, কখনও সোনা, কখনও হরি, কখনও পুনিয়া। এখানে একলা ঝুনিয়া, তাহাকে আবার বাসার সমস্ত কাজও করিতে হয়।

গোবর ছিল যৌবনের নেশায় পাগল। তাহার অতৃপ্ত লালসা বিষয়ভোগের সাগরে ডুবিয়া যাইতে চাহিত। কোনও কাজে তাহার মন লাগিত না। ঝুড়ি লইয়া যাইত, এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিত। মনোরঞ্জনের অন্য কোনও উপকরণ ছিল না। প্রতিবেশী মজুর আর একাওয়ালা সারা রাত তাস ও জুয়া খেলিত। প্রথমে সেও খুব খেলিত; কিন্তু এখন ঝুনিয়ার সঙ্গে হাস্য পরিহাসই তাহার মনোরঞ্জনের একমাত্র উপকরণ। অল্প দিনেই ঝুনিয়া এই জীবন হইতে উবিয়া গেল; ঝুনিয়া চাহিত কোথাও বিরলে গিয়া বসে, খুব নিশ্চিন্ত

হইয়া শোয় ; কিন্তু সেই বিরল আর কোথাও পায় না। উহার এখন গোবরের উপর রাগ হয়। গোবর শহরের জীবনের কত মোহন চিত্র আঁকিয়াছিল, আর এখানে এই নিষ্ঠুর কুঠুরিটি ছাড়া আর কিছুই নাই। শিশুকে দেখিয়াও উহার বিরক্তি লাগিত। কখনো কখনো তাহাকে মারধর করিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিত, আর ভিতর হইতে কবাট লাগাইত। ছেলে বাহিরে কাঁদিতে কাঁদিতে লুটাইয়া পড়িত।

তাহার উপর বিপদ। আর একটি শিশু আসিতেছে। কয়েকদিন আগে বা পরে। সর্বদা মাথা ব্যথা করে। খাইতেও রুচি নাই। এমন ঘুম পায় যে ইচ্ছা করে, এক কোণে চুপচাপ পড়িয়া থাকে। কেহ যেন তাহাকে কিছু না বলে, না নড়ায় ; কিন্তু এদিকে গোবরের নিষ্ঠুর প্রেম স্বাগতের জন্য দরজায় ধাক্কা দিতেছে। স্তনে দুধের নাম নাই, কিন্তু লাল্লু বুকের উপর চড়াও হইয়া আছে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনও দুর্বল হইয়া গিয়াছে। সে যাহা সঙ্কল্প করে, অল্পেই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। সে থাকে শুইয়া, আর লাল্লু আসিয়া জোর করিয়া তাহার বুকের উপর বসে ও স্তন মুখে লইয়া কামড়াইতে থাকে। ছেলে এখন দুই বৎসরের। দাঁতে খুব ধার, মুখে দুধ না পাইলে রাগে সে দাঁত বসাইয়া দেয় ; কিন্তু ঝুনিয়ার মধ্যে এখন এতটুকু শক্তিও নাই যে ধাক্কা দিয়া তাহাকে বুক হইতে সরাইয়া দেয়। সর্বদা তাহার চোখের সামনে মৃত্যু যেন দাঁড়াইয়া আছে। স্বামী ও পুত্র, কাহারও জন্যই তাহার ভালবাসা নাই, সকলেই স্বার্থের বন্ধু। বর্ষার দিনে যখন লাল্লুর দাস্ত হইতে লাগিল, আর সে দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিল, তখন ঝুনিয়া মনে করিল তাহার মাথা হইতে একটা বিপদ সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন এক সপ্তাহ পরে বালক মারা গেল, তখন তাহার স্মৃতি পুত্রস্নেহ অপেক্ষা সজীব হইয়া তাহাকে কাঁদাইতে লাগিল।

আর যখন গোবর বালকের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরেই পুনরায় তাহার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিল, তখন সে ক্রোধে জ্বলিয়া বলিল, তুমি কি পশু ?

ঝুনিয়ার কাছে এখন লাল্লুর স্মৃতি লাল্লু হইতেও বুঝি প্রিয়। লাল্লু যতদিন সামনে ছিল, ততদিন শিশুকে দিয়া সে যতটা সুখ পাইত তাহা হইতে বুঝি কষ্টই পাইত বেশি। এখন লাল্লু তাহার মনে আসিয়া বসিয়াছে, শান্ত, স্থির, সুশীল, সহাস্যবদন। তাহার কল্পনায় এখন বেদনাভরা আনন্দ, তাহাতে বাস্তবের কালো ছায়া নাই। বাহিরের লাল্লু তাহার ভিতরের লাল্লুর প্রতিবিম্ব মাত্র ছিল। সেই

যে প্রতিবিম্ব, যাহা অসত্য, যাহা অস্থির, তাহা তাহার সামনে নাই। সত্য রূপ তো তাহার ভিতরে আছে। ঝুনিয়ার আশা ও শুভেচ্ছায় তাহা সজীব, দুধের পরিবর্তে সে ঐ শিশুকে নিজের রক্ত খাওয়াইয়া মানুষ করিতেছে। ঐ যে বন্ধ কুঠরী, ঐ যে দুর্গন্ধভরা বাতাস, আর ঐ যে দুই বেলার ধোঁয়ার মধ্যে থাকা, এই সকলের খেয়ালই যেন তাহার এখন নাই। এই স্মৃতি তাহার ভিতরে বসিয়া তাহাকে যেন শক্তি প্রদান করিতে লাগিল। বাঁচিয়া থাকিতে যে ছিল তাহার জীবনের ভার, মরিয়া গিয়া সে যেন তাহার প্রাণে প্রাণে মিলিয়া গিয়াছে। তাহার সমস্ত মমতা অন্তর্মুখী হইয়া বাহির সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। গোবর দেরিতেই আসুক, কি শীঘ্রই আসুক, তৃপ্তির সঙ্গে আহার করুক, কি নাই করুক, প্রসন্ন হউক বা উদাসী থাকুক, এখন আর তাহার সে চিন্তা মোটেই নাই। গোবর কি রোজগার করে, আর কি বা খরচ করে, এ সম্বন্ধেও সে পরোয়া করে না। সে যে বাঁচিয়া ছিল তাহা ভিতরে ভিতরে; বাহিরে সে ছিল কেবল নির্জীব যন্ত্র।

তাহার শোকের ভাগী হইয়া, তাহার অন্তর্জীবনে প্রবেশ করিয়া, গোবর তাহার নিকটে যাইতে পারিত, তাহাকে নিজের জীবনের অঙ্গ করিয়া লইতে পারিত; কিন্তু সে তাহার বাহ্যজীবনের শুষ্ক তটের উপর আসিয়া পিপাসু অবস্থায়ই ফিরিয়া যায়।

একদিন সে রুক্ষ স্বরে বলিল—তা লাল্লু লাল্লু করে ক দিন কাঁদতে থাকবে? চার-পাঁচ মাস তো হয়ে গেল।

ঝুনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি আমার দুঃখ বুঝতে পারবে না। নিজের কাজ দেখ। আমি যেমনি আছি তেমনি পড়ে থাকতে দাও।

তুই কাঁদতে থাকলে কি লাল্লু ফিরে আসবে?

ঝুনিয়ার কাছে এ কথার কোনও জবাব ছিল না। সে উঠিয়া আলুর তরকারির জন্য আলু সিদ্ধ করিতে লাগিল। গোবরের মত পাষাণ হৃদয় তাহাকে বুঝিতে পারিল না।

এই দরদের অভাব লাল্লুকে তাহার মনে আরও জীবন্ত করিয়া তুলিল। লাল্লু তাহারই, ইহাতে কাহারও ভাগ নাই, কাহারও হিস্‌সা নাই। এ পর্যন্ত লাল্লু কিছুটা তাহার হৃদয়ের বাহিরেও ছিল, গোবরের হৃদয়েও তাহার কিছু জ্যোতি ছিল। এখন সে সম্পূর্ণরূপে তাহার।

গোবর ফিরি করিয়া জিনিসপত্র বিক্রী করার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া চিনির কলে চাকুরি লইল। মিঃ খান্না প্রথম মিল হইতে উৎসাহ পাইয়া সম্প্রতি এই দ্বিতীয় মিল খুলিয়াছিল। গোবরকে সেখানে খুব সকালে যাইতে হইত, আর সারাদিনের পর সন্ধ্যাবাতি জ্বলিবার সময়ে সে যখন বাড়ি ফিরিত, তখন তাহার দেহের মধ্যে এতটুকুও প্রাণ থাকিত না। গাঁয়ে থাকিতেও উহাকে এর চেয়ে কম মেহনত করিতে হইত না; কিন্তু সেখানে উহার একটুও ক্লান্তি বোধ হইত না। মাঝে মাঝে সে হাঁসিয়া খেলিয়াও লইত। আবার খোলা ময়দানে, উন্মুক্ত আকাশের নীচে, উহার যেন ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইত। সেখানে উহার দেহ যতটা কাজই করুক, মন থাকিত স্বচ্ছন্দে। এখানে শরীরের ততটা মেহনৎ না হইলেও ঐ কলের কোলাহল, ঐ গতি, আর ঝড়ের মত গর্জন, যেন উহার উপর বোঝার মত চাপিয়া রহিত। এখানে ভয়ও ছিল যে, না জানি কবে যেন দণ্ড দিতে হয়। সব শ্রমিকেরই এই দশা; সকলেই তাড়ি বা মদে নিজের নিজের দৈহিক শ্রান্তি ও মানসিক অবসাদ ডুবাইয়া রাখিত। মদে গোবরেরও আগ্রহ জন্মিল; ঘরে আসিত নেশায় চুর হইয়া, এক প্রহর রাত কাটিলে তবে। আর আসিয়া কোন না কোন ছুতা খুঁজিয়া ঝুনিয়াকে গালি দিত, ঘর হইতে বাহির করিয়া দিত, কখনও কখনও মারপিটও করিত।

ঝুনিয়ার এখন এই সন্দেহ হইতে লাগিল যে সে রক্ষিতা বলিয়া বুঝি তাহার এই অপমান হইতেছে; বিবাহিতা স্ত্রী হইলে গোবরের সাধ্য কি যে তাহার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে। বেরাদরি উহাকে দণ্ড দিত, উহার হুঁকা-জল বন্ধ করিয়া দিত। এই ধূর্ত টার সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া সে কী ভুলই না করিয়াছে! সমস্ত দুনিয়ায় উপহাসের পাত্র হইল, লাভও কিছু হইল না। সে গোবরকে নিজের শত্রু বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। না তাহার খাওয়া-দাওয়ার কথা গ্রাহ্য করিত, না নিজের। গোবর যখন তাহাকে মারিত, তখন উহার এত ক্রোধ হইত যে ইচ্ছা করিত গোবরের গলা ছুরি দিয়া চিরিয়া ফেলে। প্রসবের সময় যেমন নিকটে আসিতে থাকিল, তাহার চিন্তাও তেমনি বাড়িতে থাকিল। এই ঘরেই তো তাহার মরণ হইবে। কে তাহাকে দেখিবে শুনিবে, কে তাহাকে সামলাইবে? আর যে গোবর এইভাবে মার-পিট করিতেছে, ঝুনিয়া চলিয়া গেলে তো তাহারও জীবন নরকই হইয়া যাইবে।

একদিন সে কল হইতে জল আনিতে গিয়াছে, পাড়ার একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল—কয় মাস হল রে ?

ঝুনিয়া লজ্জা পাইয়া বলিল—কি জানি দিদি, আমি তো গুনি নাই।

দোহারা শরীর, কালো-রং, বেঁটে, দেখিতে কুরূপা, বড় বড় স্তন—মেয়েটির। তাহার স্বামী এক্কা চালাইত, আর সে নিজে লাকড়ির দোকান করিত। ঝুনিয়া কয়েকবার তাহার দোকান হইতে লাকড়ি আনিয়াছিল। এতটুকুই পরিচয়।

একটু হাসিয়া বলিল—আমার তো মনে হচ্ছে, সময় পুরো হয়ে গেছে। আজ কি কাল হবে। কোনও দাই-টাই ঠিক করেছিস ?

ঝুনিয়া ভয়াতুর স্বরে বলিল—আমি তো এখানে কাউকে জানি না।

তোর মরদ কি রকম, নাকে তেল দিয়ে বসে আছে ?

আমাকে দিয়ে আর তার কি দরকার ?

হাঁ, তাই তো দেখছি। তুই তো আঁতুড় ঘরে ঢুকবি, ধরবার করবার কাউকে চাই না ? শাশুড়ি-ননদ, ছোট জা কি বড় জা, কেউ কি নাই ? কাউকে লোক পাঠিয়ে আনতে হয়।

আমার সব মরে গেছে, থাকা না থাকা সমান।

ঝুনিয়া জল আনিয়া এঁঠো বাসন মাজিতে লাগিল, আর প্রসবের ভয়ে তাহার বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে থাকিল—কি করে কি হবে, ভগবান! উঁহু! বড় জোর মরে যাব? ভালই হবে, জঞ্জাল থেকে রেহাই পাব।

সন্ধ্যাবেলা হইতে তাহার পেটে ব্যথা হইতে থাকিল। সে বুঝিতে পারিল, বিপদের সময় আসিয়াছে। এক হাতে পেট ধরিয়া ঘামে ভিজিয়া সে চুলা ধরাইল, খিচুড়ি নামাইল, আর ব্যথায় কাতর হইয়া সেখানেই মাটিতে শুইয়া পড়িল। রাত প্রায় দশটা বাজে এমন সময় গোবর আসিল, তাহার মুখে গায়ে তাড়ির গন্ধ; হেলিতে দুলিতে পড়ে পড়ে অবস্থায় আসিতেছে, মুখে উট্‌কো বুলি—'আমি কাউকে গ্রাহ্য করি না। যার গরজ আছে, সে এক শ বার থাক, নইলে চলে যাক। আমি কারু রাগ সইতে পারি না। নিজের বাপ-মার রাগ সইতে পারলাম না—যারা জন্ম দিয়েছে। অন্যের রাগ সইব কেমন করে? জমাদার চোখ রাঙ্গায়। এখানে কারো মারপিট সইব না। লোকে না

ধরে ফেল্লে রক্ত খেয়ে ফেলতাম, রক্ত! কাল দেখে নেব বাছাধনকে। ফাঁসি-ই তো হবে। দেখিয়ে দেব, মরদ মরে কেমন করে।' হাসিতেছে, চোট-পাট করিতেছে, গোঁফে তা দিতেছে; ফাঁসির তক্তায় ঝুলিব, তাহাও সই। 'মেয়ের জাত! কতখানি নিমকহারাম হয়! খিচুড়ি নামিয়েছে, আর পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। কেউ থাক চাই না-ই খাক, নিজের বেলায় বেশ মজা করে ফুলকো উড়িয়েছে, আমার জন্য খিচুড়ি; দে কষ্ট যতটা পারিস; ভগবান তোকে শাস্তি দেবেন, তিনি ন্যায় বিচার করেন।'

সে ঝুনিয়াকে জাগাইল না। কিছু বলিলও না। চুপ করিয়া খিচুড়ি থালায় ঢালিল, আর দুই চার গ্রাস মুখে দিয়া বারান্দায় শুইয়া পড়িল। এক প্রহর পরে তাহার ঠাণ্ডা লাগিল। কুঠুরিতে কম্বল লইতে গিয়া ঝুনিয়ার কাতরানি শব্দ শুনিল। নেশা ছুটিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল—কেমন লাগছে রে ঝুনিয়া? কোথাও ব্যথা হয়েছে না কি?

হাঁ, পেটে জোর ব্যথা হচ্ছে।

তুই আগে বলিস্ নাই কেন? এখন এ সময়ে যাই কোথায়?

কাকে বলব?

আমি কি মরে গিয়েছিলাম?

আমি মরি আর বাঁচি, তোমার তাতে কতই ভাবনা!

গোবর ঘাবড়াইয়া গেল। কোথায় যায় দাই খুঁজিতে? এ সময় সে আসিবেই বা কেন? ঘরে তো কিছু নাই-ই, ডাইনি আগে বলিলে কারো কাছ থেকে দুই চার টাকা চাহিয়া লইত। এই হাতেই শ-পঞ্চাশ টাকা হরদম পড়িয়া থাকিত, দুজন খোসামোদ করিয়া যাইত। এই কুলক্ষণা আসিতেই লক্ষ্মী যেন রাগ করিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ কে ডাকিল—একি, তোমার বৌ কি কাতরাচ্ছে? ব্যথা ওঠে নাই তো?

এ সেই মোটা সোটা মেয়েটি, যার সঙ্গে আজ ঝুনিয়ার কথাবার্তা হইয়াছিল, ঘোড়াকে দানা খাওয়াইবার জন্য উঠিয়াছিল। ঝুনিয়ার কাতরানি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে।

গোবর বারান্দায় গিয়া বলিল—পেটে ব্যথা; ছটফট করছে। এখানে দাই পাওয়া যাবে?

ও তো আমি ওকে আজ দেখেই বুঝেছিলাম। কচ্চিসরাইতে দাই থাকে, ছুটে গিয়ে ডেকে আন। বোলো, জলদি চল। ততক্ষণ আমি এখানে বসে আছি।

আমি তো কচ্চিসরাই দেখি নাই, কোন দিকে ?

আচ্ছা, তুমি ওকে পাখা দিয়ে বাতাস কর, আমি ডেকে আনছি। তাই লোকে বলে, আনাড়ি লোককে দিয়ে কোনও কাজ হয় না। ভরা পেট, আর দাইয়ের খোঁজখবর নাই !

এই বলিতে বলিতে সে চলিয়া গেল। মেয়েটির মুখের সামনে লোকে উহাকে চুহিয়া বলে ; উহাই তাহার নাম, কিন্তু মুখ ফিরাইলে বলে 'মুটকি'। কারো কাছে 'মুটকি' নাম শুনিলে সে তাহার সাত পুরুষ উদ্ধার করিয়া দেয়।

গোবর দশ মিনিটও বসে নাই, তাহার মধ্যে সে ফিরিয়া আসিল, আর বলিল—এ রকম হলে সংসারে গরিবের চলে কি করে! রাঁড় বলছে, পাঁচ টাকা নেব তবে যাব ; আর রোজ আট আনা ; বারো দিনে একখানা শাড়ী। আমি বললাম, তোর মুখ পুড়িয়ে দেব। তুই যা চুলোয়। আমি দেখে নেব। বারোটা ছেলের মা কি হই নাই ? তুমি বাইরে যাও গোবরধন, আমি সব করে নেব। সময় পড়লে মানুষই মানুষের কাজে লাগে। চারটা ছেলে খসিয়েছে তো দাই হয়ে গেছে !

সে ঝুনিয়ার কাছে গিয়া বসিল, আর তাহার মাথা নিজের কোলের উপর রাখিয়া তাহার পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—আমি তো আজ তোকে দেখেই বুঝেছিলাম। সত্যি সত্যি বলছি, এই চিন্তায় আমার আজ ঘুম আসে নাই। এখানে তোর কোন্ আত্মীয় বসে আছে !

ঝুনিয়া ব্যথায় দাঁতে দাঁত চাপিয়া কাতরাইতে কাতরাইতে বলিল—আর বাঁচব না দিদি। হায়! আমি তো ভগবানের কাছে চাইতে যাই নাই। একটাকে মানুষ করেছিলাম। তাকে তুমি কেড়ে নিয়েছ, তো এটাকে দিয়ে কি কাজ ছিল! আমি যদি মরে যাই মা, তুমি বাচ্চাটার উপর দয়া রেখ। ওকে মানুষ করে দিও। ভগবান তোমার ভাল করবেন।

চুহিয়া আদর করিয়া তাহার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—ধৈর্য ধর, বেটি, ধৈর্য ধর। এখখুনি কষ্ট দূর হবে। তুই-ও তো চুপ চাপ ছিলি ? এতে

লজ্জার কি! আমাকে বলে রাখলে আমি মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে তাবিজ নিয়ে আসতাম; ঐ যে মির্জাসাহেব, যিনি এই বড় বাড়ির হাতায় থাকেন।

ইহার পর আর ঝুনিয়ার কিছু হুঁশ থাকিল না। সকালে নয়টার সময়ে তাহার চৈতন্য হইল, তখন দেখিল, চুহিয়া শিশুকে লইয়া বসিয়া আছে, আর সে পরিষ্কার শাড়ী পরিয়া শুইয়া; এত দুর্বল, শরীরে যেন রক্তের নামগন্ধ নাই।

চুহিয়া রোজ সকালে আসিয়া ঝুনিয়ার জন্য দুধ-সাগু ও হালুয়া তৈরী করিয়া দিয়া যাইত, আর দিনেও কত বার আসিয়া শিশুর গায়ে তেল মাখাইত, আর তোলা দুধ খাওয়াইত। আজ চার দিনের দিন; কিন্তু ঝুনিয়ার স্তনে দুধ আসে নাই। শিশু কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা চিরিয়া ফেলিল; কারণ তোলা দুধ তাহার হজম হইত না, এক মুহূর্তও সে চুপ করিয়া থাকিত না। চুহিয়া নিজের স্তন তাহার মুখে ঢুকাইয়া দিত। শিশু একটুখানি তাহা চুষিত; কিন্তু দুধ না পাইয়া আবার চিৎকার করিতে আরম্ভ করিত। চার দিনের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝুনিয়ার দুধ নামিল না দেখিয়া চুহিয়া ঘাবড়াইয়া গেল। শিশু শুকাইয়া যাইতেছে। ছোট বাজারে এক পেনসনভোগী ডাক্তার থাকে; চুহিয়া তাহাকে লইয়া আসিল। ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—এর শরীরে রক্ত নাই, দুধ আসবে কোথা থেকে? সমস্যা জটিল হইয়া গেল। শরীরে রক্ত আনিবার জন্য কয়েক মাস পুষ্টিকর ঔষধ খাইতে হইবে, তবে যদি দুধ আসে। ততক্ষণ তো এই মাংসের ডেলার সব প্রয়োজনই শেষ হইয়া যাইবে।

রাত এক প্রহর। গোবর তাড়ি খাইয়া চৌকাঠের কাছে পড়িয়াছিল। চুহিয়া শিশুকে চুপ করাইবার জন্য নিজের বুকে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিল, হঠাৎ তাহার মনে হইল, বুকে বুঝি দুধ আসিয়াছে। খুসি হইয়া বলিল—নে ঝুনিয়া, এখন তোর খোকা বেঁচে যাবে, আমার দুধ এসে গেছে।

ঝুনিয়া চমকাইয়া উঠিল, বলিল—তোমার বুকে দুধ এসে গেছে?

হাঁ রে, সত্যি!

আমার তো বিশ্বাস হয় না।

দেখে নে।

সে নিজের স্তন টিপিয়া দেখাইল। ধারা বাহিয়া দুধ বাহির হইতেছে।

ঝুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার ছোট মেয়ে তো আট বছরের কম নয়?

হাঁ, আট বছরের; কিন্তু আমার অনেকটা দুধ হত।

তার পর এদিকে তোমার তো কোন কিছু হয় নাই ?

ঐ মেয়েটাই কোলের ছিল। বুক একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু ভগবানের লীলা আর কি !

এখন হইতে চুহিয়া চার পাঁচবার আসিয়া শিশুকে দুধ খাওয়াইয়া যাইত। ছেলে জন্মিয়াছিল দুর্বল, কিন্তু চুহিয়ার স্বাস্থ্যকর দুধ খাইয়া মোটা সোটা হইয়া উঠিল। একদিন চুহিয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছে ; ছেলে ক্ষুধায় ছটফট করিতে লাগিল। চুহিয়ার ফিরিতে সেদিন দশটা হইল, তখন ঝুনিয়া শিশুকে কাঁধে লইয়া ঘুরিতেছিল, আর শিশু কাঁদিতেছিল। চুহিয়া শিশুকে কোলে লইয়া দুধ খাওয়াইয়া নিতে চাহিল ; কিন্তু ঝুনিয়া তাহাকে হেঁচকা মারিয়া কহিল—থাক। হতভাগা মরে যায়, সেও ভাল। কারো কিছু করতে হবে না।

চুহিয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। অনেক অনুরোধের পর ঝুনিয়া শিশুকে তাহার কোলে দিল।

কিন্তু ঝুনিয়া আর গোবরের মধ্যে এখনও বনিবনাও নাই। ঝুনিয়ার মনে এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে এ লোকটা পাকা মতলববাজ, কোনও দরদ নাই, আমাকে শুধু ভোগের বস্তু মনে করে, আমি মরি কি বাঁচি সেদিকে নজর নাই ; নিজের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হউক, অন্য দিকে দৃষ্টি নাই। হয়তো ভাবিতেছে, এ মরিয়া গেলে আর একটাকে নিয়া আসিব ; কিন্তু মুখ ধুয়ে বসে থাক বাছাধন। আমি এমনি আনাড়ি ছিলাম যে তোমার ফাঁসে আটকাইয়া গেছি। তখন তো পায়ের ওপর মাথা রাখিতে ; এখানে আসিতেই কেন জানি না মেজাজই বদল হইয়া গেল। শীত আসিল ; কিন্তু না আছে পরিবার কাপড়, না আছে বিছাইবার। ডাল-রুটি হইতে যে দু চার টাকা বাঁচে, তাড়িতে তাহা উড়িয়া যায়। পুরানো এক লেপ ছিল ; দুইজনে তাহাতেই শোয় ; তবু দুইজনের মধ্যে এক শ ক্রোশ ফাঁক। দুইজনে এক কাতে শুইয়া রাত কাটায়।

শিশুকে কোলে লইয়া খেলা দিবার জন্য গোবরের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত। কখনও কখনও রাত্রে উঠিয়া সে তাহার আদরের মুখখানি দেখিয়া লইত ; কিন্তু ঝুনিয়ার দিক হইতে তাহার মন সরিয়া আসিতেছিল। ঝুনিয়াও তাহার সহিত কথা বলিত না, তাহার কিছু সেবাও করিত না, উভয়ের এই মনের মালিন্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লোহার উপর মরিচার মত গভীর, দৃঢ় ও কঠোর হইয়া যাইতেছিল। একে অন্যের কথার উলটা অর্থই বাহির করিত, এমন অর্থ

যাহাতে পরস্পরের দ্বেষ আরও বাড়ে; আর দিনের পর দিন এক একটা কথা মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিত, তিল তিল করিয়া সেই কথা বাড়াইয়া একে অন্যের উপর লাফাইয়া পড়িবার সুযোগ খুঁজিত, শিকারী কুকুরের মত।

এদিকে গোবরের কারখানাতেও সর্বদা একটা না একটা হাঙ্গামা লাগিয়াই আছে। এখনকার বজেটে চিনির উপর 'ডিউটি' ধার্য হইয়াছিল। মিলের মালিকেরা মজুরি কমাইবার ভাল এক ছুতা পাইল। ডিউটির দরুণ যাহা ক্ষতি হইত, মজুরি কমাইলে তাহার দ্বিগুণ লাভ। কয়েক মাস ধরিয়া এই মিলেও গোল লাগিয়াছিল। মজুরসংঘ হরতাল করিবার জন্য তৈরী হইয়া বসিয়াছিল। এদিকে মজুরি কমিল, ওদিকে হরতাল। তাহারা মজুরি এক আধলা কমাইতেও রাজি হইল না। এই আক্কারার দিনে যখন মজুরিতে এক আধলাও বাড়ে নাই, তখন কমাইবার কথায় তাহারা কেন রাজি হইবে! মির্জা খুরশেদ হইলেন সংঘের সভাপতি, আর বিজলীর সম্পাদক পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ছিলেন মন্ত্রী বা সেক্রেটারী। দুইজনেই এমন হরতাল করাইবার পক্ষে ছিলেন, যাহাতে মিলের মালিকদের কিছুদিন মনে থাকে। হরতাল হইতে মজুরদেরও ক্ষতি হইবে, এমন কি হাজার হাজার লোকে খাইতে পাইবে না; এদিকটায় তাঁহাদের দৃষ্টি মোটেই ছিল না। আর গোবর ছিল হরতালকারীদের মধ্যে সকলের আগে, তাহার স্বভাব তো উগ্র ছিলই; মালিকদের ভয় দেখানোর প্রয়োজনও ছিল। সে মারিতে কি মরিতে ডরাইত না। একদিন ঝুনিয়া নিজে খুব শক্ত হইয়া গোবরকে বুঝাইতেছিল—তুমি ছা-পোষা লোক। তোমার এ ভাবে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া ঠিক নয়। এ কথার পর গোবর রাগিয়া উঠিল—আমার কথায় কথা বলবার তুই কে? আমি তোর কাছে সলা-পরামর্শ চাই না। কথায় কথা বাড়িল আর গোবর ঝুনিয়াকে মারিল খুব। চুহিয়া আসিয়া ঝুনিয়াকে ছাড়াইল, আর গোবরকে বকিতে লাগিল। গোবরের মাথায় শয়তান চাপিয়াছিল। চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল—তুমি আমার ঘরে আর এসো না চুহা, তোমার আসার কোনও দরকার নাই।

চুহিয়া ব্যঙ্গের সঙ্গে বলিল—তোমার ঘরে যদি না যাই, তবে আমার পেট ভরবে কি করে? এখান থেকেই তো মেগে চেয়ে নিয়ে যাই, তবে না হাঁড়ি চড়ে! আমি না থাকতাম, লালা, তাহলে এই বিবি আজ আর তোমার লাথি খাবার জন্য বসে থাকত না।

গোবর ঘুসি বাগাইয়া বলিল—আমি বলে দিচ্ছি, আমার বাড়িতে এসো না, তুমিই এই ডাইনের মেজাজ আকাশে চড়িয়ে দিয়েছ।

চুহিয়া ধমক খাইয়া সেখানেই নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল—আচ্ছা, এখন চুপ কর গোবর! বেচারী আধমরা পোয়াতি স্ত্রীকে মেরে তুমি খুব বেশি বাহাদুরি কর নাই। তুমি ওর জন্য কি এমন করেছ যে ও তোমার মার সহ্য করবে? এক টুকরো রুটি খাওয়াও বলে? এমন ভালমানুষ স্ত্রী পেয়েছ, নিজের ভাগ্য বলে মেন। আর কেউ হলে তোমার মুখে ঝাঁটা মেরে চলে যেত।

মহল্লার লোক জমা হইয়া গেল, চারি দিক হইতে গোবরের উপর গালিবর্ষণ হইতে লাগিল; তাহারাই, যাহারা নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীকে রোজ মারে, এই সময়ে ন্যায় ও দয়ার প্রতিমূর্তি সাজিল। চুহিয়া আরও বাঘিনী হইয়া নালিশ করিতে লাগিল—মিনসে বলে কি, আমার ঘরে এসো না! বিবি-বাচ্চা রাখতে চলেছে, জানে না যে বিবি-বাচ্চা পোষা অনেক সাহসের কাজ। জিজ্ঞাসা কর একে, আমি না থাকলে এই যে শিশু বাছুরের মত হলবল করছে, এ কোথায় থাকতো। স্ত্রীকে মেরে পৌরুষ দেখাচ্ছে। আমি তোর বৌ নই, নইলে এই জুতো উঠিয়ে মুখের ওপর চটাপট মারতাম, আর ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতাম। তাই দিতে ইচ্ছা করে।

গোবর রাগ করিতে করিতে নিজের কাজে চলিয়া গেল। চুহিয়া স্ত্রীলোক না হইয়া পুরুষ হইলে মজা দেখাইয়া দিত। স্ত্রীলোকদের মুখে কিছু কি আটকায়?

কলে অসন্তোষের মেঘ ঘন হইতেছিল। মজুরেরা 'বিজলীর' সংখ্যা পকেটে লইয়া বেড়াইত, আর একটু অবসর পাইলেই দুই তিন জন মিলিয়া উহা পড়িতে শুরু করিত। কাগজখানার বিক্রী খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। মজুরদের নেতা বিজলী কার্যালয়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত বসিয়া হরতালের স্কিম তৈরী করিত, আর সকালে যখন পত্রিকায় এই সংবাদ মোটা মোটা অক্ষরে ছাপা হইত, তখন লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত, আর পত্রিকার এক এক কপি দ্বিগুণ তিনগুণ দামে বিক্রী হইয়া যাইত। ওদিকে কোম্পানীর ডাইরেকটরও ওৎ পাতিয়াছিলেন। হরতাল হইয়া গেলে তাঁহারই ভাল। লোকের তো আর অভাব নাই; বেকারদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার অর্ধেক মাহিনায় এমন লোক সহজেই

পাওয়া যাইবে। মাল তৈয়ারীর খরচা একদম অর্ধেক বাঁচিয়া যাইবে। পাঁচ দশ দিন কাজের ক্ষতি হইবে, হউক। শেষকালে স্থির হইল, মজুরি কমানোর কথাটা সাধারণে ঘোষণা করা হউক। দিন আর সময় ঠিক করা হইল। পুলিশে খবর দেওয়া হইল। মজুরদের কানে খবর পৌঁছাইল না। তাহারা ছিল নিজের ধান্ধায়। তাহারা এমন সময়ে হরতাল করিতে চাহিতেছিল, যখন গুদামে খুব অল্প মাল মজুত থাকে, আর বাজারে চাহিদা থাকে বেশি।

হঠাৎ একদিন যখন মজুরেরা সন্ধ্যার সময় ছুটি পাইয়া চলিয়া যাইবে, এমন সময় ডাইরেক্টদের ঘোষণা শুনানো হইল। ঐ সময় পুলিশ আসিয়া গেল। মজুরদের নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তখন হরতাল করিতে হইল—গুদামে এত মাল জমা ছিল যে চাহিদা খুব বেশি হইলেও ছয় মাসের আগে ফুরাইবে না।

মির্জা খুরশেদ এই খবর শুনিয়া সামান্য একটু হাসিল, যেন কোনও মনস্বী যোদ্ধা শত্রুর রণকৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। এক মুহূর্ত চিন্তায় ডুবিয়া থাকিবার পর বলিল—বেশ কথা। ডাইরেক্টরদের যদি এমনি ইচ্ছা, তবে তাই সই। এখন হাওয়া তাদের অনুকূল, কিন্তু আমাদের আছে ন্যায়ের বল। ওরা নতুন লোক রেখে নিজেদের কাজ চালাতে চায়; আমাদের চেষ্টা হবে যাতে ওরা একজনও নতুন লোক না পায়। এই হবে আমাদের ফতোয়া।

বিজলী কার্যালয়ে এই সময়ে জরুরী সভা বসিল, কার্যকরী সভা সংগঠিত হইল, কর্মকর্তা সব বাছা হইল, আর রাত আটটায় মজুরদের লম্বা এক জলুষ বাহির হইল। রাত দশটা বাজিতে পরের দিনের সমস্ত প্রোগ্রাম ঠিক করা হইল, সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল যে কোনও রকম দাঙ্গা ফ্যাসাদ যেন হইতে না পারে।

কিন্তু সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইল। ধর্মঘটীরা যখন দেখিল, পঙ্গপালের মত নূতন মজুর মিলের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাহাদের হিংসাবৃত্তি আর রাশ মানিল না। ভাবিয়াছিল, রোজ পঞ্চাশ কি এক শ ভর্তি হইতে আসিবে, তাহাদের বুঝাইয়া সুঝাইয়া কি ধমকাইয়া তাড়াইয়া দিবে; ধর্মঘটীদের সংখ্যা দেখিয়া নূতন লোক নিজেরাই ভয়ে ভয়ে চলিয়া যাইবে। কিন্তু এখন ব্যাপার দাঁড়াইল অন্য রকমের; যদি এই সমস্ত লোক ভর্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে ধর্মঘটীদের সঙ্গে মিটমাটের কোনও আশাই থাকিবে না। ঠিক হইল, নূতন লোকদের কলে যাইতে দেওয়াই হইবে না। বলপ্রয়োগ ছাড়া অন্য উপায় নাই। নতুন দলও

লড়িতে কি মরিতে তৈয়ার। তাহাদের অধিকাংশ ক্ষুধায় এত জর্জরিত যে এই সুযোগ কিছুতেই ছাড়িতে চাহিল না। ক্ষুধায় মরিয়া যাওয়ার চেয়ে, কি ছেলে-পুলে ক্ষুধায় মরিতেছে তাহা দেখার চেয়ে, এই অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া মরাই ভাল। দুই দলে ফৌজদারি বাধিয়া গেল। 'বিজলী'-সম্পাদক তো পলাইয়া বাঁচিল, বেচারি মির্জা মার খাইল, আর তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া গোবরও খুব আঘাত পাইল। মির্জাজী ছিল পালোয়ান লোক, আর শিক্ষিত লাঠিয়াল, নিজের গায়ে কোনও গভীর চোট পড়িতে দেয় নাই। গোবর গেঁয়ো; পুরা লাঠি মারিতে জানিত; জানিত না নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে, লড়াইতে সে বিদ্যা মারিতে পারার চেয়েও বড়। তাহার এক হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল, মাথা ফাটিয়া গেল, আর শেষটায় সে সেইখানেই অসাড় হইয়া পড়িয়া গেল। কাঁধের উপর অগুন্তি লাঠি পড়িতে লাগিল, তাহাতে তাহার এক এক অঙ্গ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ধর্মঘটীরা উহাকে পড়িতে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল। কেবল দশ বার জন লোক, যাহারা পরীক্ষায় পার হইয়াছে, তাহারাই মির্জাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া। নূতন লোকেরা বিজয় পতাকা উড়াইতে উড়াইতে কলে ভর্তি হইয়া গেল, আর পরাজিত ধর্মঘটী নিজেদের হতাহতদিগকে উঠাইয়া হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু হাসপাতালে এতগুলি লোকের জায়গা নাই। মির্জাজীকে হাঁসপাতালে নিয়া গেল, গোবরকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধ লাগাইয়া ঘরে পৌঁছাইয়া দিল।

গোবরের সেই অসাড় দেহ দেখিয়া ঝুনিয়ার নারীত্ব জাগিয়া উঠিল। এ পর্যন্ত তাহার সবলরূপই সে দেখিয়াছে; যাহা উহাকে শাসন করিয়াছে, ধমক দিয়াছে, মারিয়াছে, আজ তাহা পঙ্গু, নিঃসহায়, দয়ার যোগ্য। ঝুনিয়া খাটিয়ার উপর ঝুঁকিয়া সজল চোখে গোবরের দিকে চাহিয়া দেখিল, আর ঘরের দশা ভাবিয়া গোবরের উপর তাহার মনে ঈর্ষামিশ্রিত রাগ হইল। গোবর জানিত, ঘরে এক পয়সাও নাই। সে এও জানিত যে কোথা হইতেও এক পয়সা আসিবার আশাও নাই। ইহা জানা সত্ত্বেও, তাহার বার বার বোঝানো সত্ত্বেও, গোবর এই বিপদ ডাকিয়া আনিল। ঝুনিয়া কত বার বলিয়াছিল, তুমি এ ঝগড়ায় থেক না, আগুন যাহারা লাগায় তাহারা আগুন লাগাইয়াই সরিয়া যাইবে, মরিতে মরিবে গরিবেরা, কিন্তু কবে তাহার কথায় গোবর কান দিয়াছে! ঝুনিয়া তো উহার শত্রু ছিল; আর তাহারাই ছিল মিত্র, যাহারা এখন ফূর্তি করিয়া মোটর চড়িয়া

বেড়ায়। ঝুনিয়া ক্রোধে এক প্রকারের আত্মতৃপ্তি ছিল; যেমন ছোট ছোট ছেলেদের চেয়ার হইতে পড়িতে দেখিলে হয়, বার বার মানা করিলেও তাহারা চেয়ারে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে ইতস্ততঃ করে না—আমরা চিৎকার করিয়া উঠি, বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, তোমার মাথাটা দু টুকরা হইয়া গেল না কেন।

কিন্তু এক মুহূর্ত গোবরের করুণ ক্রন্দন শুনিয়া তাহার সমস্ত চৈতন্য শিহরিয়া উঠিল। ব্যথায় ডুবিয়া এই শব্দ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল—হায় হায়! সমস্ত শরীর চুরমার হয়ে গেছে। কারো একটু দয়াও হল না!

এই ভাবে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া গোবরের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। আশা ক্রমেই ক্ষয় হইতেছে, তবু আশা বুকে বাঁধিয়া গোবরের দেহে জীবনের কোনও চিহ্ন সে খুঁজিতেছিল। আর প্রতিক্ষণ তাহার ধৈর্য অস্তায়মান সূর্যের মত ডুবিতেছিল, ভবিষ্যতের অন্ধকার তাহার মন ছাইয়া ফেলিতেছিল।

হঠাৎ চুহিয়া আসিয়া চিৎকার করিল—গোবরের কি অবস্থা হয়েছে, বৌ! আমি তো এখখুনি শুনে দোকান থেকে ছুটে আসছি।

ঝুনিয়ার রুদ্ধ অশ্রু উছলিয়া পড়িল। মুখে সে কিছু বলিতে পারিল না। ভয়ভীত চক্ষে চুহিয়ার দিকে তাকাইল।

চুহিয়া গোবরের মুখ দেখিল, বুকের উপর হাত রাখিল, তাহার পর আশ্বাস-ভরা স্বরে বলিল—এ দু দিনে ভাল হয়ে যাবে। ঘাবড়িও না। ভাল হবে। তোর এয়োতির জোর ছিল। কত লোক ঐ দাঙ্গায় মারাই গেছে। ঘরে টাকা পয়সা কিছু আছে?

ঝুনিয়া লজ্জায় মাথা নাড়িল।

আমি এনে দিচ্ছি। অল্প একটু দুধ গরম করে নে।

ঝুনিয়া তাহার পা জড়াইয়া বলিল—দিদি, তুমি আমার মায়ের কাজ করলে। আমার আর কেউ নাই।

শীতের উদাস সন্ধ্যা আজ আরও উদাস মনে হইতেছিল। ঝুনিয়া চুলা ধরাইল আর দুধ জাল দিতে লাগিল। চুহিয়া বারান্দায় ছেলেকে খেলা দিতে থাকিল।

হঠাৎ ঝুনিয়া ভারি গলায় বলিল—আমি বড়ই হতভাগী, দিদি। আমার মনে হয়েছিল, বুঝি আমার জন্যই এর এ দশা হয়েছে। প্রাণ বিষিয়ে ওঠে, মনে তো দুঃখ হয়ই, তবু গালাগালও মুখ দিয়ে বের হয়, শাপও বেরোয়। কে জানে আমার গাল…

ইহার পর সে আর কিছু বলিতে পারিল না। চোখের জলে কথা ভাসিয়া গেল।

চুহিয়া আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল—কি কথা ভাবছিস রে মেয়ে! বেঁচে যে গেল তা তোর সিঁদূরের ভাগ্যে। কিন্তু হাঁ, এটা ঠিক যে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে মুখে যতটা চাই বকে নে, মনে রাগ পুষবি না। বীজ যদি ভিতরে পড়েছে, অঙ্কুর তার বেরোবেই।

ঝুনিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—এখন কি করি, দিদি!

চুহিয়া সাহস দিল—কিছু না মেয়ে, ভগবানের নাম নে। তিনিই গরিবকে রাখেন।

এই সময় গোবর চোখ মেলিল, ঝুনিয়াকে সামনে দেখিয়া অনুনয়ের ভাবে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—আজ বড় চোট খেয়েছি ঝুনিয়া! কাউকে আমি কিছু বলিনি। সকলে অনায়াসে আমাকে মারল। যা বলেছি যা শুনেছিস মাফ কর। তোকে মারধর করেছি, তার এ ফল পেলাম। আর অল্পক্ষণ তোর কাছে আছি। এবার আর বাঁচব না। ব্যথায় সমস্ত শরীর কেটে যাচ্ছে।

চুহিয়া ভিতরে আসিয়া বলিল—চুপচাপ পড়ে থাক। কথাবার্তা বোল না? মরবে না, ওর ভার আমার ওপর।

গোবরের মুখে আশার ঝলক দেখা দিল। বলিল—সত্যি বলছ, মরব না?

হাঁ, মরবে না, তোমার হয়েছে কি? মাথায় একটু চোট লেগেছে, আর হাতের হাড় গিয়েছে ভেঙ্গে। মরদের তো এমনি চোট রোজই লাগছে। চোটে কেউ মরে না।

আমি ঝুনিয়াকে আর কখনো মারব না।

ভয় পাচ্ছ যে ঝুনিয়া তোমায় না মারে?

ও মারলেও কিছু বলব না।

সেরে উঠলে একথা ভুলে যাবে।

না দিদি, কখনো ভুলব না।

এ সময় গোবর শিশুর মত কথা কহিত। দশ-পাঁচ মিনিট অজ্ঞানের মত পড়িয়া রহিত। তাহার মন না জানি কোথায় কোথায় উড়িয়া বেড়াইত। কখন দেখিত, নদীতে ডুবিয়া যাইতেছে, ঝুনিয়া তাহাকে বাঁচাইবার জন্য নদীতে নামিয়া আসিতেছে। কখনও দেখিত, কোনও দৈত্য তাহার বুকে চড়িয়া আছে,

আর ঝুনিয়ার মূর্তি ধরিয়া কোনও দেবী তাহাকে বাঁচাইবার জন্য নদী পথে চলিয়া আসিতেছে। আর বার বার চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিত—আমি মরব না তো রে ঝুনিয়া ?

উহার এই অবস্থা তিনদিন ধরিয়া থাকিল, আর ঝুনিয়া রাত দিন তাহার সামনে দাঁড়াইয়া যেন মৃত্যুর হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। ছেলেকে সামলাইয়া রাখিত চুহিয়া। চার দিনের দিন ঝুনিয়া এক্কা লইয়া আসিল, আর সকলে ধরাধরি করিয়া গোবরকে তাহার উপর তুলিয়া হাসপাতালে লইয়া গেল। সেখান হইতে বাড়ি আসিয়া গোবরের মনে হইল, এবার সে সত্যসত্যই বাঁচিয়া যাইবে। দুই চোখে অশ্রু ভরিয়া সে বলিল—আমায় ক্ষমা কর, ঝুন্না !

এই তিন চার দিনে চুহিয়ার তিন চার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল, এখন ঝুনিয়ার তাহার কাছ থেকে আর কিছু লইতে সংকোচ লাগিতেছিল। তাহারও তো জমানো টাকা কিছু নাই ; লাকড়ি বিক্রীর টাকা সে ঝুনিয়াকে দিয়া দেয়। শেষটায় ঝুনিয়া কিছু কাজকর্ম করিবে স্থির করিল। গোবরের ভাল হইতে এখনো কয়েক মাস লাগিবে। খাওয়া-দাওয়াও চাই, ওষুধপত্রও চাই। সে কিছু কাজকর্ম করিলে খাওয়ার খরচটা তো চলিয়া যাইবে। শিশুকাল হইতে সে গোরুর কাজ আর ঘাস কাটা শিখিয়াছিল। এখানে গোরু কোথায় ; তবে, ঘাস কাটিতে পারে। মহল্লার স্ত্রীপুরুষ কত লোকে বরাবর শহরের বাহিরে ঘাস কাটিতে যায়, আর আট-দশ আনা রোজগার করে। সকালে সেও গোবরের হাতমুখ ধোয়াইয়া ও ছেলেকে তাহার কাছে রাখিয়া ঘাস কাটিতে বাহির হইয়া যায়, আর তিন প্রহর পর্যন্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া ঘাস কাটিতে থাকে। তাহার পর সে ঘাস বাজারে লইয়া বেচে, ও সন্ধ্যার সময় ঘরে ফেরে। রাত্রেও সে গোবরের ঘুম আসা পর্যন্ত জাগিয়া থাকে, আবার গোবরের ঘুম হইতে ওঠামাত্র জাগে ; কিন্তু এতখানি কঠোর শ্রম করিলেও তাহার মন এতখানি প্রসন্ন থাকে যে মনে হয় যেন দোলনার উপর বসিয়া গান করিতেছে ; সারা রাস্তা সঙ্গী স্ত্রীপুরুষদের সহিত হাসিঠাট্টা ফুরত্তি করিতে করিতে যায়। ঘাস কাটিবার সময়েও সকলে মিলিয়া হাস্য কৌতুক চলিতে থাকে। অদৃষ্টের জন্য বিলাপ কেহ করে না, দুরবস্থার কথা বলিয়া কেহ চোখের জল ফেলে না। জীবনের সার্থকতায়, কঠিন হইতে কঠিনতর আত্মত্যাগে, স্বাধীন সেবায় যে উল্লাস, তাহার জ্যোতি ঝুনিয়ার প্রত্যেক অঙ্গে

খেলিতে লাগিল। শিশু আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া হাততালি দিতে দিতে খুসি হয়, শক্তির আনন্দ সে অনুভব করিতে থাকে; তাহারও প্রাণের মধ্যে তেমনি আনন্দের উৎস খুলিয়া গিয়াছে। আর মন যদি সুস্থ থাকে, শরীর কি করিয়া অসুস্থ হয়? এই এক মাসের মধ্যে উঁহার যেন কায়াকল্প হইয়া গেল। তাহার অঙ্গের আর শিথিলতা নাই, আছে চপলতা, আছে নমনীয়তা, আছে সুকুমার ভাব। মুখের উপর বিবর্ণতা নাই, রক্তের গোলাপী আভা দেখা দিয়াছে। তাহার যে যৌবন বদ্ধ কুঠরিতে পড়িয়া অপমান ও কলহের চাপে কুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা যেন তাজা হাওয়া ও আলো পাইয়া লক্‌লক্ করিয়া বাড়িয়া উঠিল। এখন তাহার কোনও কথায়ই রাগ হয় না। শিশু একটু সামান্য কাঁদিলেই যে আগে রাগ করিয়া উঠিত, এখন তাহার ধৈর্য ও প্রেমের অন্ত পাওয়া যায় না।

এদিকে ভাল হইয়া উঠিলেও গোবর কিছু কিছু উদাস ভাবে থাকিত। যখন আমরা কোনও প্রিয়জনের উপর অত্যাচার করি, আর যখন বিপদ আসিয়া পড়িলে সেই তীব্র ব্যথা অনুভব করিবার শক্তি হয়, তখন আমাদের আত্মা জাগিয়া উঠে, আমরা সে খারাপ ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হই। গোবর সেই প্রায়শ্চিত্তের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। এবার তাহার জীবনের রূপ একেবারে অন্যরকম হইবে, যাহাতে কটুতার স্থানে থাকিবে মৃদুতা, অভিমানের স্থানে নম্রতা। এখন সে জানিয়াছে, সেবা করিবার সুযোগ বড় ভাগ্যে মেলে, আর এই সুযোগ সে কখনও ছাড়িবে না।

## ২৮

মজুরদের এই হরতাল মিঃ খান্নার বড়ই অন্যায় মনে হইতে লাগিল। সে তো সর্বদাই জনসাধারণের সঙ্গে এক হইয়া থাকিতে চাহিয়াছে, নিজেকে জনতারই একজন মনে করিয়াছে। গেল বার জাতীয় আন্দোলনে সে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছিল। সমগ্র জেলার সে ছিল প্রধান নেতা, দুইবার জেল খাটিয়াছে, বেশ কয়েক হাজার টাকা লোকসান দিয়াছে। এখনও সে মজুরদের অভিযোগ শুনিতে প্রস্তুত। কিন্তু চিনির কলের অংশীদারদের ভালমন্দ বিচার করিবে না, এমনটা তো হইতে পারে না। তাহার মধ্যে যে সুকুমার মনোবৃত্তি

আছে, তাহার খাতিরে নিজের স্বার্থ হয়তো সে ত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু অংশীদারদের স্বার্থ রক্ষা না করিলে যে অধর্ম হইবে। ব্যাপার হইল এই, সদাব্রত কেহ তো খোলে নাই যে সব কিছু মজুরদের বাঁটিয়া দিবে। শতকরা পনের কুড়ি টাকা লাভ হইবে, এই বিশ্বাসেই না অংশীদারগণ টাকা দিয়াছে? শতকরা দশ টাকাও যদি না পায়, তবে তাহারা ডাইরেকটারদের, বিশেষত খান্নাকে, ধাপ্পাবাজ ভাবিবে না? আর, সে নিজের বেতনই বা কম করে কি করিয়া? অন্য কোম্পানীর তুলনায় সে তো নিজের বেতন খুব কমই রাখিয়াছে, মাসে মাত্র হাজার টাকা লয়। অবশ্য কমিশন কিছু পায়; তা সে যেমন এতটা নেয়, তেমনই মিল পরিচালনাও তো করে! মজুরেরা কেবল হাত দিয়া কাজ করে, আর ডাইরেকটার কাজ করে নিজের বুদ্ধি, বিদ্যা, প্রতিভা, প্রভাব ও প্রতিপত্তি দিয়া। এই দুই শক্তির মূল্য তো সমান হইতে পারে না। মজুরেরা কেন বোঝে না যে এখন বাজার মন্দা, তাহাতে আবার চারিদিকে বেকারের ছড়াছড়ির দরুণ মজুর সস্তা হইয়া গিয়াছে। এক টাকার জায়গায় বারো আনা পাইলেও উহাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আর সত্য বলিতে কি, উহারা বেশ সন্তুষ্ট আছে, উহাদের কোনই দোষ নাই। উহারা তো মূর্খ, একদম মূর্খ। দোষ ঐ ওঙ্কারনাথ আর মির্জা খুরশেদের। ইহারা দুইজনে উহাদের কাঠের পুতুলের মত নাচাইতেছে, সামান্য পয়সা আর যশের লোভে। একবার ভাবিয়া দেখে না, ইহাদের এই খেলায় কত লোকের ঘর ছারখারে যাইবে। ওঙ্কারনাথের কাগজ চলে না, তার খান্না বেচারা কি করিবে? আজ যদি তাহার এক লাখ গ্রাহক জুটিয়া যায়, আর পাঁচ লাখ মুনাফা থাকে, তবে কি নিজের খোরপোষ মাত্র লইয়া বাকি সব সে কর্মচারীদের মধ্যে বাঁটিয়া দিবে? কি সব কথা! এই যে ত্যাগী মির্জা খুরশেদ, এ তো একদিন লক্ষপতি ছিল। হাজার হাজার মজুর উহার কাজে খাটিত। তখন কি ও নিজের দিন গুজরানের মত অর্থ লইয়া বাকি সব বিলাইয়া দিত? ঐ টাকায় তো ও ইউরোপীয়ান মেয়েগুলির সঙ্গে ভাবসাব করিত, বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে খানাপিনা করিত, মাসে হাজার টাকার মদই খাইত, আর ফি বছর ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াইয়া আসিত। আজ কিনা মজুরদের দুঃখে উহার বুক ফাটিয়া যায়!

এই দুই নেতাকে খান্না গ্রাহ্য করে না, উহাদের নীতির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে ওর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। না পরোয়া করে ও রায়সাহেবের, সে তো

হামেশা ওর কথায় সায় দেয়, আর ওর প্রত্যেক কাজই সমর্থন করে। উহার পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মাত্র আছে, যাহার অপক্ষপাত বিচারের উপর উহার ভরসা—সে ডাঃ মেহতা। যেদিন হইতে মেহতা মালতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াইয়া তুলিয়াছে, সেদিন হইতে অবশ্য খান্নার চোখে সে অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। মালতী অনেক বৎসর ধরিয়া খান্নার হৃদয়ের অধীশ্বরী হইয়া আছে, কিন্তু মালতীকে সর্বদা সে খেলনা মনে করিত—অতি প্রিয় খেলনা অবশ্য। হারাইয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে, কেহ ছিনাইয়া লইলে, বুক ভাঙ্গিয়া যায়, কান্না আসে। খান্না অনেক কাঁদিয়াছেও বটে, তবু মালতী উহার কাছে খেলারই সামগ্রী ছিল। ও কোন দিন মালতীকে বিশ্বাস করে না। ও কোনদিন মালতীর উপরকার বিলাসের আবরণটি ভেদ করিয়া উহার অন্তঃকরণ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। নিজে হইতে যদি ও খান্নার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিত, তবু খান্না স্বীকার করিত না, কোন ছলে ঠেকাইয়া রাখিত। অন্য অনেক জন্তুর মতো খান্নার জীবন ছিল দোহারা বা দুমুখী। একদিকে ও ছিল ত্যাগ, জনসেবা আর পরোপকারের ভক্ত, অন্য দিকে স্বার্থ, বিলাসিতা আর প্রভুত্বের পূজারী। কোন্‌টা ওর আসল চেহারা তাহা বলা কঠিন। কখনও উহার আত্মার ভাল দিক সেবা আর সহৃদয়তায় ভরিয়া থাকে, মন্দ দিক থাকে স্বার্থ আর বিলাসে ভরপুর। ভাল আর মন্দ সর্বদা সমান তালে চলিত, কিন্তু প্রচণ্ডতা ও হঠকারিতার জন্য উহার মন্দ, শান্ত সৌম্য উত্তমকে চাপিয়া রাখিত। উহার মন্দ অর্ধেক ঝুঁকিয়া ছিল মালতীর দিকে, আর ভাল অর্ধেক মেহতার দিকে, কিন্তু উহার ভাল মন্দ এখন এক হইয়া গিয়াছে। ও বুঝিতেই পারে না, মেহতার মত আদর্শবাদী লোক কি করিয়া মালতীর মত চঞ্চল, বিলাসিনী রমণীর প্রতি আসক্ত হইতে পারে। ও হাজার চেষ্টা করিয়াও মেহতার এই আচরণের অর্থ বুঝিতে পারে নাই। কখনও কখনও উহার এমন সন্দেহও হয়, হয়তো মালতীর আর একটা রূপ আছে যাহা ও দেখিতে পায় না, যাহা দেখিবার শক্তি উহার নাই।

স্বপক্ষ আর বিপক্ষের সকল যুক্তি বিচার করিয়া দেখিয়া ও স্থির করিল, এই পরিস্থিতিতে একমাত্র মেহতার কাছেই ও আলোক পাইতে পারে।

ডাক্তার মেহতার কাজের নেশা—অর্ধেক রাত্রিতে শুইতে যায়, আবার এক প্রহর রাত থাকিতেই উঠিয়া পড়ে। যে কাজই পড়ুক, সে সময় করিয়া লইবে। হকি খেলা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্কসভা, গ্রামসংগঠন বা কাহারও বাড়িতে

বিবাহের উৎসব—সব কাজেই উহার উৎসাহ, আর সব কাজের জন্যই ও সময় করিয়া লয়। কাগজেও মাঝে মাঝে তাহার লেখা বাহির হয়, কয়েক বৎসর ধরিয়া দর্শন সম্বন্ধে একখানা বৃহৎ পুস্তক লিখিতেছিল, এবার তাহা শেষ হইয়া আসিল। সম্প্রতি এক বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করিয়াছে। নিজের বাগানের চারাগুলিতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিয়া দেখিতেছে; কিছুদিন আগে বিজ্ঞান পরিষদে ও একটি সিদ্ধান্ত উপস্থিত করিয়াছিল যে বৈদ্যুতিক শক্তি পাইলে গাছগুলি তাড়াতাড়ি বাড়িবে, গাছের ফসল বেশি হইবে, আর অফলা গাছেও ফল ফলিবে। আজকাল সকাল বেলায় দুই তিন ঘণ্টা উহার এই পরীক্ষাতেই কাটিয়া যায়।

মিঃ খান্নার কথা শুনিয়া কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া মেহতা বলিল, সরকারি ডিউটি বসেছে বলে মজুরদের পাওনা কমাতে হবে, এমন কি কথা আছে? আপনারা চেয়েছিলেন গভর্মেণ্টের কাছে অভিযোগ করতে। সরকার শোনে নাই বলে কি দণ্ড পাবে মজুরেরা? আপনারা কি মনে করেন মজুরেরা এতই বেশি পায় যে সিকি ভাগ কাটলে ওদের কষ্ট হবে না? আপনার মজুরেরা থাকে গর্তে, দুর্গন্ধ ময়লা গর্তে, যেখানে আপনি এক মিনিট দাঁড়াতেও পারবেন না। ওদের কাপড় এমন যে, তা দিয়ে আপনি জুতোও মুছবেন না। ওদের খাবার! আপনার কুকুরও তেমন খায় না। আমি ওদের সঙ্গে মিলে মিশে ওদের সুখ দুঃখের ভাগীদার হয়েছি—জানি, আপনারা ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে অংশীদারদের পেট ভরাতে চান······

খান্না অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, তা, আমাদের সব অংশীদাররাই তো বড়লোক নয়। কত জন তো নিজেদের সর্বস্ব এই মিলে ঢেলে দিয়েছে, এর থেকে লাভের টাকা না পেলে তাদের পেটই চলবে না।

মেহতা এমন ভাবে জবাব দিল যেন এই দিকটা দেখিবারই যোগ্য নয়—যে শেয়ার কিনতে পারে, তার অবস্থা কখনোই এমন নয় যে শেয়ারের লাভের ওপরই তার জীবন মরণ নির্ভর করে। হাঁ, হোতে পারে যে লাভের অঙ্ক কম হোলে একটা চাকর কমিয়ে দিতে হবে, দুধ, ফল আর মাখনের বিল একটু খাটো করতে হবে; কিন্তু তাকে আধপেটা খেতেও হবে না, উলঙ্গ থাকতেও হবে না। যারা কেবল টাকা খাটিয়ে বাড়ায়, তাদের চাইতে যারা প্রাণ দিয়ে খেটে দিচ্ছে, তাদের দাবি নিশ্চয় বেশি।

এই কথাই পণ্ডিত ওঙ্কারনাথও বলিয়াছিল। মির্জা খুরশেদেরও এই পরামর্শ।

এমন কি গোবিন্দীও মজুরদের পক্ষ নিয়াছে, তবে খান্নাজী উহাদের কথায় কান দেয় নাই, কিন্তু মেহতার মুখে এই কথা শুনিয়া সে পড়িল মুসকিলে। ওঙ্কারনাথকে সে মনে করে স্বার্থলিপ্সু, মির্জা খুরশেদকে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য, আর গোবিন্দীকে অকর্মণ্য। কিন্তু মেহতার কথার মধ্যে যে আছে চরিত্রের, দৃঢ়তা সদ্‌ভাব আর বিস্তর পড়াশোনার পরিচয়!

মেহতা হঠাৎ প্রশ্ন করিল—এ বিষয়ে আপনার স্ত্রীর পরামর্শ নিয়েছেন? সঙ্কুচিত ভাবে খান্না বলিল, হাঁ, ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

তিনি কী বললেন?

যা আপনি বলছেন।

আমিও তাই মনে করেছিলাম। আর আপনি কিনা ওঁর মত বিদূষী স্ত্রীকে পরামর্শের অযোগ্য মনে করেন!

এমন সময়ে মালতী আসিয়া উপস্থিত। খান্নাকে দেখিয়া সে বলিল, ও, আপনিও এখানে? আমি আজ মেহতাজীকে খেতে বলেছি। সব জিনিস নিজে হাতে রেঁধেছি। আপনাকেও নেমন্তন্ন করছি। গোবিন্দী দেবীকে বলে আমি আপনার এ দোষ মাপ করিয়ে নেব!

খান্নার অদ্ভুত লাগিল। মালতী আজকাল নিজে রাঁধিতেছে! সেই মালতী, যে নাকি নিজের জুতা কখনো নিজে পরিত না, আলোটা কখনও সুইচ্‌ টিপিয়া নিভাইত না; বাবুগিরি আর ফুর্তিই ছিল যাহার প্রাণ!

ঠাট্টা করিয়া বলিল, আপনি যখন রেঁধেছেন, তখন নিশ্চয় যেতে হবে। আপনি রাঁধতে ওস্তাদ, তা তো কোনদিন ভাবি নাই।

অসঙ্কোচে মালতী বলিল, ইনি জোর করে রাঁধুনী বানিয়ে ছেড়েছেন। এঁর হুকুম কি অমান্য করা চলে! পুরুষ যে দেবতা! এ রসিকতাটা উপভোগ করিয়া মেহতার দিকে কটাক্ষ হানিয়া খান্না বলিল, পুরুষেরা আপনার চোখে এত সম্মানের পাত্র আগে তো ছিল না!

মালতী দমিবার মেয়ে নয়। ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিয়াও ঠাট্টার সুরে বলিল, এখন হয়েছে; কেন জানেন, আমি এত দিন পুরুষের যে রূপের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম তার চাইতে এ অনেক বেশি সুন্দর। পুরুষ এত সুন্দর, এমন কোমলহৃদয়…

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া মালতীর দিকে চাহিয়া মেহতা বলিল, মালতী, দয়া কর, এবার থাম, নইলে আমি এখান থেকে চলে যাব।

আজকাল কাহারও সঙ্গে দেখা হইলেই, মালতী মেহতার প্রশংসার সৌধ নির্মাণ করিত, নূতন দীক্ষিত যেমন করিয়া নূতন বিশ্বাসের ঢাক পিটিয়া বেড়ায়। রুচিসঙ্গত হইতেছে কিনা, তাহাও সে ভাবিয়া দেখিত না। বেচারী মেহতার বুকে যেন বিঁধিত। কঠিন দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা সে আনন্দে শুনিত, কিন্তু নিজের প্রশংসা শুনিলে সে ঠিক যেন বোকা বনিয়া যায়, মুখটা সামনে ঝুঁকিয়া পড়ে, যেন আভরণের ভারে ঝুঁকিয়াছে। আর মালতী—সে চুপ করিয়া থাকিবার মেয়ে নয়; আগেও যেমন এখনও তেমন—ব্যবহারে, বুদ্ধিতে বিচারে, সব কিছুতে ওর স্বভাব খোলামেলা। ও মনে কিছু চাপিয়া রাখিতে জানে না। সুন্দর একখানা শাড়ী পাইলে যেমন ও পরিবার জন্য অস্থির হইয়া ওঠে, মনে একটা সুন্দর ভাব আসিলে তাহাও প্রকাশ না করিয়া ওর শান্তি নাই।

মালতী আগাইয়া আসিয়া উহার পিঠে হাত রাখিয়া ওকে যেন বাঁচাইয়া দিতেছে এমন ভাবে বলিল; আচ্ছা তোমাকে যেতে হবে না, আমি এই চুপ করলাম। আমি দেখছি তুমি নিজের নিন্দা শুনতেই ভালোবাস। তবে তাই শোন। খান্নাজী, শুনুন, এই ভদ্রলোক আমার ওপর প্রেমের জাল······

চিনির কলের চিমনি এখান হইতে চোখে পড়ে। খান্না ঐ দিকে চাহিয়া রহিল। খান্নার কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ ঐ চিমনি আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। খান্নার চোখে অভিমানের ঝিলিক ফুটিয়া উঠিল। এখনই ওকে মিলের অফিসে যাইতে হইবে। ডাইরেকটারদের এক জরুরী মিটিং আছে, তাহাতে উহাকে পরিস্থিতিটা বুঝাইয়া বলিতে হইবে, এই সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

কিন্তু চিমনির কাছে কিসের এত ধোঁয়া? দেখিতে দেখিতে বেলুনের মত সারা আকাশ ধোঁয়ায় ছাইয়া গেল। সকলে শঙ্কিত ভাবে ঐ দিকে চাহিল, কোথাও আগুন লাগে নাই তো? আগুনই মনে হয় যে।

সহসা চোখে পড়িল, রাস্তা দিয়া হাজার হাজার লোক কলের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—খান্না তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কোথায় ছুটে চলেছ?

একটি লোক একটু দাঁড়াইয়া বলিল, চিনির কলে আগুন লেগেছে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?

খান্না মেহতার দিকে তাকাইল, আর মেহতা চাহিল খান্নার দিকে। মালতী

দৌড়াইয়া বাড়ির ভিতরে গেল জুতা পরিয়া আসিতে। আপশোষ আর আলোচনার সময় ইহা নয়। কাহারও মুখে কথা সরিতেছে না। বিপদে পড়িলে আমাদের চিন্তা অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে। খান্নার গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। শঙ্কাকুল তিনটি প্রাণী তাহাতে উঠিয়া বসিল, গাড়ী কলের দিকে ছুটিল। চৌরাস্তায় পৌঁছিয়া দেখে, সারা শহর মিলের দিকে বন্যার মত ছুটিয়া চলিয়াছে। লোককে কাছে টানিবার এক মন্ত্রশক্তি আগুনের আছে। গাড়ী আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

মেহতা ততক্ষণে জিজ্ঞাসা করিল, আগুনের বীমা করিয়েছেন তো? দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া খান্না বলিল, কোথায় হোল ভাই, এই তো সবে লেখাপড়া হচ্ছিল। কে জানতো, এমন বিপদ এসে পড়বে।

গাড়ীখানা ওখানেই ভগবানের হাতে ছাড়িয়া গিয়া হাঁটিয়া উহারা ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে কলের সম্মুখে পৌঁছিল। দেখিল, যেন আগুনের সাগর আকাশ পর্যন্ত উথলাইয়া উঠিয়াছে। আগুনের উন্মত্ত লহরী এক এক ঝলকে তাহার লোল জিহ্বা মেলিয়া এমন উঁচুতে উঠিতেছে, মনে হয়, আকাশকেও গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ঐ অগ্নিসমুদ্রের নীচে ধোঁয়ায় এমন ছাইয়া ফেলিয়াছে, মনে হইতেছিল শ্রাবণের ঘনঘটা যেন কাজলসমুদ্রে স্নান করিয়া ধরায় অবতরণ করিয়াছে। আর উপরে যেন দাঁড়াইয়া আছে হিমালয়, উদ্বেল, কম্পমান। কলের হাতায় লক্ষ লোকের ভিড়, পুলিশ আছে, ফায়ার ব্রিগেড আছে, সেবাসমিতির ভলান্টিয়ার আছে, কিন্তু আগুনের ভীষণতায় সকলে যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐ আগুনের সমুদ্রে পড়িয়া ফায়ার ব্রিগেডের জলের ছিটা যেন বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাইতেছে। ইট পুড়িতেছে, লোহা পুড়িতেছে, গলা চিনির রস চারিদিকে স্রোতের মত গড়াইতেছে। অন্য কথায় কাজ কি, মাটির ভিতর হইতে যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল।

দূর হইতে মেহতা আর খান্না ভাবিল, এতগুলি লোক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে, ইহারা আগুন নিভাইবার চেষ্টা করে না কেন। কাছে আসিয়া বুঝিল, তামাসা দেখা ভিন্ন অন্য কিছু করা সাধ্যের বাহিরে। মিলের সীমানার পঞ্চাশ গজের মধ্যে যাওয়া মানে প্রাণে মরা। ইট পাথরের টুকরা ছিটিয়া আসিয়া গুলির মত গায়ে বিঁধিবে। হাওয়ার গতি যদি এদিকে আসে, তবে তো প্রাণ লইয়া ছুটাছুটি পড়িয়া যাইবে।

ইহারা তিনজনে ছিল ভিড়ের পশ্চাতে। কি করা যায় বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু আগুন লাগিল কি করিয়া, আর এত শীঘ্র ছড়াইয়াই বা পড়ে কি করিয়া? আগে কি কাহারও চোখে পড়ে নাই? অথবা দেখিয়াও কেহ নিভাইবার চেষ্টা করে নাই? সকলের মনেই এই সব ভাবনা, কিন্তু কে কাহাকে জিজ্ঞাসা করে? মিলের কর্মচারীরা তো আছে, তবে এই ভিড়ে তাহাদের পাত্তা পাওয়া সুকঠিন।

হঠাৎ হাওয়ার বেগ এত প্রবল হইল যে অগ্নিশিখা দুর্বার বেগে নীচে ছড়াইয়া পড়িল, সমুদ্রে যেন জোয়ার আসিয়া পড়িল। এ উহার ঘাড়ে পড়িয়া একে অপরকে মাড়াইয়া, দলিয়া লোক ছুটিতে লাগিল, একটা সিংহ যেন অরণ্য মথিত করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। আগুন এমন প্রবল ভাবে জলিয়া উঠিল, মনে হইল শেষ নাগ বুঝি সহস্র মুখ বিস্তার করিয়া অগ্নি বর্ষণ করিতেছে। আগুনের হলকায় কতজনে পুড়িয়া ঝলসিয়া গেল; একটা হলকা খান্নার মুখে আসিয়া লাগিল। মালতীকে মেহতা দুই হাতে ধরিয়া রাখিয়াছে, নতুবা সে নিশ্চয় পুড়িয়া যাইত। তিনজনে কোনমতে দেওয়ালের কাছে একটা তেঁতুল গাছের নীচে গিয়া দাঁড়াইল। খান্না মিলের চিমনির দিকে অচেতন তন্ময়ভাবে চাহিয়া রহিল।

মেহতা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার খুব বেশি লাগে নি তো?

খান্না জবাব দিল না, ঐদিকেই চাহিয়া রহিল। উহার চোখে এমন শূন্যতা যাহা বিক্ষিপ্তচিত্ততার লক্ষণ বলিয়া মনে হয়।

মেহতা উহার হাত ধরিয়া বলিল, আমরা অনর্থক এখানে দাঁড়িয়ে আছি। চলুন এবার যাই, আমার মনে হয় আপনার বেশ একটু চোট লেগেছে।

খান্না তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, আর ঠিক যেন পাগলের মত বলিল, এর মধ্যে কার কারসাজি, তা আমি জানি। এতেই যদি ও খুসি হয়, তবে ঈশ্বর ওর ভালো করুন! আমার কুছ পরোয়া নাই—কুছ পরোয়া নাই। আমি যদি চাই আজই নতুন কল দাঁড় করাতে পারি—একদম নতুন। এরা আমাকে কি মনে করে? মিল আমাকে তৈরি করে নি, আমিই মিল তৈরি করেছি। আবার একটা কল আমি এখুনি বানাতে পারি। এ কারসাজি যার, তাকে শেষ করে ছাড়বো। আমি সব জানি, সব জানি।

উহার কথা শুনিয়া আর মুখের ভাব দেখিয়া মেহতা ঘাবড়াইয়া গেল; বলিল, চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি, আপনার শরীরটা ভাল নেই।

অট্টহাসি হাসিয়া খান্না বলিল, আমার শরীর খারাপ! তাই বুঝি কলটা জ্বলে গেল! এরকম কত গণ্ডা মিল আমি অক্লেশে খুলতে পারি। আমার নাম খান্না, চন্দ্রপ্রকাশ খান্না। আমার সর্বস্ব আমি এই মিলে ঢেলেছি। প্রথম কলে আমরা শতকরা কুড়ি টাকা লাভ দিয়েছি। উৎসাহিত হয়ে আমি এই কলটা খুলি। এর অর্ধেক টাকা আমার একলার। ব্যাঙ্কের দু লাখ টাকা আমি এতে লাগিয়েছি। এক ঘণ্টা আগে, এক কেন, আধ ঘণ্টা আগে আমি ছিলাম দশ লাখ টাকার মালিক। জানেন, ঠিক দশ লাখ। আর এখন হয়েছি—না, না, দেউলিয়া। ব্যাঙ্কের কাছে আমার দু লাখ ধার আছে—যে বাড়িতে রয়েছি, তা এখন আমার নয়। যে থালায় খাচ্ছি, তাও আমার নয়। ব্যাঙ্ক থেকে আমায় বার করে দেবে। যে খান্নাকে দেখে লোকে হিংসেয় জ্বলতো, সে আজ ধুলোয় মিলিয়ে গেল। সমাজে আমার স্থান নেই, বন্ধুরা আমায় বিশ্বাসের পাত্র না ভেবে দয়ার পাত্র মনে করবে। শত্রুরা জ্বলবে না, আমায় দেখে হাসবে। আপনি জানেন না মিঃ মেহতা, আমি নিজের মত ও বিশ্বাস কি ভাবে প্রতিদিন হত্যা করেছি। কত ঘুস দিয়েছি, কত ঘুস নিয়েছি। কিষাণদের আখ মাপবার জন্যে কত লোক রেখেছি, কত নকল বাটখারা রেখেছি। এ সব শুনেই বা কি হবে? কিন্তু নিজের এ দুর্দশা ঘটাবার জন্য কেনই বা খান্না বেঁচে রইল? যা হবার হোক, দুনিয়ার লোক যত খুসি হাসুক, বন্ধুরা যত ইচ্ছা আফশোস করুক, লোকে যেমন চায় গাল দিক। এ সব দেখার আর শোনার জন্যে খান্না বেঁচে থাকবে না, খান্না নির্লজ্জ বেহায়া নয়।

বলিতে বলিতে খান্না দুই হাতে নিজের মাথা চাপড়াইতে লাগিল আর জোরে কাঁদিয়া উঠিল।

মেহতা উহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, খান্নাজী, একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি সব বুঝে এমন মন খারাপ করছেন কেন? টাকায় মানুষ যে সম্মান পায় তা টাকারই মান, মনুষ্যত্বের নয়। নির্ধন হলেও আপনি শত্রু মিত্র সকলের বিশ্বাস-ভাজন থাকতে পারবেন। চাই কি, তখন আপনার শত্রু কেউ থাকবেই না। চলুন, ঘরে চলুন। একটু বিশ্রাম পেলে আপনার মন শান্ত হবে।

খান্নার মুখে জবাব আসিল না। তিন জনে চৌরাস্তায় আসিয়া দেখে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ী খান্নার কুঠিতে আসিয়া পৌঁছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া শান্তভাবে খান্না বলিল, গাড়ী আপনারা নিয়ে যান, আমার এখন গাড়ীর দরকার নেই।

মালতী আর মেহতাও নামিয়া পড়িল। মালতী বলিল, চল, তুমি ভালো করে একটু শোবে, আমরা বসে গল্প সল্প করবো।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মালতীর দিকে চাহিয়া করুণ স্বরে খান্না বলিল, মালতী, আমার সব দোষ তুমি ক্ষমা কর। মেহতা আর তুমি ছাড়া সংসারে আমার কেউ নাই। আশা করি তোমাদের চোখে আমি নেমে যাব না। পাঁচ দশ দিন বাদে এ বাড়িও হয়তো ছেড়ে দিতে হবে। টাকায় কি ভেলকিই না দেখাল!

মেহতা বলিল, আমি সত্যি বলছি খান্নাজী, আমার কাছে আজ আপনার ইজ্জত যতখানি বাড়লো, আগে কোনদিন ততখানি ছিল না।

তিনজনে ঘরে গিয়া বসিল। দরজা খোলার শব্দ পাইয়াই গোবিন্দী আসিয়া বলিল, আপনারা কি ওখান থেকে আসছেন? মহারাজ তো বড়ই খারাপ খবর নিয়ে এসেছে।

খান্নার মনে এমন দুর্বার ঝড়ের মতো আবেগ জন্মিল যে, সে গোবিন্দীর পায়ের উপর পড়িয়া চোখের জলে তাহার পা ভিজাইয়া দিল। ভারি গলায় বলিল, হাঁ, প্রিয়ে, আমাদের সর্বস্ব গেছে।

উহার ভগ্ন, আহত, নির্জীব প্রাণ সান্ত্বনার জন্য ব্যাকুল; জীবনসূত্র ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে বুঝিয়াও রোগী যেমন আশায় আশায় বৈদ্যের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, খান্নাও তেমনই ব্যগ্রতাভরে গোবিন্দীর কাছে সান্ত্বনা খুঁজিতে লাগিল। সেই গোবিন্দী, যাহার উপর সর্বদা কত জুলুম করিয়াছে, হরদম যাহাকে অপমান করিয়াছে, যাহাকে এতদিন জীবনের দায় মনে করিয়াছে, সর্বদা যাহার মৃত্যু কামনা করিয়াছে—সেই যেন আজ দুই হাতে বরাভয় বহিয়া আনিয়া উহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, উহার চরণতলে যেন খান্নার স্বর্গ, দুর্ভাগার মাথায় হাত রাখিয়া গোবিন্দী যেন নির্জীব ধমনীতে ধমনীতে আবার প্রাণ সঞ্চালিত করিয়া দিবে। মনের এই অসীম দুর্বল মুহূর্তে, এই ঘোর বিপদের দিনে বুঝি গোবিন্দী আজ তাহাকে বুকে টানিয়া লইতে প্রস্তুত। নৌকাবিহারের সময় তীরলগ্ন যে শিলাখণ্ড আমাদের পথের বাধা হইয়া দাঁড়ায়, যাহাকে সরাইয়া ফেলিতে আমরা ব্যস্ত হই, নৌকা ভাঙ্গিয়া গেলে সেই শিলাই হয় পরম আশ্রয়।

গোবিন্দী উহাকে একটি সোফায় তুলিয়া বসাইল, আর স্নেহকোমল স্বরে

বলিল, তুমি এত মন খারাপ করছো কেন? টাকার জন্যে? যে টাকা সংসারের সব কিছু অনর্থের মূল? দেখ, ঐ ধনে আমাদের কি বা সুখ ছিল? সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একটা না একটা ঝঞ্ঝাট। আত্মার দস্তুর মতো ক্ষতি। ছেলেরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায়, আত্মীয়স্বজনকে চিঠি পত্র লিখতে পর্যন্ত তোমার সময় হয় না! তবে হাঁ, মান ছিল, কারণ মানুষ চিরদিন ধনেরই পূজো করে এসেছে। অমন মানে তোমার কাজ নেই। যতদিন টাকা আছে তোমার কাছে ল্যাজ নাড়বে, আবার কাল ঠিক অতখানি খাতির করে অন্যের দোরে যাবে। ভাল লোকে টাকার কাছে মাথা নোয়ায় না। ভাল লোকে দেখে, তুমি কি রকম লোক; যদি দেখে লোকটা খাঁটি, তার মধ্যে ত্যাগের ভাব আছে, পৌরুষ আছে, তবেই তাকে সম্মান করে। তা না হলেই তোমাকে সমাজের শত্রু ভেবে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আমি ভুল বলছি না তো, মেহতাজী?

মেহতা যেন স্বর্গের স্বপ্ন দেখিতেছিল, চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, ভুল কথা! আপনি যা বলছেন সংসারের সাধু, জ্ঞানী লোকেরা যে বহুদিনের সাধনার ফলে তা বলেন।

গোবিন্দী মেহতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ধনী কে যে হয় আর কে যে হয় না, তার কি ঠিক আছে? যে লোক কলকৌশলে অন্যকে বোকা বানিয়ে দিতে পারে······

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া খান্না বলিল, না গোবিন্দী, টাকা করার জন্যে চাই নিজের মধ্যে সংস্কার। কেবল কৌশলে টাকা হয় না। তার জন্যেও ত্যাগ স্বীকার কোরতে, তপস্যা কোরতে হয়। অতখানি সাধনায় বোধ হয় ঈশ্বরকেও লাভ করা যায়। আত্মা, বুদ্ধি, শরীরের সকল শক্তির সাধনার সামঞ্জস্যকে বলে ঐশ্বর্য।

গোবিন্দী প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, হাঁ, তা ঠিক, টাকার জন্যে কম তপস্যা করতে হয় না, কিন্তু এও ঠিক যে, টাকাকে আমরা যত বড় মনে করি, টাকা ততটা বড় জিনিস নয়। আমার তো আনন্দই হোচ্ছে যে তোমার মাথা থেকে টাকার ভার নেমে গেছে। এখন তোমার ছেলেরা মানুষ হবে, অভিমান আর স্বার্থের পুতুল হবে না! রাগ কোরো না, কিন্তু এতদিন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল শুধু ভোগবিলাস আর আত্মতৃপ্তি। ঈশ্বর তোমার ঐ সব থেকে

বঞ্চিত করে আজ পবিত্র, উন্নত জীবনে যাবার পথ খুলে দিলেন। সে পথে কষ্ট কিছু হবে, কিন্তু তাকে বরণ করে নাও। তুমি কেন এ ব্যাপারটাকে মস্ত বিপত্তি মনে করছো? অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সুযোগ মিললো, তা বুঝছো না? আমার মতে লোককে পীড়ন করার চেয়ে নিজে পীড়িত হওয়া ঢের ভালো। ঐশ্বর্য গিয়ে যদি তুমি নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করতে পার তবে তা কি বড় বেশি দাম দেওয়া হবে? ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করায় সৈনিকের যে গৌরব, তা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

গোবিন্দীর কৃশ বিবর্ণ মুখে এমন জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, মনে হইল ওর যেন কোথা হইতে বিলক্ষণ শক্তি লাভ হইয়াছে, ওর এত দিনের মূক সাধনা আজ প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছে।

মেহতা ভক্তিশ্রদ্ধাভরা চোখে উহাকে দেখিতেছিল। খান্না মাথা নীচু করিয়া ছিল, আর মালতী মনে মনে লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। গোবিন্দীর মন এত উঁচু, এমন বিশাল উহার হৃদয়, এমন সুন্দর বিচারশক্তি!

## ২৯

নোহরী সেই সব মেয়েদের দলে ছিল না যাহারা ভাল কাজ করিয়া তাহা জলে ফেলিয়া দেয়। সে যদি কাহারও কিছু ভাল করিয়া থাকে তবে নিজের ঢাক খুব বাজাইবে, আর সে চেষ্টা যতখানি যশ পাইবার যোগ্য তাহার চেয়ে বেশি পাইবার জন্য প্রাণপাত করিবে। এরকম লোকের যশের বদলে নিন্দা আর বদনামই জোটে। কাহারও ভাল না করা দুর্নামের কথা নহে। আমার ভাল করার ইচ্ছা নাই, বা সামর্থ্য নাই, তাহার জন্য কেহ আমাকে মন্দ বলিতে পারে না; কিন্তু আমি যখন ভাল করিয়া তাহার বদলে কৃতজ্ঞতা পাইতে চাই, তখন যাহার ভাল করিয়াছি সে আমার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, আর আমার ঋণ শোধ করিয়া ফেলিতে চায়। 'ভাল করিলাম' এই জ্ঞান মনের মধ্যে থাকিলেই ভাল, আর বাহিরে প্রকাশ পাইলে হয় খারাপ। নোহরী চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতেছে—বেচারা হরি বড় দুরবস্থায় পড়েছিল, মেয়ের বিয়েতে জমি রেহান রাখতে হোত; ওর এ দশা চোখে দেখে দয়া হোল। ধনিয়াকে দেখে গা জলত; ও মাগীর তো অহঙ্কারে মাটিতে আর পা পড়ে না। হরি বেচারা চিন্তায় শুকিয়ে যাচ্ছিল।

আমি ভাবলাম, এই সঙ্কটের সময় একে কিছুটা সাহায্য করি। শেষটায় মানুষই তো মানুষের কাজে লাগে। আর হরি তো এখন আর পর নয়, মানো আর না-ই মানো, ও যে তোমারই কুটুম্বের মধ্যে হয়ে পড়েছে। টাকাটা বের করে দিয়ে দিলাম। না হলে মেয়েটা এখনও বসে থাকত।

ধনিয়াই বা এই বড়াই কতদিন ধরিয়া শুনিবে। টাকা খয়রাত দিয়েছিল! বড় খয়রাত দেনেওয়ালী! সুদ মহাজনও নেবে, তুমিও নেবে। কৃতজ্ঞতার কি আছে এতে। অন্যকে দিলে সুদের জায়গায় আসলও গায়েব হয়ে যেত, আমরা নিয়েছি, তাই হাতে টাকা এলেই নাকের সামনে রেখে দেব। আমি ছিলাম বলে তোমার ঘরের বিষ তুলে খেয়ে ফেললাম, কখনও আর সে কথা মুখে আনি নাই। গাঁয়ে কেউ দরজা মাড়াতে দিত না। আমরা তোমার মর্যাদা করে দিয়েছি, তোমার মুখ কালো হতে দিই নাই।

রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রাবণের অন্ধকারের ঘটায় আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। সমস্ত গাঁ অন্ধকার। হরি খাওয়া সারিয়া তামাকু খাইল, আর যেমন শুইতে যাইবে অমনই ভোলা আসিয়া দাঁড়াইল।

হরি জিজ্ঞাসা করিল—কেমন চলছে ভোলা মাহাতো! যখন এই গাঁয়ে থাকতে হবে, তখন ছোটখাট ঘর একখানা তৈরি করে নাওনা কেন? গাঁয়ের লোক কত শত কুৎসা রটনা করছে। তা কি তোমার ভাল লাগে? মন্দ ভাবে নিও না, তোমার সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে গেছে, এই জন্য তোমার বদনাম শুনতে পারি না, নইলে আমার কি আসে যায়?

ধনিয়া এমনি সময় এক ঘটি জল লইয়া হরির শিয়রে রাখিতে আসিল। শুনিয়া বলিল—অন্য কেউ হলে এমনধারা স্ত্রীর মাথা কেটে ফেলত।

হরি ধমক দিল—কেন বাজে কথা বলছিস? জল রেখে দিয়ে শুতে যা। আজ তুই-ই কুপথে চললে কি আমি তোর মাথা কেটে ফেলব? কাটতে দিবি?

ধনিয়া সেই জলের একটু ছিটাইয়া বলিল—কুপথে চলুক তোমার বোন, আমি কেন কুপথে চলব! আমি বলছি দুনিয়ার কথা, তুমি আমায় গাল পাড়ছ। এখন দেখছি মুখ মিষ্টি হয়ে গেছে। স্ত্রী যে রাস্তায় খুসি চলেছে, পুরুষ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে; এমন পুরুষকে আমি পুরুষই বলি না।

হরির মনে দুঃখ হইতেছিল। ভোলা তাহার কাছে আসিয়াছে হয়তো নিজের ব্যথা বেদনার কথা বলিতে; ও আবার উলটিয়া তাহার উপর চড়াও

হইল! একটু গরম হইয়া বলিল—তুই যে সারা দিন নিজেরই মনে যা খুসি করিস, তা আমি কি তোর সঙ্গে ঝগড়া করি! কিছু বললে মারতে আসিস। সে কথা ভেবে দেখ।

ধনিয়া মন জোগাইয়া চলিতে শিখে নাই। বলিল—বৌ ঘিয়ের ঘড়া উলটে দিক, ঘরে আগুন লাগাক, পুরুষ সয়ে নেবে; কিন্তু তার কুপথে চলা কোনও পুরুষই সইবে না।

ভোলা দুঃখিত স্বরে বলিল—তুই খুব ঠিক বলছিস রে ধনিয়া! নিশ্চয় আমার উচিত ছিল ওর মাথা কেটে ফেলা, কিন্তু অতখানি পৌরুষ তো ছিল না। তুই গিয়ে বুঝিয়ে আয়, আমি সব কিছু বলে হেরে গেলাম।

স্ত্রীকে বশে রাখবার সামর্থ্য যদি না-ই থাকে, তাহলে বিয়ে করলে কেন? এই কেলেঙ্কারির জন্য? ভেবেছিলে কি যে, ও এসে তোমার পা টিপবে, তোমাকে তামাক সেজে সেজে খাওয়াবে, আর যখন তুমি অসুখে পড়বে তখন তোমার সেবা করবে? তা সে রকম করতে পারে সেই স্ত্রী যে তোমার সঙ্গে জোয়ান বয়সের সুখ পেয়েছে। আমার বুদ্ধিতে এটা আসে না যে তুমি কি করে ওর হাতের পুতুল হয়ে গেলে! বিয়ের আগে কিছু সন্ধান তো নিতে হয় যে ওর স্বভাব কেমন, কি প্রকৃতির লোক; তুমি যে ভুখা শিয়ালের মত পাগল হলে। এখন তো তোমার ধরমই হল কাটারি দিয়ে ওর গলা কেটে ফেলা। ফাঁসি হবে বড় জোর। এই কেলেঙ্কারির থেকে ফাঁসি ভাল!

ভোলার রক্তচলাচল দ্রুত হইল। বলিল—তাহলে এই হল তোমার পরামর্শ?

ধনিয়া বলিল—হাঁ, এই আমার পরামর্শ। এখন শ-পঞ্চাশ বছর তো বাঁচবে না। মনে করবে, এই পর্যন্ত আয়ু ছিল।

হরি এবার জোরে ধমক দিল—চুপ কর, বড় সাধু সেজে এসেছেন! জবরদস্তি পাখি পর্যন্ত পিঁজরায় রাখা যায় না, মানুষকে রাখবে কি করে। তুমি ওকে ছেড়ে দাও ভোলা, মনে কর, ও মরে গেছে, আর গিয়ে নিজের ছেলেপুলের সঙ্গে আরামে থাক। দুখানা রুটি খাও আর রামনাম কর। জোয়ান বয়সের সুখ সব চলে গেছে। ও বৌ হল চঞ্চল, বদনাম আর জ্বালাপোড়া ছাড়া ওকে দিয়ে তোমার আর কোন সুখ হবে না।

ভোলা নোহরীকে ছাড়িয়া দিবে? অসম্ভব! নোহরী এখনও তাহার দিকে

রোষভরা দৃষ্টি হানিয়া ভর্ৎসনা করিতেছে মনে হয়; কিন্তু না, ভোলা এখন তাহাকে ছাড়িয়াই দিবে। যেমন করিতেছে, তাহার ফল ভুগুক।

ভোলার চক্ষে জল আসিয়া গেল। বলিল—হরি ভাই, এই বৌয়ের দরুণ আমার যত কষ্ট হচ্ছে তা আমিই জানি। ওর জন্য কামতার সঙ্গে আমার লড়াই হল। বুড়ো বয়সে এই দাগাও আমার অদৃষ্টে ছিল, তা ঘটে গেল। আমাকে রোজ শোনায় যে তোমারই মেয়ে তো বেরিয়ে গেছে। আমার মেয়ে বেরিয়ে গেছে, কি পালিয়ে গেছে, কিন্তু নিজের লোকের সঙ্গেই পড়ে রয়েছে, তারই সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে আছে। এমন বৌ-ই তো আমি দেখি নাই। অন্যের সঙ্গে হাসাহাসি করছে, আমায় দেখেই তেলের হাঁড়ির মত গাল ফোলাবে। আমি গরিব মানুষ, তিন চার আনা রোজ হল আমার মজুরি; দুধ-দই, মাছ-মাংস, মালাই-রাবড়ি আনব কোথা থেকে?

ভোলা এখান থেকে প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজের ঘরে গেল যে এখন হইতে ছেলেদের সঙ্গে থাকিবে, অনেক ধাক্কা খাইয়াছে; কিন্তু পরের দিন সকাল বেলায় হরি দেখিল, ভোলা দুলারী সাহুয়াইনের দোকান থেকে তামাক লইয়া চলিয়া যাইতেছে।

হরি তাহাকে ডাকা উচিত মনে করিল না। আসক্তিতে লোকে নিজের বশে থাকে না। সেখান হইতে আসিয়া ধনিয়াকে বলিল—ভোলা তো এখনও ওখানে আছে। নোহরী সত্যি সত্যি ওর ওপরে কিছু যাদু করেছে।

ধনিয়া নাক সিটকাইয়া বলিল—ও যেমন বেহায়া, এও তেমনি বেহায়া। এমন মরদের তো গণ্ডুষ জলে ডুবে মরা উচিত। এখন ওর অহঙ্কার না জানি কোথায় গেছে। ঝুনিয়া এখানে এলে ও তার পিছনে পিছনে ডাণ্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়াত; ইজ্জৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল! এখন ইজ্জৎ নষ্ট হয় না?

হরির ভোলার উপর দয়া আসিয়াছিল। বেচারি এই কুলটার ফেরে পড়িয়া নিজের জীবনটা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। ছাড়িয়া যায় যদি, তবে কেমন হয়? স্ত্রীকে এমনি করিয়া ছাড়িয়া যাওয়া কি সাজে? এ ডাইনি তো উহাকে সেখানেও শান্তিতে থাকিতে দিবে না! কখনও পঞ্চায়েৎ করিবে, কখনও ভাত কাপড়ের দাবি করিবে। এখন তো শুধু গাঁয়ের লোকেরা জানে। কাহারও কিছু বলিতে সংকোচ হয়, শুধু কানাকানি করে। তখন তো দুনিয়াই ভোলাকে মন্দ বলিবে। লোকে তো এই কথাই বলিবে যে মরদ যখন ছাড়িয়া

দিয়াছে, তখন বেচারী নিঃসহায় মেয়ে মানুষ করে কি! মরদ খারাপ হইলে মেয়ের গলায় ছুরি বসায়। মেয়ে খারাপ হইলে মরদের মুখে কালি লাগাইয়া দেয়।

ইহার দুই মাস পরে এক দিন গাঁয়ে খবর রটিয়া গেল যে নোহরী জুতা মারিয়া ভোলার মাথার উপর টাক করিয়া দিয়াছে।

বর্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে, রবিশস্য বুনিবার আয়োজন চলিতেছে। হরির আখ তো নিলাম হইয়া গিয়াছে। আখের বীজের জন্য তাহার টাকা জোটে নাই, তাই আর আখ বসান হয় নাই। ওদিকে ডাইনের বলদটিও বসিয়া আছে, নূতন বলদ না হইলে আর কাজ চলে না। পুনিয়ার একটা বলদ নালায় পড়িয়া মারা গিয়াছিল, তখন হইতে আরও অসুবিধা শুরু হইয়াছে। একদিন পুনিয়ার ক্ষেতে লাঙ্গল চলিত, একদিন হরির ক্ষেতে। ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া যেমন হওয়া উচিত তেমনটি আর হইতে পাইত না।

হরি লাঙ্গল লইয়া ক্ষেতে গেল; কিন্তু ভোলার চিন্তা ওকে পাইয়া বসিয়াছিল। সে তাহার জীবনে কখনও শোনে নাই যে কোনও স্ত্রী তাহার স্বামীকে জুতা মারিয়াছে। জুতা কেন, চাপড় কি ঘুষি মারিবার কোনও ঘটনা তাহার মনে আসে না; আর আজ নোহরী ভোলাকে জুতা দিয়া পিটিয়াছে, সকলে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিয়াছে। এই মেয়ের হাত থেকে ও হতভাগার প্রাণ বাঁচে কি করিয়া? এখন তো ভোলার কোথাও ডুবিয়া মরা উচিত। জীবনে যখন বদনাম ও দুর্দশা ভিন্ন আর কিছু নাই, তখন লোকের মরিয়া যাওয়াই ভাল। ভোলার নাম করিয়া কাঁদিবার জন্য কে বসিয়া আছে? ছেলে ইচ্ছা করিলে ক্রিয়াকর্ম করিতে পারে; কিন্তু তাহা লোকলজ্জার ভয়ে। কাহারও চোখের জল পড়িবে না। তৃষ্ণার বশে পড়িয়া লোকে এমনি করিয়া জীবনকে ভণ্ডুল করিয়া দেয়। যখন কাঁদিবার কেহ নাই, তখন জীবনের জন্য মোহই বা কী, আর মরণে ভয়ই বা কী!

এক ঐ নোহরী, আর এদিকে এই চামারনী সিলিয়া! দেখিতে শুনিতে ওর চেয়ে লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ। মন হইলে দুই চার জনকে খাওয়াইয়া খাইবে, ও সাজিয়া গুজিয়া বেড়াইবে; কিন্তু করে মজুরি, মরে ক্ষুধায়, মতই-এর নাম ধরিয়া বসিয়া আছে, অথচ সেই নির্দয়টা ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করে না। কে জানে, ধনিয়া মারা গেলে হরিরও আজ এই দশা হইত। তাহার মৃত্যুর কল্পনা করিতেই হরির গায়ে

কাঁটা দেয়, ধনিয়ার মূর্তি মানসচক্ষের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া যায়—সেবা ও ত্যাগের দেবী ; যৌবনের তেজ, কিন্তু মোমের মত কোমল হৃদয় ; এক এক পয়সার জন্য প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের সর্বস্ব আহুতি দান করিতে তৈয়ার। যৌবনে সে কম রূপবতী ছিল না। নোহরী তাহার কাছে কী! চলিত যখন, তখন মনে হইত রানীর মত চলিতেছে। যে দেখিতে আসিত, সে দাঁড়াইয়া দেখিতেই থাকিত। এই পটেশ্বরী ও ঝিংগুরী তখন ছিল বয়সে যুবা। দুইজনে ধনিয়াকে দেখিয়া বুকের উপর হাত রাখিয়া স্থির হইত। শতবার দরজায় চক্রাকারে ঘুরিত। হরি তাহাদের সন্ধানে থাকিত ; কিন্তু ঝগড়ার কোনও সূত্র পাইত না। সে সব দিনে ঘরে খাওয়া-পরার বড় টানাটানি ছিল। সে বছর বরফ পড়িয়া ক্ষেতে একেবারে কোন ফসল হয় নাই। লোকে জংলী কুল খাইয়া খাইয়া দিন কাটাইত। হরিকে দুর্ভিক্ষের ক্যাম্পে কাজ করিতে যাইতে হইত ; ছ পয়সা তাহার রোজ ছিল। ধনিয়া ঘরে একাই থাকিত ; কিন্তু কখনও কেহ তাহাকে কোনও বাবুসাহেবের পানে মন্দভাবে তাকাইতে দেখে নাই। পটেশ্বরী একবার কিছু ঠাট্টা করিয়াছিল ; তাহার এমন মুখ-ভাঙ্গা জবাব দিয়াছিল যে এখন পর্যন্ত সে ভুলিতে পারে নাই।

সহসা হরি দেখিল মাতাদীন আসিতেছে। কসাই কোথাকার, কেমন তিলক লাগাইয়াছে, যেন ভগবানের আসল ভক্ত। রং করা শেয়াল! এমন বামুনকে প্রণাম করে কে?

মাতাদীন কাছে আসিয়া বলিল—তোমার ডাইনের বলদটা তো বুড়ো হয়ে গেছে হরি, এবার সেঁচ পর্যন্ত টিকবে না। একে এনেছ, পাঁচ বছর হবে কি?

হরি ডাইনের বলদের পিঠে হাত রাখিয়া বলিল—পাঁচ বছর কি রকম? এই তো আট বছর চলেছে ভাই! প্রাণ চায় একে পেনসন দিয়ে দিই। কিন্তু কিষাণ আর তার বলদ, যমরাজ পেনসন দিলে তবে এরা ছুটি পাবে। এর ঘাড়ে জোয়াল রাখতে আমার মন চায় না। বেচারা ভাবে হয়তো, এখনও ছুটি নাই, এবার কি আমার হাড় লাঙ্গলে জুতবে নাকি? কিন্তু নিজের থেকে কেউ অচল হয় না। তুমি আছ কেমন? এখন তো শরীরটা ভাল লাগছে?

মাতাদীন এদিকে এক মাস ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিল। একদিন তো তাঁহার নাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল ; চারপাই হইতে তাহাকে নীচে নামাইয়া দেওয়া হইল। তখন হইতে উঁহার মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে সিলিয়ার উপর

অত্যাচার করিবার জন্যই এই সাজা সে পাইল। যখন সে সিলিয়াকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়, তখন সিলিয়া গর্ভবতী। তাহার একটুও দয়া হয় নাই। পূরা গর্ভ লইয়াও সিলিয়া মজুরি করিতেছিল। ধনিয়া যদি উহার প্রতি দয়া না করিত তাহা হইলে সে মারাই পড়িত। কত দুর্দশায় জ্বলিয়া পুড়িয়াও বাঁচিয়া আছে; এই অবস্থায় মজুরিও তো করিতে পারে না। এখন লজ্জা পাইয়া ও নরম হইয়া সে হরির হাতে সিলিয়াকে দুটা টাকা দিতে আসিয়াছিল। হরি যদি এই টাকাটা তাহাকে দিয়া দেয় তবে ও খুবই উপকৃত মনে করিবে।

হরি বলিল—তুমি গিয়ে কেন দিয়ে দাও না।

মাতাদীন দীনভাবে বলিল—আমায় ওর কাছে পাঠিও না হরি মাহাতো। কোন মুখ নিয়ে যাব? ভয়ও লাগে, আমায় দেখে যদি কিছু অভিশাপ দিতে আরম্ভ করে। তুমি আমার ওপর এতটুকু দয়া করো। এখন আমি হাঁটতে পারি না; কিন্তু এই টাকার জন্য এক যজমানের কাছে ক্রোশভর দৌড়িয়েছি। নিজের করমের ফল খুব ভুগে নিলাম। এই বামনাইয়ের বোঝা এখন ওঠালেও ওঠে না। লুকিয়ে ছাপিয়ে যত ইচ্ছা দুষ্কর্ম কর, কেউ কিছু বলবে না। প্রত্যক্ষ কিছু করতে পার না, তা হলে কুলে কলঙ্ক লেগে যাবে। তুমি বাবা ওকে বুঝিয়ে দিও যে আমার অপরাধ যেন ক্ষমা করে। এ ধরমের বাঁধন বড় কড়া। যে সমাজে জন্ম, যে সমাজে মানুষ, সেখানকার নিয়ম পালন তো করতেই হয়। আর কোন জাতের ধরম নষ্ট হলে তাতে বিশেষ কিছু হানি হয় না; বামুনের ধরম নষ্ট হলে যে কারও ধরম থাকে না। ওর পূর্বপুরুষের ধরমই যে ওর রোজগার। ও যে তারই রুটি খায়। এই প্রায়শ্চিত্তের পেছনে আমার তিন শ টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। যখন ধর্ম ছেড়েই থাকতে হবে, তখন আর যা কিছু করবার, প্রত্যক্ষই করব। সমাজের প্রতি লোকের যদি কিছু ধর্ম থাকে, তাহলে মানুষের প্রতিও তো সমাজের কিছু ধর্ম থাকবে। সমাজধর্ম পালন করলে সমাজ আদর করে; কিন্তু মনুষ্যধর্ম পালন করলে তো ঈশ্বর খুসি হন।

সন্ধ্যাবেলা হরি যখন সিলিয়াকে ভয়ে ভয়ে টাকা দুইটা দিল, সিলিয়া তখন যেন নিজের তপস্যার বর পাইল। দুঃখের ভার তো ও একাই বহিতে পারে, সুখের ভার কিন্তু একা বহন করা যায় না। কাহাকে এই খোস-

খবরটা শুনায়? ধনিয়ার সঙ্গে ও নিজের মনের কথা বলিতে পারে না। গাঁয়ে আর কোনও প্রাণী নাই, যাহার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা আছে। তাহার পেটে কথাগুলা কিলবিল করিতে লাগিল। সোনাই ছিল তাহার সখী। সিলিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। সারা রাত সবুর করে কি করিয়া? মনের মধ্যে আঁধির মত ঝড় উঠিল। এখন ও আর অনাথ নয়। মাতাদীন উহার হাত আবার ধরিয়াছে। জীবনপথে তাহার সামনে এখন কোন খাত অন্ধকার ভীষণ বদন বিস্তার করিয়া নাই, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র আছে পড়িয়া, তাহাতে কত কত লতা ফুল লক লক করিয়া উঠিতেছে, সেখানে ঝরণা যায় গান করিয়া আর হরিণ ফিরে লাফাইয়া লাফাইয়া। তাহার শুকানো স্নেহ আজ পাগল হইয়া উঠিয়াছে। মাতাদীনকে সে যে মনে মনে কত শাপ দিয়াছে। এখন তাহার কাছে সে ক্ষমা চাহিবে। তাহার সত্য সত্যই বড় ভুল হইয়াছিল যে সমস্ত গাঁয়ের সামনে তাহাকে অপমান করিয়াছিল। ও তো নিজে চামারনী, জাতে নীচু, ওর আর কি গিয়াছে! আজ দশ-বিশ টাকা খরচ করিয়া বেরাদরিকে রুটি খাওয়াক, আবার বেরাদরি তাহাকে নিবে। ও বেচারার তো চিরকালের জন্য ধর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে মর্যাদা আর ও ফিরিয়া পাইবে না। রাগে সে কতদূর অন্ধ হইয়া গিয়াছিল যে সকলের কাছে তাহার প্রেমের ঢাক বাজাইতে থাকিল! ওর ধর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, ওর তো ক্রোধ হইবেই, কিন্তু সিলিয়ার ঘাড়ে ভূত চাপিল কেন? সে যদি নিজের ঘরে চলিয়া যাইত, তাহা হইলে মন্দ কি হইত? ঘরে তাহার কোন বন্ধন তো ছিল না। দেশে মাতাদীনের এই জন্যই আদর যে সে আচারে নিয়মে থাকে। সে ধর্মই যদি নষ্ট হইল, তাহা হইলে মাতাদীন কেন তাহার রক্ত পান করিতে চাহিবে না?

অল্পক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত তাহার দৃষ্টিতে সমস্ত দোষ ছিল মাতাদীনের; আর এখন সমস্ত দোষ হইল নিজের। সহৃদয়তা হইতে সহৃদয়তা জন্মিল। ছেলেকে বুকে জড়াইয়া সে খুব আদর করিল। এখন ছেলেকে দেখিয়া তাহার আর লজ্জা বা গ্লানি হয় না। ও এখন শুধু তাহার দয়ার পাত্র নহে, ও এখন তাহার সম্পূর্ণ মাতৃস্নেহ ও গর্বের অধিকারী।

কার্তিকের রুপালী জ্যোৎস্না প্রকৃতির উপর মধুর সংগীতের মত ঢাকিয়া রহিয়াছিল। সিলিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। সে সোনার কাছে গিয়া এই

সুখের সংবাদ শোনাইবে। এখন আর সে ঘরে থাকিতে পারে না। এই তো সন্ধ্যা হইল। ডোঙ্গা পাওয়া যাইবে। সে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিল, নদীর ধারে আসিয়া দেখে, ডোঙ্গা ও পারে, মাঝির কোথাও খোঁজ নাই। চাঁদ গলিয়া যেন নদীর মধ্যে বহিয়া যাইতেছে। সেখানে এক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া সিলিয়া কি ভাবিয়া লইল; আবার নদীতে নামিল। নদীতে একটু যদি বেশি জল থাকে, তবে কি হইবে। সেই উল্লাসের সাগরের সামনে এ নদী আর কি! জল প্রথমে ছিল হাঁটু পর্যন্ত, পরে কোমর পর্যন্ত আসিল, শেষে গলা জল। সিলিয়া ভয় পাইল, ডুবিয়া না যায়, কোথাও গর্ত না থাকে; কিন্তু প্রাণের সঙ্গে খেলা করিয়া সে সামনে পা বাড়াইল। এখন সে মাঝামাঝি আসিয়াছে; মৃত্যু তাহার সামনে নাচিতেছে, কিন্তু সে ঘাবড়াইল না। সে সাঁতরাইতে জানে, ছেলেবেলা হইতে এই নদীতে কতবার সাঁতরাইয়াছে; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াও নদী পার হইয়াছে। তবু তার বুক ধুক ধুক করিতে লাগিল; কিন্তু জল কম হইতে শুরু করিল। এখন কোনও ভয় নাই। সে তাড়াতাড়ি নদী পার হইল, আর তীরে পৌছিয়া কাপড়ের জল নিংড়াইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল। চার দিক নিঝুম। কোন একটা আওয়াজও শোনা যাইতেছে না; সোনার সহিত দেখা হইবে, এই মধুর কল্পনা তাহাকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল।

কিন্তু সেই গাঁয়ে পৌছিয়া সোনার বাড়ি যাইতে তাহার সংকোচ হইতে লাগিল। মথুরা কি বলিবে? তাহার ঘরের লোকেরা কি বলিবে? সোনাও রাগ করিবে, এত রাত্রে তুই কেন আসিলি? দেহাতে সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া কিষাণেরা সন্ধ্যা হইতেই শুইয়া পড়ে। সমস্ত গ্রামে একটা নিঝুম ভাব। মথুরার ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। সেই দরজার সামনে এখনও আগুন চমকাইতেছিল। সিলিয়া নিজের কাপড় সেঁকিতে লাগিল। হঠাৎ খিল খুলিয়া মথুরা বাহিরে আসিয়া ডাকিল—ওখানে কে বসে আছে চৌকাঠের কাছে?

সিলিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টানিয়া কাছে গিয়া বলিল—আমি, সিলিয়া।

সিলিয়া! এত রাত্রে কি করে এলে? ওখানে সব কুশলে তো?

হাঁ, সব কুশল। প্রাণ অস্থির করছিল। ভাবলাম, যাই, সকলের সঙ্গে দেখা করে আসি। ..দিনে তো ছুটিই পাওয়া যায় না।

তবে কি নদী সাঁতরে এলে ?

আর কি করে আসি ? জল কম ছিল।

মথুরা তাহাকে বাড়ির ভিতরে লইয়া গেল। দেউড়িটা অন্ধকার। সিলিয়ার হাত ধরিয়া সে টানিল। সিলিয়া এক হেঁচকানিতে হাত ছাড়াইয়া লইল, রাগ করিয়া বলিল—দেখ মথুরা, আমার সঙ্গে এমন ধারা করলে আমি কিন্তু সোনাকে বলে দেব। তুমি আমার ছোট বোনের স্বামী। একথা মনে রেখো। সোনাকে বুঝি মনে ধরে না ?

মথুরা তাহার কোমরে হাত দিয়া বলিল—তুমি বড় নিষ্ঠুর, সিল্লী ; এখন কে দেখছে ?

আমি কি সোনার চেয়ে সুন্দর ! তোমার অদৃষ্টের জোর যে ইন্দ্রের পরীর মত বৌ পেয়েছ। এখন মন ছুটেছে ভোমরা হতে। ওকে বলে দিলে তোমার যে মুখ দেখবে না।

মথুরা লম্পট ছিল না। সোনাকে সে প্রেমভরা চোখেই দেখিত। সময়টা অন্ধকার, স্থান নির্জন, আর সিলিয়ার যৌবন দেখিয়া তাহার মন চঞ্চল হইয়া গিয়াছিল ; এই তম্বিতে তাহার হুঁশ হইল। সিলিয়াকে ছাড়িয়া দিতে দিতে বলিল—তোমার পায়ে পড়ি সিল্লী, ওকে বোলো না। এখন যা সাজা ইচ্ছা দাও।

সিল্লীর তাহার উপর দয়া হইল। আস্তে আস্তে তাহার মুখে চাপড় মারিয়া বলিল—এর সাজা এই যে আমাকে এমনিভাবে আর বলবে না, কাউকেই আর বলবে না, নইলে সোনা তোমার হাতের বাইরে চলে যাবে।

আমি দিব্যি করছি, সিল্লী, আর কখনও এমনি ধারা হবে না।

তাহার গলার স্বরে ছিল প্রার্থনার ভাব। সিল্লীর মন দুলিতে লাগিল। তাহার দয়া সরস হইতে লাগিল।

আর যদি হয় ?

তাহলে তুমি যা ইচ্ছা কোরো।

সিলিয়ার মুখ তাহার মুখের পাশে আসিয়া গিয়াছিল, আর দুজনের শ্বাসে, কথায় ও দুইজনের দেহে কম্পন লাগিয়াছিল। সহসা সোনা ডাকিয়া বলিল—ওখানে কার সঙ্গে কথা বলছ ?

সিল্লী পিছনে সরিয়া গেল। মথুরা আগাইয়া আঙ্গিনায় আসিল, বলিল—তোমাদের গাঁ থেকে সিল্লী এসেছে।

সিল্লীও পিছনে পিছনে আসিয়া আঙ্গিনায় দাঁড়াইল। সে দেখিল, সোনা এখানে কত আরামে থাকে। বারান্দাতে খাটিয়া আছে; তাহার উপর সুজনির নরম বিছানা বিছানো; ঠিক সেই রকম, যেমনটি থাকিত মাতাদীনের চারপাইয়ের উপর। তাকিয়াও আছে, লেপও আছে। খাটের নীচে ঘটিতে জল রাখা আছে। আঙ্গিনায় আয়নার মত জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এক কোণে তুলসীমঞ্চ, অন্য দিকে জোয়ারের কয়েকটা আঁটি দেওয়ালের গায়ে ঠেস দেওয়া রহিয়াছে। মাঝখানে আছে খড়ের আঁটি। কাছেই উদূখল, তাহার নিকটে ধান কোটা হইয়া পড়িয়া আছে। খাপড়ার চালের উপর লাউয়ের ডগা উঠিয়াছে, তাহাতে কয়েকটা লাউ উঁকি মারিতেছে। বারান্দার অন্য দিকে একটা গোরু বাঁধা। এই অংশে মথুরা ও সোনা শোয়। আর সকলে হয়তো অন্য অংশে থাকে। সিলিয়া ভাবিল, সোনার জীবনে কত সুখ। সোনা উঠিয়া আঙ্গিনায় আসিল; কিন্তু কই, ছুটিয়া আসিয়া সিল্লীর গলা জড়াইয়া ধরিল না তো। সিল্লী মনে করিল, হয়তো মথুরা দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া সোনা লজ্জা করিতেছে; অথবা কে জানে, ওর এখন মান বেশি হইয়াছে। সিল্লী চামারনীর সঙ্গে গলাগলি করিলে নিজের অপমান হইবে মনে করে। সিলিয়ার সমস্ত উৎসাহ জল হইয়া গেল। এই মিলনে হর্ষের বদলে হইল ঈর্ষা। সোনার গায়ের রং কতখানি খুলিয়াছে, আর শরীর কেমন কাঞ্চনের মত পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে! গঠন তো সুডোল হইয়াছেই; মুখের উপর গৃহিণীত্বের গরিমার সঙ্গে যুবতীর হাস্যময়ী কান্তিও আছে। সিল্লী মুহূর্তের জন্য মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া দেখিতে থাকিল। এ সেই সোনা, যে শুকনা শরীর লইয়া এলোচুলে ঝুঁটি বাঁধিয়া এদিক ওদিক ছুটিয়া বেড়াইত। মাসের পর মাস মাথায় তেল পড়িত না, ছেঁড়া নেকড়া জড়াইয়া বেড়াইত। আজ সে নিজের ঘরে রানী। গলায় হাঁসুলী আর হার, কানে কর্ণফুল ও সোনার মাকড়ি, হাতে চাঁদির চুড় ও কংকন, চোখে কাজল, সিঁথিতে সিঁদুর। ইহাই ছিল সিলিয়ার কল্পনার স্বর্গ। সোনাকে দেখিয়া সে খুসি হইল না। ও কতখানি অহংকারী হইয়া গিয়াছে। কোথায় সিলিয়ার গলা জড়াইয়া ঘাস কাটিতে যাইত, আজ মুখের দিকে তাকায় না পর্যন্ত। সে ভাবিয়াছিল, সোনা তাহার গলা ধরিয়া একটু কাঁদিবে, আদর করিয়া তাহাকে বসাইবে, তাহাকে খাবার খাওয়াইবে, আর গাঁ ও বাড়ির একশটা কথা জিজ্ঞাসা করিবে, নিজের নূতন জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিবে—সোহাগরাত ও মধুর

মিলনের কথা হইবে। তা সোনার মুখে ভাবের লেশ নাই। এখানে আসিয়াছে বলিয়া সিলিয়ার অনুতাপ হইতে লাগিল।

শেষে সোনা রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—এত রাত্রে কি করে এলি সিল্লী?

সিল্লী চোখের জল বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রাণ চাইছিল। অনেক দিন হয়ে গেল, দেখা করতে চলে এলাম।

সোনার স্বর আরও কঠোর হইল—তা লোকে পরের বাড়ি যায়, দিনের বেলায়, না এতটা রাত্রে?

বাস্তবিক পক্ষে উহার আসা সোনার ভাল লাগিতেছিল না। ঐ সময় তাহার প্রেম ক্রীড়া ও হাস্যবিলাসের, সিল্লী তাহাতে বাধা দিয়া যেন তাহার মুখের থালা কাড়িয়া লইল।

সিল্লী সংজ্ঞাহীনের মত মাটির দিকে তাকাইয়া থাকিল। ধরণী কেন বিদীর্ণ হয় না, ও তাহাতে প্রবেশ করে। এতখানি অপমান! সে তাহার এতখানি বয়সে অনেক অপমান সহ্য করিয়াছে, কত দুর্দশার দেখা পাইয়াছে; কিন্তু আজ এই ফাঁস তাহার অন্তঃকরণে যেমন ঢুকিয়া গিয়াছে, অন্য কোনও কথা তেমন ধারা প্রবেশ করে নাই। যতই মুষলধারে বৃষ্টি হউক, ঘরের ভিতরে মটকা-বাঁধা গুড়ের কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু যেই তাহা রোদে শুকাইবার জন্য বাহিরে খুলিয়া রাখা হইল, সেই সময়ে এক ছিটা জলও তাহার সর্বনাশ করিয়া দিবে। সিলিয়ার অন্তঃকরণের সমস্ত কোমলতা এই সময়টিতে হাঁ করিয়া বসিয়াছিল, আকাশ হইতে অমৃত বৃষ্টি হইবে বলিয়া। বৃষ্টি হইল অমৃতের বদলে বিষ, আর সিলিয়ার প্রতি রোমে তাহা ছুটিয়া চলিল। সাপের কামড়ের মত বিষের ঢেউ আসিল। ঘরে উপবাসী থাকিয়া শুইয়া থাকা এক কথা; কিন্তু পংক্তিভোজনে বসাইয়া পরে উঠাইয়া দেওয়া তো ডুবাইয়া মারারই মত। সিলিয়ার এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা অসহ্য মনে হইতেছিল, কেহ যেন তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। সে কিছু জিজ্ঞাসাই করিতে পারিল না। সোনার মনে কি আছে, সে শুধু আন্দাজ করিতেছিল। ঐ বাক্সে যে সাপ বন্ধ আছে তাহা কোন রকমে যেন বাহিরে না আসে, তাহার পূর্বেই সে এখান থেকে পলাইতে চায়। কি করিয়া পালাইবে, কিসের ছলে? উহার প্রাণ কেন বাহির হইয়া যায় না?

মথুরা ভাঁড়ারের চাবি উঠাইয়া লইয়াছিল, সিলিয়ার জলপানের জন্য

কিছু বাহির করিবে বলিয়া ; কর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিল। এদিকে সিল্লী শ্বাস জোরে জোরে ফেলিতেছিল, মাথার উপরে যেন কেহ তলোয়ার ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

সোনার দৃষ্টিতে সব চেয়ে বড় পাপ ছিল—কোনও পুরুষের পরস্ত্রীর দিকে, আর কোনও স্ত্রীর পরপুরুষের দিকে, তাকানো। এই অপরাধের কোনও ক্ষমা তাহার কাছে নাই। চুরি, হত্যা, জাল—কোনও অপরাধই এত ভীষণ নয়। হাসিঠাট্টা ও মন্দ মনে করে না, খোলাখুলিভাবে যদি হয়। লুকানো-ছাপানো হাসিঠাট্টা সে হেয় মনে করে। ছোটবেলা হইতেই সে অনেক প্রকারের কথা জানিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছে। যখন হরির হাট হইতে বাড়ি আসিতে দেরি হইয়া যাইত, আর ধনিয়া সন্ধান পাইত যে সে দুলারী সাহুয়াইনের দোকানে গিয়াছে, তা সে তামাক নিতেই যাক না কেন, তখন ধনিয়া কত দিন ধরিয়া হরির সঙ্গে কথাও বলিত না, ঘরের কোনও কাজও করিত না। একবার এমনই একটা কথা লইয়া সে বাপের বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল। এই মনোবৃত্তি সোনার মধ্যে আরও তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছিল। যত দিন তাহার বিবাহ হয় নাই তত দিন এ চিন্তা তত খানি প্রবল হয় নাই ; কিন্তু বিবাহ হইয়া যাওয়ার পর তাহার কাছে ইহা ব্রতের ভাব ধারণ করিল। ভ্রষ্ট স্ত্রী-পুরুষের গায়ের চামড়া ছাড়াইয়া লইলেও তাহার দয়া হয় না। তাহার দৃষ্টিতে দাম্পত্যের বাহিরে প্রেমের স্থান ছিল না। স্ত্রী-পুরুষের একের অন্যের প্রতি যে কর্তব্য তাহাকেই সে প্রেম মনে করিত। তাহাতে আবার সিল্লীর সঙ্গে তাহার ভগ্নীর সম্বন্ধ। সিল্লীকে সে ভালবাসিত, তাহাকে বিশ্বাস করিত। সেই সিল্লী আজ তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। মথুরা ও সিল্লীর মধ্যে অবশ্যই প্রথম হইতে সাঁট আছে। মথুরা নদীর ধারে কি ক্ষেতে তাহার সঙ্গে হয়তো দেখা করে, আর আজ এত রাত্রে নদী পার হইয়া সিল্লী ওর জন্য আসিয়াছে। সে যদি এ দুজনের কথা না শুনিত, তাহা হইলে সে ইহার কিছু জানিতেই পারিত না। মথুরা হয়তো মনে করিয়াছে, প্রেমমিলনের এই সব চেয়ে ভাল অবসর। ঘরে সব চুপচাপ। তাহার প্রাণ সব কিছু জানিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। সমস্ত রহস্য সে জানিয়া লইতে চাহিতেছিল, যাহাতে আত্মরক্ষার কোনও উপায় ভাবিয়া লইতে পারে। আর মথুরাই বা কেন এখানে দাঁড়াইয়া আছে? সে কি উহাকে কিছু বলিতেও দিবে না?

সোনা রাগ করিয়া কহিল—তুমি বাইরে যাচ্ছ না কেন, না, একে পাহারা দিতে থাকবে ?

মথুরা কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সিল্লী সব কিছু বলিয়া না ফেলে, ভয়ে তাহার প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছিল।

আর সিল্লীর প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছিল যে, এখন বুঝি ঐ ঝুলানো তলোয়ার তাহার মাথার উপর পড়িবে।

তখন সোনা খুব গম্ভীর স্বরে সিল্লীকে জিজ্ঞাসা করিল—দেখ সিল্লী, আমাকে সাফ সাফ বলে দাও, না হলে তোমার সামনে, এখানে, নিজের গলায় কাটারি বসাবো। তারপর তুমি আমার সতীন হয়ে রাজত্ব করো। দেখ, কাটারি ঐ সামনে পড়ে আছে। এক খাপে দুই তলোয়ার থাকতে পারে না।

সে লাফাইয়া সামনের আঙ্গিনা হইতে কাটারি উঠাইয়া লইল, তাহা হাতে লইয়া আবার বলিল—একথা মনে কোর না যে আমি শুধুই বাজে ভয় দেখাচ্ছি। রাগে আমি কি করে বসি, বলতে পারি না। সাফ সাফ বলে দে।

সিলিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এক একটা শব্দ তাহার মুখ হইতে বাহির হয়, মনে হয় যেন গ্রামোফোনের ভিতর হইতে আওয়াজ আসিতেছে। সে একটা কথাও লুকাইতে পারিল না। সোনার মুখের মধ্যে ভীষণ সঙ্কল্পের ভাব, যেন মাথায় খুন চাপিয়াছে।

সোনা তাহার প্রতি বর্শার মত তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চাহিয়া যেন কঠোর আঘাত করিতে করিতে বলিল—ঠিক ঠিক বলছ তো ?

বিলকুল ঠিক। নিজের ছেলের দিব্যি।

কিছু লুকাও নাই তো ?

যদি আমি একবিন্দুও লুকিয়ে থাকি তবে আমার চোখের মাথা খাই।

তুমি ঐ পাপিষ্ঠকে লাথি মারলে না কেন ? ওকে দাঁত দিয়ে কামড়ালে না কেন ? ওর রক্ত খেলে না কেন, চিৎকার করলে না কেন ?

সিল্লী ইহার কি জবাব দিবে ?

সোনা পাগলের মত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—কথা বলছিস না কেন ? কেন তুই ওর নাক তোর দাঁত দিয়ে কাটলি না ? দুহাতে ওর গলা টিপে ধরলি না কেন ? তাহলে আমি তোর পায়ের নীচে মাথা রাখতাম। এখন তো আমার চোখে তুমি একেবারে উচ্ছন্ন গেছ ;

যদি এই তোর মনে ছিল, তবে মাতাদীনের নামে কেন কলঙ্ক দিলি, কেন কারু সঙ্গে বাস করিস না, কেন নিজের ঘরে চলে যাস না? তাই তো তোর বাড়ির লোকেরা চাইছিল। তুই গোবর আর ঘাস নিয়ে বাজারে যেতিস, সেখান থেকে টাকা আনতিস; আর তোর বাপ বসে বসে ঐ টাকা থেকে তাড়ি খেত। তবে কেন ঐ বামুনকে অপমান করলি? কেন তার আবরু নষ্ট করলি? কেন সতী লক্ষ্মী সেজে বসে আছিস? একলা যখন থাকতে পারা যায় না, তখন কেন কারো সঙ্গে বিয়ে বসিস না? কেন নদী কি পুকুরে ডুবে মরিস না? অন্যের জীবনে কেন বিষ গুলে দিস? আজ আমি তোকে বলে দিচ্ছি যে, যদি এ রকমের কথা আর কখনও হয় আর আমি টের পাই, তাহলে আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনও বেঁচে থাকবে না। ব্যস, এখন মুখে চুন কালি মেখে চলে যা। আজ থেকে তোর আমার মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকল না।

সিল্লী ধীরে ধীরে উঠিল; নিজেকে সামলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, তাহার কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মুহূর্তের জন্য সাহস সঞ্চয় করিল। কিন্তু নিজের সাফাই কি বলিবে বুঝিতে পারিল না। চোখের সামনে অন্ধকার, মাথা ঘুরিতেছে, গলা শুকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত দেহ অবশ হইয়া গিয়াছে, যেন প্রতি রোমকূপ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। এক এক পা ফেলিতেছে, যেন সামনে গভীর খাদ; এই ভাবে বাহির হইয়া সে নদীর দিকে চলিল।

দরজায় মথুরা দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল—এ সময়ে কোথা যাও সিল্লী?

সিল্লী জবাব দিল না। মথুরাও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

সেই রূপালী চাঁদিনী এখনও বিছানো আছে। নদীর লহরী এখনও চাঁদের কিরণে স্নান করিতেছে। আর সিল্লী পাগলের মত স্বপ্নের ছায়ার মত নদীর মধ্যে চলিয়া যাইতেছে।

## ৩০

একটু একটু করিয়া সমস্ত মিলটি পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ কলটিকেই আবার দাঁড় করাইতে হইবে। মিস্টার খান্না আপ্রাণ চেষ্টায় ঐ কাজে লাগিয়াছেন। মজুরদের হরতাল বজায় আছে, কিন্তু তাহাতে মালিকদের

বিশেষ আসে যায় না। নূতন লোক কত কম টাকায় পাওয়া গিয়াছে, তাহারা প্রাণ দিয়া কাজও করিতেছে। কারণ তাহাদের মধ্যে বেশির ভাগ বেকারের দল, জীবিকার সংস্থানে বাধা জন্মায় এমন কাজ করার সাহস ইহাদের কোথায়। যতই কাজ চাপাও, যত কম ছুটি দাও, ইহাদের অভিযোগ নাই। মাথা নীচু করিয়া বলদের মত ইহারা কাজ করিয়া যায়। বকা ঝকা, গালাগালি, এমন কি লাঠির বাড়ি খাইলেও ইহাদের মনে গ্লানি জন্মে না। কাজেই আবার ফিরিয়া আসিয়া খান্নার খোসামোদি করা, আর আগের অপেক্ষাও কম মজুরিতে কাজ করা ভিন্ন পুরানো মজুরদের অন্য গতি রহিল না। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের উপর তো উহাদের আর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। নিরিবিলি পাইলে উহার বোধ হয় রক্ষা থাকিবে না। তা পণ্ডিতজী কিন্তু খুব সতর্ক হইয়া থাকে। সাঁঝ-বাতি জলিবার পর সে ঘরের বাহির হয় না, আর অফিসারদের না-হক খোসামোদ করে। মির্জা খুরশেদের অবস্থা যেমন তেমন, তবে মির্জা বেচারী মজুরদের কষ্ট দেখিয়া সত্যই চায় যে দলের সবাই ফের বাহাল হইয়া যায়; কিন্তু তখনই আবার নতুন মজুরদের দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া উপায় ভাবিয়া পায় না, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে বলে, তোমাদের যা ইচ্ছা কর।

মিঃ খান্না কিন্তু পুরানো লোকদের কাজে ফিরিয়া আসিতে উৎসুক দেখিয়া আরো বেশি কড়া হইয়া উঠিল; অবশ্য মনে মনে ও ভাবিতেছিল, একই বেতনে যদি পুরানো লোকে কাজ করে কত ভাল হইবে, নূতন লোকেরা সমুদয় শক্তি অর্পণ করিয়াও পুরানো লোকেদের সমান কাজ দিতে পারে না। পুরানো দলের অনেকেই ছোটবেলা হইতে এই মিলের কাজে হাত পাকাইয়াছে, আর নূতন দলের অধিকাংশই তো গ্রামের গরিব চাষী, যাদের খোলা মাঠে, ফাঁকা হাওয়ায়, পুরানো আমলের কাঠের হাতিয়ার দিয়া কাজ করার অভ্যাস। মিলের ভিতর উহাদের দম বন্ধ হইয়া আসে। মেশিনের চাকা জোরে ঘুরিতে দেখিলে উহারা ভয় পাইয়া যায়। শেষটায় পুরানো মজুরেরা যখন নিতান্ত কাহিল হইয়া পড়িল, তখন খান্না উহাদের আবার বাহাল করিতে রাজি হইল; কিন্তু নতুন দল আরো কমে কাজ করিতে রাজি। তখন ডিরেকটারদের কাছে প্রশ্ন করা হইল, কি করা যায়। অর্ধেকের মত হইল, বেতন কিছু কমাইয়া নতুন দলকেই রাখা হউক; আর অর্ধেকের মত হইল, পুরানো দলকেই আনা

হউক, তবে বর্তমান মজুরিতে—অবশ্য কিছু বেশি টাকা খরচ হইবে, তা কাজ অনেক ভাল পাওয়া যাইবে। খান্না মিলের প্রাণ, একরকম সর্বেসর্বা। ডিরেকটাররা ওর হাতের পুতুল। শেষ মীমাংসা উহারই হাতে, আর ও শুধু বন্ধুদের নয়, শত্রুরও পরামর্শ লইয়াছে। সর্বপ্রথম ও গোবিন্দীর পরামর্শ লইয়াছে। যেদিন হইতে মালতী সম্বন্ধে খান্নার আশা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর যখন হইতে গোবিন্দী জানিয়াছে যে, মেহতার মত পণ্ডিত, গুণবান লোক তাকে কত শ্রদ্ধা করে, তাহার কাছে কত আশা রাখে, সেদিন হইতে দম্পতীর মনে পূর্বেকার ভালবাসা আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। ঠিক ভালবাসা নয়; সাহচর্য বটে। উভয়ের মধ্যেকার দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হিংসা, অশান্তি দূর হইয়াছে।

মালতীর হাবভাবও সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। মেহতার জীবন এতকাল পর্যন্ত পড়া আর চিন্তায় কাটিয়াছে, সব কিছু পড়িয়া শুনিয়া, আত্মবাদ আর অনাত্মবাদ খুব ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া, উহার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি এই দুইয়ের মধ্যে আছে যে সেবামার্গ—তাহাকে কর্মমার্গও বলিতে পারা যায়—উহাই কেবল জীবনকে পবিত্র আর উন্নত করিতে পারে। সর্বজ্ঞ কোন ঈশ্বরে উহার বিশ্বাস নাই। ও যে নিজেকে নাস্তিক বলিয়া জাহির করে না, সে কেবল এ বিষয়ে উহার কোন স্থির মত নাই বলিয়াই। তবে উহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, জীবের জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, এ সকল ঐশ্বরিক বিধান নয়। উহার মতে; মানুষ অহঙ্কারবশে নিজেকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে যে সে বলে, তাহার সকল কাজের প্রেরণা ঈশ্বর হইতে আসে। যে অসংখ্য পঙ্গপাল সমুদ্রের সামনে পড়িলে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, তাহারাও নিশ্চয় ঈশ্বরকেই দায়ী করে। ঈশ্বরের বিধান যদি এতই অজ্ঞেয় যে মানুষের বোঝার অসাধ্য, তবে উহা মানিয়াই বা মানুষের এমন কি তৃপ্তি সম্ভব? ঈশ্বরকে কল্পনার ও একটা মাত্র অর্থ দেখিতে পায়, তাহা হইল মানবজীবনের একতা। একাত্মবাদ, সর্বাত্মবাদ বা অহিংসাতত্ত্বকে ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে না, দেখে ভৌতিক দৃষ্টি দিয়া। ইতিহাসে কোন কালে ইহাদের বিশেষ আধিপত্য না থাকিলেও মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশের ইতিহাসে ইহাদের স্থান অতি উচ্চে। মানবসমাজের ঐক্যে মেহতার দৃঢ় আস্থা; কিন্তু সেজন্য ঈশ্বরতত্ত্ব মানিবার প্রয়োজনকে সে স্বীকার করে না। প্রাণীমাত্রেরই এক আত্মায় অবস্থিতি;

মেহতার মানব-প্রেমের মূলে এমন কোনও বিশ্বাস নাই। দ্বৈত অদ্বৈতের ব্যবহারিক মূল্য ছাড়া অন্য কোন সার্থকতা তাহার চোখে নাই—আর তাহার মতে ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য শুধু মানুষকে মানুষ বলিয়া কাছে টানিয়া লওয়ার জন্য, ভেদবুদ্ধি দূর করিয়া ভ্রাতৃভাব বাড়াইবার জন্য। এই একতা, এই অভিন্নতা, মেহতার মনে এমনই দৃঢ় ভাবে বদ্ধমূল যে সেজন্য আধ্যাত্মিক ভিত্তি খাড়া করা তাহার মতে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। একবার এই জ্ঞান লাভ করিয়া আর কি সে শান্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে? নিজের স্বার্থের বাহিরে নিত্য নূতন কাজ বেশি বেশি করিয়া করা চাই। না করিলে চিত্তের শান্তি থাকে না। যশ, লাভ, বা কর্তব্যপালন এ সকল কথা তাহার মনেই আসে না। ইহাদের তুচ্ছতাই তাহাকে ইহাদের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। সেবাই এখন তাহার স্বার্থ। আর তাহার এই উদার সেবা অজ্ঞাতসারে মালতীর উপরও প্রভাব বিস্তার করিল। এ যাবৎ যত পুরুষ মালতীর সঙ্গে মিশিয়াছে, সকলে উহার বিলাস প্রবৃত্তিকেই উসকাইয়া তুলিয়াছে। উহার ত্যাগের প্রবৃত্তি তাই দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছিল, আজ মেহতার সংসর্গে আসিয়া সে প্রবৃত্তি যেন জাগিয়া উঠিল। সকল মননশীল জীবেই এ প্রবৃত্তি লুকানো থাকে, হঠাৎ প্রকাশের আলো পাইয়া চমক দিয়া ওঠে। মানুষ যখন ঐশ্বর্য আর নাম-যশের পিছনেই ঘুরিয়া মরে, তখন বুঝিতে হইবে, কোন বিশুদ্ধ আত্মার সঙ্গলাভ তাহার হয় নাই। মালতী আজকাল সর্বত্র বিনা ভিজিটে গরিবের ঘরে রোগী দেখিতে যায়। গরিব রোগীদের সঙ্গে উহার ব্যবহার আজকাল নরম হইয়া আসিয়াছে। অবশ্য এখনও সাজসজ্জায় উহার অরুচি জন্মে নাই, রং আর পাউডার মাখা ছাড়াকে ও এখনও কষ্টকর মনে করে।

আজকাল এক একদিন ওরা দুইজনে গ্রামের দিকে চলিয়া যায়, আর দুই চার ঘণ্টা চাষীদের সঙ্গে থাকে, কখনও বা তাহাদের কুটিরেই রাত কাটায়, তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মত খাওয়া দাওয়া করিয়া নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। একদিন উহারা সেমরীতে গিয়া উপস্থিত, আর এখানে ওখানে ঘুরিতে ঘুরিতে বেলা পড়িয়া আসিল। হরি দরজায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, এমন সময় মেহতা আর মালতী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মেহতা হরিকে দেখিয়াই চিনিল, বলিল, এই তোমার গাঁ? মনে আছে, সেবার আমরা রায়সাহেবের বাড়ি এসেছিলাম, আর ধনুর্যজ্ঞ পালায় তুমি মালী সেজেছিলে?

হরির সব কথা মনে পড়িল, চিনিতে পারিয়া চেয়ার আনিবার জন্য পটেশ্বরীর ঘরের দিকে ছুটিল।

মেহতা বলিল, চেয়ারে দরকার নেই, আমরা এই খাটিয়ার উপর বসছি। চেয়ারে বসতে আসি নি, তোমার কাছে কিছু শিখতে এসেছি।

দুইজনে খাটিয়ার উপর বসিল, দেখিয়া হরি তো হতবুদ্ধি। ইহাদের কি করিয়া খাতির করিবে? খাতির করার মত কিই বা আছে তাহার?

অবশেষে বলিল, জল আনি?

মেহতা বলিল, হাঁ, বেশ তেষ্টা পেয়েছে।

মিষ্টি কিছু আনি?

বেশ, তবে ঘরে যদি থাকে।

মিষ্টি আর জল আনিতে হরি ঘরে গেল। ততক্ষণে গাঁয়ের যত ছেলে সবাই আসিয়া জুটিল, ইহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল যেন চিড়িয়াখানার কোন নতুন জীব ইহারা।

সিলিয়া ছেলে কোলে একটা কি কাজে যাইতেছিল; ইহাদের দুইজনকে দেখিয়া কৌতূহলবশে থামিয়া দাঁড়াইল।

মালতী আসিয়া শিশুকে কোলে লইল, আর আদর করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, ক মাসের হয়েছে?

সিল্লী ঠিক জানে না। অপর একটি মেয়ে বলিল, বছর খানেকের হবে; না রে?

সিল্লী সায় দিল।

মালতী ঠাট্টা করিয়া বলিল, বেশ ছেলে, আমাকে দিয়ে দাও না?

গর্বে ফুলিয়া উঠিয়া সিলিয়া বলিল, আপনারই তো।

তবে আমি নিয়ে যাই?

বেশ তো, নিয়ে যান। আপনার কাছে থাকলে মানুষ হবে। গাঁয়ের আরও মেয়ে আসিয়া পড়িল আর মালতীকে হরির ঘরে নিয়া গেল। এখানে পুরুষদের মধ্যে উহারা মালতীর সঙ্গে আলাপ করিতে পারিতেছিল না। মালতী গিয়া দেখে, খাটিয়া বিছানা রহিয়াছে, তাহার উপর সতরঞ্চি পাতা, পটেশ্বরীর ঘর হইতে আনা হইয়াছে। মালতী বসিল, তারপর সন্তানপালন আর শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে আলাপ চলিল। মেয়েরা মন দিয়া শুনিতে লাগিল।

ধনিয়া বলিল, এখানে এত সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি করে হবে, এখানে আমাদের খাওয়ারই নেই ঠিক।

মালতী বুঝাইয়া বলিল, পরিষ্কার থাকতে খরচা কিছু নেই। কেবল একটু পরিশ্রম আর চোখ থাকা চাই, তা হলেই হয়।

দুলারী সাহুয়াইন বলিল, আচ্ছা, হুজুর, আপনি এত সব কথা কোত্থেকে জানলেন, আপনার তো এখনো বিয়েই হয় নি।

মালতী হাসিয়া বলিল, তুমি কি করে জানলে যে আমার বিয়ে হয় নি? মেয়েরা সকলে মুখ ঘুরাইয়া হাসিল। পুনিয়া বলিল, এ কি আর ঢাকা থাকে মেমসাহেব? মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

মালতী হাসিয়া বলিল, এজন্যেই তো বিয়ে করি নি। করলে তোমাদের সেবা কি করে কোরতাম?

সবাই সমস্বরে বলিল, ধন্য হুজুর, আপনি ধন্য।

সিলিয়া মালতীর পা টিপিয়া দিতে গেল, হুজুর কত দূর থেকে এসেছেন, নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

মালতী পা টানিয়া লইয়া বলিল, না, না, আমি মোটেই হাঁপিয়ে পড়ি নি, আমি তো মোটরে এসেছি। আমি চাই তোমরা ছেলেপুলেদের নিয়ে এস, আমি ওদের দেখে বলে দিই কি করে ওদের নীরোগ রাখতে পারবে, কি করে ওদের স্বাস্থ্য মজবুত হবে।

দেখিতে দেখিতে কুড়ি পঁচিশটি শিশু আসিয়া হাজির হইল। মালতী পরীক্ষা শুরু করিল। একটির চোখ উঠিয়াছে, তাহার চোখে ওষুধ দিল। বেশির ভাগ শিশু দুর্বল, তাহার কারণ মা বাপেরা ভাল খাইতে পায় না। মালতী শুনিয়া অবাক হইল যে খুব কম ঘরেই দুধ জোটে, ঘি তো লোকে সম্বৎসরে চোখেও দেখে না।

মালতী যেমন সব গাঁয়ে বলে তেমন এই গাঁয়েও খাদ্যের গুণ সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিল; উহার প্রাণ পুড়িতে লাগিল, কেন ইহারা ভাল খাইতে পাইবে না? উহার রাগ হইল গ্রামবৃদ্ধদের উপর। মরি-বাঁচি করিয়া খাটিয়া দিবে, অথচ যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা পেট ভরিয়া খাইতে পাইবে না, এই জন্যই কি ইহাদের জন্ম? যেখানে দুই চারিটি বলদের খোরাক জোটে, সেখানে দুইটা একটা গাভীর খোরাক মিলিবে না? কেন খাওয়াটা উহাদের কাছে আনন্দের ব্যাপার না

হইয়া শুধু প্রাণরক্ষার বস্তু হইল? কেন ইহারা সরকারকে বলে না যে, নামমাত্র সুদে টাকা দিয়া সুদখোর মহাজনদের হাত হইতে আমাদের বাঁচাও? মালতী তো যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে একই উত্তর শুনিয়াছে যে, ইহাদের উপার্জনের বেশির ভাগটাই চলিয়া যায় মহাজনের সুদ মিটাইতে। নিজেদের মধ্যে এত অমিল যে ভাইয়ে ভাইয়ে ক্বচিৎ একত্র থাকে। ইহাদের এই দুর্দশার মূলে আছে শুধু সংকীর্ণতা আর স্বার্থপরতা। মালতী এ সকল কথা মেয়েদের বুঝাইয়া বলিল। ইহাদের শ্রদ্ধা দেখিয়া মালতীর মনে সেবার প্রেরণা আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। মালতী বুঝিল, এই ত্যাগের জীবনের কাছে উহার বিলাস বিভবের জীবন নিতান্তই তুচ্ছ। আজ উহার জরিপাড় দেওয়া রেশমী শাড়ী, সুগন্ধিসেবিত শরীর, আর পাউডার মাখা মুখ উহাকে লজ্জা দিতে লাগিল। উহার হাতের এনামেল-করা সোনার ঘড়ি যেন অপলক নেত্রে উহাকে ভর্ৎসনা করিতেছে। জড়োয়া নেকলেস যেন আজ উহার গলায় বিঁধিতেছে। এই সব শ্রদ্ধায় ভরা, ত্যাগে মহান নারীহৃদয়ের তুলনায় নিজেকে ওর ছোট মনে হইতেছিল। ইহাদের অপেক্ষা ও অনেক বেশি জানে শোনে, কালের হাল-চাল অনেক বেশি বোঝে, কিন্তু যে অবস্থার মধ্যে ইহারা জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে, সে অবস্থার মধ্যে ও কি একটি দিনও থাকিতে পারিত? অহঙ্কারের নাম নাই, দিনভর কাজ করিতেছে, কত উপবাস যাইতেছে, কত দুঃখ পাইতে হয়, তবু প্রসন্ন মুখ। পরকে ইহারা এমনই আপন করিয়া লইয়াছে যে নিজেদের অস্তিত্ব বলিয়া কিছু রাখে নাই। ইহাদের জীবন নিজের ছেলেমেয়ে, স্বামী আর আত্মীয়পরিজনের জন্য। এই ভাবটি রক্ষা করিয়া, ইহারই ক্ষেত্র আরও বাড়াইয়া দিয়া, ভবিষ্যতে নারীত্বের আদর্শ প্রস্তুত হইবে। ইহার স্থলে আলোকপ্রাপ্ত মেয়েদের মধ্যে যে আত্ম-সুখের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে তাহারা সব কিছুই আপনার সুখের জন্য মনে করে, তাহা হইতে ইহাদের এই নিদ্রিত অবস্থাও ভাল। পুরুষ নির্দয়, তাহা স্বীকার, কিন্তু তাহারাও তো এই মায়েদের পুত্র? মায়েরা কেন এমন শিক্ষা দেয় না যে পুত্র মাকে, মাতৃজাতিকে পূজা করে? তাহার কারণ, মায়েরা এমন শিক্ষা দিতে পারে না, তাহার কারণ, মায়েরা এত নামিয়া গিয়াছে যে আজ তাহাদের ব্যক্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, তাহাদের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে।

না, তোমাদের অমন ভাবে আত্মলোপ করলে চলবে না। সমাজের কল্যাণের

জন্যে মেয়েদের আপন আপন অধিকার রক্ষা কোরতে হবে। যেমন কিষাণকেও তার নিজের রক্ষার জন্য কিছু কিছু দেবত্ব ছাড়তে হবে, তেমনি—তোমাদেরও নিজের অধিকার বজায় রাখবার জন্য চেষ্টা কোরতে হবে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা তখনও মালতীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাহার কথা শুনিয়া শুনিয়া যেন ইহাদের আশ মেটে না। কেহ কেহ তো উহাকে রাত্রিটা থাকিবার জন্য ধরিয়া বসিল। মালতীরও ইহাদের সরল স্নেহ এমন মধুর লাগিল যে, সে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইল। রাত্রিবেলা মেয়েরা উহাকে গান গাহিয়া শুনাইবে। প্রত্যেকের ঘরে গিয়া খোঁজখবর নিয়া মালতী সময়ের সদ্‌ব্যবহার করিল। উহার অকপট মঙ্গলকামনা আর সহানুভূতি এই গাঁয়ের মেয়েদের কাছে ভগবতীর বরদানের চেয়ে কম নয়।

এদিকে মেহতা সাহেব খাটিয়ার উপর আসর জমাইয়া বসিয়া কিষাণদের কুস্তি দেখিতেছে। আপশোষ হইতে লাগিল, মির্জাসাহেবকে কেন সঙ্গে আনিল না। আনিলে উহারা একজুটি হইত। উহার আশ্চর্য লাগিতেছিল, এই সব নিরীহ বালক আর অকালপ্রৌঢ় লোকগুলির সহিত শিক্ষিত নামধারী লোকেরা কেন নিষ্ঠুর আচরণ করে? অজ্ঞানের মত জ্ঞানীও সরল ও অকপট হয় আর সোনালী স্বপ্ন দেখিতে চায়। মানবতায় জ্ঞানী লোকের বিশ্বাস এমন দৃঢ়, এমন জীবন্ত যে, নিষ্ঠুর ব্যবহার তাহাদের অমানুষিক মনে হয়। তাহারা একথা ভুলিয়া যায় যে ভেড়ীরা ভেড়াদের নিরীহতার জবাব চিরদিনই পাঞ্জা আর দাঁত দিয়া দিয়াছে। জ্ঞানীরা নিজেদের মনগড়া এক আদর্শ সংসার সৃষ্টি করিয়া আদর্শ মানবতার আবাদ করিতেছে; তাহাতেই ডুবিয়া আছে। বাস্তব কি রকম অসম্ভব, কতদূর দুর্বোধ্য, কতটা অগম্য, তাহা উহারা ভাবে না। গ্রামের লোকদের মাঝে বসিয়া মেহতাজীর মনে এই প্রশ্নই তোলপাড় করিতে লাগিল, কেন আজ ইহাদের অবস্থা এমন করুণ হইল। চোখ মেলিয়া এই সত্যকে দেখিবার সাহস উহার নাই যে, ইহাদের ভালমানষিই ইহাদের দুর্দশার মূল। সম্ভবত, ইহারা যদি এত ভালমানুষ না হইত, তবে এমন হালও হইত না। দেশে কি হইতেছে, বিপ্লবও যদি আসিয়া যায়, তবু তাহার ইহারা কিছুরই খবর রাখে না। বলশালী রূপে যে কোন দল ইহাদের সামনে আসিবে, তাহার কাছেই ইহারা মাথা নোয়াইতে প্রস্তুত। ইহাদের নিরীহতা, জড়তার সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে; ইহাদের কর্মঠ করিবার জন্য চাই-কঠিন আঘাত।

আত্মা যেন চারি দিক হইতে নিরাশ হইয়া এখন নিজের মধ্যেই পা ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, জীবনের চেতনাই যেন ইহাদের লুপ্ত হইয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে ; যাহারা মাঠে কাজ করিতেছিল, তাহারাও তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতেছে। এমন সময় মেহেতা দেখিতে পাইল গাঁয়ের কয়েকটি লোকের সঙ্গে একটি শিশুকে কোলে করিয়া মালতী এমনভাবে চলিয়াছে যেন সেও ইহাদেরই একজন। মেহতার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। মালতী এক প্রকার নিজের ধরণে নিজেকে মেহতার কাছে সঁপিয়া দিয়াছে। এ বিষয়ে মেহতার আজ আর কোনও সন্দেহ ছিল না, তবু মালতীর জন্য উহার হৃদয়ে তেমন উৎকট আগ্রহ জাগ্রত হয় নাই যাহাতে বিবাহের প্রস্তাব করা চলে, আর তাহার অভাবে এমন প্রস্তাব করা মেহতার পক্ষে হাস্যজনক। মালতী যেন অনাহূত অতিথির মত উহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর মেহতা তাহাকে স্বাগত জানাইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রেম নাই, আছে শুধু পৌরুষ। মালতী যদি উহাকে এমন যোগ্য পাত্র মনে করিয়া থাকে যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করা চলে, তো মেহতার উহার কৃপাকে অস্বীকার করার সাধ্য নাই। তবে সঙ্গে সঙ্গে মেহতা চাহিয়াছে যে, গোবিন্দীর পথ হইতে মালতীকে সরাইয়া আনিতে হইবে। ও জানিত, মালতী এক পা শক্ত করিয়া না ফেলিয়া আর এক পা উঁচু করিবে না। ও আরও বুঝিয়াছিল যে, মালতীর সঙ্গে এই ছলনা করিয়া ও নীচতার পরিচয় দিতেছে। ইহার জন্য নিজের প্রতি উহার ধিক্কারের সীমা ছিল না। কিন্তু যতই ও মালতীকে কাছাকাছি দেখিতেছে, ততই তাহার প্রতি আকর্ষণ বাড়িতেছে। রূপের আকর্ষণ তো ওর মনে দাগ কাটিতে পারে নাই, ইহা হইল গুণের আকর্ষণ। ও জানিত, যাহাকে প্রকৃত প্রেম বলে, তাহা তো সম্ভব কেবল কোন বাঁধনে বাঁধা পড়িলে। তাহার আগে যে প্রেম সে কেবল রূপের মোহ, যাহা টেঁকে না ; তবে আগে জানিয়া লওয়া দরকার, সাহচর্যের ফলে যে পাথর উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, উজ্জ্বলতার সম্ভাবনা তাহার আছে কি না। সব পাথরই তো বাটালিতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে না, সব পাথরে তো সুন্দর মূর্তি গড়িয়া ওঠে না। এই কয় দিনে মালতী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উহার হৃদয়ে কিরণ ঢালিয়াছে ; কিন্তু এখনও সেই মৃদু কিরণ-মালা কেন্দ্রিত হইয়া তেমন উজ্জ্বল রূপ পরিগ্রহ করে নাই যাহাতে সারা অন্তর জ্বলিয়া ওঠে। আজ মালতী গ্রাম্য মেয়েদের সঙ্গে মিলিয়া ও সকল ভেদবুদ্ধি

ঘুচাইয়া দিয়া অন্তরের দীপটি পূর্ণদীপ্তিতে জ্বালিয়া ধরিয়াছে। আর আজই প্রথম মেহতা মালতীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করিল। গাঁয়ের চারিদিক ঘোরা শেষ করিয়া মালতী যেই ফিরিল, মেহতা অমনই উহাকে সঙ্গে নিয়া নদীর পারে চলিল। ঠিক হইয়াছে, রাত্রিটা এখানেই কাটাইবে। কেন জানি না, মালতীর বুক আজ ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। সে দেখিল, মেহতার মুখে আজ এক বিচিত্র জ্যোতি আর কামনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নদীর ধারে কে যেন রূপার চাদর বিছাইয়া রাখিয়াছে, আর নদী রত্নখচিত অলঙ্কারে সাজিয়া মধুর স্বরে গাহিয়া চলিয়াছে; তারাকে, ঘুমে ঢলিয়া পড়া গাছগুলিকে, চন্দ্র আপনার নৃত্য দেখাইতেছে। প্রকৃতির এই মোহন শোভার মধ্যে মেহতা যেন পাগল হইয়া গেল। শৈশবকাল, শৈশবের খেলাধূলা, সব যেন আবার ফিরিয়া আসিল। বালুর উপর বার কয়েক লাফালাফি করিয়া এক দৌড়ে নদীর মধ্যে নামিয়া সে হাঁটু জলে গিয়া দাঁড়াইল।

মালতী বলিল, জলের মধ্যে দাঁড়িও না, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

জল ছিটাইতে ছিটাইতে মেহতা বলিল, আমার তো ইচ্ছা হোচ্ছে, সাঁতার দিয়ে নদীর ওপারে চলে যাই।

না, না, জল থেকে উঠে এস, আমি যেতে দেব না।

তুমি আমার সঙ্গে যাবে না? সেই সোনার দেশে—যেখানে স্বপ্নের রাজ্য?

আমি যে সাঁতার জানি না।

আচ্ছা এসো, একটা নৌকো বানাব, তাতে বসে চলে যাবে।

মেহতা জল হইতে উঠিয়া আসিল। আশে পাশে অনেক দূর পর্যন্ত ঝাউবন। মেহতা পকেট থেকে ছুরি বাহির করিয়া মেলা ডাল কাটিয়া জড়ো করিল। নদীর পাড়ে খড়ের গাদা পড়িয়া ছিল, তাহার উপর চড়িয়া খড়ের একটা আঁটি কাটিয়া আনিল। তারপর ওখানেই বালির বিছানায় বসিয়া খড় পাকাইয়া দড়ি বাঁধিয়া ফেলিল। এমন খুসি, মনে হইবে স্বর্গারোহণের জন্য তৈয়ার হইতেছে। কত বার আঙ্গুল কাটিয়া রক্ত বাহির হইল, মালতী রাগ করিয়া গাঁয়ে ফিরিবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিল, কিন্তু মেহতার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ঠিক বালকের মত উল্লাস, সেই রকমই আনাড়িপনা, আর ঠিক সেই রকমই হঠকারিতা। উহার দর্শন বিজ্ঞান সব কিছু এই উল্লাসের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

দড়ি তৈয়ারি হইয়াছে। ঝাউয়ের বড় একটা তক্তাও প্রস্তুত হইল। কাঠের দুই মাথায় দড়ি দিয়া সে ঝাউয়ের ডালগুলি বাঁধিল। ফাঁকে ফাঁকে পাতা ভরিয়া দিল যেন জল না ওঠে। ব্যস্, নৌকা প্রস্তুত। রাত্রি আরো স্বপ্নময় হইয়াছে।

জলে নৌকা ভাসাইয়া মালতীর হাত ধরিয়া মেহতা বলিল, এসো, বসো।

শঙ্কিত মালতী বলিল, দুজনের ভার সইবে তো?

দার্শনিকের হাসি হাসিয়া মেহতা বলিল, যে নৌকায় বসে আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করি, তা কি এর চেয়ে বেশি মজবুত, মালতী? কিসের ভয়?

ভয় আবার কি, তুমি সঙ্গে থাকতে?

ঠিক বলছো?

এতদিন পর্যন্ত কারু সাহায্য না নিয়ে একলা আমি কত বাধা বিঘ্ন পার হয়েছি, আজ তো তোমার সঙ্গে রয়েছি।

দুইজনে ঐ ঝাউয়ের তক্তার উপর বসিল, আর মেহতা ঝাউয়েরই একটা ডাল দিয়া ঐ নৌকা বাহিতে আরম্ভ করিল। তক্তা ডগমগ করিয়া জলের মধ্যে ভাসিয়া চলিল।

এই ভয়ের সময় একটু অন্যমনস্ক হইবার জন্য মালতী জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুমি তো চিরকাল শহরে কাটালে, গ্রামের জীবন তোমার অভ্যাস হোল কবে? আমি তো কিছুতে পারতাম না এমন তক্তা বানাতে।

অনুরক্ত নয়নে উহার দিকে চাহিয়া মেহতা বলিল, এটা বোধ হয় আমার পূর্বজন্মের সংস্কার। প্রকৃতির স্পর্শে আমি যেন নতুন জীবন পাই। শিরায় শিরায় আমার আনন্দ উছলে ওঠে। প্রত্যেকটি পশু, প্রত্যেকটি পাখী, আমায় যেন আনন্দের ভোজে নেমন্তন্ন করে, যেন কতদিনের ভুলে যাওয়া সুখের কথা আমার মনে পড়ে যায়। আর কোথাও আমি অমন আনন্দ পাই না—না গানের প্রাণকাঁদানো সুরে, না দর্শনের বড় বড় কথায়। প্রকৃতি যেন আমার সব চাইতে আপনার। পাখীরা নিজের নিজের কোটরে গিয়ে যেমন আনন্দ পায়, প্রকৃতির মাঝে এলে আমার যেন ঠিক তেমনই আনন্দ হয়।

ডগমগ করিয়া, কখনও সোজা, কখনও বাঁকা, কখনও বা ঘুরপাক খাইতে খাইতে তক্তা ভাসিয়া চলিল।

সহসা মালতী করুণ কণ্ঠে বলিল, আচ্ছা আমি যদি তোমার জীবনে কোনদিন না আসতাম!

উহার হাতখানা নিজের হাতে নিয়া মেহতা বলিল, নিশ্চয় আসতে। কতবার আসছ, আবার এক ঝলক সৌরভের মত, কল্পনার ছায়ার মত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছ। তোমাকে বাহুপাশে বাঁধবার জন্যে আমি ছুটে চলেছি, কিন্তু হাত খোলা পেয়ে তুমি বারবার পালিয়ে যাচ্ছ।

উন্মাদের মত মালতী বলিল, কিন্তু তুমি কি ভেবেছ, তুমি কি বুঝতে চেয়েছ, কেন এমন হয়?

হাঁ মালতী, অনেক ভেবেছি, বারবার ভেবেছি।

তা কি মনে হোল?

কি জান, আমার মনে হয়, আমি যে ভিত্তির উপর আমার জীবনের গৃহ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি সে ভিত্তি চঞ্চল, স্থির নয়। সে গৃহ মস্ত একটা প্রাসাদ নয়, ছোট্ট একটা কুটির। কিন্তু তারো জন্যে তো চাই একটা স্থির আধার!

হাত ছাড়াইয়া নিয়া অভিমানভরে মালতী কহিল, এ তোমার বৃথা আক্ষেপ। তুমি বরাবর আমাকে পরীক্ষকের চোখে দেখেছ, কখনো প্রেমের চোখে দেখ নি। তুমি কি জান না মেয়েরা পরীক্ষা চায় না, মেয়েরা চায় প্রেম? পরীক্ষা গুণকে দোষ করে তোলে, সুন্দরকে বানায় অসুন্দর, আর প্রেম দোষকে করে তোলে গুণ, অসুন্দরকে সুন্দর। আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, তাই ভাবতেই পারি না তোমার মধ্যে খারাপ কিছু থাকতে পারে। কিন্তু তুমি আমায় শুধু পরীক্ষা করেছ, তাই আমাকে অস্থির, চঞ্চল, আরও কত কি ভেবে, কেবল আমার কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছ। না, না, আজ আমায় বলতে দাও, কেন আমি এমন অস্থির, চঞ্চল; আমি চঞ্চল, কারণ আমি এমন ভালবাসা পেলাম না যা আমাকে স্থির অচঞ্চল কোরে দিতে পারে। আমি যেমন করে তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছি, তুমিও যদি তেমন ভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারতে, তবে দেখতে আজ আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ থাকতো না।

মালতীর এই অভিমানে আনন্দ উপভোগ করিয়া মেহতা বলিল, তুমি কোন দিন আমায় পরীক্ষা কর নি? ঠিক বলছো?

কখনও না।

তা হলে তোমার ভুল হয়েছে।

তা হোক, সেজন্যে আমার দুঃখ নেই।

না মালতী, ভাবুকতার কথা নয়। ভালোবাসবার আগে আমরা সবাই যাচাই করে নিই, আর তুমিও নিশ্চয় করেছ, হয়তো অজ্ঞতসারে। আমি আজ তোমাকে স্পষ্ট বলে রাখি, আমি তোমায় গোড়ায় আর পাঁচ জন মেয়ের মতোই দেখেছি, নিতান্ত হালকা ভাবে, যেমন সবাইকে দেখি। আর আমার বিশ্বাস, তুমিও তখন আমাকে সখের খেলনার মতই মনে কোরতে।

মালতী বলিয়া উঠিল, ভুল, একদম ভুল। আমি কখনও তোমাকে ও ভাবে দেখি নি। আমি প্রথম দিন থেকেই তোমাকে দেবতা মনে করে নিজের হৃদয়······

বাধা দিয়া মেহতা বলিল, আবার সেই ভাবুকতা। এ সব গুরুতর বিষয়ে ভাবুকতা ভালো নয়। তবে তুমি যদি গোড়ায়ই আমাকে এতটা দয়া করে থাক, তবে তারও কারণ বোধ হয়, আত্মগোপন করতে তোমার চেয়ে আমি বেশি ওস্তাদ। আমি যত দিন থেকে মেয়েদের সঙ্গে মিশছি, দেখছি ওরা প্রেম, ভালবাসা, এ সব নিয়ে খুব মাথা ঘামায়। আগে স্বয়ম্বর সভায় পুরুষকে পরীক্ষা দিতে হোত। সেই মনোভাব এখনো বজায় আছে, হতে পারে তার চেহারাটা একটু বদলে গেছে। আমি প্রথম দিন থেকে বরাবর চেষ্টা করেছি তুমি আমার আসল রূপটাই যেন দেখতে পাও, আর আমিও যেন তোমার আত্মার সন্ধান পেয়ে যাই। আর আজ বলি মালতী, তোমার হৃদয়ের গভীরে যখনই নামতে পেরেছি, তখনই আমার রত্নলাভ হয়েছে। মজা লুটতে এসেছিলাম, হয়ে গেলাম উপাসক। আমার ভেতর তুমি কি দেখেছ তা অবশ্য আমি জানি না।

এতক্ষণে উহারা নদীর ওপারে আসিয়া পড়িল। নামিয়া গিয়া দুইজনে চরের উপরকার বালির বিছানায় বসিয়া পড়িল, আর ঐ কথারই খেই ধরিয়া মেহতা বলিল, আজ ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করবো বলে তোমায় এখানে নিয়ে এলাম মালতী।

মালতী কম্পিত স্বরে বলিল, এখনও কি সেকথা তোমার জানতে বাকি আছে?

হাঁ, তার কারণ, আজ আমি তোমাকে আমার সেই রূপটাই দেখাব, যা তুমি দেখ নি, আর যা আমিও লুকিয়ে রেখেছি। আচ্ছা ধর, আজ তোমায়

বিয়ে করে কাল যদি আমি তোমার কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করি, তবে তুমি আমায় কি শাস্তি দেবে ?

কেন এ কথা বলছো ?

আমার কাছে এটা খুবই বড় কথা।

আমি তো তার সম্ভাবনাই দেখছি না।

সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়। বড় বড় মহাত্মারও মুহূর্তে পতন হতে পারে।

আমি তবে তার কারণটা খুঁজে বার করবো, আর তাকে সরিয়ে দেবো।

ধর, তাতেও আমার অভ্যেস গেল না।

তবে জানি না, তখন কি কোরবো। হয়তো বিষ খেয়ে পড়ে থাকবো।

কিন্তু তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমার উত্তর হবে অন্য রকম।

মালতী ভয়ে ভয়ে বলিল—তা বল, শুনি।

দৃঢ় ভাবে মেহতা বলিল, আমি কিন্তু আগে তোমায় মেরে ফেলবো, তার পর নিজে মরবো।

মালতী জোরে হাসিয়া উঠিল। উহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। সেই কাঁপুনি লুকাইবার জন্যই উহার হাসি। মেহতা বলিল, তুমি হাসছ যে ?

আমার মনে হয় না তুমি এমন হিংসাবাদী।

না মালতী, এ বিষয়ে আমি আস্ত পশু, আর তাতে লজ্জা পাবারও কিছু দেখি না। আধ্যাত্মিক প্রেম বা ত্যাগময়, নিঃস্বার্থ প্রেম, যাতে পুরুষ নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কেবল প্রেমিকার জন্যে বেঁচে থাকে, তার সুখেই নিজের সুখ মনে করে, প্রেমিকার পায়ে আত্ম সমর্পণ করে দেয়, তা আমার মতে নিরর্থক শব্দ মাত্র। বইয়ে অমন প্রেমের কথা আমি ঢের পড়েছি, যেখানে প্রেমে পড়ে পুরুষ তার প্রেমিকার নতুন প্রণয়ীর জন্য প্রাণ দিচ্ছে ; আমার মতে মনের সে ভাব শ্রদ্ধা হতে পারে, সেবা হতে পারে, তাকে প্রেম বলা চলে না। প্রেম শান্ত গাভী নয়, রাগী, খুনে, রক্তপিয়াসী বাঘ, যা নিজের শিকারের ওপর আর কারু দৃষ্টি সইতে পারে না, কাউকে সেদিকে দেখতে পর্যন্ত দেয় না।

মালতী উহার চোখে চোখ রাখিয়া বলিল, প্রেম যদি খুনে বাঘ হয় তবে আমি তার কাছ থেকে দূরে দূরেই থাকবো। আমি তো ওকে গাভীই ভেবেছিলাম। আমার মতে প্রেম সন্দেহের ওপরে। প্রেম দেহের টান নয়, আত্মার। সেখানে সন্দেহের বিন্দুমাত্র স্থান নেই, আর হিংসা তো সন্দেহেরই পরিণাম।

প্রেমে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, প্রেমের মন্দিরে যাচাই করতে না এসে যদি তুমি উপাসক হয়ে আস তবেই বর পাবে।

মালতী উঠিয়া দাঁড়াইল, আর জোরে জোরে নদীর দিকে চলিতে লাগিল, যেন তার হারানো পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। এমন আনন্দ সে জীবনে পায় নাই। একলার স্বাধীন জীবনে সে নিজের মধ্যে এমন দুর্বলতা অনুভব করিত যাহাতে সর্বদা অস্থিরভাবে সে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; তাহার মন একটা আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিত, যাহার উপর নির্ভর করা চলে, যাহার উপর ভর দিয়া সংসারের সম্মুখীন হওয়া যায়। নিজের মধ্যে সেই শক্তি মালতী খুঁজিয়া পাইত না, বুদ্ধি আর চরিত্রবল দেখিলে সেই দিকে লালায়িত হইত। যে পাত্রে রাখা যায় জলের মত মালতী সেই পাত্রের রূপ ধারণ করিত, তাহার নিজস্ব রূপ কিছু ছিল না।

তাহার মনের ভাব যেন পরীক্ষার্থীর মত। পাঠ্য বইয়ের উপর ছাত্রদের আকর্ষণ জন্মায়, তবে পুস্তকের সেই অংশেই তাহাদের মন বেশি পড়িয়া থাকে যেগুলি পরীক্ষায় আসা সম্ভব। তাহাদের প্রধান লক্ষ্য পরীক্ষায় পাশ করা। জ্ঞানার্জন পরের কথা। যদি জানিত পরীক্ষক খুব সদয়, চোখ বুজিয়া ছাত্র পাশ করায়, তবে বোধ হয় পরীক্ষার্থী চোখ তুলিয়া বইয়ের দিকে একবার চাহিয়াও দেখিত না। মালতী যাহা কিছু করিত, সবই মেহতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। মেহতার প্রেম আর বিশ্বাসের পাত্র হইয়া মেহতার হৃদয়রাজ্যের রানী হইবে, ইহাই ছিল মালতীর সাধনা। পরীক্ষার্থীর মত মালতীও যোগ্যতার প্রমাণ দিতে ব্যস্ত, যোগ্যতা অর্জন হইলে পরীক্ষক নিজেই সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে, এতটা ধৈর্য তাহার ছিল না।

আজ কিন্তু মেহতা ঘা দিয়া উহার আত্মশক্তিকে জাগাইয়া দিয়াছে। প্রথম দেখার দিনটি হইতেই উহার মন মেহতার দিকে ঝুঁকিয়াছিল। ও দেখিয়াছে, উহার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে মেহতা সব চেয়ে যোগ্য; তাহার নির্মল জীবন, প্রখর বুদ্ধি, স্থির বিচারের ক্ষমতা, এ সবই ছিল মালতীর আকর্ষণ। ধন ঐশ্বর্য তো উহার কাছে খেলনার মত, ছেলেরা যাহা লইয়া খেলে আর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলে। যদিও কুৎসিৎ জিনিসে উহার ঘৃণা, তবু রূপেরও তেমন আকর্ষণ নাই। মেহতার বুদ্ধি আর তেজস্বিতা উহার উপর এমন ছাপ ফেলিয়াছে যে আজকাল ও উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে নিজেকে সংস্কার করার কাজে। উহার যে প্রেরণায়

দরকার ছিল তাহা মিলিয়াছে, আর অজ্ঞাতসারে তাহাকে উহাকে চালাইয়া লইতেছে। যে নূতন আদর্শের সন্ধান সে পাইয়াছে তাহাতে পৌঁছিবার জন্য চলিয়াছে তাহার সাধনা। সফলতা আসে, আর সে মনে ভাবে, কবে এমন দিন আসিবে যেদিন মেহতার সঙ্গে একাত্ম হইয়া যাইবে! উহার সাধনায় নিষ্ঠা আরও বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু আজ যখন আশার দ্বার পর্যন্ত আনিয়া মেহতা উহার সামনে প্রেমের এমন আদর্শ তুলিয়া ধরিল যে প্রেমে সমর্পণ নাই, যে প্রেম আদর্শের স্বর্গ হইতে লোককে মাটির জগতে টানিয়া নামায়, যেখানে হিংসা দ্বেষ আর সন্দেহের রাজত্ব, তখন ও এমন ধাক্কা খাইল, গুরুকে নীচ কাজ করিতে দেখিলে শিষ্য বুঝি তেমনই আঘাত পায়। মালতী আজ দেখিল প্রখর বুদ্ধির বশে মেহতা প্রেমকে পশুত্বের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, প্রেমের পবিত্র স্বর্গীয় ভাবের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতেছে।

দেখিয়া তাহার মন দমিয়া গেল, সে যেন বসিয়া পড়িল।

মেহতা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, মালতী, এসো, আর একটু বসি।

সে বলিল, না, এবার ফিরতে হবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

## ৩১

রায়সাহেবের গ্রহ সুপ্রসন্ন ছিল। তাঁহার তিনটি কাজই সুসম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার বিবাহ খুব ধূমধামেই সম্পন্ন হইয়াছে, মোকদ্দমায় জিতিয়াছেন আর নির্বাচনে শুধু সফলই হন নাই, হোম মেম্বার হইয়াছেন। চারিদিক হইতে প্রশংসা আর অভিনন্দন আসিতেছে। এই মোকদ্দমায় জিতিয়া রায়সাহেবের স্থান হইয়াছে তালুকদারের পহেলা শ্রেণীতে। সম্মান আগেও কিছু কম ছিল না, এখন তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়, গভীর ও মজবুত হইল। খবরের কাগজে প্রতিদিন তাঁহার ছবি আর কাহিনী বাহির হইতে লাগিল। ধারের মাত্রা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে, তবু রায়সাহেবের তাহাতে পরোয়া নাই। এই নতুন পাওয়া মৌজার একটা টুকরা বেচিলেই তো ঋণমুক্ত হইতে পারেন। সুখের মাত্রা কল্পনারও সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। এতদিন তো কেবল লখনৌয়ে তাঁহার বাড়ি

ছিল, এখন শিমলা, মুসুরী, নৈনিতাল তিন জায়গায় বাড়ি তৈয়ার করা দরকার হইয়া পড়িল। ঐ সব জায়গায় গিয়া হোটেলে বা অন্য রাজরাজড়ার বাড়িতে ওঠা এখন আর শোভা পায় না। সূর্যপ্রতাপ সিংহের এ সব জায়গায় বাড়ি আছে, সুতরাং রায়সাহেবের না থাকা বড়ই লজ্জার কথা। আর যোগাযোগও এমন হইল যে, বাড়ি তৈয়ারি করার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইল না, খুব সস্তায়, তৈরি বাড়ি পাওয়া গেল। প্রত্যেক বাড়ির জন্য মালী, চৌকিদার, গোমস্তা, খানসামা ইত্যাদি বাহাল করা হইল। আর সব চেয়ে বড় সৌভাগ্যের কথা, মহামান্য সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে রায়সাহেব রাজা উপাধি পাইয়া গেলেন। এত দিনে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইল। সেদিন খুব ধূমধাম হইল, আর এমন ভোজ দেওয়া হইল যে আগেকার সব রেকর্ড ভাঙ্গিয়া গেল। হিজ একসেলেনসি যেদিন সনদ উপহার দিলেন, রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার সর্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল। এই তো জীবন! এই না সেদিন বিদ্রোহীদের পাল্লায় পড়িয়া তাঁহাকে ব্যর্থতার বদনামের ভাগী হইতে হইয়াছিল, জেল খাটিতে হইয়াছিল, আর অফিসারদের চোখে তিনি কতই না ছোট হইয়া গিয়াছিলেন! আর আজ সেই ডি. এস. পি. তাঁহার কাছে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া আছে, যে না কি এক দিন তাঁহার হাতে হাতকড়া পরাইয়া দিয়াছিল।

কিন্তু তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় জয় তো হইল সেদিন, যেদিন চিরশত্রু, পরাজিত সূর্যপ্রতাপ সিংহ তাঁহার বড় ছেলের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। মোকদ্দমা জিতিয়া, এমন কি মিনিস্টার হইয়াও বুঝি এত আনন্দ হয় নাই। ঐ সব ব্যাপারই তো কল্পনায় ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারটা ছিল কেবল আশাতীত নয়, কল্পনারও অতীত। সেই সূর্যপ্রতাপ সিংহ, যে না কি মাস কয়েক আগেও তাঁহাকে কুকুরের অধম মনে করিয়াছে, আজ কি না সে মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব করে! কি অসম্ভব কথা! রুদ্রপাল এম. এ. পড়ে, নির্ভীক, আদর্শবাদী, নিজের উপর ভরসা রাখে, যথেষ্ট অভিমানী, সুরসিক আর অলসপ্রকৃতির ছেলে। পিতার এই ধন আর মানের লিপ্সা তাহার বড়ই খারাপ লাগে।

রায়সাহেব তখন নৈনিতালে। প্রস্তাব শুনিয়া গর্বে ফুলিয়া উঠিলেন; বিবাহের ব্যাপারে ছেলের উপর জোর খাটাইতে ইচ্ছা নাই, তবু বিশ্বাস আছে বাপ যাহা ঠিক করিবে রুদ্রপাল তাহাতে আপত্তি করিবে না। আর রাজা সূর্য-

প্রতাপসিংহের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া এমনই সৌভাগ্যের কথা যে, রুদ্রপালের অমত হইতে পারে এ কথা তাঁহার মাথায়ই আসিল না। পত্রপাঠ রাজাসাহেবকে কথা দিয়া দিলেন আর রুদ্রপালকে ফোন করিলেন।

রুদ্রপাল জবাব দিল, আমার মত নাই।

রায়সাহেব জীবনে কখনও এমন নিরাশ হন নাই, আর এত রাগও তাঁহার আর কখনও হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, কি জন্য?

সময়ে জানতে পারবেন।

আমি এখুনি জানতে চাই।

আমি বলতে চাই না।

তোমাকে আমার হুকুম মানতে হবে।

আমার মন যাতে সায় দেয় না, এমন জিনিসে আমি আপনার হুকুম মানতে পারি না।

রায়সাহেব খুব নরম স্বরে বুঝাইয়া বলিলেন, আদর্শবাদের জন্যে তুমি নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে বসেছ। এ সম্বন্ধটা হোলে সমাজে তোমার স্থান কত উঁচু হবে, ভেবে দেখেছ? মনে রেখো, এটা ঈশ্বরের বিধান। ঐ বংশের কোন গরিব মেয়ে আনতে পেলেও আমি ভাগ্য মনে কোরতাম, আর এ তো আমাদের সমাজের মাথা রাজা সূর্যপ্রতাপের মেয়ে। আমি প্রতিদিন মেয়েটিকে দেখছি, তুমিও দেখে থাকবে। রূপগুণ, স্বভাবচরিত্র, সব দিক থেকে এমন মেয়ে হয় না। আমি আর কত দিন? তোমার সামনে সমস্ত জীবন পড়ে আছে। আমি তোমাকে জোর করতে চাই না। তুমি তো জান, বিয়ের ব্যাপারে আমার মতামত কি রকম উদার! কিন্তু তোমায় ভুল করতে দেখলে ভুল দেখিয়ে দেওয়াও তো আমার ধর্ম।

ইহার উত্তরে রুদ্রপাল বলিল, এ বিষয়ে আমার মত অনেক আগেই ঠিক করা আছে, এখন আর তা বদলান চলে না।

ছেলের বোকামি দেখিয়া রায়সাহেবের রাগ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন, মনে হোচ্ছে, তোমার মাথা ঘুরে গেছে। এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। দেরি করো না। আমি কিন্তু রাজাসাহেবকে কথা দিয়ে ফেলেছি।

রুদ্রপাল উত্তর করিল, দুঃখের বিষয় আমার এখন যাবার সময় নাই।

পরের দিন রায়সাহেব নিজেই চলিয়া আসিলেন। দুই জনেই নিজের নিজের

অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এক দিকে প্রাপ্তবয়স্কের পরিপক্ক বুদ্ধি, আপোষ করিতে ব্যগ্র—অপর দিকে কাঁচা আদর্শবাদ, জেদী, উদ্ধত এবং নির্মম।

রায়সাহেব একেবারে সরাসরি মর্মে ঘা দিলেন—আমি জানতে চাই, কে সে মেয়ে।

অচল দৃঢ়তার সঙ্গে রুদ্রপাল বলিল—আপনি যদি শুনবেনই, তো শুনুন। মালতী দেবীর বোন সরোজ।

রায়সাহেব যেন আঘাত পাইয়া পড়িয়া গেলেন, বলিলেন—ঐ মেয়ে!

আপনি তো সরোজকে দেখে থাকবেন?

খুব দেখেছি। তুমি রাজকুমারীকে দেখ নি নাকি?

আজ্ঞে, তা খুব দেখেছি।

তবু······

আমার কাছে রূপের কোন দাম নাই।

তোমার আক্কেল দেখে আমার দুঃখ হোচ্ছে। মালতীকে তো জান, ও কি রকম মেয়ে! ওর বোন কি অন্য রকম হবে?

রুদ্রপাল ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, আমি এ বিষয় নিয়ে আর কিছু বলতে চাই না, তবে বিয়ে যদি করি, সরোজকেই কোরবো।

আমি বেঁচে থাকতে নয়।

তা, আপনার অবর্তমানে হবে।

খুব ভাল সংকল্প তোমার!

বলিতে বলিতে রায়সাহেবের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। যেন সমস্ত জীবন আজ শূন্য হইয়া গেল। মন্ত্রিত্ব, জমিদারি, রাজা উপাধি, সব যেন বাসি ফুলের মত নীরস, নিরানন্দ হইয়া পড়িল। জীবনের সকল সাধনা ব্যর্থ হইল! স্ত্রী যখন মারা যান, তাঁহার বয়স ছত্রিশের বেশি ছিল না। ইচ্ছা করিলেই তিনি আবার বিবাহ করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে পারিতেন। কত জনে পীড়াপীড়িও করিয়াছিল, কিন্তু এই ছেলেমেয়ের মুখ চাহিয়াই না একক জীবন বরণ করিয়া লইয়াছিলেন! ইহাদের মুখ চাহিয়াই না ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া চলিয়াছেন! আজ পর্যন্ত তো হৃদয়ের সমগ্র স্নেহ ইহাদের উপরই পড়িয়া আছে। আর এই ছেলে কি না আজ এমন নিষ্ঠুর ভাবে কথা বলিতেছে, যেন বাপের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই! মান প্রতিপত্তি, জায়গা জিরেতের জন্য

প্রাণপণং করেন কেন—ইহাদেরই জন্য তো সব কিছু করিতেছেন! তবু ছেলের যদি বাপের জন্য এতটুকু দরদ নাই, তবে আর কিসের জন্য এই তপস্যা? আর কতদিনই বা বাঁচিবেন? ততদিন আরামে থাকিলেই হয়। তাঁহার কত শত ভাইবন্ধু তো গোঁফে তা দিয়া জীবনটা উপভোগ করে, আর নাকে তেল দিয়া ঘুমায়। রায়সাহেবই বা কেন ভোগবিলাসে মগ্ন হইয়া থাকিবেন না? তখন খেয়াল হইল না যে, এই তপস্যা সন্তানদের জন্য নয়, নিজেরই জন্য; যশের জন্য ততটা নয়, যতটা নিজের কর্মশীল স্বভাবের জন্য। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাঁহার যে কাজ করা চাই। বিলাসী আর অকর্মণ্য জীবনে তৃপ্তি নাই। তিনি জানেন না যে কোন কোন লোকের প্রকৃতিই এমন যে, তিল তিল করিয়া নিজেকে হত্যা করিবে—শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত থামে না।

এই আঘাতের প্রতিক্রিয়া ঘটিতে দেরি হইল না। আমরা যাহাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করি, প্রতিদানের আশা না রাখিলেও তাহাদের কাছে দাবি থাকেই। তাহাদের শাসন করিতে চাই হয়তো তাহাদেরই মঙ্গলের জন্য, তবে ঐ মঙ্গল শেষ পর্যন্ত তাহাদের না হইয়া আমাদেরই জন্য হইয়া পড়ে। ত্যাগ যত বেশি, এই দাবি আর শাসনও ততই প্রবল হইয়া ওঠে, আর যখন অপর পক্ষে সহসা বিদ্রোহের কারণ ঘটে তখন আমরা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠি, এবং ত্যাগ তখন ধরে প্রতিহিংসার রূপ। রায়সাহেবের জিদ হইল, সরোজের সঙ্গে ছেলের বিবাহ ঘটিতে দিবেন না, এজন্য যদি পুলিসের সাহায্য নিতে হয়, বা নিজের নীতিকে হত্যা করিতে হয়, তাহাও স্বীকার।

যেন তলোয়ার উঁচাইয়া রায়সাহেব বলিলেন, হাঁ, আমি মরলেই হবে, তবে তার দেরি আছে।

রুদ্রপাল উপেক্ষাভরে বলিল, ঈশ্বর করুন, আপনি চিরজীবী হোন, সরোজের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে।

মিছে কথা!

মোটেই নয়, প্রমাণপত্র মজুদ।

রায়সাহেব মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এমন উন্মত্ত হিংসায় ভরা দৃষ্টিতে তিনি বোধ হয় কখনও শত্রুর দিকেও চাহেন নাই। শত্রু খুব বেশি করিলে স্বার্থে ঘা দিতে পারে, কিন্তু এ যে সম্মানের উপরে আঘাত! আর এই আঘাত যে মর্মে গিয়া বাজিল, যেখানে তাঁহার সারা জীবনের সকল প্রেরণা

সঞ্চিত রহিয়াছে ! একটা আঁধি আসিয়া যেন জীবনের মূল উপড়াইয়া ফেলিল। আজ্ তিনি একেবারে নির্বল। পুলিশের সমস্ত শক্তি হাতে পাইয়াও অক্ষম। তাঁহার শেষ অস্ত্র ছিল বলপ্রয়োগ, সেই অস্ত্র এখন হাতের বাহিরে। রুদ্রপাল সাবালক, সরোজও সাবালিকা। রুদ্রপাল আবার নিজের জমিদারির মালিক; তাহার উপর রায়সাহেবের মোটেই হাত নাই। হায় রে, যদি জানিতেন এই হতভাগ্য এমন ভাবে বিদ্রোহ করিয়া বসিবে তবে কে এই সম্পত্তির জন্য লড়িত? এই মামলার জন্য কমসে কম দু তিন লাখ খরচ হইয়া গেল; জীবনই নষ্ট হইল। এখন লজ্জা বাঁচাইয়া চলিতে হইলে ইহাকে 'বাপু' 'বাছা' করিয়া কথা বলিতে হইবে, বেশি বাধা দেওয়া চলিবে না, তার জন্য ইজ্জত ধূলায় লুটাইয়া দিতে হইলেও উপায় নাই। আত্মজীবন বলি দিয়াও তিনি আর কর্তা নন। ওহো, সারা জীবনই নষ্ট হইল, সারাটা জীবন!

রুদ্রপাল চলিয়া গিয়াছে। রায়সাহেব গাড়ী আনাইয়া মেহতার বাড়ি গেলেন। মেহতা ইচ্ছা করিলে মালতীকে বুঝাইতে পারে। সরোজও উহার কথা ঠেলিতে পারিবে না; দশ বিশ হাজার টাকা গুণাগার দিলেও যদি এই বিবাহ বন্ধ করা যায়, রায়সাহেব তাহাতে প্রস্তুত। নিজের স্বার্থের নেশায় তাঁহার খেয়াল হইল না যে, যে বিষয় লইয়া আজ মেহতার কাছে চলিয়াছেন, তাহাতে মেহতার সহানুভূতি থাকা সম্ভব নয়।

সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া মেহতা রায়সাহেবকে উসকাইয়া তুলিল; গম্ভীর ভাবে বলিল, এ তো আপনার মানমর্যাদার ব্যাপার।

রায়সাহেব ঠিক ধরিতে পারেন নাই। খুসি হইয়া বলিলেন, হাঁ, সত্যি তাই। রাজা সূর্যপ্রতাপ সিংহকে তো আপনি জানেন।

আমি তার মেয়েকেও দেখেছি। সরোজ ওর পায়ের ধূলোরও যোগ্য নয়।

কিন্তু এই হতভাগার আক্কেলটা একবার দেখুন।

তা আপনি আর কি করবেন, ও নিজেই পরে পসতাবে। উপেক্ষা করাই আপনার ঠিক।

আহা! তবে এ যে দেখা যায় না মেহতাজী! হাতে পেয়ে কি ছাড়া যায়? এ সম্বন্ধটা করবার জন্যে যদি অর্ধেক সম্পত্তি ছাড়তে হয়, তাতেও আমি রাজি। আপনি মালতী দেবীকে একটু বুঝিয়ে বললে কাজটা হয়ে যায়। এদিক থেকে যদি অমত করা হয় তবে রুদ্রপাল দিন কত হয় তো

মাথা চাপড়াবে ; পাঁচ দশ দিন বাদে নেশা কেটে গেলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। প্রেম ট্রেম কিছু নয়, সব চোখের নেশা।

কিন্তু কিছু ঘুস না দিলে মালতী রাজি হবে কেন ?

আপনি যা বলবেন, তাই আমি ওকে দেব। ও যদি চায় আমি ওকে এখানকার ডাফ্‌রিন হস্‌পিটালের ইন্‌-চার্জ করে দেব।

দেখছি, ও আপনাকে চাইলে আপনি তাতেও রাজি! মন্ত্রিত্ব পাবার পর থেকে আপনার সম্বন্ধে ওর মত নিশ্চয় বদলে থাকবে।

রায়সাহেব মেহ্‌তার মুখের দিকে তাকাইলেন। উহার মুখে যেন হাসির রেখা দেখা যাইতেছে। এতক্ষণে সব বোধগম্য হইল ; দুঃখিত ভাবে বলিলেন, এই কি আপনার ঠাট্টা করার সময়? আমি আপনার কাছে এলাম কেন? আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি আমার অবস্থাটা ঠিক মত বুঝে পরামর্শ দেবেন। আর আপনি কিনা আমায় ঠাট্টা কোরছেন! যার দাঁতের ব্যথা হয় নি সে কি দাঁতের ব্যথার কষ্ট বোঝে ?

গম্ভীরভাবে মেহতা বলিল, ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনি যে ব্যাপার নিয়ে এসেছেন তা নিয়ে গম্ভীরভাবে আলোচনা করা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়। বিয়ে যে যার মতে করবে, নিজের দায়িত্বে। ছেলের বিয়ের দায়িত্ব আপনি ঘাড়ে নিতে চান কেন, বিশেষ যখন আপনার ছেলে সাবালক, নিজের ভাল মন্দ, লাভ লোকসান বোঝবার বয়স হয়েছে? আমি অন্তত বিয়ের মত গুরুতর ব্যাপারে মান ইজ্জতের স্থান আছে বলে মনে করি না। ধনেই যদি প্রতিষ্ঠা হোত, তবে রাজাসাহেব ঐ নাংগা বাবার সামনে ঘণ্টার-পর ঘণ্টা জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে থাকতো না। জানি না সত্যি কতদূর গড়াবে ; তবে রাজাসাহেব নাকি নিজের এলাকায় দারোগাকেও সেলাম করছে! একে আপনি ইজ্জত বলেন ; কিন্তু লখনৌয়ে দোকানী পসারী, রাস্তার লোক, যাকে জিজ্ঞাসা করবেন দেখবেন ওর নাম শুনেই গালি দেয়। এই কি মান সম্ভ্রম? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সরোজের মত ভালো বৌ আপনি সহজে পাবেন না।

রায়সাহেব আপত্তির সুরে বলিলেন, ও তো মালতীরই বোন।

মেহতার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। বলিল, মালতীর বোন হওয়া কি অপমানের বিষয়? আপনি মালতীকে জানেন না, জানবার চেষ্টাও করেন নি। আমিও আগে তাই ভাবতুম, কিন্তু এখন দেখছি, ও খাঁটি সোনা, যা

আগুনে পুড়ে আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যারা তলোয়ার উঁচিয়ে চলে না, কিন্তু দরকার পড়লে নিজেদের গুণের পরিচয় দেয়, মালতী সেই সব বীরের দলে। খান্নার আজকাল কি দশা হয়েছে, আপনি জানেন কি ?

সহানুভূতির ভাবে মাথা দুলাইয়া রায়সাহেব বলিলেন, হাঁ, শুনেছি, আর অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে ওর সঙ্গে দেখা করি, কিন্তু সময় হয়ে ওঠে নি। ঐ কলে আগুন লেগেই ওর সর্বনাশ হোল।

আজ্ঞে হাঁ। আজকাল ও একরকম বন্ধুদের দয়াতেই বেঁচে আছে। তাতে ক মাস ধরে গোবিন্দীর অসুখ। গোবিন্দী তো খান্নার কাছে নিজেকে বলি দিয়েছে; সেই পশুর কাছে, যে নাকি হামেশা ওকে জ্বালিয়েছে আর আজ যে মরতে বসেছে। মালতী রাতের পর রাত ওর শিয়রে বসে আছে, পাঁচ শ টাকা ভিজিট পেলেও যে আগে কারু কাছে এক রাত জাগতো না। খান্নার ছেলেমেয়েগুলির দেখাশোনার ভারও ঐ মালতীর ওপর। জানি না, এই মাতৃত্ব ওর মধ্যে কোথায় ঘুমিয়ে ছিল। আপনি তো জানেন আমি ঘোর নাস্তিক, কিন্তু ওকে দেখে যেন মনের মধ্যে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস জেগে উঠছে, আত্মশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ওর চেহারার মধ্যে যেন দেবত্বের ঝলক দেখতে পাচ্ছি। মানবতার এমন শক্তি, এত বৈচিত্র্য, এ যেন আমি আজ প্রথম প্রত্যক্ষ কোরলাম। আপনি ওর সঙ্গে একবার দেখা কোরবেন ? তবে চলুন, এই ছুতোয় যাওয়া যাক।

সন্দিগ্ধভাবে রায়সাহেব বলিলেন, আপনিই যখন আমার দুঃখ বুঝলেন না, তখন মালতী কি বুঝবেন ? মাঝখান থেকে আমার লজ্জাই সার হবে। তা ওঁর কাছে যাওয়ার জন্যে আপনার ছুতোর দরকার কি ? আমি তো জানতাম, আপনি ওঁকে যাদু করেছেন।

মেহতা হাসিয়া ঠাট্টার সুরে বলিল, ও সব কথা এখন স্বপ্ন হয়ে গেছে, আজকাল আমি ওর দেখাই পাই না। ওর আজকাল সময়ই হয় না। দুচার বার গিয়েছি, কিন্তু মনে হয়েছে আমাকে দেখে ও খুসি হয় না। লজ্জায় আর যাই নি। ভাল কথা মনে পড়ল, আজ মহিলা ব্যায়ামশালার একটা জলসা হবে, আপনি যাবেন ?

মনমরা ভাবে রায়সাহেব বলিলেন, না ভাই, আমার অবসর নাই। রাজাসাহেবকে কি জবাব দেব সে ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি যে তাঁকে কথা দিয়ে ফেলেছি।

বলিতে বলিতে রায়সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর ধীরে ধীরে দরজার দিকে চলিলেন। যে গ্রন্থি খুলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আরও জটিল হইয়া পড়িল। অন্ধকার আরও গভীর হইয়া গেল। গাড়ী পর্যন্ত আসিয়া মেহ্‌তা বিদায় লইল।

রায়সাহেব সোজা নিজের বাড়ি আসিয়া যেই খবরের কাগজটি হাতে নিলেন, বেয়ারা আসিয়া তন্‌খার কার্ড হাতে দিল। তন্‌খার উপর তাঁহার এতই বিরক্তি যে উহার মুখ দেখিতে চাহেন না; কিন্তু মনের এই দুর্বলতার সময় ভাবিলেন, তন্‌খার কাছে আর কিছু না হোক, একটু সহানুভূতি হয়তো পাওয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি উহাকে ডাকাইলেন।

পা টিপিয়া টিপিয়া কাঁদো কাঁদো মুখে তন্‌খা ঘরে ঢুকিল, আর মাটি পর্যন্ত ঝুঁকিয়া সেলাম করিতে করিতে বলিল, আমি তো হুজুরকে দর্শন করার জন্য নৈনিতাল গিয়েছিলাম। সৌভাগ্য যে, এখানে আপনার সঙ্গে দেখা হোল। আপনার খবর ভাল তো?

তাহার পর নিজের পূর্বেকার ব্যবহার একদম ভুলিয়া গিয়া, অতি ঘোরালো ভাষায় রায়সাহেবের যশোগান শুরু করিয়া দিল। এ রকম হোম মেম্বার আর হবে কি? যেদিকে চাইবেন, দেখবেন হুজুরেরই গুণগান চলেছে। এ রকম পদে আপনার মত লোকই শোভা পায়।

রায়সাহেব ভাবিতেছিলেন, লোকটা কত বড় ধূর্ত, নিজের গরজ পড়িলে গাধাকে বলে দাদা; পয়লা নম্বরের বেহায়া আর নির্লজ্জ। কিন্তু উহার প্রতি রাগ না হইয়া দয়াই হইল। বলিলেন, তারপর, আজকাল আপনি কি করছেন?

কিছু না হুজুর, একদম বেকার। এরই জন্যে তো আপনার কাছে এসেছি, আপনার হয়তো পুরানো ভৃত্যকে মনে আছে। আজকাল বড় কষ্টে পড়েছি হুজুর। হুজুর তো রাজা সূর্যপ্রতাপ সিংহকে জানেন। লোকটা কাউকে মানুষ বলে মনে করে না। এক দিন তো আপনারই নিন্দে কোরতে লাগলো। আমার সহ্য হচ্ছিল না, আমি বললাম, থামুন মহারাজ, রায়সাহেব আমাদের প্রভু, তাঁর নিন্দা শুনতে পারি না। ব্যস, এই কথায় আমার ওপর চটে গেলেন। আমিও সেলাম দিয়ে সরে এলাম। আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি, আপনি কি অত চাল দেখান; রায়সাহেবের সম্ভ্রমের কাছে আপনি দাঁড়াতে পারেন না।

চালে মান হয় না, মান হয় গুণে। আপনার যা যোগ্যতা, তা দুনিয়ার সবাই জানে।

অভিনয় করিয়া রায়সাহেব বলিলেন, আপনি যে একদম ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলেন।

তন্‌খা উদ্ধতভাবে বলিল, আমার হুজুর সোজা কথা, তা লোকের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক। যত দিন হুজুরের চরণ ধরে আছি, ততদিন কাকে ভয়? ও তো হুজুরের নাম করলে জলে ওঠে। যখনই শুনবো, হুজুরের নিন্দে। আপনি যেদিন থেকে মিনিস্টার হয়েছেন, ওর সর্বাঙ্গে যেন সাপের বিষের জ্বালা। আমার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হোল। লোককে দিতে থুতে তো জানেই না; চাষীদের ওপর যা অত্যাচার করে তা আর জিজ্ঞাসা কোরবেন না। লোকের ইজ্জত বাঁচান দায়। দিন দুপুরে মেয়েদের···

মোটরের আওয়াজ শোনা গেল, আর গাড়ী হইতে নামিলেন স্বয়ং রাজা সূর্য প্রতাপসিংহ। রায়সাহেব ঘরের বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন আর উঁহার আগমনে সম্মানিত বোধ করিয়া বলিলেন, আমিই তো যাচ্ছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে।

এই প্রথম রাজা সূর্যপ্রতাপের পদধূলিতে এই গৃহ পবিত্র হইল! কি সৌভাগ্য!

মিঃ তন্‌খা ভিজে বিড়ালের মত বসিয়া রহিল। রাজাসাহেব এখানে! তাই তো, এদিকে কি এই দুই মহাত্মার বন্ধুত্ব হইয়া গিয়াছে নাকি? ও তো আসিয়াছিল, রায়সাহেবের ঈর্ষানল জ্বালাইয়া সেই তাপে নিজের অভীষ্ট সাধন করিতে। কিন্তু ভালই হইল, রাজাসাহেব দেখা করিতে আসিল। অবশ্য মনের জ্বালা তো কুমোরের আগুন নয় যে মাটির লেপ দিলেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে?

সিগার ধরাইতে ধরাইতে তন্‌খার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে দেখিয়া রাজাসাহেব বলিল, তোমার যে দেখাই নেই মিঃ তন্‌খা। সেদিনকার নেমন্তন্ন বাবদ আমার কাছ থেকে সমস্ত টাকা আদায় করে নিয়ে হোটেলওয়ালাকে এক পাই দিলে না; সে তো আমার মাথা খেয়ে ফেলছে। আমি তো বলি, এটা বিশ্বাসঘাতকতা। আমি ইচ্ছে করলে এখুনি তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি।

বলিতে বলিতেই রায়সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিল, এমন বেইমান লোক আমি জন্মে দেখি নি, রায়সাহেব! আপনাকে সত্যি বলছি, আমি কখনও আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতাম না; কিন্তু এ শয়তান আমাকে ধোঁকা দিয়ে এক লাখ টাকা নষ্ট করিয়ে দিল। আর এখন ও নিজে বাড়ি কিনেছে, গাড়ী করেছে, এক বেশ্যার সঙ্গেও জুটেছে। পুরো বাবু বনে গেছে। আর এখন লোকঠকানো শুরু করেছে। বড়লোকের ঠাট রক্ষা করতে হলে সম্পত্তি থাকা চাই, এ লোকটার সম্পত্তি হল বন্ধুদের চোখে ধূলো দেওয়া।

তন্‌খার দিকে তিরস্কারের দৃষ্টিতে চাহিয়া রায়সাহেব বলিলেন, আপনি চুপ করে রইলেন কেন, মিঃ তন্‌খা? জবাব দিন। রাজাসাহেব তো আপনার সব জারিজুরি ভেঙ্গে দিলেন। এর কিছু জবাব আছে আপনার? সব বোঝা গেছে। আপনি এখন দয়া করে এখান থেকে চলে যান, আর খবরদার, এদিকে মুখ দেখাবেন না। দুজন ভাল লোকের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে নিজের কাজ হাসিল করা হল বিনা পুঁজিতে রোজগার; আর মনে রাখবেন, এ রকম কাজে লাভ লোকসান দুইই মহা বিপদের।

তন্‌খার মাথা এমন নীচু হইয়া গেল যে সে আর মাথা তুলিতে পারিল না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, চুরি করিতে গৃহস্বামীর অন্তঃপুরে আসিলে কুকুর তাড়া খাইয়া যেমন ভাবে বাহির হইয়া যায়।

সে চলিয়া গেলে রাজাসাহেব বলিল, আমার নিন্দে করছিল বুঝি?

আজ্ঞে হাঁ, তবে আমি খুব শুনিয়ে দিয়েছি।

শয়তান।

একদম।

বাপবেটার মধ্যে ঝগড়া বাধাবে, মিয়াবিবির মধ্যে ঝগড়া বাধাবে। এ বিষয়ে একেবারে ওস্তাদ। যাক, বাছাধনের আজ খুব শিক্ষা হয়েছে।

তাহার পর শুরু হইল রুদ্রপালের বিবাহের কথাবার্তা। রায়সাহেবের গলা শুকাইয়া উঠিল। কেহ যেন উঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে তীরসন্ধান করিতেছে। কোথায় লুকান, কি করিয়া বলেন যে ছেলের উপর আমার কোন অধিকার নাই? কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে হইল না, রাজাসাহেব আগেই ব্যাপারটা শুনিয়াছেন, তাই রক্ষা!

রায়সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তা আপনি কি করে জানলেন?

একটু আগে রুদ্রপাল আমার মেয়েকে একটা চিঠি লিখেছে, মেয়ে আমাকে সেটা দেখিয়েছে।

আজকালকার ছেলের এদিকে ভালো কিছু নাই থাক, স্বেচ্ছাচার আর স্বাধীনতার নেশা খুব আছে।

নেশাই তো! তবে তার ওষুধও আমি জানি। আমি ঐ মেয়েটাকে এমন গায়েব করে ফেলবো, যে ওর পাত্তাই পাওয়া যাবে না। পাঁচ দশ দিনে নেশা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফল হবে না।

রায়সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। এই ধরণের চিন্তা তাঁহার মনেও আসিয়াছিল, কিন্তু তিনি দানা বাঁধিতে দেন নাই। সংস্কার দুইজনের একই রকমের, দুইজনের মধ্যেই গুহাবাসী আদিম মানুষটি বাঁচিয়া। রায়সাহেব তাহাকে কাপড় চোপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, আর রাজাসাহেবের কাছে তাহা নগ্ন, নিরাবরণ। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার এই সুযোগ রায়সাহেব ছাড়িতে পারিলেন না।

বলিলেন, কিন্তু দেখুন এটা বিংশ শতাব্দী, দ্বাদশ শতাব্দী নয়, রুদ্রপালের ওপর এ রকম ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া কি হবে তা অবশ্য জানি না, কিন্তু মানবতার দৃষ্টিতে……

বাধা দিয়া রাজাসাহেব বলিল, আর মানবতা! দেখছেন না, দুনিয়ায় আজকাল পশুত্বেরই রাজত্ব। আর দেখুন না—রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ বাধছে কেন পঞ্চায়েত ডেকে বিবাদ মিটিয়ে ফেললে কি চলে না? যত দিন মানুষ আছে, তত দিন তার পশুভাবও থাকবে।

ছোট খাট কথা কাটাকাটির পর ক্রমে ঝগড়ায় আসিয়া দাঁড়াইলে রাজাসাহেব অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন। পরের দিন রায়সাহেবও নৈনিতাল প্রস্থান করিলেন। তাহার একদিন পরেই রুদ্রপাল সরোজকে লইয়া বিলাত পাড়ি দিল। রায়সাহেব ও উহার মধ্যে আর পিতাপুত্রের সম্পর্ক রহিল না। তাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। আর এখন তন্খা হইল রুদ্রপালের পরামর্শদাতা। রুদ্রপালের পক্ষ হইতে রায়সাহেবের উপরে এক নালিশ রুজু হইল, মামলায় রায়সাহেবের বিরুদ্ধে দশ লাখ টাকার ডিক্রী হইল। ডিক্রীর জন্য তাঁহার দুঃখ তত হইল না যত হইল অপমান। অপমানেরও বাড়া দুঃখ এই যে, জীবনের বহুকালের যত আশা সব ধূলিসাৎ হইল, আর সব চেয়ে বড়

দুঃখ যে, নিজের ছেলেই শেষটায় এমন দাগা দিল! ‘পুত্র আমার অনুগত’, কে যেন নিষ্ঠুর হাতে এই গৌরব কাড়িয়া লইল।

কিন্তু তাঁহার দুঃখের পেয়ালা এখনও ভরে নাই। বাকি টুকু পূর্ণ করিয়া দিল, মেয়ে জামাইয়ের বিবাহ-বিচ্ছেদ। সাধারণ হিন্দু মেয়েদের মত মীনাক্ষীও ছিল লাজুক, মুখচোরা। বাবা যাহার সঙ্গে বিবাহ দিলেন তাহারই সঙ্গে চলিয়া গেল, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা জন্মিল না। দিগ্বিজয় সিংহ বিলাসী, মদ্যপ। মীনাক্ষী ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হইতে লাগিল। বই আর পত্রিকার মধ্যে মন বসাইয়া দিল। দিগ্বিজয়ের বয়স ত্রিশের বেশি হইবে না, লেখাপড়া যথেষ্ট করিয়াছে, কিন্তু বড় অহঙ্কারী, সর্বদাই নিজের উচ্চ কুলের মর্যাদা জাহির করিতে ব্যস্ত, আর ভারি নিষ্ঠুর ও কৃপণ। গাঁয়ের যত ছোটলোকদের বৌ-ঝিদের সঙ্গে মাখামাখি; বন্ধুত্বও ছোটলোকদের সঙ্গে—যাহারা খোসামোদ করিয়া উহাকে অতিরিক্ত খোসামোদপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। এমন ব্যক্তিকে মীনাক্ষী কি করিয়া সম্মান করিবে! এদিকে কাগজে কাগজে নারীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদি পড়িয়া ওর চোখও খুলিয়া গিয়াছে। ও মেয়েদের ক্লাবে আনাগোনা শুরু করিয়া দিল। সেখানে কত শিক্ষিত আর সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা আসে। ভোট, নারীর অধিকার, নারী-জাগরণ ইত্যাদি বিষয়ে কত আলোচনা হয়, মনে হয়, পুরুষের বিরুদ্ধে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। বেশির ভাগ সেই সব মেয়েরাই আসে, যাহাদের স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও হয় না, নতুন শিক্ষার আলোক পাইয়া যাহারা পুরাতন সংস্কারকে ভাঙ্গিতে চায়। কয়েকটি যুবতী মেয়েও আসিত, তাহারা বড় বড় ডিগ্রীধারী, বিবাহকে আত্মসম্মানের পরিপন্থী মনে করিয়া চাকুরির খোঁজে ব্যস্ত। একজন ছিলেন মিস সুলতান, বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়া এখন পর্দানশিন মেয়েদের আইনের পরামর্শ দিবার কাজ করেন, তাঁহারই পরামর্শে মীনাক্ষী স্বামীর নামে খোরপোষের দাবি পেশ করিল, বলিল, ও আর স্বামীর গৃহে থাকিতে চাহে না। অবশ্য খোরপোষের মীনাক্ষীর কোনই প্রয়োজন ছিল না, বাপের বাড়িতে খুব সুখেই সে থাকিতে পারিত। কিন্তু ও চায় এখান হইতে যাওয়ার আগে দিগ্বিজয়ের মুখে চুনকালি মাখাইয়া যাইবে। দিগ্বিজয় সিংহও কম নয়, মীনাক্ষীর চালচলন ভাল নয় বলিয়া পালটা মামলা করিল। স্বামী-স্ত্রীর এই ঝগড়া মিটাইবার জন্য রায়সাহেব যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মীনাক্ষী যে স্বামীর মুখ

দেখিতে নারাজ! যদিও দিগ্বিজয় সিংহের নালিশ খারিজ হইয়া গেল আর মীনাক্ষী খোরপোষের ডিক্রী পাইল, তবু এই অপমান মীনাক্ষীর বুকে চাপিয়া রহিল। ও আলাদা বাড়িতে থাকিয়া সমাজতন্ত্রবাদের আন্দোলনে পাণ্ডাগিরি করিতে লাগিল, কিন্তু বুকের জ্বালা শান্ত হইল না।

একদিন রাগের বশে হাতে এক হাণ্টার লইয়া ও গেল দিগ্বিজয় সিংহের বাড়িতে; গিয়া দেখে মেলা ইয়ারবক্সী জমা হইয়াছে আর বেশ্যার নাচ হইতেছে। পিশাচদের এই আড্ডায় পৌঁছিয়া রণচণ্ডীর মত মীনাক্ষী মারধর শুরু করিয়া দিল। হাণ্টারের বাড়ি খাইয়া লোকে দিগ্বিদিকে ছুটিয়া পালাইল—এই সব ছোটলোক বন্ধুবান্ধব ওর তেজের কাছে দাঁড়াইবে কি করিয়া? কুমার সাহেব যখন একা বাকি, তখন মীনাক্ষী তাহার উপরও জোরে চাবুক চালাইল, কুমারসাহেব অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বেশ্যা এতক্ষণ পর্যন্ত ভয়ে এককোণে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবার তাহার পালা। মীনা যেই হাণ্টার উঁচু করিবে অমনি বেশ্যা তাহার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, দিদি, আমায় মারবেন না, আর কোন দিন এখানে আসবো না। আমি নির্দোষ।

ঘৃণাভরে তাহার দিকে চাহিয়া মীনা বলিল, হাঁ, জানি, তোর দোষ নেই। আমি কে, তা জানিস কি? চলে যা এখানে থেকে, আর কখনো আসবি না। আমরা মেয়েরা পুরুষের ভোগবিলাসের পুতুল, তোর দোষ কি?

উহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া আবেগভরে মেয়েটি বলিল, ঈশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন। যেমন শুনেছিলাম, আপনাকে তেমনি দেখছি।

সুখী কিসে হয় বল তো?

আপনি জানেন।

না, তুমি বল।

বেশ্যার প্রাণ ওষ্ঠাগত। কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়া এখন আশীর্বাদ করিতে বসিয়াছে! প্রাণে বাঁচিয়াছে, এখন কোথায় নিজের পথ দেখিবে, না, আশীর্বচন ঝাড়িতে বসিল! এখন জান বাঁচিলে হয়।

ভয়ে ভয়ে বলিল, হুজুরের নাম বাড়ুক, ধন বাড়ুক, সুখ বাড়ুক।

মীনাক্ষী হাসিয়া বলিল, বেশ, বেশ।

ও গিয়া নিজের মোটরে উঠিল, তারপর জেলার হাকিমের বাড়িতে গিয়া এই কাণ্ডের আভাস দিয়া সোজা নিজের বাড়ি চলিয়া গেল। সেই অবধি

স্বামী স্ত্রী পরস্পরের রক্তপাতের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল। দিগ্বিজয়সিংহ রিভলভার হাতে লইয়া তাকে তাকে ফেরে, আর মীনাও আত্মরক্ষার জন্য দুইজন পালোয়ান নিজের সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছে। রায়সাহেবের সুখের স্বর্গ নিজের জীবন কালেই চুরমার হইয়া গেল। সংসারে নিরাশ হওয়ায় উঁহার চিত্ত এখন অন্তর্মুখী হইয়া উঠিল। এতদিন আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল, বাঁচিবারও আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে পথ বন্ধ হওয়ায় মন আপনা হইতেই ভক্তির দিকে ঝুঁকিল। যে নূতন জায়গীরের উপর নির্ভর করিয়া কর্জ করিয়াছিলেন, শোধ দিবার ব্যবস্থা করার আগেই তাহা হাতছাড়া হইয়া গেল, ঋণের বোঝা মাথায় চাপিয়া রহিল। মিনিস্ট্রির দরুণ অবশ্য মোটারকম প্রাপ্তি আছে, তবে তাহার সবটাই চলিয়া যায় মিনিস্টারের ঠাট বজায় রাখিতে, এদিকে রায়সাহেবের নিজের রাজসিক ঠাট বজায় রাখিতে গিয়া কৃষক প্রজাদের উপর কতরকম যে জুলুম করিতে হয় বলার নয়। অথচ সে সবে আগে রায়সাহেবের কতই না ঘৃণা ছিল, প্রজাকে কষ্ট দিতে মন চায় না, তাহাদের দুঃখে প্রাণ প্রকৃতই কাঁদে, কিন্তু নিজের দরকার মিটাইতে গিয়া হায়রান। মুস্কিল আরও যে, ভক্তির পথে, বা উপাসনায়ও তিনি শান্তি পান না। উনি তো মোহকে ছাড়িতে চান, কিন্তু মোহ যে উঁহাকে ছাড়িতে চায় না, আর এই টানাটানির ফলে উঁহার মনে গ্লানি, অপমান আর অশান্তির শেষ নাই। মনের শান্তি না থাকিলে শরীরই বা কি করিয়া সুস্থ থাকে? নীরোগ থাকিবার জন্য কিছু সাধনা করিলেও একটা না একটা রোগ লাগিয়াই আছে। রন্ধনশালায় প্রতিদিন কতরকম রান্না হইতেছে, কিন্তু তাঁহার খাদ্য শুধু মুগের ডাল, আর ফুলকা রুটি। চোখের উপরে তাঁহার অন্য ভাইরা তাঁহার চেয়েও বেশি শোকগ্রস্ত, অপমানে জর্জর, ঋণে ডোবা, তবু কেমন আরামে খাওয়া পরা চলিতেছে, কোনদিকে ঠাট একটু কমে নাই—এমনধারা নির্লজ্জতা কিন্তু ইঁহার ধাতে সয় না। মন থেকে সংস্কারগুলি এখনও একেবারে লোপ পায় নাই। পরপীড়া, প্রবঞ্চনা, নির্লজ্জতা, অত্যাচার, ইহাদের তালুকদারির ভূষণ আর বড়লোকি চাল নাম দিয়া তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, আর এইখানেই তাঁহার সব চেয়ে বড় পরাজয়।

## ৩২

হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া মির্জা খুরশেদ এক অভিনব কাজে হাত দিল, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা তাহার স্বভাবে নাই। কাজটি হইল, নগরের বেশ্যাদের লইয়া একটা নাট্যমণ্ডলী সৃষ্টি করা। ভালো দিনে মির্জাজী খুবই বিলাসী ছিল, কিন্তু হাসপাতালের নিঃসঙ্গ জীবনে, ক্ষত ও রোগের কষ্ট ভোগ করিয়া তাহার মন সংযত হইয়া উঠিয়াছিল। আগেকার জীবনের কথা ভাবিয়া মনে গভীর দুঃখ হইত; আগে যদি খেয়াল হইত, তবে লোকের কত উপকার করিতে পারিত, কত জনের শোকের ব্যথা, দারিদ্রের যাতনা লঘু করিতে পারিত। কিন্তু ধন ঐশ্বর্য সে শুধু বিলাস ব্যসনেই ব্যয় করিয়াছে। বিপদের সময়ে আমাদের আত্মা জাগিয়া ওঠে, একথা তো নতুন নয়; বুড়া বয়সে যৌবনের ভুলের জন্য কে না অনুতাপ করে! ঐ সময়টা যদি জ্ঞান বা শক্তির সঞ্চয়ে লাগিয়া থাকিত, সুকৃতির পাত্র ভরিয়া তুলিত, তবে আজ মনে কত শান্তি মিলিত! হাসপাতালে থাকিতে মির্জাজী দুঃখ পাইত এই মনে করিয়া যে, সে মরিলে চোখের জল ফেলার কেহ নাই। এক এক করিয়া জীবনের পূর্ব ঘটনা সব মনে পড়িত। বসোরার এক ক্যাম্পে সে যখন ম্যালেরিয়া জ্বরে বিছানায় পড়িয়া ছিল, একটি গ্রাম্য মেয়ে কত যত্নে তাহার সেবা করিয়াছিল। ভাল হইয়া উঠিয়া মেয়েটিকে যখন টাকাপয়সা, গয়নাপত্র দিতে গেল, মেয়েটি কেমন মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, চোখে জল, মুখটি ভার করিয়া সে উপহার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। এই নার্সদের শুশ্রূষার মধ্যে নিয়ম আছে, ব্যবস্থা আছে, খাঁটি সেবার ভাব আছে, কিন্তু কোথায় সেই তন্ময়তা, যাহা নাকি ছিল ঐ গাঁয়ের মেয়ের অনভ্যস্ত, আনাড়ি হাতের সেবার মধ্যে! সেই মেয়েটির অনুরাগে ভরা মুখ মির্জা কবে ভুলিয়া গিয়াছে। আবার আসিব কথা দিয়াও আর তাহার কাছে যাওয়া হয় নাই। বিলাসবিভবের মাঝে কখনও তাহাকে মনেও পড়ে নাই, যদি কখনও বা মনে পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে ছিল দয়া, প্রেম ছিল না। জানে না, ঐ মেয়েটির শেষটায় কি হইয়াছে, কিন্তু আজকাল প্রায়ই ঐ মেয়েটির নম্র, স্নিগ্ধ, শান্ত সরল মুখখানি মির্জার চোখের উপর ভাসিয়া ওঠে। তখন যদি তাহাকে বিবাহ করিত, আজ জীবন কত মধুর হইতে পারিত! এই মেয়েটির প্রতি যে অন্যায় হইয়া গিয়াছে তাহারই অনুশোচনা আজ ঐ শ্রেণীর সকলের

প্রতি সহানুভূতি জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের সেবার জন্য তাহাকে অনুপ্রেরণা দিল। নদী যতদিন বিস্তারের পথে চলিতেছিল, উহার গতিবেগে, ফেনিল প্রবাহে, কর্দমাদিতে বাধা পাইয়া সূর্যের কিরণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, গভীরে পৌছিতে পাইত না ; আজ স্রোত শান্ত, আলো তাই অন্তস্তল স্পর্শ করিয়াছে।

বসন্তকালের এক সন্ধ্যায় মির্জাসাহেব নিজের কুটীরের বারাণ্ডায় বসিয়া দুইটি বারাঙ্গনার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিল, এমন সময় মিঃ মেহতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। মির্জা উল্লসিত হইয়া হাত বাড়াইয়া দিল, আর বলিল, আসুন, আসুন। আমি তো আপনারই অভ্যর্থনার জন্য তৈরি হয়ে পথের দিকে চেয়ে ছিলাম।

সুন্দরী দুইটি হাসিয়া উঠিল। মেহতা লজ্জিত বোধ করিল।

মেয়ে দুইটিকে চলিয়া যাইতে সঙ্কেত করিয়া মির্জাজী মেহতাকে চেয়ারে বসাইয়া বলিল, আমি নিজেই যাচ্ছিলাম আপনার কাছে। আমার বিশ্বাস, আমি যে কাজে হাত দিতে যাচ্ছি তা সম্পূর্ণ হবে না, যদি আপনি সাহায্য না করেন। আপনি শুধু পিঠে হাত দিয়ে উৎসাহ দেবেন, আর বলবেন, বেশ করেছ, এগিয়ে চল।

মেহতা হাসিয়া বলিল, আপনি যে কাজে হাত দেবেন, তাতে কি আর আমার মত বইয়ের পোকার সাহায্য করা দরকার হবে? আপনি বয়সে আমার চাইতে বড়, দুনিয়ার অনেক কিছু দেখেছেন, অতি সামান্য লোকের ওপরও আপনার যেরকম প্রভাব খাটে, তা যদি আমার খাটতো, তবে না জানি কত কিছু আমি কোরে ফেলতাম।

অতি অল্প কথায় মির্জাসাহেব নিজের পরিকল্পনাটা বুঝাইয়া বলিল। তাহার ধারণা, রূপের বাজারে সেই মেয়েরাই আসে, নিজের ঘরে যাহাদের সম্মানজনক আশ্রয় নাই, অথবা অর্থের কষ্টে যাহারা বাধ্য হইয়া পড়ে; সুতরাং এই দুইটি অসুবিধা যদি দূর করা যায় তবে খুব কম মেয়েই এই ভাবে পতিত হইবে।

অন্য পাঁচজন চিন্তাশীল সজ্জন ব্যক্তির মত মেহতাও এই প্রশ্ন নিয়া চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহার মতে মনের সংস্কার আর ভোগলালসাই মুখ্যত মেয়েদের এ পথে টানিয়া নামায়। দুই বন্ধুর মধ্যে এই বিষয় লইয়া মতভেদ হইল, দুইজনেই আপন আপন পক্ষ লইয়া প্রবল তর্কবিতর্ক করিল।

হাতের মুঠি শূন্যে সঞ্চালন করিয়া মেহতা বলিল, আপনি বেশ ঠাণ্ডা মাথায় এ প্রশ্নটা ভেবে দেখেন নি। পেট চালাবার আরও অনেক উপায় আছে। ভোগবিলাসের খিদে শুধু ভাতে মেটে না, তার জন্য চাই দুনিয়ার যত কিছু ভাল জিনিস। সমাজের ব্যবস্থা যত দিন আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত বদলান না যাচ্ছে, এ সব মণ্ডলীতে কোনই কাজ হবে না।

গোঁফে তা দিয়া মির্জা কহিল, আর আমি বলছি, এ শুধু ভাতেরই প্রশ্ন, শুধুই পেটের সমস্যা—অবশ্য এ সমস্যা সকলের সমান নয়। মজুরদের চাই ডাল ভাত, পাতায় ছাওয়া ঘর, উকিলের চাই বাংলো, মোটর, খিদমদগারি করার লোক; লোক শুধু রুটি চায় না, আরও বহুবিধ জিনিসে তার দরকার। মেয়েদেরও মনে যদি নানারূপে এসব প্রশ্ন ফুটে ওঠে, তাতে কি দোষ দেওয়া চলে?

মেহতা একটু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতেন যে মির্জাজীর সঙ্গে উঁহার মতের প্রভেদ কিছুই নাই, আছে কেবল শব্দের হেরফের; কিন্তু ঝগড়ার উত্তেজনার সময় ভাবিয়া দেখিবার ধৈর্য থাকে কি? রাগে গরম হইয়া বলিলেন, ক্ষমা করবেন মির্জা সাহেব; কিন্তু যত দিন দুনিয়ায় ধনী নামে এক জাত আছে তত দিন বেশ্যারাও থাকবে। আপনার মণ্ডলী যদি সফলও হয়, যদিও তাতেই আমার ঘোর সন্দেহ, তবু দশ পাঁচটি মেয়ের বেশি আপনি নিশ্চয় পাবেন না, আর তারাও দু চার দিনের বেশি থাকবে না। সব ছেলেরাই যেমন কবিতা লিখতে পারে না, সব মেয়েরাও তেমনই অভিনয় করতে পারে না। আর যদিই বা ধরেন এই বেশ্যারা আপনার মণ্ডলীতে টিকে থাকে, তাও বাজারে ওদের জায়গা খালি থাকবে না। মূলে যদি না কুড়ুল মারা যায়, পাতা কেটে লাভ কি? বড়লোক বা বিত্তশালীদের কেউ কেউ তো দেখা গেছে, সংসার ছেড়ে, ঈশ্বর চিন্তায় জীবন সঁপে দিয়েছেন। কিন্তু ধনের রাজত্ব পুরো দস্তুর কায়েম রয়েছে, তাতে তো একটুও ভাঁটা পড়ে নি।

এই হঠকারিতায় মির্জাজীর দুঃখ হইল। এমন যাহার বিচারবুদ্ধি, এত যাহার লেখাপড়া, সেও কিনা এই রকম সব কথা বলে! সমাজের ব্যবস্থা কি এত সহজেই বদল হয়, সে তো সাধনার ব্যাপার। তত দিন কি তাই বলিয়া অনর্থ ঘটিতে দেওয়া হইবে? আর কিছু করিতে পারি না বলিয়া কি পুরুষের ভোগ-লালসার কাছে এই অবলা নারীদের বলি দিতে হইবে? বাঘকে কেন

খাঁচায় বন্ধ করা হউক না, দাঁত নখ থাকা সত্ত্বেও সে যেন কাহারও ক্ষতি না করিতে পারে! বাঘ কবে অহিংসাব্রত গ্রহণ করিবে, সেই আশায় কি চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হইবে? ধনীরা যেমন ভাবে খুসি টাকা ওড়াক, মির্জার কিছু আসে যায় না; চাই মদে ডুবিয়া থাকুক, বা মোটরের পর মোটরের মালা গলায় পরুক, কেল্লা তৈয়ার করুক, বা ধর্মশালা, কি মশজিদ নির্মাণ করুক, কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু অবলা মেয়েগুলির জীবন যেন নষ্ট না করে। মির্জা এইটি সহ্য করিতে পারে না। রূপের বাজার সে এমন খালি করিয়া ফেলিবে যে বড়লোকদের সোনার মোহরের উপর থুতু ফেলিবারও কেহ থাকিবে না। কেন, যখন মদের দোকানে পিকেটিং হইয়াছিল, বড় বড় মাতালেরা কি জলেই মনের আগুন শান্ত করে নাই?

মির্জার বেকুবিতে হাসিয়া মেহতা বলিল, আপনার জানা উচিত যে দুনিয়ায় এমন জায়গাও আছে যেখানে বেশ্যা নেই, কিন্তু আমীরদের দৌলত সেখানেও মনোরঞ্জনের জিনিস তৈরি করে নিয়েছে।

মেহতার বোকামিকে ঠাট্টা করিয়া মির্জা বলিল, জানি মশায়, জানি। আপনাদের আশীর্বাদে দুনিয়াটা দেখে নিয়েছি, তবে কি জানেন, এটা হিন্দুস্থান, ইউরোপ নয়।

মানুষের স্বভাব সর্বত্র এক।

হাঁ, তবে এটাও মনে রাখবেন যে, প্রত্যেক জাতেরই একটা কিছু আছে, যাকে বলা যায় তার আত্মা। সতীত্ব হোচ্ছে হিন্দুস্থানের আত্মা।

এ হল, আপনার বড়াই আপনি করা!

অর্থের আপনি এমন নিন্দে করেন, তবু তো খান্নাকে সাহায্য করায় আপনার ক্লান্তি নেই।

মেহতার রাগ পড়িয়া আসিয়াছিল, নম্রভাবে সে বলিল, আমি তো খান্নাকে তখন থেকে সাহায্য করছি যখন থেকে সে অর্থের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। এখন যদি ওর অবস্থা দেখেন, আপনার দয়া হবে। আর আমি কিই বা করতে পারি। কলেজের ছুটি তো নেই, খুব বেশি করি তো শুকনো কথায় সহানুভূতি জানানো। হাঁ, করেছে বটে মিস মালতী, খান্নাকে ওই বাঁচিয়ে তুললো। মানুষের মনের গভীরে ত্যাগ আর সেবার কত যে শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে, এত দিন পর্যন্ত তা আমার ধারণাই ছিল না। এক দিন যান না, খান্নাকে দেখে

আস্থন। ও মহা খুসি হয়ে যাবে। ওর এখন সব চেয়ে বেশি দরকার সহানুভূতির।

মির্জা যেন কতকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বলিল, তা আপনি যখন বলছেন, যাব এক দিন। আপনার সঙ্গে জাহান্নামে যেতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু দেখুন, মিস মালতীর সঙ্গে না আপনার বিয়ে হবার কথা ছিল? খুব জোর গুজব ছিল যে।

মেহতা লজ্জিত ভাবে বলিল, তপস্যা করছি, দেখা যাক, কবে দেবী বর দেন।

আগে তো ও আপনার জন্যে পাগল ছিল।

আমারও তো ধারণা তাই ছিল; কিন্তু আমি যেই হাত বাড়িয়ে ওকে ধরতে গেলাম, দেখি, ও একেবারে আকাশে উঠে বসেছে। অত উঁচুতে আমি কি করে নাগাল পাই; সাধ্যসাধনা করছি নীচে নেমে আসার জন্যে। আজকাল তো আমার সঙ্গে ও কথাই বলে না।

বলিতে বলিতে মেহতা কান্নায় ভরা হাসি হাসিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

মির্জা প্রশ্ন করিল, ফের কবে দেখা হবে?

এবার আপনাকে কষ্ট করে যেতে হবে। আর, শুনুন, খান্নার কাছে নিশ্চয় যাবেন একবার।

হাঁ, যাব।

মির্জা দেখিলেন খিড়কির দরজা দিয়া মেহতা বাহির হইয়া গেল; চলায় তেমন স্ফূর্তি নাই—যেন গভীর কোন চিন্তায় ডুবিয়া আছে।

## ৩৩

ডাক্তার মেহতা ছিল পরীক্ষক, হইয়া গেল পরীক্ষার্থী। মালতীর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকিয়া তাহার ভয় হইতে লাগিল, উহাকে সে হারাইয়া না ফেলে। কয়েক মাস ধরিয়া মালতী তাহার কাছে আসেই নাই, আর সে নিজে যখন অস্থির হইয়া তাহার বাড়ি গেল, তখনও দেখা হইল না। যে সময়ে রুদ্রপাল ও সরোজের প্রেমলীলা চলিতেছিল, তখন তো মালতী তাহার পরামর্শ লইবার জন্য

প্রায় নিত্যই এক আধবার আসিত ; কিন্তু যে দিন তাহারা দুজনে ইংলণ্ড চলিয়া গেল, সেই দিন হইতে তাহার আসা-যাওয়া বন্ধ। বাড়িতে গিয়াও তাহার দেখা পাওয়া সহজ নহে। মনে হয়, সে যেন মেহতাকে এড়াইতে চায়, যেন জোর করিয়া নিজের মনকে তাহার কাছ থেকে সরাইয়া আনিতে চায়। যে সব বইয়ে এত দিন মেহতা ডুবিয়া থাকিত, তাহারা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না ; যেন তাহার মনোনিবেশের ক্ষমতাই চলিয়া গেল। সংসারের ব্যবস্থায় মেহতা কোনও দিন বিশেষ পটু ছিল না। সব জড়াইয়া মাসে এক হাজার টাকার বেশি উপার্জন করিত, কিন্তু এক আধলাও বাঁচিত না। ডালরুটি খাইয়া থাকার বেশি টাকা তাহার হাতে আসিত না। বাবুগিরি সব শুধু গাড়ীটায়, তাহা তো সে নিজেই চালায়। কিছু টাকা খরচ হইত বই কিনিতে, কিছু যাইত চাঁদায়, কিছু গরিব ছাত্রগণের ভরণপোষণে ও বাগান করায়—এই শেষেরটি ছিল তাহার সখের জিনিস। নানা রকমের গাছগাছড়া বিদেশ হইতে চড়া দামে কেনা, আর তাহার পরিচর্যা—এই ছিল তাহার মনের বিলাস, চাই মনের ভোগই বলুন। কিন্তু এদিকে কয়েক মাস ধরিয়া ঐ বাগিচার প্রতিও তাহার যেন কিছু বিরক্ত বিরক্ত ভাব দেখা যাইতেছে, সংসারের ব্যবস্থাও আরও খারাপ হইল। খাওয়া তো দুখানি লুচি, আর ইহাতেই খরচ পড়ে এক শ টাকার বেশি! আচকান পুরানা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেই কঠোর শীত কাটিয়া গেল। নূতন আচকান কিনিবার সামর্থ্য নাই, কখনও কখনও ঘি বিনা ডাল খাইয়া উঠিতে হইত। কবে যে ঘিয়ের কেনেস্তারা কেনা হইয়াছিল, তাহা নিজেরই মনে ছিল না, মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেই বা কি করিয়া? সে কি মনে করিবে না যে, তাহাকে অবিশ্বাস করা হইতেছে? শেষে এক দিন তিন বার চেষ্টা করিবার পর চারবারের বার যখন মালতীর দেখা পাইল, তখন মালতী মেহতার এই অবস্থা দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না। বলিল—তুমি কি এমন শীতটাও এই পরেই কাটিয়ে দেবে? এ আচকান পরতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না?

পত্নী না হইয়াও মালতী তাহার এতখানি ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল যে নিতান্ত আত্মীয়ের মত সহজভাবে সে এই প্রশ্ন করিল।

মেহতা রাগ না করিয়া কহিল, কি করি মালতী, পয়সা তো বাঁচেই না।

মালতীর আশ্চর্য লাগিল—তুমি হাজার টাকার বেশি রোজগার কর, আর নিজের কাপড়চোপড় করবার পয়সাও তোমার থাকে না! আমার আয় কখনও

চার শ টাকার বেশি হয় নাই; কিন্তু তা দিয়ে আমি সমস্ত সংসার চালাই, আর বাঁচেও কিছু। ব্যাপারটা কি? তুমি কর কি?

আমি তো এক পয়সাও বাজে খরচ করি না, আর এমন কিছু সখও নাই।

আচ্ছা, আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে একজোড়া আচকান তৈরি করিয়ে নাও।

মেহতা সলজ্জ ভাবে বলিল—এখনই তৈরি করতে দেব। সত্যি বলছি।

যদি এখানে আসতে হয় তো মানুষের মত কাপড়চোপড় পরে এস।

এ যে ভারি কঠিন শর্ত।

কঠিন তো বটেই। তোমার মত লোকের সঙ্গে কড়াকড়ি না করলে কাজ চলে না।

কিন্তু বাড়িতে যে বাক্স খালি, পয়সা না লইয়া কোনও দোকানে যাইবার সাহসও নাই। মালতীর বাড়ি যাইবে, তা কোন মুখে যায়? বুকের ভিতর কাঁপিতে থাকে। এক দিন নূতন এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত। এদিকে কয়েক মাস ধরিয়া বাড়িভাড়া দেওয়া হয় নাই। মাসে মাসে পঁচাত্তর টাকা দেনা বাড়িতেছিল। বাড়িওয়ালা যখন অনেক তাগাদা করিয়াও টাকা আদায় করিতে পারিল না, তখন নোটিশ দিল; কিন্তু নোটিশ তো আর টাকা গড়িবার কল নয়! নোটিশের তারিখ পার হইয়া গেল, টাকা জমা দেওয়া হইল না। তখন বাড়িওয়ালা নিরুপায় হইয়া নালিশ রুজু করিয়া দিল। সে জানিত, মেহতাজী খুব সজ্জন, পরোপকারী পুরুষ; কিন্তু ছয় মাস অপেক্ষা করা ছাড়া বেশি ভালমানষি আর সে কি দেখাইবে? মেহতা নিজের পক্ষ সমর্থন করিল না, একতরফা ডিক্রী হইয়া গেল। বাড়িওয়ালা তাড়াতাড়ি ডিক্রী জারি করাইল, আর ক্রোকের পেয়াদা মেহতাকে তাহা আগের থেকে জানাইতে আসিল; কারণ তাহার ছেলে ইউনিভারসিটিতে পড়ে, মেহতা তাহাকে যৎসামান্য কিছু বৃত্তিও দেয়। ঘটনাচক্রে মালতীও তখন উপস্থিত ছিল। বলিল—ক্রোক কেমন করে হল? কিসের জন্য?

পেয়াদা বলিল, বাড়িভাড়ার ডিক্রী হয়েছিল যে। আমি বললাম, হুজুরের কাছে এত্তেলা দিয়ে দিই। চার পাঁচ শ টাকার মামলা। এমন একটা আর কি! দশ দিনের মধ্যেও যদি টাকাটা দিয়ে দেন, তবে কোনও ক্ষতি নাই। আমি মহাজনকে দশ দিন পর্যন্ত আটকে রাখব।

আমিন চলিয়া গেলে মালতী ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—নহবতের শব্দ এত দূর এসে পৌছেছে! আমার অবাক লাগে যে তুমি এত সব মোটা মোটা বই লেখ কেমন করে। ছয় ছয় মাসের বাড়িভাড়া বাকি, আর তোমার হুঁশ নাই!

মেহতা লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া বলিল—কেন থাকবে না, কিন্তু টাকা যে বাঁচেই না। অথচ এক পয়সাও বাজে খরচ করি না।

হিসাব-টিসাব কিছু রাখ না?

হিসাব রাখব না কেন? যা কিছু পাই, সমস্তই লিখে যাই। নইলে ইনকমট্যাক্সওয়ালারা আস্ত রাখবে না।

আর যা কিছু খরচ কর, সেটা—?

তার তো কোন হিসাব রাখি না।

কেন?

কে লেখে; বোঝার মত মনে হয়।

আর এই পুথিগুলো লেখ কি করে?

ওর মধ্যে তো বিশেষ কিছু করতে হয় না। কলম নিয়ে বসে যাই আর লিখতে শুরু করি। সব সময় তো আর খরচের খাতা খুলে বসে থাকি না।

তা এ টাকা কি করে শোধ করবে?

কারো কাছে কর্জ করে নেব। তোমার কাছে থাকে তো দিয়ে দাও।

আমি শুধু এক সর্তে দিতে পারি; তোমার সমস্ত আয় আমার হাতে আসবে আর সমস্ত খরচ আমার হাত দিয়ে হবে।

মেহতা খুসি হইয়া বলিল—বাঃ, যদি এই ভার নাও, তাহলে আর কথা নাই, জোরসে ঢোল বাজাব।

মালতী ডিক্রীর টাকা শোধ করিয়া দিল, আর পরের দিনই মেহতাকে ঐ বাংলো খালি করিতে বাধ্য করিল। নিজের বাংলোতে তাহার জন্য বড় বড় দুইখানি ঘর দিল। তাহার আহারাদির ব্যবস্থাও নিজের সংসারের মধ্যে করিয়া লইল। মেহতার অন্য জিনিসপত্র বেশি ছিল না, কিন্তু কয়েক গাড়ী বই ছিল। তাহার ঘর দুইখানি বইয়ে বোঝাই হইয়া গেল। নিজের বাগান ছাড়িয়া আসিতে তাহার খুব কষ্ট হইয়াছিল; মালতী তাহার গোটা হাতাই তাহাকে ছাড়িয়া দিল, যত ইচ্ছা ফুলগাছ লাগাক।

মেহতা তো নিশ্চিন্ত ; কিন্তু তাহার আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া মালতীকে ভারি বিপদে পড়িতে হইল। সে দেখিল, মেহতার মাসিক আয় হাজার টাকারও বেশি ; কিন্তু তাহার প্রায় সমস্তটাই গোপন দানে উড়িয়া যায়। বিশ পঁচিশ জন ছেলে তাহার নিকট হইতে বৃত্তি লইয়া পড়াশুনা করে ; বিধবাদের সাহায্যের অঙ্কও সামান্য নয়। এই খরচের কোনটা সে কমাইবে, তাহা বুঝিতে পারিল না। সমস্ত দোষ তাহারই ঘাড়ে পড়িবে ; সমস্ত নিন্দা তাহারই ভাগে পড়িবে। কখনও মেহতার উপর রাগ করে, কখনও নিজের উপর, কখনও প্রার্থীদের উপর, এমন সরল উদার ব্যক্তির স্কন্ধে নিজের ভার চাপাইতে যাহাদের একটুও সঙ্কোচ হয় না। ইহা দেখিয়া আরও রাগ হয় যে—এই সব প্রার্থীর মধ্যে দানের পাত্র কেহই নয়। একদিন সে মেহতাকে খুব এক হাত নিল।

মেহতা তাহার অভিযোগ শুনিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বলিল—তোমার এক্তিয়ার আছে, যাকে চাই দাও, যাকে চাই দিও না। আমাকে জিজ্ঞাসা করার কোনও প্রয়োজন নাই। হাঁ, কৈফিয়ৎ তোমাকেই দিতে হবে।

মালতী রাগিয়া বলিল—হাঁ, তা বই আর কি, যশ তোমার হোক, অপযশ পড়ুক আমার ঘাড়ে। আমি বুঝতেই পারি না, তুমি কি যুক্তি দিয়ে এই দানপ্রথা সমর্থন করতে পার। মানুষকে এই প্রথা যতখানি অলস করেছে, বসে বসে খাওয়াচ্ছে, তার আত্মগৌরবে যে পরিমাণ আঘাত করেছে, মানুষের প্রতি অন্যায় অবিচারও ততটা অনিষ্ট করে নাই ; বরং আমার মতে মানুষের মনে বিদ্রোহের ভাবনা সৃষ্টি করিয়ে অন্যায় অবিচার সমাজের উপকারই করেছে।

মেহতা স্বীকার করিল—আমারও এই মত।

তোমার এই মত নয়।

না মালতী, সত্যি বলছি।

তা হলে মতে আর কাজে এতটা তফাৎ কেন ?

দুই মাসের পর মালতী অনেককে নিরাশ করিল। কাহাকেও সাফ জবাব দিল, কাহাকেও বলিল, 'নিরুপায়' ; কাহাকেও ফৈজৎ করিল।

মেহতার বজেট তো ধীরে ধীরে ঠিক হইয়া গেল ; কিন্তু ইহাতে তাহার মনে এক প্রকার গ্লানি হইল। মালতী যখন তৃতীয় মাসে তিন শ টাকা বাঁচিয়াছে দেখাইল, তখন মেহতা কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে মালতী যেন খাটো হইয়া গেল। নারীর মধ্যে চাই দান ও ত্যাগ। এই দুইটিই তাহার

সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য। এই আধারের উপরই সমাজভবন দাঁড়াইয়া আছে। বণিক্ বুদ্ধিকে অমঙ্গল বলিয়াই মেহ্‌তা মনে করিত, তবে তাহার ধারণা এ অমঙ্গল আমাদের সমাজ এড়াইতে পারে না।

যখন মেহতার আচকান তৈরি হইয়া আসিল, আর নূতন ঘড়িও আসিল, তখন হইতে কয়েকদিন সংকোচে মেহ্‌তা বাড়ির বাহিরে আসিতে পারিল না। আত্মসেবার চেয়ে বড় অপরাধ তাহার দৃষ্টিতে আর কিছুই ছিল না।

কিন্তু রহস্যের কথা এই যে, মালতী তাহাকে হিসাব-কিতাবে কসিয়া বাঁধিতে চায়, তাহার দানের দরজা বন্ধ করিয়া দিতে চায়, কিন্তু নিজের বেলায় মালতী অন্যের জীবন দান করিতে গিয়া নিজের সময় ও সদাশয়তা দুই হাতে বিলাইয়া দেয়। বড়লোকদের বাড়িতে সে তো ফি না লইয়া যাইত না, কিন্তু গরিবদের ঔষধও দিত বিনা পয়সায়। দুইজনে এইটুকু প্রভেদ যে মালতী ছিল ঘরেরও বটে, আবার বাহিরেরও; মেহতা ছিল শুধু বাহিরের, তাহার নিকট ঘরের অস্তিত্বই ছিল না। উভয়েই স্বার্থত্যাগ করিতে চাহিত। মেহতার রাস্তা ছিল পরিষ্কার। নিজের দেহ ছাড়া তাহার উপর আর কাহারও ভার ছিল না। মালতীর পথ ছিল দুর্গম; তাহার উপর দায়িত্ব ছিল, বন্ধন ছিল, যে বন্ধন সে ভাঙ্গিতে পারে নাই, ভাঙ্গিতে চাহে নাই। ঐ বন্ধনেই যে সে জীবনের প্রেরণা খুঁজিয়া পাইত। মেহতাকে নিকটে দেখিয়া তাহার এই বোধ হইতেছিল যে, মেহতা খোলা জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইবার জীব, তাহাকে পিঁজরায় বন্ধ করা যায় না; আর যদি বা বন্ধ করা যায় তবে সে ছুটিবে আঁচড়াইতে কামড়াইতে; খাঁচার জরার মধ্যে সর্বপ্রকারের সুখ পাইলেও তাহার প্রাণ সর্বদা জঙ্গলের জন্য অস্থির হইতে থাকিবে। মেহতার পক্ষে গৃহস্থের জগৎ এক অজ্ঞাত দেশ, সে দেশের রীতিনীতি সবই তাহার অজানা।

সংসারকে মেহ্‌তা বাহির হইতে দেখিয়াছিল, আর তাহা জাল জুয়াচুরিতে ভরা বলিয়া মনে করিত। যেদিকেই তাকাইত, নজরে পড়িত সব কিছু মন্দ; কিন্তু যখন সমাজের গভীর স্তরে গিয়া দেখিল, তখন সে বুঝিতে পারিল যে এ সকল মন্দের পিছনে আছে ত্যাগ, আছে প্রেম, আছে ধৈর্য ও সাহস; ইহাও দেখিল সে ঐ সব ঐশ্বর্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু তাহারা দুর্লভ বস্তু; আর এই শঙ্কা ও সন্দেহের মধ্যে যখন সে দেখিতে পাইল মালতী এক দেবীর মত অন্ধকার হইতে আলোতে বাহির হইতেছে, তখন অস্থির হইয়া সমস্ত ধৈর্য হারাইয়া সে তাহার

দিকে ভাঙ্গিয়া পড়িল, এমন যত্ন করিয়া মালতীকে লুকাইয়া রাখিতে চাহিল যাহাতে অন্য কাহারও চোখে না পড়িতে পায়। এই মোহই যে বিনাশের কারণ, সে জ্ঞান আর রহিল না। প্রেমের মত নির্মম বস্তু কি ভয়ে চাপিয়া রাখা যায়? প্রেম তো চায় পূর্ণ বিশ্বাস, পূর্ণ স্বাধীনতা, পূর্ণ দায়িত্ব। পল্লবিত হইবার শক্তি তাহার নিজের মধ্যে, তবে আলো ও উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া চাই। উহা তো দেওয়ালের মত নয়, যে উপর হইতে ইট বসাইয়া যাওয়া চলে; উহার মধ্যে যে প্রাণ আছে, ছড়াইয়া পড়িবার অসীম শক্তি আছে।

যে দিন হইতে মেহতা এই বাংলোয় আসিয়াছে, সেই দিন হইতে মালতীর সঙ্গে তাহার দিনে কয়েকবার করিয়া দেখা হওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে। তাহার বন্ধুরা মনে করে, এ তাহার বিবাহের প্রস্তুতি, শুধু বিবাহ হওয়ার বাকি, অনুষ্ঠানের আয়োজন করার অপেক্ষা। মেহতাও এই স্বপ্ন দেখিতেছিল। মালতী যদি চিরকালের জন্য তাহাকে পায়েই ঠেলিবে, তাহা হইলে তাহার জন্য এত ভালবাসা কেন? হয়তো সে মেহতাকে ভাবিবার সুযোগ দিয়াছে। মেহতা ভাবিয়া চিন্তিয়া এই সঙ্কল্পে আসিয়া পৌছিয়াছে যে মালতী বিনা সে অন্ধ, মালতীই তাহাকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতে পারে। বাহিরে মালতী বিলাসপ্রিয়; ভিতর হইতে দেখিলে কিন্তু সেই মনোভাবই শক্তির কেন্দ্র; তথাপি অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। তখন মালতী ছিল পিপাসিত; এখন মেহতা পিপাসায় কাতর। একবার জবাব পাইয়া যাওয়ার পর মালতীকে ও বিষয়ে কিছু বলার আর তাহার সাহস হয় না, যদিও তাহার মনে এখন আর সন্দেহের লেশ ছিল না। মালতীকে কাছাকাছি দেখিয়া তাহার প্রতি মেহতার আকর্ষণ বাড়িয়াই চলিল। পুস্তকের যে অক্ষর দূর হইতে অস্পষ্ট বলিয়া মনে হইতেছিল, কাছে আসিলে তাহাই হইয়া গেল স্পষ্ট, দেখা গেল তাহার মধ্যে অর্থ আছে, তাহার বক্তব্য কিছু আছে।

এদিকে মালতী তাহার বাগানের জন্য গোবরকে মালী রাখিয়াছিল। একদিন সে রোগী দেখিয়া ফিরিতেছিল, এমন সময় পথে পেট্রোল ফুরাইয়া গেল। সে নিজেই গাড়ী চালাইতেছিল; খোঁজ করিল, পেট্রোল কোথায় পাওয়া যাইবে। রাত নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল, মাঘের শীত। রাস্তার উপর সব চুপ চাপ। এমন কোনও লোক নজরে আসে না যে গাড়ীটা ঠেলিয়া পেট্রোলের দোকান পর্যন্ত লইয়া যায়। বারবার চাকরের উপর রাগ হইতেছিল। নিমকহারাম কোথাকার! কোনও খেয়াল নাই!

কর্মসূত্রে গোবর অন্য দিক হইতে সেখানে আসিয়া পড়িল। মালতীকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সে অবস্থা বুঝিয়া লইল, ও গাড়ীটা দুই ফারলং ঠেলিয়া পেট্রোলের দোকান পর্যন্ত লইয়া আসিল।

মালতী খুসি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—চাকরি করবে ?

গোবর আগ্রহের সঙ্গে রাজি হইল। পনের টাকা বেতন ঠিক হইল। মালীর কাজ তাহার পছন্দ; একাজ সে করিয়াছে, তাহাতে আনন্দও পাইয়াছে। কলের মজুরিতে টাকা বেশি, কিন্তু সে কাজে গোলমাল আছে।

পরের দিন গোবর মালতীর বাড়ি কাজ করিতে শুরু করিল। তাহার থাকিবার জন্য একটা কুঠরিও পাওয়া গেল। ঝুনিয়াও আসিল। মালতী যখন বাগানে আসে, দেখে, ঝুনিয়ার ছেলে ধূলামাটিতে খেলিতেছে। একদিন মালতী তাহার হাতে একটা মিঠাই দিল। সেই হইতে শিশু মালতীকে চিনিল; তাহাকে দেখিলেই পিছু পিছু যায়, মিঠাই না পাওয়া পর্যন্ত সঙ্গ ছাড়ে না।

একদিন মালতী বাগানে আসিয়া শিশুকে দেখিতে পাইল না। ঝুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বাচ্চার জ্বর হইয়াছে।

মালতী ঘাবড়াইয়া গেল, বলিল, জ্বর এসেছে! তা আমার কাছে আনিস নাই কেন, চল গিয়ে দেখি।

বালক খাটিয়ার উপর শুইয়া, জ্বরে অচৈতন্য। খাপড়ার ঘর এত সঁ্যাৎসেতে, এত অন্ধকার, আর সেখানে ঠাণ্ডার সময়েও এত মশা যে মালতী এক মিনিটও সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না; তাড়াতাড়ি আসিয়া থার্মোমিটার লইল, ফিরিয়া গিয়া দেখে—দেহের তাপ এক শ চার ডিগ্রি! মালতীর ভয় হইল, বসন্ত নয় তো! বাচ্চাকে এখনও টীকা দেওয়া হয় নাই। যদি এই সঁ্যাৎসেতে কুঠরিতে থাকে, তাহা হইলে জ্বর আরও বাড়িবার ভয়ও রহিল।

সহসা বালক চোখ মেলিয়া দেখিল, মালতী দাঁড়াইয়া; বালক করুণ নয়নে তাহার দিকে চাহিল, আর তাহার কোলে যাইবার জন্য হাত বাড়াইল। মালতী তাহাকে কোলে উঠাইয়া আস্তে আস্তে চাপড়াইতে লাগিল।

মালতীর কোলে আসিয়া বালক যেন খুব আরাম পাইল। নিজের উত্তপ্ত আঙুল দিয়া তাহার গলার মতির মালা ধরিয়া টানিতে লাগিল। মালতী নেকলেস বাহির করিয়া তাহার গলায় দিল। বালকের স্বার্থবুদ্ধি এই অবস্থাতেও সজাগ ছিল। নেকলেস পাইয়াছে এখন আর মালতীর কোলে থাকিবার

তেমন কিছু প্রয়োজন রহিল না। যদি উহা কাড়িয়া লয়! ঝুনিয়ার কোল এখন বেশি নিরাপদ।

মালতী খুসি মনে বলিল—ভারি চালাক ছেলে! জিনিস নিয়ে কেমন পালাচ্ছে!

ঝুনিয়া বলিল—দিয়ে দে বাবা, মেমসাহেবের জিনিস।

বালক দুই হাতে হারটা ধরিয়া মার দিকে রোষভরে তাকাইল। মালতী বলিল—তুমি পরে থাক বাবা, আমি পালাচ্ছি না।

তখনই বাংলোতে আসিয়া সে নিজের বসিবার ঘর খালি করিয়া ঝুনিয়াকে সেই নূতন ঘরে আনাইল।

বালক সে স্বর্গভূমি কৌতূহল ভরা চক্ষে দেখিয়া লইল। ছাদে পাখা ঘুরিতেছে, রঙীন বাল্‌ব, দেওয়ালে ছবি: অনেকক্ষণ ধরিয়া সমস্ত জিনিস এক একটা করিয়া দেখিতে থাকিল। মালতী খুব আদর করিয়া ডাকিল—মঙ্গল!

মঙ্গল একটু হাসিয়া তাহার দিকে তাকাইল; যেন বলিতেছে—আজ তো হাসতে পারছি না, মেমসাহেব! আপনি যদি কিছু পারেন তো করুন।

মালতী ঝুনিয়াকে অনেক কিছু পরামর্শ দিল, আর যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল—তোর বাড়িতে আর কোনও মেয়ে থাকে তো গোবরকে বলে দে। দু চার দিনের জন্য নিয়ে আসুক। আমার ভয় হচ্ছে, বসন্ত হয়েছে। কত দূরে তোদের বাড়ি?

ঝুনিয়া নিজের গাঁয়ের নাম ঠিকানা বলিল। আঠার বিশ ক্রোশ আন্দাজ হইবে।

মালতীর বেলারীর কথা মনে ছিল। বলিল—ঐ গাঁ তো নয়, যার আধ মাইল পশ্চিমেই নদী?

হাঁ হাঁ, মেমসাহেব, ঐ গাঁই বটে। আপনি কি করে জানলেন?

একবার আমরা ও গাঁয়ে গিয়েছিলাম। হরির বাড়িতে ছিলাম। তুই হরিকে চিনিস?

ও তো আমার শ্বশুর, মেমসাহেব। আমার শাশুড়িকেও দেখে থাকবেন?

হাঁ, হাঁ, খুব বুদ্ধিমতী মনে হয়েছিল। আমার সঙ্গে অনেক গল্প করেছিল। তুই গোবরকে পাঠিয়ে দে, মাকে নিয়ে আসুক।

ও মাকে আনতে যাবে না।

কেন?

আছে একটা কারণ।

ঝুনিয়াকে নিজের সংসারের বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না-বান্না, সব কিছুই করিতে হইত। দিনের বেলা দুজনে ছোলামুড়ি দাঁতে কাটিয়া চালাইত। রাত্রে মালতী আসিলে ঝুনিয়া নিজের রান্না করিয়া লইত, আর মালতী গিয়া বসিত শিশুর কাছে। ঝুনিয়া বার বার চাহিত যে শিশুর কাছে গিয়া বসে, কিন্তু মালতী তাহাকে আসিতে দিত না। রাত্রে শিশুর জ্বর বাড়িত; সে অচৈতন্য হইয়া দুই হাত উপরে ছুঁড়িত। মালতী তাহাকে কোলে লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরে পাইচারি করিত। চার দিনের দিন শিশুর গায়ে গুটি বাহির হইল। মালতী বাড়ির সকলকে টীকা দিল, নিজে টীকা লইল। মেহতাকেও দিল। গোবর, ঝুনিয়া, মহারাজ, কেহই বাদ গেল না। প্রথম দিন গুটি ছোট ছিল, আর ফাঁক ফাঁকও ছিল। মনে হইল, বুঝি জল বসন্ত। পরের দিন গুটি যেন ফুলিয়া আঙুরের দানার মত হইল, আর কয়েকটা দানা মিলিয়া বড় বড় আমলকির মত হইল। মঙ্গল জ্বালা পোড়া চুলকানি ও ব্যথায় অজ্ঞান হইয়া করুণ স্বরে কাতরাইত, আর দীন অসহায় নেত্রে মালতীর দিকে তাকাইয়া থাকিত। তাহার কাতরানি ছিল বয়স্ক লোকদের মত, দৃষ্টিতেও ছিল বয়স্কের ভাব, যেন সে হঠাৎ বড় হইয়া গিয়াছে। এই অসহ্য ব্যথায় তাহার অবোধ শৈশব যেন ফুরাইয়া গেল; তাহার শিশুবুদ্ধি যেন জাগিয়া উঠিল, বুঝিল যে মালতীর যত্নেই সে সুস্থ হইয়া উঠিতে পারে। মালতী যেই কোনও কাজে উঠিয়া যায়, অমনই সে কাঁদিতে থাকে। মালতী আসিতেই আবার চুপ করে। রাত্রে তাহার আচ্ছন্ন ভাব বাড়ে, আর মালতীকে প্রায় সারারাত বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু মালতী কখনও বিরক্ত হয় না, কখনও রাগ করে না। হাঁ, ঝুনিয়ার উপর তাহার কখনও কখনও অবশ্য রাগ হয়, কারণ সে জানে না বলিয়া যাহা করার নয় তাহাই করিয়া বসে। গোবর আর ঝুনিয়া দুইজনেরই ঝাড়ফুঁকে বেশি বিশ্বাস; এখানে তাহার কোনও সুযোগ নাই। তাহার উপর ঝুনিয়া দুই ছেলের মা হইয়াও ছেলে মানুষ করিতে জানিত না, মঙ্গল বিরক্ত করিলে তাহাকে জোরে ধমক দিত। একটু ফাঁক পাইলেই মাটিতে শুইয়া পড়িত, আর সকাল না হইলে উঠিত না; গোবর তো ঐ ঘরে ঢুকিতে যেন ভয় পাইত। মালতী ওখানে বসিয়া, কি করিয়া যায়?

সে ঝুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া শিশুর অবস্থা জানিয়া লইত, আর খাইয়া দাইয়া শুইয়া পড়িত। সেই আঘাতের পর সে আর পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায় নাই। সামান্য কিছু কাজ করিলেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। যত দিন ঝুনিয়া ঘাস বেচিত আর সে নিজে আরামে পড়িয়া থাকিত, তত দিন সে কিছুটা সারিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর এদিকে কয়েক মাস বোঝা বহিয়া আর রাজমিস্ত্রির জোগান দিয়া তাহার শরীর খারাপ হইয়াছিল। তাহার উপর আবার এখানে কাজ বেশি। সমস্ত বাগানে জল দেওয়া, কেয়ারি লাগানো, ঘাস ছোলা, গোরুদের সানি জল খাওয়ানো ও দোহানো। আর যে মালিক এতটা দয়ালু, তাঁহার কাজে কি করিয়া ফাঁকি দেয়! এই কৃতজ্ঞতা বোধ তাহাকে এক মুহূর্তও আরামে বসিয়া থাকিতে দেয় না; মেহতা যখন নিজেই খুরপি লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাগিচায় কাজ করে, তখন সে আরাম করিবে কি করিয়া! সে নিজে শুকাইয়া যাইতেছিল, কিন্তু বাগান হইতেছিল সবুজ।

মেহতারও বালকের উপর মায়া পড়িয়াছিল। এক দিন মালতী শিশুকে কোলে লইয়া মেহতার গোঁফ উপড়াইয়া দিয়াছিল। দুষ্ট ছেলে এমন জোরে ধরিয়াছিল যে দুই এক গাছা সমূলে উপড়াইয়া আসে। মেহতার চোখে জল আসিল।

মেহতা রাগিয়া বলিল—বড় শয়তান ছেলে!

মালতী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—তুমি গোঁফ কামিয়ে ফেল না কেন?

আমার গোঁফ যে আমার প্রাণ থেকে প্রিয়।

ও আবার ধরলে টেনে উপড়ে তবে ছাড়বে।

তাহলে আমিও ওর কান টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

তাহার গোঁফ ধরিয়া টানিতে মঙ্গলের ভারি মজা লাগিত। সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিত, আর আরও জোরে টানিত। মেহতারও বুঝি কৌতুক বোধ হইত; কারণ সে প্রায় প্রত্যহ দুই একবার তাহাকে দিয়া গোঁফ টানাইয়া লইত।

যখন মঙ্গলের বসন্তের গুটি উঠিল, মেহতারও তখন খুব ভাবনা হইল; সর্বদা ঘরে গিয়া শিশুকে দেখিয়া আসিত, দেখিয়া তাহার কষ্ট হইত। শিশুর কষ্টের কথা মনে করিয়া তাহার কোমল প্রাণ আন্দোলিত হইত। মেহতা দৌড় ধাপ করিলে শিশু যদি ভাল হইয়া যাইত, তবে সে পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত পর্যন্ত

দৌড়াইত; টাকা খরচ করিলে যদি ভাল হইত, তবে ভিক্ষা করিয়া পর্যন্ত তাহাকে আরোগ্য করিত। কিন্তু এ ব্যাপারে তো কাহারও হাত নাই। শিশুকে ছুঁইতেও তাহার হাত কাঁপিত, পাছে বড় গুটিগুলি ছিঁড়িয়া যায়। মালতী কেমন কোমল হাতে তাহাকে উঠায়, কাঁধে ফেলিয়া ঘরে পাইচারি করে, কেমন আদর করিয়া ভুলাইয়া তাহাকে দুধ খাওয়ায়, এই বাৎসল্য তাহার দৃষ্টিতে মালতীকে না জানি কত উঁচুতে উঠাইয়া দিল! মালতী শুধু রমণী নয়, মাতাও বটে। আর যেমন তেমন মাতা নয়, প্রকৃতই দেবী, মাতা ও জীবনদায়িনী, পরের ছেলেকেও নিজের বলিয়া মনে করিতে পারে; মাতৃত্ব যেন তাহার মধ্যে সঞ্চিত ছিল, আজ দুই হাতে তাহা বিলাইতেছে। তাহার প্রতি অঙ্গ হইতে মাতৃস্নেহ ঝরিয়া পড়িতেছিল, উহাই যেন তাহার যথার্থ রূপ। বাহিরের হাব ভাব, সৌখীন বেশভূষা, তাহার মাতৃত্বের উপরের আবরণ মাত্র, তাহার অন্তরের বিভূতিকে তাহা সযত্নে ঢাকিয়া রক্ষা করিত।

রাত্রি একটা বাজিল। মঙ্গলের কান্না শুনিয়া মেহতা চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, বেচারা মালতী অর্ধেক রাত পর্যন্ত তো জাগিয়াছে; এখন আবার উঠিতে তাহার কত কষ্ট হইবে; ঘরের দরজা খোলা থাকিলে মেহতা নিজেই গিয়া শিশুকে শান্ত করিবে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে ঘরের দরজা পর্যন্ত আসিল, ও কাচের ভিতর দিয়া ঘরের মধ্যটা দেখিয়া লইল। মালতী শিশুকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে, শিশু আপন মনে কাঁদিতেছে—হয়তো কিছু স্বপ্ন দেখিয়াছে, নয়তো কোনও কারণে ভয় পাইয়াছে। মালতী তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেছে, থাবড়াইতেছে, ছবি দেখাইতেছে, কোলে লইয়া 'দোলা' দিতেছে কিন্তু শিশুর চুপ করিবার নাম নাই। মালতীর এই পরিপূর্ণ বাৎসল্য, এই অদম্য মাতৃভাব দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল, ইচ্ছা করিল যে ভিতরে গিয়া মালতীর চরণে হৃদয় ঢালিয়া দেয়। মনের অন্তস্তল হইতে ভিড় করিয়া কতকগুলি অনুরাগমাখা সম্বোধন যেন উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, প্রিয়ে, আমার স্বর্গের দেবি, আমার রানী, আমার ডার্লিং······

সেই প্রেমোন্মাদনায় সে ডাকিয়া উঠিল—মালতী, দরজাটা একটু খুলে দাও না।

মালতী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল, আর জিজ্ঞাসু চক্ষে তাহার দিকে তাকাইল।

মেহতা জিজ্ঞাসা করিল—ঝুনিয়া কি ওঠে নাই ? ও তো বড় কাঁদছে।

মালতী সমবেদনাপূর্ণ স্বরে কহিল, আজ আট দিনের দিন ; অসুখ হয়তো গাড়বে, তাই।

তাহলে দাও, আমি কিছুক্ষণ নিয়ে ঘুরে বেড়াই, তুমি ক্লান্ত হয়ে থাকবে।

মালতী মুচকি হাসিয়া বলিল—তোমার একটুতেই রাগ হয়ে যাবে।

কথা সত্য ; কিন্তু নিজের দুর্বলতার কথা স্বীকার করে কে ? মেহতা জিদ করিয়া বলিল—তুমি আমাকে এত হালকা মনে করেছ ?

মালতী শিশুকে তাহার কোলে দিল। তাহার কোলে যাইতেই সে একদম চুপ করিল। বালকের যে এক অন্তর্জ্ঞান আছে, তাহা তাহাকে বলিয়া দিল, এখন কাঁদিয়া তোমার কোনও লাভ নাই। এ নতুন লোকটি স্ত্রী নয়, পুরুষ, আর পুরুষেরা রাগী, কঠিনও বটে ; চারপাইয়ের উপর তাহাকে বাহিরে অন্ধকারে শোয়াইয়া দূরে চলিয়া যাইতে পারে, কাহাকে কাছেও আসিতে দিবে না।

মেহতা বিজয়গর্বে বলিল—দেখেছ, কেমন চুপ করিয়েছি।

মালতী ঠাট্টা করিয়া বলিল—হাঁ, এ বিদ্যায় তুমি পণ্ডিত। কোথায় শিখলে ?

তোমার কাছ থেকে।

আমি স্ত্রীলোক, আমার ওপর বিশ্বাস করা যায় না।

মেহতা লজ্জিত হইয়া বলিল—মালতী, তোমাকে জোড় হাতে বলছি, আমার ঐ কথা ভুলে যাও। এই কয় মাসে আমি কতদূর পসতাচ্ছি, কতখানি লজ্জিত আছি, কতখানি দুঃখ পেয়েছি, তুমি হয়তো তা আন্দাজ করতে পারবে না।

মালতী সরল ভাবে বলিল—সত্যি বলছি, আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম।

কি করে বিশ্বাস করি ?

তার প্রমাণ এই যে আমরা দুজন একই ঘরে থাকি, এক সঙ্গে খাই, হাসি, কথা বলি।

আমাকে কি কিছু চাইবার অনুমতি দেবে না ?

মেহতা মঙ্গলকে খাটের উপর শোয়াইয়া দিল, শিশু চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। মেহতা মালতীর দিকে প্রার্থীর চক্ষে চাহিয়া রহিল, যেন তাহার অনুমতির উপর সমস্ত কিছু নির্ভর করিতেছে।

মালতী আর্দ্র হইয়া বলিল—তুমি জান, সংসারে তোমার চেয়ে নিকট আমার কেউ নাই। আমি অনেক দিন হল নিজেকে তোমার চরণে সমর্পণ করে দিয়েছি,

তুমি আমার পথপ্রদর্শক, আমার দেবতা, আমার গুরু। আমার কাছে তোমার কিছু চাইবার দরকার নাই, শুধু ইসারা করবার অপেক্ষা। যখন তোমাকে দেখি নাই আর তোমাকে চিনিও নাই, তখন ভোগ ও স্বার্থসেবাই ছিল আমার জীবনের ইষ্ট; তুমি এসে সে জীবনকে প্রেরণা দিলে, স্থিরতা দিলে। আমি তোমার ঋণ কখনও ভুলতে পারি না। জীবন পথে চলতে চলতে আমি তোমার কথাই সম্বল করেছি। দুঃখ এই যে তুমিও আমাকে অন্য দশ জনেরই মতই মনে করে! তোমার কাছ থেকে আমি এটা আশা করি নি। এর জন্য আমিই দায়ী, সে কথা জানি; কিন্তু তোমার অমূল্য প্রেম পেয়েও আমার বদল হবে না এটা মনে করে আমার প্রতি অন্যায় করেছ। আমি এখন কতটা গর্ব অনুভব করছি, সে কথা তুমি বুঝতে পার না। তোমার প্রেম ও বিশ্বাস পেয়ে এখন আমার আর কিছুর অভাব রইল না। এই দান আমার জীবনকে সার্থক করার পক্ষে যথেষ্ট। এতেই আমার পূর্ণতা।

ইহা বলিতে বলিতে মালতীর মন অনুরাগে এমন ভরিয়া গেল যে মেহতার বুকে সে যেন না লীন হইয়া যায়। মনের ভিতরের যত আশা আকাক্ষা সব বাহিরে আসিয়া যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। তাহার প্রত্যেকটি রোম পুলকিত হইয়া উঠিল। যে আনন্দকে সে দুর্লভ মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এতই সুলভ, এতই নিকটে? হৃদয়ের সে আহ্লাদ মুখের উপর ফুটিয়া তাহাকে এমন সুন্দর দেখাইল যে মেহতার চক্ষে তাহা দেবত্বের আভা বলিয়া মনে হইল। এ কি নারী, না কল্যাণের, পবিত্রতার, ত্যাগের প্রতিমা!

ঠিক তখনই ঝুনিয়া জাগিয়া উঠিল, এবং মেহতা নিজের ঘরে চলিয়া গেল; দুই সপ্তাহ পর্যন্ত মালতীর সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলিবার তাহার অবসর মিলিল না। মালতী কখনও তাহার সঙ্গে নিভৃতে দেখা করিত না। মালতীর সে কথাগুলি তাহার হৃদয়ে গুঞ্জন করিত; তাহার মধ্যে কতখানি সান্ত্বনা ছিল, কতখানি বিনয়, কতখানি মোহ!

দুই সপ্তাহে মঙ্গল ভাল হইয়া গেল। সত্য বটে, মুখের উপর বসন্তের দাগ গেল না। সেদিন মালতী আশপাশের ছেলেদের ভরপেট মিঠাই খাওয়াইল, আর যে সমস্ত মানত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও পালন করিল। এই ত্যাগের জীবনে কত আনন্দ, তাহা এখন তাহার অনুভব হইতেছিল। ঝুনিয়া ও গোবরের আনন্দ যেন তাহার ভিতর প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। অন্যের কষ্ট নিবারণে

তাহার যতখানি উল্লাস ও সুখ বোধ হইতেছিল, ভোগবিলাসের জীবনে কখনও তেমন হয় নাই। ভোগলালসা এখন সেই সমস্ত ফুলের মত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল যাহাদের ফল ধরিয়াছে। এখন সে সেই শ্রেণী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, যেখানে মানুষ স্থূল আনন্দকে পরম সুখ মনে করে। সে আনন্দ এখন তাহার কাছে তুচ্ছ, অধঃপতনের কারণ, লঘুবৃত্তি, এমন কি বীভৎসের মত বোধ হয়। বড় বাংলোয় থাকার কী আনন্দ, যদি তাহার আশে পাশে মাটির ঝুপড়িগুলি যেন বিলাপ করিতে থাকে! মোটরকারে চড়িয়া এখন তাহার গর্ব হয় না। মঙ্গলের মত অবোধ বালক তাহার জীবনে কত খানি আলো ঢালিয়া দিয়াছে, প্রকৃত সুখের দরজাই যেন তাহার সামনে খুলিয়া দিয়াছে।

এক দিন মেহতার খুব মাথা ধরিল। সে চোখ বন্ধ করিয়া চারপাইয়ের উপর পড়িয়া ছটফট করিতেছিল, এমন সময় মালতী আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কখন থেকে ধরেছে?

মেহতার মনে হইল, ঐ দুটি কোমল হাত যেন সমস্ত ব্যথা টানিয়া লইল। সে উঠিয়া বলিল—ধরেছে তো দুপুর বেলা থেকে, আর এমন ব্যথা এ পর্যন্ত কোনও দিন আমার হয় নাই; কিন্তু তোমায় কাছে পেয়ে মাথা এত হালকা হয়ে গেল যে মনে হচ্ছে ব্যথা তো হয়ই নাই; তোমার হাতের এ গুণ।

মালতী তাহাকে একটা কি ঔষধ আনিয়া খাইতে দিল, আর নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া থাকিতে অনুনয় করিয়া শীঘ্র ঘর হইতে চলিয়া যাইতে চাহিল।

মেহতা আগ্রহ করিয়া বলিল—দু মিনিটও বসবে না?

মালতী দরজা হইতে ফিরিয়া বলিল—এখন কথা বললে আবার মাথাব্যথা শুরু হবে। আরাম করে শুয়ে থাক। আজকাল তোমাকে হামেশা কিছু না কিছু পড়তে বা লিখতে দেখি। দু চার দিন লেখাপড়া ছেড়ে দাও।

তুমি এক মিনিটও বসবে না?

আমায় এক রোগী দেখতে যেতে হবে।

ভাল, যাও।

মেহতার মুখের উপর এমন একটা উদাস ভাবের ছায়া আসিয়া পড়িল যে মালতীর আর যাওয়া হইল না, সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—আচ্ছা বল, কি বলছ।

মেহ্‌তা বিমনা হইয়া বলিল, এমন কিছু নয়। এই বলছিলাম যে এত রাত্তির হয়েছে, রোগী দেখতে যাবে কোথায় ?

ঐ যে, রায়সাহেবের মেয়ে ! ওর অবস্থা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এখন কিছু সামলে নিয়েছে।

সে চলিয়া যাইতেই মেহতা আবার শুইয়া পড়িল। কিছু বুঝিতে পারিল না যে মালতী কপালে হাত দিলে ব্যথা অমনই চলিয়া গেল কি করিয়া। তাহার নিশ্চয়ই কোনও 'সিদ্ধাই' আছে, যাহা কি না তাহার তপস্যার, তাহার সেবারই পুরস্কার। মালতী নারীত্বের সেই উচ্চ আদর্শে পৌছিয়াছে যেখানে সে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত চোখে পড়ে। এখন সে আর প্রেমের বস্তু নয়, শ্রদ্ধার বস্তু। এখন সে দুর্লভ হইয়া গিয়াছে, আর দুর্লভতাই পুরুষসিংহের শক্তিকে জাগাইয়া তোলে। মেহতা প্রেমের মধ্যে যে সুখ কল্পনা করিয়াছিল, শ্রদ্ধা তাহাকে আরও গভীর, আরও আনন্দময় করিয়া দিয়াছে। প্রেমে আছে কিছু অভিমান, কিছু মমত্ব। শ্রদ্ধা তো নিজেকে বিলোপ করিয়া দেয়, আত্মলোপকেই ইষ্ট করিয়া নেয়। প্রেম অধিকার করিতে চায়, যাহা কিছু দেয় তাহার বদলে চায়ও কিছু। শ্রদ্ধার পরম আনন্দ নিজেকে সমর্পণ করায়, যাহাতে অহমিকা লুপ্ত হইয়া যায়।

মেহতার সেই প্রকাণ্ড গ্রন্থ এতদিনে শেষ হইয়া গিয়াছিল, যাহা সে তিন বৎসর ধরিয়া লিখিয়াছিল, আর যাহাতে সে সংসারের সকল দর্শনতত্ত্বের সমন্বয় করিয়াছিল। এই গ্রন্থ সে মালতীকে সমর্পণ করিয়াছিল, আর যেদিন তাহা ইংলণ্ড হইতে ছাপা হইয়া আসিল, আর এক খণ্ড মালতীকে সে উপহার দিল, সেদিন মালতী তাহা নিজের নামে সমর্পিত দেখিয়া বিস্মিতও হইল, দুঃখিতও হইল।

সে বলিল—এ তুমি করেছ কি ? আমি তো নিজেকে এর উপযুক্ত বলে মনে করি না।

মেহতা গর্ব করিয়া বলিল—কিন্তু আমি তো মনে করি। এ তো একটা কিছু জিনিসই নয়। যদি আমার এক শ প্রাণ থাকত, তাহলে আমি তা তোমার পায়ে উপহার দিতাম।

আমার কাছে ! স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া যে আর কিছু জানেই না !

তোমার ত্যাগের এক টুকরাও যদি আমি পেতাম তো নিজকে ধন্য মনে করতাম ; তুমি দেবী।

পাথরের, এটুকু আর বলছ না কেন?

ত্যাগের, মঙ্গলের, পবিত্রতার।

তাহলে আমাকে খুব চিনেছ! আমি আর ত্যাগ! তোমাকে সত্যি বলছি, সেবা কি ত্যাগের ভাব কখনও আমার মনে আসে না। যা কিছু করি, প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ স্বার্থের জন্যই করি। ত্যাগ করি যেমন গানের দ্বারা দুঃখী জনকে সান্ত্বনা দিই বলে গান করি না, ; কিন্তু শুধু এই জন্য যে তাতে আমার মন প্রসন্ন হয়। এইভাব থেকে গরিবকে ওষুধ-পত্রও দিয়ে থাকি; শুধু নিজের মনকে প্রসন্ন করবার জন্য। হয়তো মনের অহংকার এতে তৃপ্তি পায়। তুমি আমায় অনর্থক দেবী তৈরি করছ। এখনও তো এতখানি গলতি রয়ে গেছে, তবু ধূপদীপ দিয়ে আমার পূজা কর।

মেহতা কাতর স্বরে বলিল—সে তো আমি বছরের পর বছর করে আসছি মালতী, আর যতদিন বর না পাব ততদিন করতেই থাকব।

মালতী টিপ্পনী করিল—বর পাবার পর হয়তো দেবীকে মন্দির থেকে ফেলে দেবে।

মেহতা বলিল—তখন তো আমার পৃথক সত্তাই থাকবে না; উপাসক উপাস্যে লয় হয়ে যাবে।

মালতী গম্ভীর হইয়া বলিল—না মেহতা, আমি মাসের পর মাস এই প্রশ্ন নিয়ে বিচার করে আসছি, শেষটায় এই ঠিক করেছি যে বন্ধুভাবে বাস করা স্বামীস্ত্রী বন্ধনের চেয়ে সুখের। আমার জন্য তোমার প্রেম, আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমি বিশ্বাস করি আজ প্রয়োজন হলে তুমি প্রাণ দিয়েও আমায় রক্ষা করবে। তোমার মধ্যে আমার গুরুকে শুধু নয়, নিজের রক্ষককেও পেয়েছি। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার উপর বিশ্বাস রাখি, আর এমন কোনও ত্যাগ স্বীকার নাই, যা না কি তোমার জন্য না করতে পারি। ঈশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, আজীবন আমাকে এই আদর্শে দৃঢ় রাখেন। আমাদের পূর্ণতার জন্য, আমাদের বিকাশের জন্য, আর কি চাই? নিজেদের ছোট্ট সংসার রচনা করে, নিজেদের আত্মাকে ছোট্ট পিঁজরের মধ্যে বদ্ধ করে, নিজেদের সুখদুঃখের মধ্যে ডুবে থেকে, আমরা কি অসীমের কাছে পৌঁছুতে পারব? এ করলে তো আমাদের জীবনের পথে বাধাই জন্মাবে। এমন প্রাণীও কচিৎ দেখা যায় বটে যে পায়ে বেড়ি লাগিয়েও বিকাশের পথে চলতে পারে, আর চলেও।

এও জানি যে পূর্ণতার জন্য সংসারের প্রেম, ত্যাগ ও বলিদানের মহত্ত্ব খুব বেশি। কিন্তু আমি নিজের আত্মাকে অতখানি শক্ত মনে করি না। যত ক্ষণ মমত্ব নাই, আপনা-আপনি ভাব নাই, তত ক্ষণ জীবনের মোহ নাই, স্বার্থের জোর নাই। যেদিন মন মোহে আসক্ত হবে ও আমি বন্ধনদশায় পড়ব, সেইদিন আমার মানবতার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে যাবে, নব নব দায়িত্ব এসে পড়বে, আর আমার সমস্ত শক্তি তা পূরণ করতে চলে যাবে। তোমার মত বিচারশীল প্রতিভাশালীর আত্মাকে আমি এই কারাগারে বন্ধ করতে চাই না। এখনও তোমার জীবন একটা যজ্ঞ, স্বার্থের জায়গা সেখানে অল্পই; আমি তাকে নীচের দিকে নিয়ে যাব না। সংসারে তোমার মত সাধকের প্রয়োজন আছে, যারা মমত্ববোধকে এতখানি ছড়িয়ে দেবে যে সমস্ত সংসার তাদের আপনার হয়ে যাবে। সংসারে অন্যায়ের, আতঙ্কের, ভয়ের আর্তস্বর ধ্বনিত হচ্ছে; অন্ধবিশ্বাসের, কপট-ধর্মের, স্বার্থের প্রকোপ ছেয়ে আছে; তোমার কানে তার আর্তস্বর এসে পৌঁছেছে। তুমিও যদি না শোন, তা হলে শুনবার লোক আর কে আসবে? অন্য লোকদের মত তুমিও তাদের প্রতি বিমুখ হয়ে কান বন্ধ করে থাকতে পারবে না। তোমার কাছে সে জীবন ভার লাগবে। নিজের বিদ্যাবুদ্ধিকে, নিজের জাগ্রত মানবতাকে, আরও উৎসাহ ও জোরের সঙ্গে উদার পথে নিয়ে যাও। আমিও চলব তোমার পিছনে পিছনে। নিজের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনও সার্থক করে তোলো। তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ। তোমার মন যদি সাংসারসুখের লোভ করে, তাহলেও আমি আমার সাধ্যমত তোমাকে সে দিক থেকে সরিয়ে দেব, ঈশ্বর করুন যে এ ব্যাপারে আমার চেষ্টা ব্যর্থ না হয়; কিন্তু তখন আমি দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলে তোমার সঙ্গ ছেড়ে দেব, আর বলতে পারবে না আমার পরিণাম কি হবে, কোন ঘাটে গিয়ে লাগব; কিন্তু সে ঘাট যে ঘাটই হোক না, এই বন্ধনের ঘাট হবে না। বল, আমাকে কি হুকুম কর?

মেহতা মাথা নীচু করিয়া শুনিল। এক একটা শব্দ যেন তাহার ভিতরের চোখ এমনভাবে খুলিয়া দিতেছিল যাহা এ পর্যন্ত কখনও হয় নাই। সেই সব ভাবনা চিন্তা যাহা এ পর্যন্ত তাহার সামনে স্বপ্নের মত ভাসিয়া বেড়াইতে তাহা এখন জীবনে বাস্তব হইয়া উঠিয়াছিল। সে আপনার প্রতি রোমে আলো ও উৎকর্ষ অনুভব করিতেছিল। জীবনের মহৎ সংকল্পের সামনে আমাদের

শৈশব আমাদের চক্ষে আবার ফিরিয়া আসে। মেহতার চক্ষে মধুর বাল্যস্মৃতি সজীব হইয়া উঠিল, যখন সে নিজের বিধবা মায়ের কোলে বসিয়া মহৎ সুখ অনুভব করিতেছিল। কোথায় সেই মা, আসুন, দেখিয়া যান তাঁহার ছেলের এই সুকীর্তি। তাহাকে আশীর্বাদ করুন। তাঁহার সেই জেদি ছেলে আজ নূতন জন্ম লাভ করিয়াছে।

দুই হাতে মালতীর পা জড়াইয়া কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল—তোমার হুকুম স্বীকার, মালতি!

দুইজনে একাত্ম হইয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল। উভয়ের চক্ষে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল।

## ৩৪

সিলিয়ার ছেলে এখন দুই বৎসরের হইয়াছে, সারা গাঁ সে ছুটিয়া বেড়ায়। নিজের একটি বিচিত্র ভাষা ও আবিষ্কার করিয়াছে, আর সেই ভাষায় অনর্গল কথা বলিয়া যায়, কেহ বুঝুক আর নাই বুঝুক। উহার ভাষায় ট, ল, আর ধ, এদের বিচিত্র কসরত দেখা যায়, কিন্তু স, র ইত্যাদি বর্ণের অস্তিত্ব নাই। উহার ভাষায় রুটির নাম উটি, দুধ, তুত, শাক আর কড়িকে সে বলে তাল। সে পশুপাখীর স্বর এমন নকল করে যে, শুনিয়া হাসিতে হাসিতে লোকের পেটে খিল ধরিয়া যায়। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, রামু, বল তো কুকুর কেমন করে ডাকে, অমনি রামু গম্ভীর মুখে বলে, ভো, ভো, আর কামড়াইতে যায়। বেড়াল কেমন করে ডাকে, বলা মাত্র ও মেঁও, মেঁও করিয়া শব্দ করে, চোখ মিটিমিটি করিয়া তাকায়, আর নখের আঁচড় দিতে শুরু করে। বড় আমুদে ছেলে। যখনই দেখ, দেখিবে সে খেলায় মত্ত, না আছে খাওয়ার হুঁশ, না আর কিছু করিবার। কোলে থাকা উহার বড়ই অপছন্দ। উহার সব চাইতে আনন্দ দরজার কাছে নিমগাছের তলায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে; ও কখনও বা কাদামাটি গায়ে মাখে, কখনও বা মাটি দিয়া ঘর বানায়। সমবয়সীদের সঙ্গে উহার বনে না। ও বোধ হয় তাহাদের খেলার সাথী হইবার যোগ্য বলিয়াই মনে করে না।

কেহ বলে, তোমার নাম কি?

ও চটপট জবাব দেয়, লামু।

তোমার বাবার নাম কি ?

মাতাদীন।

আর তোমার মায়ের নাম ?

ছিলিয়া।

দাতাদীন তোমার কে হয় ?

ও আমাল ছালা।

কে জানে কবে কে দাতাদীনের সঙ্গে উহার এই সম্পর্কটি পাতাইয়া দিয়াছে।

রূপার সঙ্গে রামুর খুব ভাব। রূপা যেন ছোট একটা খেলনা পাইয়াছে। রামুর গায়ে রূপটান মাখায়, চোখে কাজল পরায়, স্নান করায়, চুল আঁচড়াইয়া দেয়, নিজের হাতে গ্রাস গ্রাস করিয়া ভাত খাওয়ায়, কোন দিন বা কোলে করিয়া ঘুম পাড়ায়। ধনিয়া রাগ করে, তুই সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে দিলি। রূপা কাহারও কথা শোনে না। কাপড়ের পুতুল উহাকে মা হইতে শিখাইয়াছিল, আজ সত্যিকার শিশু পাইয়া উহার মাতৃত্ববোধ আর পুতুলে সন্তুষ্ট থাকিতে চায় না।

বাড়ির পিছনের দিকে, আগে যেখানে কয় বছর ধরিয়া হরির ভাইয়েরা ছিল, হরির অনুমতি লইয়া সিলিয়া সেখানে খড়ের একখানা চালা তুলিয়াছে। হরির ঘরে তো আর চিরদিন থাকা যায় না।

প্রায় শ কয়েক টাকা খরচ করার পর কাশীর পণ্ডিতগণ আবার মাতাদীনকে ব্রাহ্মণ বানাইয়া দিল। সেদিন মস্ত যজ্ঞ হইল, মেলা ব্রাহ্মণপণ্ডিত খাওয়ান হইল, কত মন্ত্র, কত শ্লোক পড়া হইল। মাতাদীনকে পবিত্র গোবর আর গোমূত্র খাইতে হইল, গোবরে উহার মন পবিত্র হইবে, আর গোমূত্রে উহার আত্মার অশুচিতার কীটাণু পর্যন্ত মরিয়া যাইবে।

তবে এক হিসাবে এই প্রায়শ্চিত্ত উহাকে সত্যই পবিত্র করিয়া দিল। হোমের প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ডে উহার মানবতা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হোমের অগ্নিশিখার মাঝে ও সমাজের ধর্মস্তম্ভগুলিকে চিনিয়া লইল। সেই দিন হইতে ধর্মের নামে ও জ্বলিয়া উঠে। ও উপবীত খুলিয়া ফেলিল, আর ব্রাহ্মণপুরোহিতের অভিমান গঙ্গায় ডুবাইয়া দিল। এখন সে পাকা চাষী। সে আরও দেখিল যে, যদিও বিদ্বান পণ্ডিতেরা উহার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তবু সাধারণ

লোকে এখনও উহার হাতে জল খায় না; উহার কাছে পাঁজির খবর নয়, লগ্ন দিনক্ষণ জিজ্ঞাসা করে, পূজা পার্বণে ওকে দান দক্ষিণাও দেয়, কিন্তু তাহাদের বাসন ছুঁইতে দেয় না।

যেদিন সিলিয়ার ছেলে হইল, ও ভাং-এর মাত্রা ডবল করিয়া দিল, গর্বে উহার বুক যেন ফুলিয়া উঠিল। বার বার ও গোঁফে তা দিতে লাগিল। ছেলে কাহার মত হইবে? উহার মত কি? দেখে কি করিয়া? উহার মনের মধ্যে এ সব চিন্তা তোলপাড় করিতে লাগিল।

তিন দিনের দিন ধানের ক্ষেতে রূপার সঙ্গে দেখা। মাতাদীন জিজ্ঞাসা করিল, রূপা, তুই সিলিয়ার ছেলেকে দেখেছিস?

রূপা বলিল, কেন দেখব না? কেমন লাল টুকটুকে, সুন্দর, কি মোটা সোটা, বড় বড় চোখ, আর এক মাথা ঝাঁকড়া চুল; পিট পিট করে তাকায়।

বালক যেন মাতাদীনের বুক জুড়িয়া বসিল। চোখে উহার নেশার ঘোর। কিশোরী রূপাকে কত কথা না জিজ্ঞাসা করিল; তাহার প্রশ্নের তোড়ে সাহস করিয়া রূপা বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা চল, দূর থেকে তোমাকে দেখিয়ে দেব; বারান্দায়ই শুয়ে আছে। সিলিয়া বোন যে কেন হরদম কাঁদে, তা বুঝি না।

মাতাদীন মুখ ঘুরাইয়া লইল; উহার চোখে জল আসিল, ঠোঁট দুইটি কাঁপিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রিবেলায় সমস্ত গ্রাম যখন সুপ্তিমগ্ন, গাছের মাথায় মাথায় গভীর অন্ধকার, তখন মাতাদীন আসিয়া সিলিয়ার ঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া ছেলের কান্না শুনিল। উহার মনে হইল, সারা দুনিয়ার যত সংগীত, যত আনন্দ আর মাধুর্য, সব যেন মিশিয়া আছে এই শিশুর কান্নার মাঝে।

শিশুকে হরির ঘরে খাটিয়ার উপর শোয়াইয়া দিয়া সিলিয়া চলিয়া যায় ক্ষেতে মজুরি করিতে। কোন ছুতায় হরির ঘরে আসিয়া মাতাদীন আড়চোখে ছেলেকে দেখে, আর তাহার চোখ জুড়াইয়া যায়, প্রাণ শীতল হয়।

ধনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলে, লজ্জা কিসের, কোলে নাও না একবার! একবার আদর কর। কি কঠিন হৃদয় তোমার! ছেলে কিন্তু একেবারে দেখতে তোমার মত হয়েছে।

সিলিয়ার জন্য দুই একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া মাতাদীন চলিয়া আসে। বালকের সঙ্গে সঙ্গে উহার আত্মাও বিকশিত হইতেছে, জীবনে যেন একটা উদ্দেশ্য জাগিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যে আসিয়াছে সংযম, গাম্ভীর্য আর দায়িত্ববোধ।

একদিন রামু খাটে শুইয়া আছে, ধনিয়া যেন কোথায় গিয়াছে। ছেলেপুলের গোলমাল শুনিয়া রূপাও বাহিরে খেলিতে গিয়াছে, ঘর খালি, এমন সময় মাতাদীন আসিয়া হাজির। নীল আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বালক হাত পা ছুঁড়িতেছে, আর শিশুসুলভ উল্লাসে নানাবিধ শব্দ করিতেছে। মাতাদীনকে দেখিয়া বালক হাসিয়া উঠিল, স্নেহবিহ্বল মাতাদীন উহাকে কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। উহার দেহ মন প্রাণ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, জলের বুকে আলোকরেখার মত উহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। শিশুর গভীর, নির্মল ফুল্ল চোখ দুইটির অতল তলে যেন জীবনের সত্যের সঙ্গে উহার পরিচয় হইল। উহার কেমন ভয় হইল, বালকের দৃষ্টি বুঝি ওর হৃদয়ের মর্মে প্রবেশ করিয়া দেখিয়া লইবে, ও কত অপবিত্র। ঈশ্বরের এই নির্মাল্য ও কেমন করিয়া স্পর্শ করিতেছে? একরকম কম্পিত হৃদয়ে শিশুকে ও শোয়াইয়া দিল। আর ঠিক ঐ সময় রূপা ফিরিয়া আসিল। মাতাদীনও বাহির হইয়া গেল।

একদিন খুব শিল পড়িতেছে। সিলিয়া ঘাস লইয়া বাজারে গিয়াছে, রূপাও নিজের খেলায় মাতিয়া আছে। রামু এখন বসিতে পারে। এক আধটুকু হামাও দেয়। উঠানে শিল পড়িয়া আছে দেখিয়া ও বোধ হয় মনে করিল বাতাসা, কয়েকটা তুলিয়া মুখে পুরিয়া দিল আর উঠানে খুব খেলা করিল। রাত্রিবেলা প্রবল জ্বর আসিল, পর দিন দেখা দিল নিউমোনিয়া। তিন দিনের দিন সন্ধ্যার মুখে সিলিয়ার কোলেই বালকের প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু শিশু মরিয়াও সিলিয়ার জীবনের কেন্দ্র হইয়া রহিল। সিলিয়ার বুকে অঢেল দুধ, গায়ের কাপড় ভিজিয়া যায়। দেখিয়া তাহার চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া আসে; সারা দিনের কাজ শেষ করিয়া রাত্রি বেলা যখন রামুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, স্তন্য পান করাইত, পুরানো সব কথা মনে পড়িয়া যায়। মনে হয়, রামু যখন স্তনে মুখ দিত, কি আনন্দের পুলকে তাহার মন ভরিয়া উঠিত। কত সোহাগ মাখানো গান ও গাহিত, আর কি মধুর স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকিত।

স্বপন দেখিত, নতুন সংসার উহারা রচনা করিয়াছে, আর সেই সংসারের রাজা ছিল যেন রামু। আর আজ সব কাজের শেষে শূন্য ঘরে বসিয়া উহার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠে, উহার প্রাণ চায় সেখানে উড়িয়া যাইতে যেখানে ওর তুলাল আজও খেলায় মত্ত। সমস্ত গাঁয়ের লোক উহার দুঃখে দুঃখী। কি সুন্দর ছেলে ছিল রামু, কি চঞ্চল, ফুর্তিবাজ, যে কেহ ডাকিত তাহারই কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। মরিয়া, আর সকলের নাগালের বাহিরে গিয়া, ও আজ লোকের আরও বেশি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, উহার ছায়া আজ সত্যিকারের রামু হইতেও বুঝি সুন্দর, অধিক লোভনীয়, অনেক হাসিখুসি।

মাতাদীন সেদিন ধরা দিয়া ফেলিল। হাওয়া বাঁচাইবার জন্য পর্দা; আবার জোর ঝড়ের সময় পর্দা উঠাইয়া রাখিতে হয়, যেন ঝড়ের সঙ্গে উড়িয়া না যায়। সেদিন ও না করিল লজ্জা, না করিল বিন্দুমাত্র ভয়। মৃতদেহ দুই হাতে তুলিয়া লইয়া ও একলাই নদীর পারে লইয়া গেল। এক মাইল পার হইলে তবে ঐ সরু নদীটি পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিন ওর খেয়াল ছিল না। আট দিন পর্যন্ত হাত সোজাই করিতে পারিল না।

উহাকে কিছু বলিতে কাহারও মন সরিল না, বরং মনে মনে সকলেই উহার সাহস আর দৃঢ়তার তারিফ করিল।

হরি বলিল, এই তো মরদের কাজ; যার হাত একবার ধরেছ, তাকে কি ছাড়তে আছে?

ধনিয়া চক্ষু নাচাইয়া বলিল, আর বলো না, বুক জ্বলে যায়। এই আবার মরদ? আমি এমন লোককে পুরুষই বলি না। যখন ডুব দিয়েছিলে, তখন খেয়াল ছিল না? তখন কি ভেবেছিলে সিলিয়া বামুন হয়ে গেল?

এক মাস কাটিল। সিলিয়া আবার মজুর খাটিতেছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা, পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতে হাসিতে আকাশে উদিত হইয়াছে; ফসল কাটার শেষে মাটিতে লুটানো যবের শীষগুলি বাছিয়া বাছিয়া ঝুড়িতে ভরিয়া ঘরের দিকে রওনা হইবে, এমন সময় হঠাৎ সিলিয়ার চোখ পড়িল পূর্ণ চন্দ্রের দিকে। মনের মাঝে যত ব্যথার স্মৃতি সব যেন জাগিয়া উঠিল; স্তন্যধারায় উহার বুকের আঁচল আর অশ্রুধারায় চোখ দুইটি ভিজিয়া গেল। মুখটি ফিরাইয়া লইয়া কান্নার মাধুরীটুকু যেন ও উপভোগ করিতে লাগিল।

হঠাৎ কিসে বাধা পাইয়া সিলিয়া চমকিয়া উঠিল। মাতাদীন পিছন হইতে

সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আর কত দিন কাঁদবে সিলিয়া? কাঁদলেও তো আর সে ফিরবে না।

বলিতে বলিতে মাতাদীন নিজেই কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

সিলিয়ার মুখের উদ্যত ভর্ৎসনা থামিয়া গেল। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, তুমি এখানে?

কাতরভাবে মাতাদীন বলিল, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, তুমি বসে আছ, তাই এলাম।

তুমি তো ওর খেলাও দেখ নি।

না সিলিয়া, এক দিন ওর সঙ্গে খেলেছি।

সত্যি?

সত্যি।

আমি কোথায় ছিলাম?

বাজারে গিয়েছিলে।

তোমার কোলে উঠে ও কাঁদল না?

না সিলিয়া, বেশ হাসছিল।

সত্যি?

সত্যি।

মোটে ঐ একটি দিন ওকে খেলা দিলে?

হাঁ, এক দিনই। তবে রোজ দেখতে আসতাম। ও খাটিয়ার ওপর শুয়ে খেলত, দেখে আমি নিজেকে সামলে চলে যেতাম।

ঠিক তোমার মত দেখতে হয়েছিল।

আমার তো দুঃখ, কেনই বা সেদিন ওকে কোলে নিলাম! আমার পাপেরই এই দণ্ড।

সিলিয়ার চোখে ক্ষমার ভাব ফুটিয়া উঠিল। ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া ও ঘরের দিকে পা বাড়াইল, মাতাদীনও সঙ্গে চলিল।

সিলিয়া বলিল, আমি তো আজকাল ধনিয়া কাকীর দাওয়ায় শুই। নিজের ঘরে মন টেকে না।

ধনিয়া বরাবর আমাকে কত বোঝাতো।

সত্যি নাকি?

হাঁ সত্যি, দেখা হলেই বোলতো।

গাঁয়ের কাছাকাছি আসিয়া সিলিয়া বলিল, আচ্ছা, এখন তবে তুমি ঘরে যাও, পণ্ডিত যদি আবার দেখে ফেলে?

ঘাড় উঁচু করিয়া মাতাদীন বলিল, আমি এখন কাউকে ভয় করি না।

ঘর থেকে বার করে দেবে, তখন যাবে কোথায়?

আমি তো নিজের ঘর তৈরি করে নিয়েছি।

ঠিক?

হাঁ, ঠিক।

কোথায়, আমি তো দেখি নি।

চল, আজ দেখাব।

দুইজনে আগাইয়া চলে। মাতাদীন আগে, সিলিয়া পিছনে পিছনে। হরির ঘরের কাছে আসিয়া মাতাদীন উহার পিছনে গিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, এই আমার ঘর।

অবিশ্বাস, ব্যঙ্গ, ক্ষমা আর দুঃখ, সব কিছু স্বরে ঢালিয়া দিয়া সিলিয়া বলিল, এ তো সিলিয়া চামারনীর ঘর।

দরজার ঝাঁপ খুলিতে খুলিতে মাতাদীন বলিল, এ আমার দেবীর মন্দির।

সিলিয়ার চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বলিল, ও, মন্দির, এক ঘড়া জল ঢেলে-দিয়ে চলে যাবে বুঝি?

সিলিয়ার মাথার ঝুড়িটি নামাইতে নামাইতে কম্পিতস্বরে মাতাদীন বলিল, না সিলিয়া, যতদিন বাঁচব, তোমার আশ্রয়ে থাকব, আর তোমায় পূজো করব।

মিথ্যেমিথ্যি বলছ।

না, তোর পা ছুঁয়ে বলছি। শুনেছি, পটেশ্বরীর ঐ বদমায়েস ছেলে ভুনেশ্বরী তোর পেছনে বড় লেগেছিল, আর তুই ওকে খুব আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছিলি।

তোমাকে কে বললে?

ভুনেশ্বরী নিজেই বলছিল।

সত্যি?

হাঁ, সত্যি কথা।

সিলিয়া দিয়াশলাই দিয়া কুপি জ্বালিল। একদিকে মাটির ঘড়া, আর এক

দিকে উনন, তাহার পাশে কয়েকটা পিতল আর লোহার মাজাঘসা চকচকে বাসন। ঘরের মাঝখানে পোয়াল বিছানো রহিয়াছে, ঐ হইল সিলিয়ার বিছানা। ঐ বিছানার শিয়রে রামুর ছোট শয্যাটি যেন পড়িয়া কাঁদিতেছে, আর আশে পাশে পড়িয়া আছে কয়েকটি মাটি আর কাঠের হাত পা ভাঙ্গা পুতুল। খেলনার মালিকই নাই, কে আর উহাদের তদারক করে? মাতাদীন খড়ের উপর বসিয়া পড়িল, বুকের মধ্যে এমন তোলপাড় করিতেছে, ইচ্ছা হয় প্রাণ খুলিয়া একবার কাঁদিয়া লয়।

উহার পিঠে হাত রাখিয়া সিলিয়া বলিল, আচ্ছা, আমার কথা তোমার কখনও মনে পড়তো!

ওর হাতখানা টানিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া মাতাদীন বলিল, তুই হরদম আমার চোখের সামনে ছিলি সিলিয়া। আচ্ছা, তোর কি আমায় মনে পড়তো?

আমার তো বুকের মধ্যে জ্বালা করতো।

একটু দয়া হোত না?

কখনও না।

তবে ভুনেশ্বরী……

থাক, খুব হয়েছে, আর গাল দিও না। আমার ভয় করছে, গাঁয়ের লোকে কি বলবে।

ভাল লোকে বলবে, এই তো ঠিক কাজ, আর যারা মন্দ লোক, তাদের কথায় কি বা এসে যায়?

তোমার রান্না কে করবে?

আমার সিলিয়া রানী।

তাহলে তোমার বামনাই কি করে থাকবে?

আমি বামুন নই, চামার হতেই চাই। যে নিজের ধর্ম পালন করে সে-ই বামুন, আর যে ধর্মপথ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সে-ই চামার।

সিলিয়া দুই হাতে মাতাদীনের গলা জড়াইয়া ধরিল।

হরির অবস্থা দিন দিন পড়িয়া আসিতেছিল। জীবনযুদ্ধে উহার চিরদিনই হার হইল, তবু কিন্তু হরি সাহস হারায় নাই। প্রত্যেকবারের হার যেন উহাকে বেশি করিয়া ভাগ্যের সহিত যুদ্ধ করার শক্তি জোগাইয়াছে; কিন্তু আজ এমন দশা যে, উহার আত্মবিশ্বাসও লোপ পাইয়াছে। নিজের ধর্ম বজায় রাখিতে পারিলেও হইত, কিন্তু তাহাও হইল না। স্বভাব খারাপ হইল, অধর্মের কড়ি কামাই করিতে হইল, এমন কোন খারাপ কাজ নাই যাহাতে হাত দেয় নাই; তবু জীবনের কোন অভিলাষ পূর্ণ হইল না, অথচ সুদিনের কল্পনা এখন মৃগ-তৃষ্ণিকার মত দূরে দূরান্তরে অপসৃত, দুরাশাও আর মনে জাগে না। মিথ্যা আশার রঙ্গীন স্বপ্ন আর চোখে চমক আনিয়া দেয় না। পরাজিত রাজার মতো হরি এখন নিজের তিন বিঘা জমির কেল্লায় আপনাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়া কোন মতে দিন গুজরান করিতেছে। অনাহার উপবাস সহিয়াছে, দুর্নাম হইয়াছে, মজুরি করিয়াছে, তবু এই কেল্লা হাত ছাড়া করে নাই; কিন্তু আজ সেই কেল্লাও বুঝি হাতছাড়া হইয়া যায়। তিন বৎসর খাজনা দেওয়া হয় নাই বলিয়া আজ পণ্ডিত নোখেরাম সম্পত্তি বেদখলের নোটিস দিয়াছে। কোথাও টাকা পাইবার আশা নাই, জমি হাতছাড়া হইলে বাকি জীবন দিনমজুরি করিয়া খাইতে হইবে। ভগবানের বিধান, রায়সাহেবের কি দোষ? চাষীদের কাছে খাজনা আদায় হইবে, তবে তো উহার দিন গুজরান হইবে! এই গ্রামের তো অর্ধেকের বেশি চাষীদের উপর বেদখলির ডিক্রীজারি হইবে, তা হউক। সকলের যে দশা হইবে, তাহারও তাহাই হইবে। ভাগ্যে যদি সুখই থাকিবে তবে কি এমন ছেলে ছাড়িয়া যায়!

সন্ধ্যা বেলা। হরি আপনার চিন্তায় ডুবিয়া আছে, এমন সময় পণ্ডিত দাতাদীন আসিয়া বলিল, তোমার জমি বেদখলের কি শুনছি হরি? নোখেরামের সঙ্গে তো আমার কথা বলা বন্ধ। কোন খবরও জানি না। শুনছি, তোমার উচ্ছেদের তারিখের মোট পনের দিন বাকি।

বসিবার জন্য খাটিয়া আগাইয়া দিয়া হরি বলিল, সে হল মালিক, যা খুসি করবে। আমার কাছে টাকা থাকলে কি আর এ অবস্থা হয়? না খেয়েছি,

না উড়িয়েছি ; কিন্তু ফসল যদি না-ই হয় আর হোলেও যদি এভাবে কড়ির দরে বিকিয়ে যায়, তবে চাষীর আর উপায় কি !

যাই হোক, জমিটা বাঁচাতেই হবে, নইলে বাঁচবে কেমন করে ? বাপ-দাদার এই চিহ্নটুকুই তো আছে। তাও যদি গেল, তবে থাকবেই বা কোথায় ?

ভগবানের মরজি, আমার সাধ্য কি ?

একটা উপায় আছে, যদি তুমি কর।

হরি যেন হাতে স্বর্গ পাইল, পণ্ডিতের পায়ের উপর পড়িয়া বলিল, আপনার খুব পুণ্য হবে মহারাজ, আপনি ছাড়া আমার কে বা আছে ? আমি তো একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

নিরাশ হবার কিছু নেই। জান তো, সুখের সময় লোকের ধর্ম এক রকম থাকে, আর দুঃখের দিনে হয় অন্য রকম। সুখের দিনে লোকে করে দান, আর দুঃখে পড়লে করে ভিক্ষা। তখন তাই হয় ধর্ম। শরীর যখন ভালো থাকে, আমরা স্নান পূজো না করে জলটুকু মুখে দিই না, অথচ যখন অসুখে পড়ি, নাওয়া ধোওয়া না করে, বাসি কাপড়ে, খাটে শুয়েই পথ্য খেয়ে নিই। তখনকার যা ধর্ম। এখানে তোমার আমার মধ্যে কত ভেদ, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে দেখবে সব এক, উঁচুনীচু সব জাতের লোক এক পংক্তিতে বসে খায়। আপৎকালে শ্রীরামচন্দ্রও শবরীর উচ্ছিষ্ট ফল খেলেন, লুকিয়ে বালিকে বধ করলেন। সঙ্কটের সময় বড় লোকেরই মর্যাদা টুটে যায়, তা তোমার আমার তো কথাই নেই। রামসেবক মাহাতোকে চেন তো ?

হরি নিরুৎসাহের ভঙ্গীতে বলিল, চিনি বৈ কি।

আমার যজমান। বেশ পয়সাকড়ি আছে। ক্ষেত আছে, তা ছাড়া লেনদেনের কাজও আছে। এমন তেজী লোক কখনও দেখি নি। ক মাস হোল স্ত্রী মারা গেছে, ছেলেপুলে নেই। তোমার রূপার সঙ্গে যদি বিয়ে দিতে চাও, তবে আমি রাজি করাতে পারি। আমার কথা ও ঠেলতে পারবে না। মেয়ে বড় হয়েছে, অথচ তোমার সময়টা পড়েছে খারাপ। এর পর কোন কথা উঠলে মুখে কালি পড়বে। এ একটা মস্ত সুযোগ। মেয়ের বিয়েও হয়ে যাবে, তোমার জমিটুকুও বেঁচে যাবে। এদিকে খরচখরচাও কিছু লাগবে না।

রামসেবক হরির বছর দুই চারিক ছোট হইবে। তাহার সঙ্গে রূপার

বিবাহের প্রস্তাব ওঠাই অপমানজনক। কোথায় ফুলের মত মেয়ে রূপা, আর কোথায় ঐ বুড়ো হাবড়া! জীবনে হরি অনেক আঘাত সহিয়াছে, কিন্তু আজিকার এই আঘাত সর্বাপেক্ষা গভীর। উহার এমনই অবস্থা যে মেয়ে বেচিবার কথাও শুনিতে হয়! অথচ অস্বীকার করার সাহসই বা কোথায়? গ্লানিতে উহার মাথাটা মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া দাতাদীন বলিল, তা কি বল হে!

হরি সোজাসুজি উত্তর না দিয়া বলিল, ভেবে দেখি।

আরে, ভাববার কি আছে এতে?

ধনিয়ার মত নিতে হবে তো।

তুমি রাজি আছ?

একটু ভাবতে দিন মহারাজ। বংশে এ পর্যন্ত কারু এমন হয় নি, কুলের মর্যাদাও তো রাখতে হবে।

পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই আমায় জবাবটা দিও। এমন যেন হয় না যে তুমি ভাবতেই থাকলে আর এদিকে জমি বেদখল হয়ে গেল।

দাতাদীন চলিয়া গেল; হরি হইতে উহার কোন আশঙ্কা নাই, কিন্তু ভয় ধনিয়াকে। তাহার নাক বড় উঁচু, মরিবে তবু মর্যাদা ছাড়িবে না। অবশ্য হরি যদি হাঁ করে, তবে কোনক্রমে কান্নাকাটি করিয়া সেও হয়তো মানিয়া লইবে, কারণ জমিটা হারাইলেও তো অপমানের কথা।

ধনিয়া আসিয়া বলিল, পণ্ডিতজী হঠাৎ যে?

এই এল, জমি বেদখলের কথা হচ্ছিল।

মায়াকান্না কাঁদতে এসেছিল, শখানেক টাকা তো ধার দেবে না?

আমার চাইবার মুখই নেই।

তবে এখানে আসে কেন?

রূপিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিল।

কার সঙ্গে?

রামসেবকের নাম শুনেছ, তার সঙ্গে।

আমি ওকে দেখলাম কবে? তবে নাম শুনেছি। কিন্তু ও তো বুড়ো।

ঠিক বুড়ো নয়, আধবয়সী।

তুমি কিছু বললে না পণ্ডিতকে? আমার কাছে যদি বলতো, এমন জবাব দিতাম যে জন্মে ভুলতো না।

কথা শুনিয়ে দিই নি, কিন্তু অস্বীকার করেছি। তবে ও বলছিল যে, বিয়েটাও বিনা খরচে হয়ে যাবে, আর জমির দখলও ছাড়তে হবে না।

স্পষ্ট কেন বলে দিলে না যে, আমরা মেয়ে বেচবো না? বুড়োর এত সাহস হল কি করে?

দুইটি দিন কাটিল, দুই জনের মধ্যে এই বিষয়ে কথাবার্তা নাই; অবশ্য ইশারায় ইঙ্গিতে আলাপ চলিয়াছে।

ধনিয়া বলে, বরকনের জোড় মেলে, তবে গিয়ে বিয়ের আনন্দ।

হরি জবাব দেয়, পাগলি, বিয়ে শুধু আনন্দের ব্যাপার নয়, বিয়ে যে তপস্যা।

রাখ তোমার তপস্যা।

আমি যা বলছি, তাই ঠিক। ভগবান যেমন ভাবে রাখেন তাইতেই সুখী থাকা, এ যদি তপস্যা না হয় তবে তপস্যা কাকে বলে?

পরের দিন ধনিয়া বিবাহের আনন্দের আর এক দফা ব্যাখ্যান সুরু করিল। ঘরে শ্বশুর শাশুড়ী, দেওর জা, ননদ, এসব যদি না থাকিল তবে শ্বশুরবাড়ির আনন্দ কোথায়? মেয়ে মাত্রই চায় কয়েকটা দিন বৌয়ের মতো থাকিতে।

হরি বলে, বৌয়ের মতো থাকা তো সুখের নয়, সে তো বিবাহিত জীবনের শাস্তি।

ধনিয়া জ্বলিয়া ওঠে, তোমার কথাই আলাদা! একলাটি বৌ ঘরে থাকবে কি করে, আগে পিছে কেউ নেই!

হরি বলে, তুই তো এসেছিলি ভরা ঘরে, একলা ছিলি না, দু দুটি দেওর, শ্বশুর শাশুড়ী ঘরে—তা তোর কি এমন সুখ হয়েছে, শুনি।

সব বাড়ির লোকই এরকম হবে?

তা না তো কি, সব যেন আকাশের দেবী হবে! একলা বৌ, আর হুকুম করার জন্যে আছে পাঁচ দিকে পাঁচ জন—বেচারি কার মন রাখে? যার কথা না শুনবে তারই মুখ ভারি হবে, সে-ই শত্রু হবে। সব চেয়ে ভালো একলা থাকা।

ব্যস, এই পর্যন্ত। কিন্তু তাও ধনিয়ার দিকে পাল্লা হালকা হইয়া আসিতেছে। চতুর্থ দিনে গ্রামসেবক মাহাতো নিজে আসিয়া হাজির। আসিয়াছে

মস্ত ঘোড়ায় চড়িয়া, সঙ্গে একজন চাকর, একটি নাপিত—যেন কোন মস্ত জমিদার। বয়স চল্লিশের উপর, চুলে পাক ধরিয়াছে, কিন্তু বেশ জোয়ান চেহারা—মুখে সতেজ একটা ভাব। উহার কাছে হরিকে নিতান্তই বুড়ো দেখায়। কি একটা মোকদ্দমার তদ্বির করিতে যাইতেছিল, তুপুরটা এইখানে কাটাইয়া যাইতে চায়। কি রোদ! আর তেমনই জোরে লু চলিতেছে। হরি সাহুয়াইনের দোকান হইতে ময়দা আর ঘি কিনিয়া আনিল। পুরি তৈয়ার হইল, অতিথি তিনজনেই খাইল। আশীর্বাদ করিবার জন্য দাতাদীনও আসিয়া উপস্থিত হইল। কথাবার্তা আরম্ভ হইল।

দাতাদীন জিজ্ঞাসা করিল, কিসের মোকদ্দমা, মাহাতো?

রামসেবক বলিল, আর বলেন কেন, মোকদ্দমা একটা না একটা লেগেই আছে। সংসারে থাকলে ভেড়া বনলে চলে কি? যত নরম হবে, লোকে ততই পেয়ে বসবে। থানা পুলিশ, আদালত আপিল—সবই হোল আমাদের রক্ষার জন্যে। কিন্তু রক্ষা করে না কেউ। চারদিকে লুঠ হোচ্চে। যে গরিব, যে দুর্বল, তার গলা কাটতে সবাই সেজে থাকে। ভগবান করুন, যেন কোন বেইমানি না করি, সেটা পাপ; কিন্তু নিজের হক্কের ধনের জন্য, ন্যায় বিচারের জন্য, লড়াই না করাও আর এক রকম পাপ। তুমিই বল, মানুষ কত্তদূর নরম হবে? এখানে তো দেখছি, যে কিষান সে সকলের পায়ের নীচে। পাটোয়ারীর নজরানা আর দস্তুরি যদি না দাও, তবে তোমার গাঁয়ে থাকাই মুশকিল। জমিদারের পেয়াদার পেট না ভরালে তোমার দিন কাটানো ভার হবে। আর থানার দারোগা কনস্টেবল তো যেন জামাই, গাঁয়ে তাদের কাজ পড়লেই জামাই আদর কর, নজরানা দাও। ওদের মর্জিমত সবাইকে চলতে হবে। নইলে এক রিপোর্টে গাঁ-কে-গাঁ সারা কোরবে। কখনও কানুনগো, কখনও তহশীলদার ডিপুটি, কখনও জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট, কখনও কালেক্টার, কখনও বা আসবে কমিশনার—আর অমনি কিষানকে জোড়হাতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ওদের জন্য সিধা সাজাও, আণ্ডা মুরগি দুধ ঘির ব্যবস্থা কর। তোমার মাথাও তো ওখানে বাঁধা রয়েছে মহারাজ! রোজ নতুন নতুনহাকিম আসছে, সেই রকম এক ডাক্তার আসছেন কুয়োয় ওষুধ ঢালতে, আর এক ডাক্তার আবার আসেন গোরুবাছুর দেখতে। ছেলেদের পরীক্ষা নিতে আসেন ইন্‌সপেক্টার, আর অফিসার যে কত রকমের তা তো বলেই শেষ করা যায় না। খালের ভিন্ন, জঙ্গলের ভিন্ন, তাড়ি মদের

ভিন্ন, কৃষি বিভাগের ভিন্ন। আবার গ্রামসংস্কারক আছে। পাদরি এলে তারও রসদ জোগাতে হবে, নইলে নালিশ করে দেবে। এত সব হাঙ্গামা আর এত সব অফিসারে যদি কিষানের কিছু ভাল হোত, তাও বুঝতাম। এই দেখুন, জমিদার সেদিন হাল পিছু দু টাকা চাঁদা ধরলেন; কোন বড় অফিসারের জন্য ভোজ ছিল। কিষানরা দিতে অস্বীকার করায় সারা গাঁয়ের ওপর জরিমানা চাপিয়ে দিল। হাকিমও ঠিক জমিদারেরই পক্ষ নেয়। একবার ভাবে না, কিষানও মানুষ, তারও কাচ্চাবাচ্চা আছে, মানইজ্জত আছে; এ সবই হোল আমাদের ভালোমানষি পাপের ফল, সবাই নরমের যম। আমি তো গাঁয়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে দিয়েছি যে, কেউ এরকম খাজনা দেবে না, ক্ষেতিও ছাড়বে না। আমাদের বুঝিয়ে দিতে পার, কি জন্যে এই চাঁদা, তবে আমরা দিতে রাজি আছি, কিন্তু যদি এসব শুধু আমাদের পিষে মারার জন্য হয় তবে আমরাও কিন্তু বেঁকে দাঁড়াব। গাঁয়ের লোক আমার কথা মেনে নিল, কেউ বাকি খাজনা দেবে না। জমিদার যখন দেখলেন যে সবাই একজোট হয়েছে, তখন নাচার। ক্ষেত কেড়ে নেবে বললেই তো হয় না। আজকালকার দিনে কারে না পড়লে কেউ কথা শোনে না। না কাঁদলে মায়ের কাছেও ছেলে দুধ পায় না।

তৃতীয় প্রহর বেলায় রামসেবক চলিয়া গেল, কিন্তু হরি আর ধনিয়ার মনের উপর যে ছাপ সে রাখিয়া গেল তাহা মুছিবার নয়। দাতাদীনের মন্ত্র কাজ করিতেছে।

দাতাদীন জিজ্ঞাসা করিল, তা এখন কি বল?

হরি আর ধনিয়া এ উহাকে দেখাইয়া বলে, ওকে জিজ্ঞাসা কর।

দাতাদীন বলে, দুজনকেই জিজ্ঞাসা করছি।

ধনিয়া বলে, বয়সটা বড়ই বেশি। অবশ্য তোমরা সবাই যা ঠিক করবে, আমারও তাতেই সায়। কপালে যা আছে, তা হবেই, তবে লোকটা ভালো।

বলশালী লোকের উপর দুর্বলের যেমন বিশ্বাস জন্মে, রামসেবকের উপর হরির কতকটা সেই ধরণের বিশ্বাস জন্মিল। ও ডুবিতে বসিয়াছে, এমন লোক যদি হাতে ধরিয়া তোলে, তখন তো রক্ষা হইল বলিয়া।

বিবাহের দিন ঠিক হইয়াছে। গোবরকেও ডাকিতে হইবে। ও তো

আসিতে লিখিয়া দিবে, তার পর আসা না আসা, তার ইচ্ছা ; বলিতে পারিবে না যে ওকে ডাকা হয় নাই। সোনাকেও আনিতে হইবে।

ধনিয়া বলে, গোবর তো এমন ছিল না, কিন্তু ঝুনিয়া আসতে দিলে হয়। বিদেশে গিয়ে এমনই ভুলে বসেছে যে, চিঠিই লেখে না ; কে জানে কেমন আছে। বলিতে বলিতে উহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসে।

চিঠি পাইয়াই গোবর আসিবে বলিয়া প্রস্তুত হইল। যাওয়াটা অবশ্য ঝুনিয়ার ভাল লাগে না, কিন্তু কিছু বলিতেও পারে না। বোনের বিবাহে ভাই যাইবে না, ইহাই বা কেমন করিয়া হয়? সোনার বিবাহে না যাওয়ায় কলঙ্ক কি কম হইয়াছে?

গোবর আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, মা বাপের সঙ্গে বিরোধ করে থাকা কিছু ভাল কথা নয়। এখন আমার হাত পা হয়েছে, তাই ওঁদের সঙ্গে ঝগড়া করি, চাই মারামারি করি, কিন্তু ওঁরাই তো জন্ম দিয়েছেন, লালন পালন করে এত বড়টা করে তুলেছেন ; ওঁরা দুচার কথা শুনিয়ে দিলেও আমাদের সয়ে যাওয়া উচিত। আজ কদিন থেকে আমার শুধু বাবা মার কথা মনে পড়ছে। জানি না, কেন তখন আমার রাগ হয়ে গেল। তোর জন্যেই মা বাপ ছাড়তে হোল।

ঝুনিয়া রাগিয়া ওঠে, আমার ঘাড়ে ঐ দোষ চাপিও না বলছি। তোমারই মাথায় লড়াই চাগিয়ে উঠলো। আমি যে এতদিন মার কাছেই ছিলাম, একটা দিনও উঁচু কথা বলি নি।

ঝগড়া তো তোকেই নিয়ে।

বেশ, মানলাম, আমারই জন্যে, তা আমিও কি তোমার জন্যে নিজের ঘর-বাড়ি ছেড়ে আসি নি?

তোর বাড়িতে কেই বা তোকে ভালবাসত! ভাই গাল দিত, ভাজ জ্বালা দিত ; ভোলা তো পেলে তোকে কাঁচা খেয়ে ফেলত।

সে তোমারই জন্যে।

যাক, এখন ওরা যতদিন আছে, ততদিন একটু সুখের মুখ তো দেখুক। ওদের মর্জি মেনে চলতে হবে। আমার বাবা তো এমন ভাল, গায়ে কোন দিন হাত অবধি তোলে নি। মা অবশ্য মাঝে মাঝে মেরেছে, তবে যখনই মারত ডেকে কিছু না কিছু খাওয়াত। আর, মারলে কি হবে, আমি আবার না হাসা পর্যন্ত ছটফট করত।

দুই জনেই মালতীর কাছে কথাটা তুলিল। মালতী কেবল ছুটিই দিল না, উপহারের জন্য একটা চরখা আর হাতের একজোড়া কঙ্কণ দিয়া দিল। তাহার নিজেরই যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হাতে তখন এমন একটি রোগী যাহাকে একদিনও ফেলিয়া যাওয়া যায় না। তবে বিবাহের দিন যাইবে কথা দিয়া বাচ্চার জন্য রাশি রাশি খেলনা দিল। মালতী বাচ্চাকে কত চুমা খাইল, কত আদর করিল, যে কয়দিন দেখা হইবে না তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ করিয়া লইল। শিশু কিন্তু অত আদরের কোন দাম না দিয়া সেই বাড়িতে যাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, যে ঘর নাকি ও চোখেও দেখে নাই। শিশুমনের কল্পনায় নিজের বাড়ি যে স্বর্গের চেয়েও অধিক বিস্ময়ের।

বাড়ির অবস্থা দেখিয়া গোবরের মন এমন দমিয়া গেল যে, মনে হইল, এখনই ফিরিয়া যায়। ঘরের এক দিক তো পড়-পড় হইয়া রহিয়াছে। একটা মোটে বলদ, তাও আধমরা। হরি আর ধনিয়া মহা খুসি, কিন্তু গোবরের প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। এই ঘর সামলাইবার আশা কোথায়? ও গোলামি করে, কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে তো পায়! কেবল একজন মালিকের চাকরি করে। এখানে দেখ, সকলেই নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করে। গোবর গোলামি করে বটে, তবে সুখে আছে। হাড়ভাঙ্গা মেহনত করিয়া ফসল ফলাও, আর যা কিছু উপায় হয় পরের হাতে তুলিয়া দিয়া ঘরে বসিয়া রামনাম জপ কর! বাবা বলিয়া এত সহ্য করে। গোবর তো এক দিনের জন্য সহিতে পারিত না। হরির একার এই দশা নয়, সারা গাঁয়ের লোকের এই দশা। এমন একটি লোক দেখিবে না, যাহার মুখ কাঁদো কাঁদো নয়। বেদনা যেন উহাদের অন্তরের মাঝে বসিয়া কাঠের পুতুলের মত নাচাইতেছে; চলে ফেরে, কাজ করে, গম পেষে, দুই পাতে, সবই করে যেন করিতে হয় তাই। জীবনে না আছে আশা, না আছে আনন্দ, জীবনের স্রোত উহাদের শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে, আর সব তারুণ্য যেন মূর্চ্ছিত। জ্যৈষ্ঠ মাস, এখনও গোলায় ফসল মজুদ, তবু কাহারও মুখে আনন্দের রেশ নাই। কেন না, বেশির ভাগ ফসল তো গিয়াছে পেয়াদার দাবি মিটাইতে, যাহা কিছু বাঁচিয়াছে তাহাও অন্যের। সম্মুখে অন্ধকার ভবিষ্যৎ—পথ দেখা যায় না। উহাদের চেতনাও নাই; ঘরের সম্মুখে ময়লা জমিয়া আছে, দুর্গন্ধ উঠিতেছে, তাহাতেও উহাদের নাকে গন্ধ যায় না, চোখে আবর্জনা পড়ে না। সকাল হইতে সন্ধ্যা

পর্যন্ত দুয়ারে শিয়াল ডাকে, তাও কাহারও হুঁশ নাই। কাঁড়া, আকাঁড়া, যাহা কিছু পায় তাহাই খায়, ঠিক যেমন করিয়া ইঞ্জিনে কয়লা খায়। এদের বলদগুলি পর্যন্ত পরখ করিয়া না দেখিয়া নাদে মুখ ঢুকায় না, কিন্তু ইহারা যাহা পায় তাহাই মুখে পুরিয়া ক্ষুধার জ্বালা মিটায়। ইহাদের স্বাদ মরিয়া গিয়াছে। স্বাদে ইহাদের প্রয়োজন নাই, তাই জীবনেও ইহারা স্বাদ পায় না। আধলা দিয়া ইহাদিগকে বেইমানি করাইতে বাধ্য করে, এক মুঠা ফসলের জন্য ইহাদের উপর লাঠি চালাইয়া দেয়। মানুষ যখন লজ্জা সরম ভুলিয়া যায়, তখনই না পতনের চূড়ান্ত।

ছেলেবেলা হইতে গোবর গাঁয়ের এই হাল দেখিয়াছে, তাহাতেই ও অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু আজ চার বৎসর যাবৎ ও যে এক নূতন জগৎ দেখিয়াছে, ভালো লোকের সঙ্গে মিশিয়া উহার বুদ্ধি খুলিয়া গিয়াছে। রাজনৈতিক সভায় সকলের পিছনে দাঁড়াইয়া ও নেতাদের বক্তৃতা শুনিয়াছে, আর সে সকল কথা উহার মর্মে মর্মে গিয়া বিঁধিয়াছে। শুনিয়া শুনিয়া ও বুঝিয়াছে, ভাগ্যকে মানুষ নিজে গঠন করে, নিজের বুদ্ধি আর সাহস দিয়া সব বিপদ আপদ জয় করিতে হয়, কোন দেবতা বা গুপ্ত শক্তি সাহায্য করিতে আসে না। উহার মনে সকলের প্রতি গভীর সমবেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে, আগেকার সেই উদ্ধত ভাব আর নাই; এখন গোবর নম্র, উদ্যোগপরায়ণ। 'যে দশায় পড়িয়াছ, স্বার্থ আর লোভের বশে তাহার চেয়ে বেশি কেন বিগড়াও? দুঃখ তোমাদের একসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে, তুচ্ছ স্বার্থের জন্য বন্ধুত্বের বন্ধন কেন ভাঙ্গিতে চাও? এই বন্ধনকে একতার বন্ধনে বাঁধিয়া লও।' এই ধরণের সব ভাব যেন উহার গায়ে মানবতার দুইটি পাখা জুড়িয়া দিল। সংসারের উঁচু নীচু দেখিবার ফলে মানুষের মনে যে উদারতা আসিয়া পড়ে, তাহা যেন এখন আকাশে উড়িবার জন্য পাখা মেলিয়া দিয়াছে। হরিকে যখন যে কাজ করিতে দেখে, গোবর তাহাই কাড়িয়া লইবার জন্য হাত বাড়ায়, হরিকে কাজ করিতে না দিয়া যেন ও আগেকার দুর্ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বলে, বাবা, এখন আর তুমি ভেব না, সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও, আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাব, এত দিন খেটে খুটে মরলে, কয়েকটা দিন তো আরাম কর; আমি থাকতে তোমার এত দুঃখ পেতে হোল, ভাবলেও আমার লজ্জা হয়। শুনিতে শুনিতে, হরির প্রতি রোম হইতে যেন ছেলের উপর আশীর্বাদ ঝরিতে থাকে, জীর্ণ

:দহে যেন অলৌকিক আনন্দ ফুটিয়া ওঠে। গোবরের এই উঠতি বয়স, এখন উহার উপর কেন এই ঋণের বোঝা হরি চাপাইবে? ও আরামে থাক াক, সুখে থাকুক। খাটিয়া মরিতে হরি-ই প্রস্তুত আছে। এই তো উহার জীবন, বসিয়া বসিয়া রাম নাম জপ করা কি উহার পোষায়? কোদাল আর খুড়ি যে উহার চাই-ই; তা ছাড়া, শুধু রাম নাম জপ করিলে উহার চিত্তে শান্তি আসিবে না। গোবর বলে, তুমি বল তো আমি সকলের সঙ্গে কিস্তিবন্দি করি, তার পর মাসে মাসে টাকা দিয়ে যাব। সব শুদ্ধ কত হবে?

মাথা দুলাইয়া হরি বলে, না বেটা, তুমি কেন কষ্ট কোরবে? তুমি বা এমন কি বেশি পাও? আমি সব দেখে নেব। এরকম সময় বেশি দিন থাকবে না। রূপা চলে যাচ্ছে। কর্জ তো শোধ হোল। তুমি কিছু ভেব না। খাওয়া দাওয়ায় সংযম রেখ, এখন যদি শরীর তৈরি হয়, তো চিরদিন টিকে থাকবে। আমার কি, আমার তো খেটে মরা শুকিয়ে যাওয়া না যাওয়া। তোমাকে এখনই ক্ষেতিতে জুততে চাই না। তুমি চমৎকার মালিক পেয়ে গিয়েছ, কিছুদিন এঁর সেবা করলে মানুষ হয়ে যাবে। একবার এখানে এসেছিলেন, সাক্ষাৎ ভগবতী।

বিয়ের দিন আবার আসবেন বলেছেন।

আমরা মাথায় করে রাখবো। এরকম ভাল লোকের কাছে থাকতে পারলে পয়সা কম পেলেও ক্ষতি নেই। এতে প্রাণটা বড় হয়, চোখ খুলে যায়।

ঠিক ঐ সময়টাতে দাতাদীন ইশারায় হরিকে ডাকিয়া একটু দূরে লইয়া গেল, আর কোমর হইতে একশ টাকার দুই খানি নোট বাহির করিয়া বলিল, আমার পরামর্শ শুনে তুমি খুব ভাল করেছ। দুই কাজই হয়ে গেল। কন্যার বিয়েও হোয়ে যাচ্ছে, আর বাপ দাদার ভিটেও বজায় রইল। আমার যা সাধ্য তোমার জন্য করেছি, এখন তুমি জান আর তোমার কর্ম জানে।

টাকাটা লইতে হরির হাত কাঁপিয়া উঠিল। মাথা আর তুলিতে পারে না, মুখে শব্দ নাই, ও যেন অপমানের অতল তলে গড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ ত্রিশ বৎসর যুদ্ধ করিবার পর জীবনে ও হার মানিল। এ হার এমন য, উহার মনে হইল, কে যেন উহাকে নগরের প্রবেশ পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে, আর যে কেহ নগরে আসে যায় সকলেই যেন উহার মুখে থুতু দিতেছে। ও যেন চিৎকার করিয়া বলিতেছে, ভাই সব, আমি দয়ার পাত্র, আমি কোন

দিন জানি নি জ্যৈষ্ঠের লু আর মাঘের বর্ষা কেমন হয়। আমার বুক চিরে দেখ, কত টুকু প্রাণ আছে, কি আঘাতে আমি জর্জর, ক্ষতবিক্ষত। জিজ্ঞাসা কর আমার বুককে, কখনও কি ও বিশ্রাম চোখে দেখেছে, কখনও কি ছায়ার নীচে বসেছে? তার ওপর এ অপমান! আর তাও ও বেঁচে আছে? কাপুরুষ, লোভী, অধম! উহার সমস্ত অগাধ বিশ্বাস, যাহা স্থূল আর অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন সব টুকরা টুকরা হইয়া উড়িয়া গেল।

দাতাদীন বলিল, তবে আমি যাই। তুমি না হয় এখন নোখেরামের কাছে যাও।

দীনভাবে হরি বলিল, যাব মহারাজ, তবে আমার ইজ্জত তোমার হাতে।

৩৬

দুই দিন পর্যন্ত গাঁয়ে খুব ধূমধাম ছিল। বাদ্যভাণ্ড বাজিল, গান বাজনা হইল, আর রূপা কাঁদিয়া কাটিয়া বিদায় হইয়া গেল; কিন্তু হরিকে কেহ ঘরের বাহির হইতে দেখে নাই। সে এমন ভাবে লুকাইয়া বসিয়া ছিল যেন তাহার মুখে কেহ কালি মাড়িয়া দিয়াছে। মালতী আসিলে গোলমাল আরও বাড়িল; অন্য গাঁয়ের মেয়েরাও আসিল।

গোবর নিজের মায়াদয়া আচারব্যবহার দিয়া সমস্ত গাঁকে মুগ্ধ করিয়া লইল। এমন কোনও ঘর ছিল না, যেখানে সে তাহার মিষ্ট ব্যবহারের স্মৃতি না রাখিয়া আসিল। ভোলা তো তাহার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল। নোহরী তাহাকে পান খাওয়াইল, এক টাকা বিদায় উপহার দিল, তাহার লখনৌয়ের ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করিল। কখনও লখনৌ গেলে তাহার সঙ্গে অবশ্য দেখা করিবে। নিজের টাকা সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে কোনও কথাই বলিল না।

দুই দিন পরে তিন দিনের দিন যখন গোবর রওনা হইবে, তখন হরি ধনিয়ার সামনে সজলনেত্রে সেই অপরাধ স্বীকার করিল, যাহা কয় দিন হইতে তাহার প্রাণকে মথিত করিতেছিল, আর কাঁদিয়া বলিল—বেটা, আমি এই জমির মোহে পাপের বোঝা মাথায় করেছি। জানি না, ভগবান আমায় এর কি দণ্ড দেবেন।

গোবর একটুও গরম হইল না, কোনও প্রকার রাগের চিহ্ন তাহার মুখের উপর ছিল না। শ্রদ্ধার ভাবে বলিল—এতে অপরাধের তো কোনও কথা নাই বাবা, হাঁ, রামসেবকের টাকাটা শোধ করে দিতে হবে। না নিয়ে তুমি কি বা করতে? আমি কোনও কাজের নই, তোমার ক্ষেতি থেকে কিছু আয় হয় না, ধার কোথাও পাওয়া যায় না। এক মাসেরও খাবার ঘরে নাই। এ অবস্থায় তুমি আর কি বা করতে পারতে? জমি জিরেত না বাঁচালে থাকতে কোথায়? লোকের যখন জোর খাটে না, তখন নিজের ভাগ্যের ওপর সব কিছু ছেড়ে দেয়। জানি না, এই গোলমালের অবস্থা কত দিন ধরে চলবে। যার রুটিরই সংস্থান নাই, তার পক্ষে মর্যাদা আর ইজ্জত সবই হল ঢং। অন্য লোকের মত তুমিও যদি অন্যের গলা টিপে ধরতে, তাদের জমি জমা মেরে নিতে, তাহলে তুমিও হতে ভাল লোক। তুমি নীতির পথ কখনও ছাড় নাই, এ হল গিয়ে তারই দণ্ড। তোমার জায়গায় আমি থাকলে হয় জেল হত, নয় ফাঁসি কাঠে ঝুলতাম। এটা আমি কখনই বরদাস্ত করতাম না যে আমি রোজগার করে সকলের ঘর ভরবো, আর নিজের ছেলেপেলেদের নিয়ে মুখ বুজে উপোষ করবো।

ধনিয়া বৌকে তাহার সঙ্গে পাঠাইতে রাজি হইল না। ঝুনিয়াও এখন কিছুদিন এখানে থাকিতে চাহিল। ঠিক হইল, গোবর একলাই যাইবে।

পরের দিন সকালে গোবর সকলের কাছে বিদায় লইয়া লখনৌ রওনা হইল। হরি তাহাকে গাঁয়ের বাহির পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে আসিল। গোবরকে এর আগে কখনও ও এতটা ভালবাসে নাই। গোবর যখন উহাকে প্রণাম করিতে গেল, তখন হরি কাঁদিয়া ফেলিল, যেন পুত্রের সঙ্গে উহার আর দেখা হইবে না। হরির প্রাণে উল্লাস ছিল, গর্ব ছিল, সংকল্প ছিল। পুত্রের এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাইয়া তাহার মনে তেজ হইল, সে মহান্ হইয়া গেল। কয়েকদিন পূর্বে তাহার উপর অন্ধকারের মত যে অবসাদের ভাব আসিয়া গিয়াছিল, যাহাতে সে নিজের পথ ভুলিয়া যাইতেছিল, সেখানে এখন উৎসাহ ও আলো।

রূপা তাহার শ্বশুরবাড়িতে, মন তাহার খুসি। যে অবস্থায় তাহার বাল্যকাল কাটিয়াছিল, তাহাতে পয়সা ছিল সব চেয়ে দামী জিনিস। মনে কতই সাধ ছিল, যাহা মনেই জোট পাকাইয়া রহিয়া গিয়াছিল। সে এখন তাহা পূর্ণ করিতে থাকিল, আর রামসেবক আধবয়সী হইয়াও জোয়ান হইয়া গেল।

সে তো রূপার স্বামী ; সে জোয়ান, কি আধবয়সী, কি বুড়া, একথা রূপার নারীর মনে কোনই প্রভেদ আনিতে পারে নাই। তাহার মন স্বামীর আকার-প্রকার বা বয়সের উপর নির্ভর করে নাই, তাহার বুদ্ধি ছিল ইহা হইতে অনেক গভীরে, মানুষের মনের সাধু সংস্কার-পরম্পরার মত, যাহা শুধু প্রলয়ের ভূমিকম্পই নড়াইতে পারে। তাহার যৌবন ছিল নিজেই নিজের মধ্যে পাগল, তাহা নিজের জন্যই নিজের বেশভূষা করিত; নিজেই খুসি হইত। রামসেবকের কাছে ছিল তাহার অন্য রূপ। তখন সে গৃহিণী হইয়া যাইত, ঘরের কাজকর্মে লাগিয়া রহিত ; নিজের যৌবন দেখাইয়া স্বামীকে লজ্জায় বা ভাবনায় ফেলিতে চাহে নাই। কোনও প্রকার অপূর্ণতার ভাব তাহার মনে আসিত না। ধানভরা গোলা, আর গাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত ছড়ানো ক্ষেত, আর ঘরের দরজা পর্যন্ত মহিষের সারি, কোনও প্রকার অপূর্ণতাকে তাহার মনের ভিতর আসিতেই দেয় নাই।

আর তাহার সব চেয়ে বড় ইচ্ছা ছিল, বাপের বাড়ির সকলকে সুখী দেখে। কি করিয়া তাহাদের দারিদ্র দূর করে? সেই গোরুর স্মৃতি তাহার মনে এখনও নবীন, যে অতিথির মত আসিয়াছিল আর চলিয়া গিয়াছিল সকলকে কাঁদাইয়া। সেই স্মৃতি এত দিন পরে আরও মধুর হইয়া গিয়াছিল। এখনও তাহার মমত্ব এই নূতন সংসারে জমাট বাঁধিতে পারে নাই। সেই পুরানো সংসার ছিল তাহার নিজের সংসার। সেখানকার সকলেই ছিল তাহার আত্মীয়, তাহাদের দুঃখ তাহার দুঃখ, আর তাহাদের সুখই ছিল তাহার সুখ। এ বাড়ির দরজার গোড়ায় এক পাল মহিষ দেখিয়াও তাহার সেই হর্ষ হইতে পারে না, যাহা নিজের দরজার উপর একটা গোরু দেখিয়া হইত। তাহার বাবার এই আশা কখনই পূর্ণ হইতে পারিল না। যেদিন সেই গোরু আসিয়াছিল, সেদিন হরির কত উৎসাহ, যেন আকাশ হইতে কোনও দেবী আসিয়াছেন। তাহার পর তাহার আর এতখানি আয় হয় নাই যে আর একটা গোরু লইয়া আসিবে ; কিন্তু রূপা জানিত, আজও সেই লোভ হরির মনে ঠিক ততখানি সজাগ হইয়া আছে। এখন সে বাপের বাড়ি গেলে, সঙ্গে করিয়া ঐ ধবলী গোরু নিশ্চয় লইয়া যাইবে। আচ্ছা, নিজের লোক দিয়া পাঠাইয়া দেয় না কেন? রামসেবককে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা ছিল। রূপা রামসেবককে জিজ্ঞাসা করিল, প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়া গেল, আর পরের দিন এক গোয়ালার

মারফত রূপা গোরু পাঠাইল। গোয়ালাকে বলিল, বাবাকে বোলো, মঙ্গলে দুধ খাওয়ার জন্য পাঠালাম। হরিও গোরু কিনিবার ফিকিরে ছিল। তাহ এমনি গোরু কেনার এখনই তাড়াতাড়ি কিছু ছিল না; কিন্তু মঙ্গল এখানে সে দুধ বিনা থাকে কি করিয়া! টাকাটা পাইলেই সে সকলের আগে গোরু কিনিবে। মঙ্গল এখন শুধু তাহার নাতি নয়, শুধু গোবরের ছেলে নয়, মালতী দেবীর খেলনাও বটে; শিশুর লালন পালন সেইভাবেই হওয়া চাই।

কিন্তু টাকা আসিবে কোথা হইতে? ঘটনাচক্রে সেই দিন এক ঠিকাদার রাস্তার জন্য গাঁয়ের অনুর্বর জমিতে কাঁকর তুলিতে শুরু করিল। হরি শোনামাত্র চটপট সেখানে গিয়া পৌঁছিল, আর আট আনা রোজ হারে মাটি খুঁড়িতে লাগিল; যদি এ কাজ দু মাসও টিকিয়া যায়, তাহা হইলে সে গোরুর পুরা টাকাটা পায়। দিনভর লু ও রোদে কাজ করিবার পর সে যখন ঘরে ফেরে, তখন দেহে একেবারে প্রাণ থাকে না; কিন্তু মনে অবসাদেরও নাম নাই। পরের দিন আবার পুরা উৎসাহে কাজ করিতে যায়। রাত্রেও খাবার খাইয়া কেরোসিনের কুপি সামনে রাখিয়া বসিয়া পড়ে, আর সুতলি কাটে। বারোটা একটা বাজিলে শুইতে যায়। ধনিয়াও পাগল হইয়া গিয়াছিল, তাহাকে এতটা মেহনৎ করিতে বাধা না দিয়া নিজেই তাহার সঙ্গে বসিয়া বসিয়া সুতলি কাটিত। গোরু তো নিতেই হইবে, রামসেবকের টাকাটাও যে শোধ করিতে হইবে। গোবর বলিয়া গিয়াছে। সে একটা মস্ত ভাবনা।

রাত বারোটা বাজিল। দুইজনে বসিয়া সুতলি কাটিতেছে। ধনিয়া বলিল—তোমার ঘুম পায় তো গিয়ে শুয়ে পড়। ভোর বেলা আবার কাজে যেতে হবে।

হরি আকাশের দিকে চাহিল—যাব এখন। বড় জোর দশটা বেজেছে। তুই শো গিয়ে।

আমি তো দুপুর বেলায় একটু ক্ষণ গড়িয়ে নিই।

আমিও দুটো মুখে দিয়ে গাছতলায় শুয়ে নিই।

বড্ড লু লাগে না?

লু আবার কী লাগবে! বেশ সুন্দর ছায়া আছে।

আমার ভয় করে, তুমি কোন অসুখে না পড়ে যাও।

সে-ই অসুখে পড়তে পারে, যে অসুখে পড়বার ফুরসৎ পায়। এখন তো

আমার এই চেষ্টা যে গোবর এখনই যদি আসে তো দেখবে যে রামসেবকের অর্ধেক টাকা শোধ হয়ে গেছে। ও নিজেও তো কিছু নিয়ে আসবে। ব্যস, এ ছর এ ধার থেকে মুক্তি পেলে নতুন জীবন হবে।

গোবরের এখন খুব খেয়াল হয়েছে ; কতটা ঠাণ্ডা হয়েছে।

যাওয়ার সময় পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল।

মঙ্গল ওখান থেকে যখন এল, কেমন শক্ত ছিল! এখানে এসে দুর্বল হয়ে গেছে।

ওখানে দুধ, মাখন, কী না পেত! এখানে রুটি পেলেই খুব। ঠিকাদারের কাছ থেকে টাকা পেলে আর একটা গোরু আনতাম।

গোরু কখন এসে যেত, তুমি যদি কথা শুনতে। নিজের ক্ষেতিই সামলাতে পারলে না, পুনিয়ার ভারও মাথা পেতে নিলে!

কি করব, ধর্ম বলেও তো একটা কিছু আছে। হীরা যে কাঁচা কাজ করল। ওর ছেলেপুলে সামলাবার কেউ চাই তো। আমি ছাড়া আর কে ছিল, বল। আমি না দাঁড়ালে ওর আজ কি গতি হত, ভেবে দেখ। এত সব করার পরও মংরু ওর নামে নালিশ করেই দিল।

টাকা পুতে রাখবে তো নালিশ হবে না?

কি বকছিস? ক্ষেতি থেকে পেট চলে তো খুব বলতে হবে। পুতে কে কি রাখবে?

হীরা যেন সংসার থেকেই চলে গেছে।

আমার মন বলছে, ও কখনও না কখনও নিশ্চয় আসবে।

দুইজনে শুইয়া পড়িল। হরি অন্ধকারে জাগিয়া দেখিল যে হীরা সামনে দাঁড়াইয়া, বড় বড় চুল, কাপড় ছেঁড়া-খোড়া, মুখ শুকনা, শরীরে রক্ত আর মাংসের নাম গন্ধ নাই, যেন লম্বাতেও খাটো হইয়া গিয়াছে। ছুটিয়া আসিয়া হরির পায়ে পড়িল।

হরি তাহাকে বুকে জড়াইয়া বলিল—তুমি একেবারে কী হয়ে গেছ হীরা, কখন এলে? আজ বার বার তোমার কথা মনে আসছিল। অসুখ হয়েছিল না কি?

আজ তাহার চোখে আর ঐ হীরা রহিল না, যে তাহার জীবনকে দুঃখময় করিয়া দিয়াছে, আজ এ সেই হীরা, যে ছিল বাপ মায়ের ছোট্ট ছেলে। মাঝের এই পঁচিশ ত্রিশ বৎসর যেন মিলাইয়া গিয়াছে, তাহার কোনও চিহ্নই নাই।

হীরা কোনও জবাব দিল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

হরি তাহার হাত ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল—কেন কাঁদছ ভাই, লোকের তো ভুল চুক হয়েই থাকে। কোথায় ছিলে এত দিন?

হীরা কাতর স্বরে বলিল—কি বলব দাদা। ব্যস, এইটে বুঝে নাও যে তোমার দর্শন বাকি ছিল, বেঁচে গেলাম। গোহত্যার পাপ আমার ওপর ভর করল। মনে হত, ঐ গোরুটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে—সর্বদা, শুয়ে, জেগে, কখনও চোখের আড়াল হত না। আমি পাগল হয়ে গেলাম, আর পাঁচ বৎসর ছিলাম পাগলাগারদে। সেখান থেকে বেরিয়েছি আজ ছয় মাস হল। চেয়ে চিন্তে খেতাম। এখানে আসবার সাহস ছিল না, কোন মুখে সংসারে আসব? শেষে প্রাণ মানল না। মন শক্ত করে চলে এলাম। তুমি আমার ছেলেপুলেদের···

হরি বাধা দিয়া বলিল—তুমি মিছিমিছি পালিয়েছিলে। ওরে, দারোগাকে পাঁচ দশ টাকা দিয়ে মামলার দফা রফা করে দেওয়া যেত, কি আর হত।

প্রাণ থাকতে তোমার ঋণ শুধতে পারব না দাদা।

আমি তো আর পর নই ভাই।

হরি খুসি হইল। জীবনের সমস্ত সংকট, সমস্ত নৈরাশ্য, যেন তাহার পায়ে লুটাইতেছে। কে বলে জীবনসংগ্রামে তাহার হার হইয়াছে? এই উল্লাস, এই গর্ব, এই পুলক, এ কি হারের লক্ষণ? এই হারেই তাহার জয়। তাহার টুটা-ফুটা অস্ত্র তাহার বিজয় পতাকা হইয়াছে। তাহার বুক ফুলিয়া উঠিল, মুখে তেজের দীপ্তি দেখা দিল। হীরার কৃতজ্ঞতায় তাহার জীবনের সমস্ত সফলতা মূর্তিমান হইয়া উঠিল। তাহার খামারে দুই এক শ মণ ধান থাকিতে পারিত, তাহার হাঁড়িতে হাজার পাঁচ শ পোতা থাকিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইতে এই স্বর্গসুখ পাওয়া যাইত কি?

হীরা তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত দেখিয়া বলিল—তুমিও তো খুব রোগা হয়ে গেছ দাদা!

হরি হাসিয়া বলিল—তা এ কি আমার মোটা হওয়ার বয়স? মোটা সেই লোকই হয়, যার না আছে ঋণের চিন্তা, না ইজ্জতের। এ যুগে মোটা হওয়া নির্লজ্জতার কথা। এক শ লোককে রোগা করে তবে একজন মোটা হয়। এ মোটা হওয়ায় কী সুখ! সুখ তো তখন, যখন সকলে মোটা হয়। শোভার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

তার সঙ্গে তো রাত্রেই দেখা হয়েছে। তুমি তো নিজেকেও পেলেছ, যে তোমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে তাকেও পেলেছ, আর নিজের গৌরবও বাড়িয়েছ। সে তো ক্ষেতবাড়ি সব বিক্রী-টিক্রী করে দিয়েছে, এখন ওর চলবে কিসে ভগবান জানেন।

আজ যখন হরি মাটি খুঁড়িতে গেল, তখন তাহার গা ভার বোধ হইতেছিল। রাত্রের ক্লান্তি দূর হইতে পারে নাই, কিন্তু তাহার চলনে তেজ ছিল, আর চালে ছিল নির্দ্বন্দ্বতার দর্প—সংসারে কেহ যেন তাহার শত্রু নাই।

আজ দশটা বাজিতেই লু চলা আরম্ভ হইল, দুপুর হইতে না হইতেই আগুনের বৃষ্টি হইতে লাগিল। হরি কাঁকরের বোঝা উঠাইয়া খাদ হইতে রাস্তার উপর লইয়া আসিত, আর গাড়ীতে বোঝাই করিত। যখন দুপুরের ছুটি হইল, তখন তাহার আর দম রহিল না। এত ক্লান্তি তাহার কখনও হয় নাই। তাহার পা আর ওঠে না। শরীর ভিতর হইতে পুড়িয়া যাইতেছে। সে না করিল স্নান, না দাঁতে কাটিল কিছু, সেই ক্লান্তির ভরে গামছা বিছাইয়া এক গাছের নীচে শুইয়া পড়িল। কিন্তু পিপাসায় গলা শুকাইয়া যায়। খালি পেটে জল খাওয়া ঠিক নয়। সে পিপাসা দমন করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভিতরের দাহ বাড়িয়া যাইতেছে। আর চুপ করিয়া থাকিতে পারা গেল না। একজন মজুর বালতি ভরিয়া রাখিয়াছিল, আর জলখাবার খাইতেছিল। হরি উঠিয়া এক ঘটি জল খাইল, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া আবার শুইয়া পড়িল; কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহার বমি হইয়া গেল, আর মুখের উপর যেন মৃত্যুর ছায়া আসিয়া পড়িল।

সেই মজুরটি বলিল—শরীর কেমন লাগছে, হরি ভাই?

হরির মাথা ঘুরিতেছিল, বলিল—কিছু নয়, ভালই আছি।

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার আবার বমি হইল, আর হাত-পা ঠাণ্ডা হইতে লাগিল। ও ঘাবড়াইয়া গেল। মাথা ঘুরিতেছে কেন? চোখের সামনে যেন আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে। তাহার চোখ বুজিয়া গেল, জীবনের সমস্ত স্মৃতি জীবন্ত হইয়া হৃদয়পটে আসিতে লাগিল; কিন্তু তাহার ক্রম নাই, আগেরটা পরে, পরেরটা আগে, স্বপ্নে দেখার মত, মিল নাই, বিকৃত, অসম্বদ্ধ। সেই সুখের ছেলেবেলা আসিল, যখন সে ডাণ্ডাগুলি খেলিত, মার কোলে শুইয়া

থাকিত। আবার সে দেখিল, গোবর আসিয়া যেন তাহার পায়ে পড়িতেছে। এই দৃশ্য বদলাইয়া গেল; ধনিয়া কনে সাজিয়া লাল শাড়ি পরিয়া তাহাকে খাদ্য পরিবেশন করিতেছে। আবার এক গোরুর ছবি সামনে আসিল, একেবারে কামধেনুর মত। সে তাহার দুধ দুহিয়া মঙ্গলকে খাওয়াইতেছিল, এমন সময় গোরু এক দেবী মূর্তি ধারণ করিল আর...

সেই মজুর আবার ডাকিল—দুপুর ঢলে গেল হরি, চল, ঝুড়ি উঠাও।

হরি কিছু বলিল না। তাহার প্রাণ না জানি কোন লোকে উড়িতেছিল। তাহার শরীর পুড়িয়া যাইতেছিল, অথচ হাত পা ঠাণ্ডা; লু লাগিয়াছিল।

তাহার বাড়িতে সংবাদ দিতে লোক ছুটিল। এক ঘণ্টার মধ্যে ধনিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া পৌছিল; শোভা আর হীরা পিছনে পিছনে ছোট খাটিয়াকে ডুলির মত করিয়া আনিতেছিল।

ধনিয়া হরির গায়ে হাত দিয়া দেখিল, অমনই তাহার বুক ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মুখ নিষ্প্রভ হইল।

কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল—তোমার শরীর কেমন আছে?

হরি অস্থির দৃষ্টিতে দেখিয়া বলিল—তুমি এসেছ গোবর, আমি মঙ্গলের জন্য গোরু এনেছি। ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে, দেখ।

ধনিয়া মৃত্যুর চেহারা দেখিয়াছে, মৃত্যুকে সে চিনিত। তাহাকে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতে দেখিয়াছে, আঁধির মত আসিতেও দেখিয়াছে। তাহার সামনে শাশুড়ী মরিয়াছে, শ্বশুর মরিয়াছে, নিজের দুই ছেলে মরিয়াছে, গাঁয়ের কত লোক মরিয়াছে। বুকে এক ধাক্কার মত লাগিল। এই আশ্রয়, যাহাকে ধরিয়া জীবন টিকিয়া আছে, তাহা যেন পড়িয়া যাইতেছে; কিন্তু না, এ ধৈর্যের সময়, তাহার শঙ্কা অমূলক, লু লাগিয়াছে, এই জন্য অজ্ঞান হইয়াছে।

উদ্গত বাষ্প রুদ্ধ করিয়া সে বলিল—আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমি, আমাকে চিনতে পারছ না?

হরির জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। মৃত্যু নিকটে আসিয়া গিয়াছিল; আগুন ধক ধক করিয়া জ্বলিতেছিল, ধোঁয়া থামিয়া গিয়াছিল। ধনিয়াকে সে দুই চোখ ভরিয়া দেখিল। চোখের দুই কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। ক্ষীণস্বরে বলিল—আমার কথা টথা মাপ করিস ধনিয়া, এখন যাচ্ছি। গোরুর জন্য লালসা

মনেই রয়ে গেল। এখন তো সব টাকা ক্রিয়াকর্মে যাবে। কাঁদিস না ধনিয়া, কতদিন বাঁচিয়ে রাখবি! সব দুর্দশা তো ভোগ হয়ে গেছে; এখন যেতে দে।

অমনই তাহার চোখ আবার বন্ধ হইয়া গেল। সেই সময় হীরা আর শোভা ডুলি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল; হরিকে উঠাইয়া তাহারা ডুলিতে শোয়াইয়া দিল, আর গাঁয়ের দিকে রওনা হইল।

গাঁয়ে এই খবর হাওয়ার মত ছড়াইয়া পড়িল। সমস্ত গাঁ একত্র হইল। হরি খাটের উপর পড়িয়া হয়তো সব কিছুই দেখিতেছে, সব কিছুই বুঝিতেছে, কিন্তু কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হাঁ, তাহার চক্ষু হইতে নির্গত অশ্রু বলিয়া দিতেছিল, মোহের বন্ধন ছেঁড়া তাহার কত কঠিন লাগিতেছে। যাহা সে নিজে করিতে পারে নাই, তাহার জন্য দুঃখের নামই তো মোহ। যে কর্তব্য পালন করা হইয়াছে, আর যে কার্য সম্পন্ন করা হইয়াছে, তাহার জন্য আবার মোহ কি? মোহ তো সেই সব অনাথকে ছাড়িয়া যাওয়াতেই, যাহাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য করিতে পারি নাই; মোহ তো সেই সব অতৃপ্ত অভিলাষের জন্য, যাহা পূর্ণ করিতে পারি নাই।

কিন্তু সব কিছু বুঝিয়াও ধনিয়া আশার বিলীয়মান ছায়া ধরিয়া রহিল। চোখ হইতে জল পড়িতেছে, যন্ত্রের মত ছুটিয়া ছুটিয়া কখনও আম সিদ্ধ করিয়া তাহার রস তৈয়ারি করিতেছে, কখনও হরির শরীরে গমের ভুষি মালিশ করিতেছে। কি করিবে, পয়সা নাই, না হইলে কাহাকেও পাঠাইয়া ডাক্তার আনাইত।

হীরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বৌঠাকরুণ, মনকে শক্ত কর, গোদান করিয়ে দাও, দাদা চলল।

ধনিয়া তাহার পানে তিরস্কারের চোখে চাহিল। মনকে ও আর এখন কত শক্ত করিবে? নিজের স্বামীর প্রতি উহার যে কর্তব্য, তাহা কি উহাকে বলিয়া দিতে হইবে? যে ছিল জীবনের সঙ্গী, তাহার নাম করিয়া কাঁদাই কি উহার ধর্ম?

আরও কয়েক জনের স্বর কানে আসিল—গোদান করাও, এখনই—এই সময়।

ধনিয়া যন্ত্রের মত উঠিল, আজ যে সুতলি বেচিয়াছিল, তাহার বিশ আনা পয়সা লইয়া আসিল, আর স্বামীর ঠাণ্ডা হাতের মধ্যে তাহা রাখিয়া সম্মুখে

[illegible] দাতাদীনকে বলিল—মহারাজ, ঘরে না আছে গোরু না আছে বাছুর, না আছে পয়সা ; এই যা পয়সা রয়েছে, এইটেই এর গো-দান।

তখনই আছাড় খাইয়া ধনিয়া পড়িয়া গেল।

---